তাইহোকু থেকে ভারতে

• নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য •

আরুণি পাবলিকেশনস
৭/১ সি, লিন্ডসে স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০ ০৮৭

উৎসর্গ

॥ অমর আত্মা মেজর সত্যভূষণ গুপ্ত (আরণ্যক সত্যমুনি) ॥

শ্রীঅভিজিৎ

TAIHOKU THEKE BHARATE

SHRI ABHIJIT

Contemporary history carries, with its own charms as well as its own complications. And in it—Subhas's, what a history —what charms, what complications—A stormy life from boyhood onwards, a strange combination of mysticisms and reality, of intense religious fervour and stern practical sense, a deep imotional susceptibility and cold calculating pragmaticism..................

Excerpts from—The History of the Indian
National Congress Vol. II (1935-1947)
Page 678
By Dr. Pattabhi Sitaramyya.

বন্দেমাতরম্

"তাইহোকু থেকে ভারতে" গ্রন্থটির লেখক শ্রীযুক্ত অভিজিৎ সরকার গ্রন্থকার হিসাবে অপরিচিত তো বটেই, সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অখ্যাত লেখক। অথচ, বইটি পড়ে শেষ করবার পর কিন্তু বিপরীত ধারণা হবে। এমন একটি গ্রন্থের জন্য ভূমিকা লেখা অতীব দুরূহ। খ্যাতিবান্ সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকের লিখিত পুস্তকের জন্য ভূমিকা লিখে দেবার অভাব ঘটে না। কেন না তাতে ভূমিকা লেখকের কোনো প্রকার ঝুঁকি থাকে না; নির্দ্বিধায় লিখে দেওয়া যায়। অখ্যাত জনের সঙ্গে নিজের সুনাম জড়িয়ে কে আর বিপদের ঝুঁকি নেবেন?

"তাইহোকু থেকে ভারতে" পুস্তকটি যখন প্রবন্ধাকারে "অচল পত্র" সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল তখন অন্যান্য বহু পাঠকের ন্যায় আমিও সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম, হায়! এমন একটি অমূল্য অভিনব তথ্যপূর্ণ লেখা পুস্তাকাকারে কবে পাব? আজ আমাদের অন্তরের আশা পূরণ হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অতি অযোগ্য অধমের ঘাড়ে সেই গুরুভার এসেছে। অজ্ঞাত নামা লেখকের জন্য আমার মত একেবারে অখ্যাত ব্যক্তিকেই প্রকাশক পাকড়াও করেছেন। বোধ হয় মনে করেছেন, এতে তাঁদের বিপদ কম।

গ্রন্থলেখক সম্বন্ধে কিন্তু এ-কথা খাটে না। এইটি এক পরম বিস্ময়কর ব্যাপার। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যে এমন একটি আকর-গ্রন্থ লেখা আদৌ সম্ভবপর কিনা তা না পড়লে কেউ ধারণাও করতে পারবেন না। অভিজিৎ বাবু তাঁর লেখায় যে উপাদান-বাহুল্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন—যে সম্পদ উপহার দিয়েছেন তা আশ্চর্যজনক। পৃথিবীর নানাদেশের সরকারী বে-সরকারী নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা ব্যাপক হারে ব্যবহার তো করেছেনই তা ছাড়া স্বদেশের ও বিদেশের গোয়েন্দা দপ্তর ও গুপ্তচক্রের অতি-গোপনে সংরক্ষিত রিপোর্ট উদ্ধার করে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়ের সপক্ষে হাজির করেছেন। এই অপ্রত্যাশিত মুন্সিয়ানা আমাদের দেশের অতি-নামী লেখককুলের পক্ষেও ঈর্ষার বস্তু হবে। লেখকের পক্ষে আরও বাহাদুরীর বিষয় যে ঐ পর্বত-প্রমাণ তথ্যাবলী স্তূপাকারে আমাদের ঘাড়ে চাপেনি। সতর্কতা সহকারে নিপুণভাবে বেছে বেছে তিনি তাঁর তূণীতে তীক্ষ্ণ তীরগুলি সংগ্রহ করেছেন।

বিচিত্র আমাদের দেশ। আর ততোধিক বিচিত্র সেই দেশের মানুষ। নতুবা জীবিত ব্যক্তিকে মৃত প্রতিপন্ন করবার জন্য কমিশন বসে? এই বিশ্ব-সংসারে এই সিদ্ধান্তটি দ্বিতীয় রহিত। কমিশন করে মেজরিটি ভোটে সাব্যস্ত হ'ল নেতাজী মৃত—অতএব নেতাজী মৃত। মহাভারতের যুধিষ্ঠিরকে যদি আজ ধর্মরাজ প্রশ্ন করতেন সপ্তভুবনের মধ্যে সব চাইতে আশ্চর্য তত্ত্ব কি, তবে বাজী রেখে বলা যায় তিনি বলতেন যে—সুভাষচন্দ্রকে এই পন্থায় মৃত ঘোষণা করা।

সাম্প্রতিক কালে বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার ন্যায় নেতাজী সম্পর্কিত পুস্তক রাশি লিখিত ও সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। অবশ্য তাতে আমাদের পাঠকদের প্রত্যাশা ও পিপাসা কতখানি মিটছে এ সংশয়ান্বিত প্রশ্ন করা যায়। স্বকপোল কল্পিত নেতাজীর চরিত্র ব্যাখায় সুভাষচন্দ্র নামক বিশ্ব-ইতিহাসের সেই অদ্বিতীয় পুরুষের তিলমাত্র আভাস হয়তো পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, তিল পরিমাণ আভাসই পাওয়া যায়। বিকৃত ব্যাখাকারীদের সম্বন্ধে বক্রোক্তি নাই-বা করলাম। মহাকাশকে পরিমাপ করা অসাধ্য, সে অপারগতা অপরাধ নয়। এই গ্রন্থের লেখক কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন-পথ-যাত্রী। তিনি যে বিষয় আশ্রয় করে এই পুস্তক লিখেছেন সেই বিষয়ে আজ পর্যন্ত কোন গ্রন্থ লিখিত হয়নি। অথচ ভাবতে অবাক হই এত সব অগণিত খ্যাত-বিখ্যাত অতি-বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক সাহস করে এই পথে অগ্রসর হননি কেন? ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগস্ট হতে ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের শেষ পাদ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এই বিষয়বস্তুটি নিয়ে কেউ কিছু লিখলেন না কেন আমাদের মত অতি সাধারণ অগণিত নেতাজী ভক্তের জন্য! অন্তরের বোবা-ভক্তি ছাড়া যারা সর্বরিক্ত তাদের উপর বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের এই অবহেলা কেন? তাঁদের দয়া-দাক্ষিণ্য থেকে কেন আমরা বঞ্চিত থাকলাম। যাক্। আশাতীত রূপে আমাদের প্রত্যাশা মিটেছে। বিধির বিধান "কেমনে কী ইন্দ্রজাল করে যে নির্মাণ সংগোপনে সবার নয়ন অন্তরালে কেহ নাহি জানে।" তাই—"নির্দিষ্ট কালে মুহূর্তে অসম্ভব আসে:..।" ইহাই নিয়তির অমোঘ ব্যবস্থাপনা। আমাদের মত অভাজনের সান্ত্বনা হয়।

ভিন্নদেশে এইরূপ গবেষণা মূলক গ্রন্থ গবেষণা সঙ্ঘের (Research team) সাহায্য ব্যতীত রচিত হয় না। লেখক একক প্রচেষ্টায় সেই অসাধ্য সাধনে সিদ্ধিলাভ করেছেন। লেখক শুধুমাত্র ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্রই নহেন—

তিনি সুভাষ-সাহিত্যের যথার্থ পথিকৃৎ রূপে আগামী কালে বরণীয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশককেও ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করি যে নিরাপদ ব্যবসায়িক পথে না গিয়ে এই পুস্তক প্রকাশ করবার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। এই গ্রন্থের লেখকের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল তাঁর সর্ব-সংকীর্ণতা মুক্ত উদার বিশ্লেষণ। এ দেশে এখন রেওয়াজ, নেতাজী সম্বন্ধে কোন বই লিখলেই মহাত্মাজীকে তুলনামূলক ভাবে হেয় করে দেখান হয়। অর্থাৎ নেতাজী অনেক বড়—তার প্রমাণ গান্ধীজি খুবই ছোটো। এই শিশুসুলভ সহজ পথে লেখক তার প্রতিপাদ্য প্রকাশ করেন নি।

মূলতঃ গ্রন্থটি "শাহনওয়াজ কমিশান"-এর রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে লেখা। ঐ রিপোর্টকে তিনি তন্ন তন্ন করে পড়েছেন এবং ন্যায় শাস্ত্রের শাস্ত্রানুযায়ী তীক্ষ্ণ প্রবল ও শাণিত যুক্তি দ্বারা তা খণ্ডিত করে স্ব-মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। এবং তাতে আশাতীত সফলতা লাভ করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি যে, "শাহনওয়াজ কমিশন রিপোর্টটি "নিরাকার ব্রহ্মের ন্যায় তুলে ধরিয়ে দিয়ে যথার্থ সুকার্য করেছেন। লেখকের প্রকাশ রীতি নিজস্ব ও স্বকীয়তায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। অতি-আধুনিক ভঙ্গীসর্বস্ব বাক্ চাতুর্যের মনোহারিত্বের মোহ ত্যাগ করে বিষয়ানুগ রীতিতে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন শ্রীযুক্ত অভিজিৎ সরকার। লেখা সর্বত্র ত্রুটি বিমুক্ত না হলেও গুণের তুলনায় তা উপেক্ষণীয়। প্রায় ছয় শত পৃষ্ঠার পুস্তক পাঠ সমাপনান্তেও মনে হয় এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল কেন।

আমরা এই গ্রন্থের পরবর্তী পর্বের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকলাম। পরিশেষে আর একটি কথা না বললে আমার ত্রুটি হবে—তা হল বইটির প্রচ্ছদ-পট। গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একাঙ্গীকৃত হয়েছে। শিল্পী সত্যই প্রসংশার দাবী করতে পারেন ইতি—

জয়হিন্দ্

শ্রীবিশ্বজিত দত্ত

—গ্রন্থকারের নিবেদন—

অতি-অল্প সময়ের মধ্যে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যাবে তা অকল্পনীয় এবং অপ্রত্যাশিত। মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে এই কথাই প্রমাণ করে যে, আমাদের দেশের জন-মানসে নেতাজীর ভাব-মূর্তির শাশ্বতদ্যুতি অকৃত্রিম ও চিরভাস্বর। যদিচ রাজনৈতিক ভাষ্যকারণ-বৃন্দ ভিন্নতর কথাই এতদিন আমাদের বুঝিয়েছেন। নেতাজী পূজারী হিসাবে এজন্য সবাইকে আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই—বিশেষ করে পাঠকবর্গকে,—প্রকাশকের পক্ষ থেকে এবং নিজের পক্ষ থেকে।

এই পুস্তক লেখার ও লেখাবার মূলপ্রেরণা দাতা যিনি প্রথম সংস্করণে তাঁর নাম আদৌ উল্লেখ করা হয় নি। শুধু প্রেরণা দাতাই নন তিনি, তার সীমাহীন নিরলস পরিশ্রম এর পিছনে না থাকলে এই গ্রন্থ কখনও লোকগোচর হ'ত না—এই ধ্রুব সত্য সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করি। বিনয় বশতঃই তিনি তাঁর নামোল্লেখ করেন নি। তাঁকে আমার অন্তরের অভিনন্দন জানাই।

যিনি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন তাঁর বিষয়ে কিছু বলবার আছে। তিনি আমার অগ্রজ প্রতীম। একরূপ পীড়াপীড়ি করেই ভূমিকা নিয়েছিলাম। পুস্তকে তাঁর নাম সংশ্লিষ্ট না করবার কারণ হল এই যে, এই গ্রন্থের বর্তমান পর্বে ও পরবর্তী পর্বে প্রসঙ্গক্রমে অনেকবার তাঁর নাম উল্লিখিত হবে। ভূমিকার বয়ান লিখিয়ে নিয়ে তাঁর অজ্ঞাতেই তাঁর অধুনা অপ্রচলিত নামটি ব্যবহার করি। বর্তমানে অনেক অনুনয়ে তাঁর নাম প্রকাশে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ভূমিকা-লেখক—শ্রদ্ধাভাজন শ্রীবিশ্বজিত দত্ত। গত ২৩।২৪ বৎসর ধরে তাঁর সংগৃহীত নানাবিধ তথ্যাবলীর ভিত্তিতেই এই পর্ব-গ্রন্থ রচনা। অতএব মূলতঃ দায়-দফা তাঁরই।

শ্রীরমেন ভট্টাচার্য আমার ব্যক্তিগত বন্ধু—তাঁর সম্বন্ধে আর বেশী কি লিখবো? ইতি—

বিনীত

কলিকাতা শ্রীঅভিজিৎ

স্বামী বিবেকানন্দ

কায়রো—১৯০০ খৃঃ
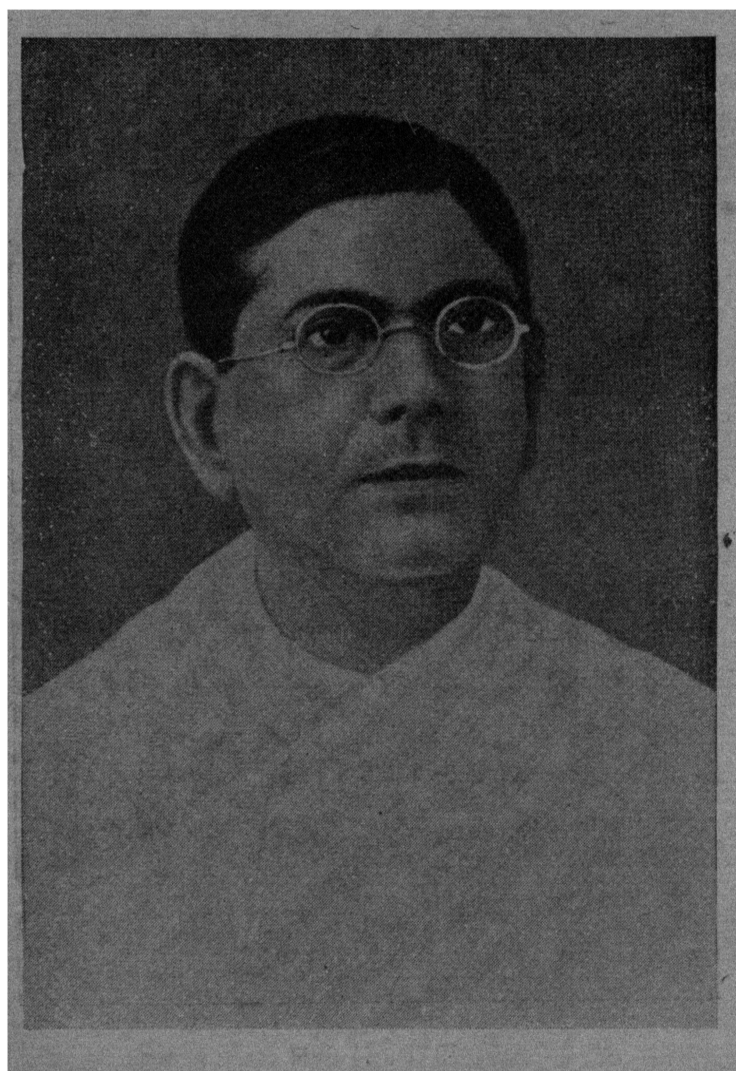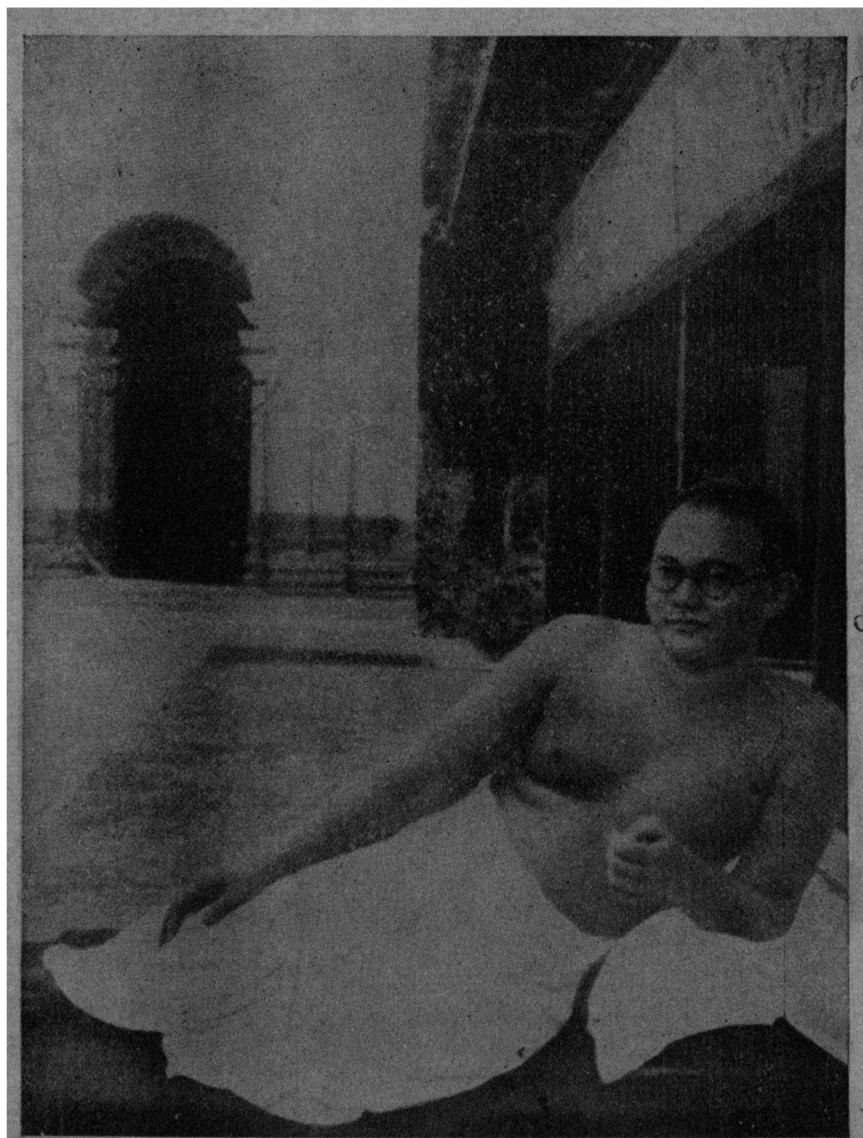
শ্রীসুভাষচন্দ্র বোস

বরিশাল, উজিরপুর গ্রামে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে—১৯৩১
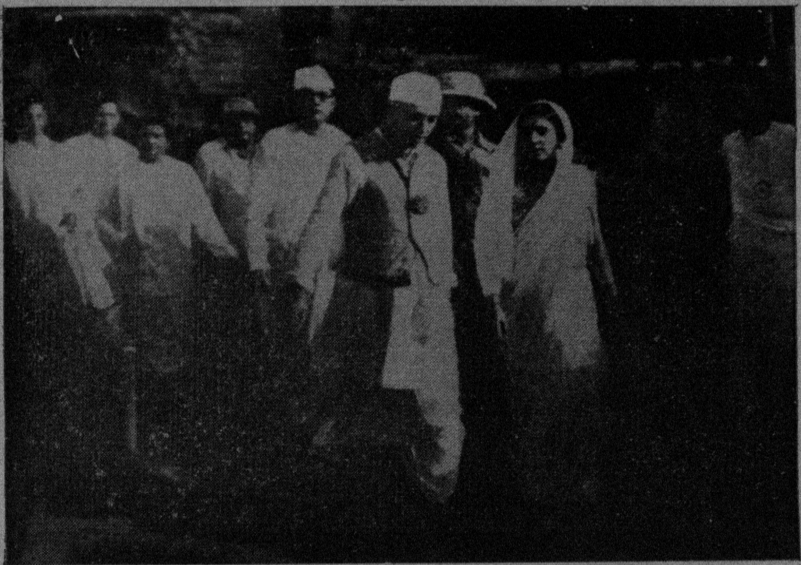
সুভাষচন্দ্র, পণ্ডিত নেহেরু ও বিজয়লক্ষী পণ্ডিত; ওয়েলিংটন স্কোয়ার-১৯৩৯

শ্রীসুভাষচন্দ্র বোস, জি. ও. সি. বি. ভি.—১৯২৮ খৃঃ কলিকাতা
কংগ্রেসের সভাপতি৺মতিলাল নেহেরু ও ৺যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
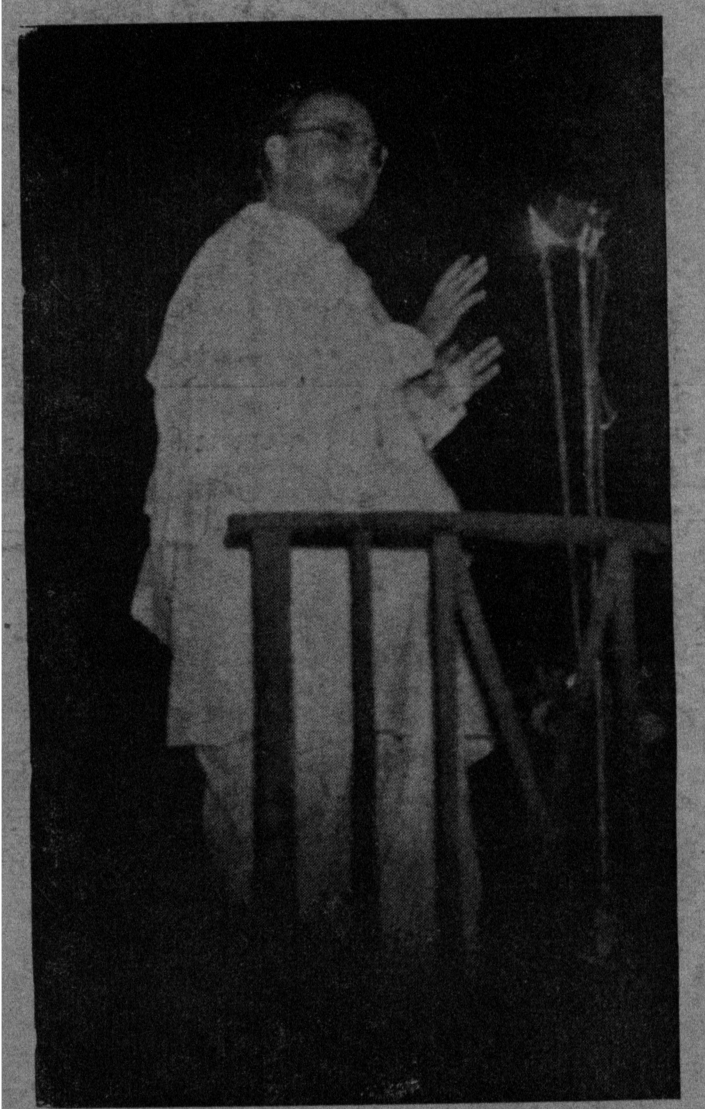
সুভাষচন্দ্র বোস ১৯৩৯, ৩রা মে, শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বক্তৃতারত
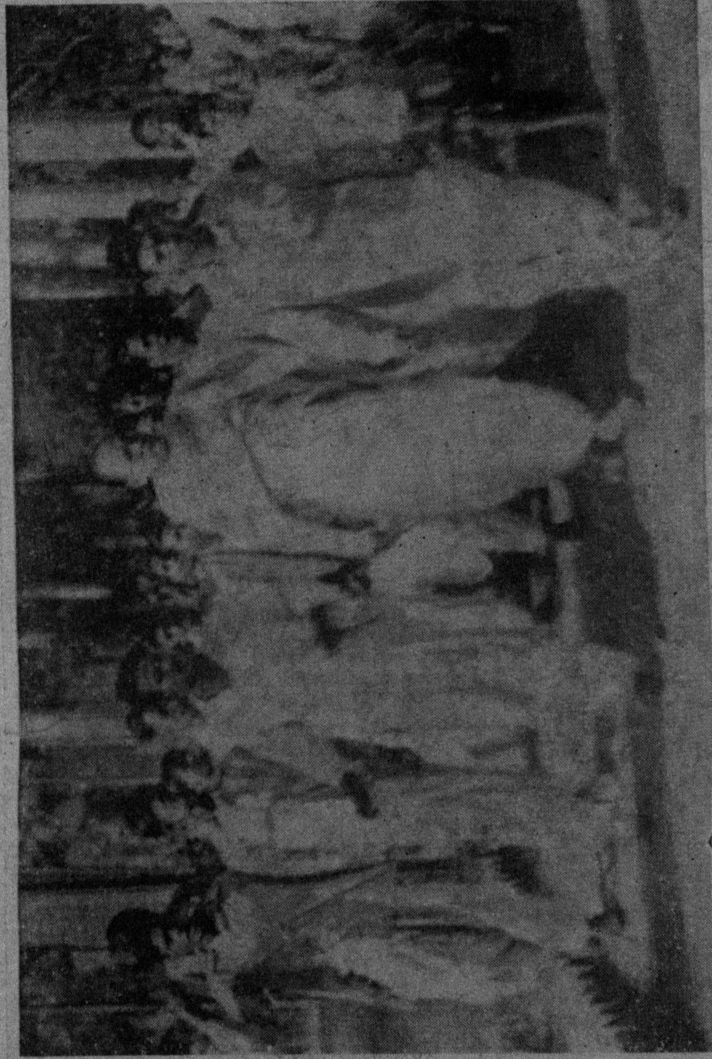
শ্রীসুভাষচন্দ্র বোস ১৯৩৯ খৃঃ ওয়েলিংটন স্কোয়ারে

সুভাষচন্দ্র ও শ্রীমতী মূলার — ভিয়েনা ১৯৩৫-৩৬

শ্রীসুভাষচন্দ্র বোস ও ৺ভুলাভাই দেশাই

শ্রীসুভাষচন্দ্র বোস—ওরফে সিনোর অর্লাণ্ডো ম্যাসেট্টা

—বার্লিন, ১৯৪১

নেতাজী ও এন. জি. গানপুলে (বার্লিন)

রাবার বোটে নেতাজী

সাবমেরিনে নেতাজী

ব্লাকড্রাগন সংস্থার প্রধান মিঃ তোয়ামার সঙ্গে আলোচনারত নেতাজী
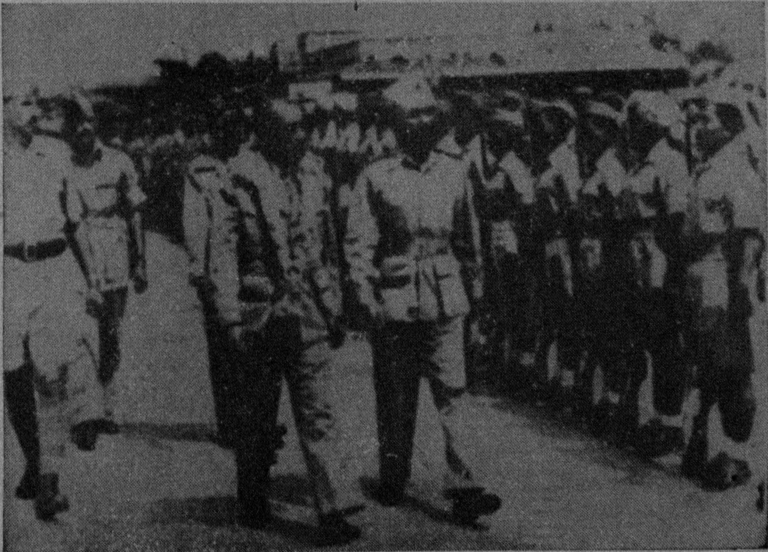
জেনারেল মোহন সিং (দক্ষিণে) এবং রাসবিহারী বসু
আজাদহিন্দ বাহিনী পরিদর্শন করছেন, মে, ১৯৪২

জার্ম্মানীর মেসেরিজে শ্রীসুভাষচন্দ্র বোস ও হপম্যান্ হারবিগ

নেতাজী জাপ পররাষ্ট্র মন্ত্রী শিগেমিৎসুর সঙ্গে করমর্দনরত

বেতারে ভাষণরত নেতাজী। পিছনে মহাত্মাজীর ছবি
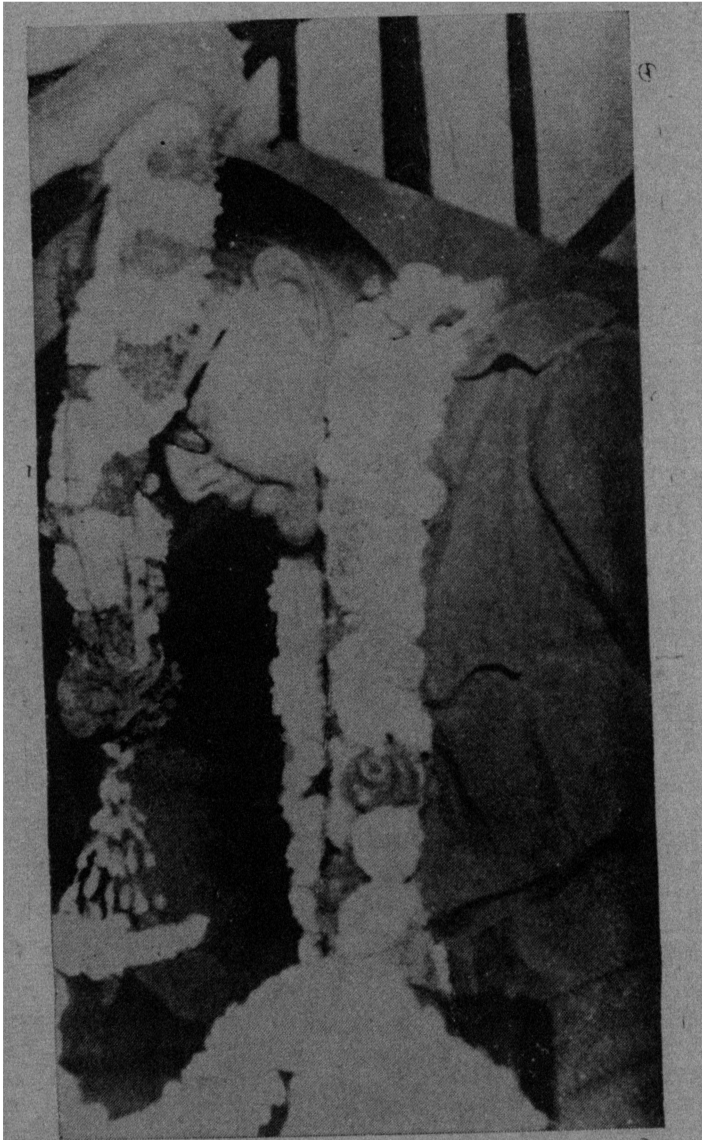
সর্ব্বাধিনায়ক—নেতাজী সুভাষচন্দ্র (শোনান)
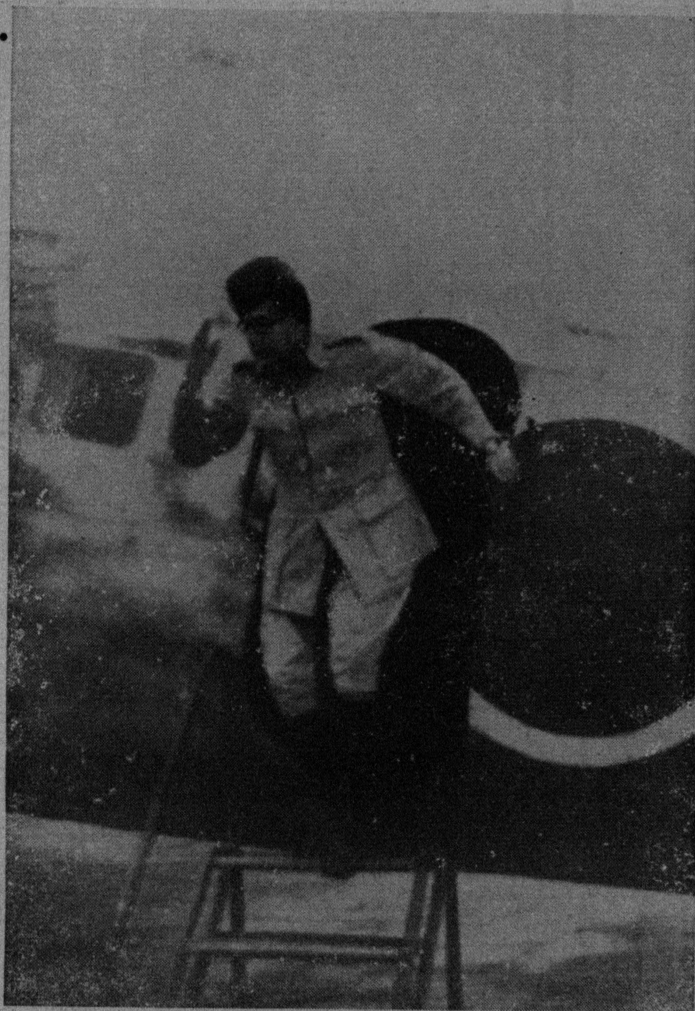
নেতাজী সিঙ্গাপুরে এলেন (হাতে গোল ঘড়ি লক্ষণীয়)

PLATE XVI B--PHOTOGRAPH OF NETAJI WEARING A ROUND WRIST WATCH

কর্নেল রহমানের পেশ করা ঘড়ি

ঘড়িতে সময় একটা বেজে দশ মিনিট প্রায়

নেতাজী ও ফিল্ড মার্শাল তিরাউচি

নেতাজীর শেষ যাত্রাপথের ইঙ্গিত—তদন্ত কমিটির ছবি

বামে—বিধ্বস্ত বিমানের ধ্বংসাবশেষ (পৃ ১৫৪, ১৫৬ দ্রষ্টব্য)
দক্ষিণে—ভষ্মাধারের সম্মুখে কর্নেল হবিবুর্ (পৃঃ ২৪৫; ২৪৯ দ্রষ্টব্য)

বিধ্বস্ত বিমানের ধ্বংসাবশেষ—তাইহোকু

(পৃঃ ১৫৩, ১৫৬ দ্রষ্টব্য)

কর্নেল নোনোগাকি, শ্রী এস. এ. আয়ার, ক্যাপ্টেন আরাই ও পিছনে কর্নেল টী

বিধ্বস্ত বিমানের ধ্বংসাবশেষ—তাইহোকু

Renkoji temple in Tokyo

টোকিওর রেনকোজির মন্দির—তদন্ত কমিটীর ছবি

(পৃঃ ৩৪৭, ৩৪৮ দ্রষ্টব্য)

ভস্মাধার সহ মন্দিরের পুরোহিত—তদন্ত কমিটীর তোলা ছবি

(পৃঃ ৩৪৭, ৩৪৮ ও ৩৫২ দ্রষ্টব্য)
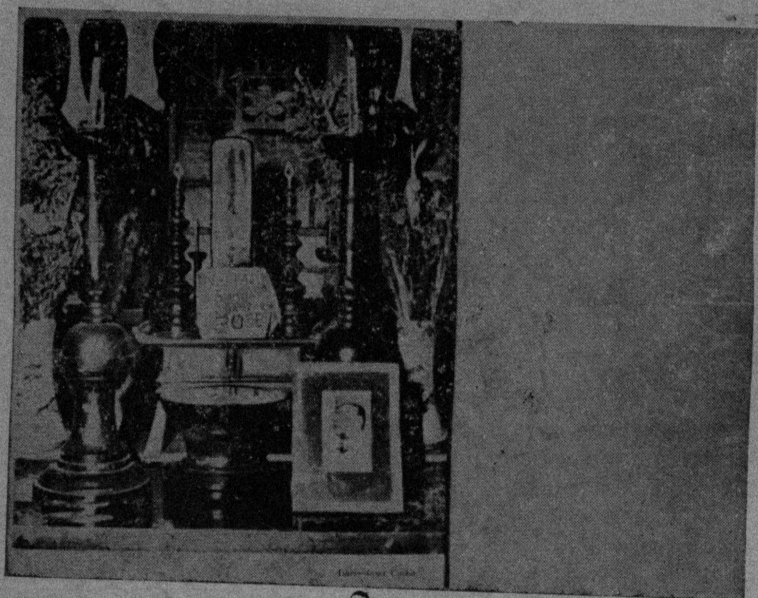
রেনকোজি মন্দিরের ভিতরের দৃশ্য—তদন্ত কমিটির তোলা ছবি

রেনকোজি মন্দিরের ভিতরের দৃশ্য—তদন্ত কমিটির ছবি
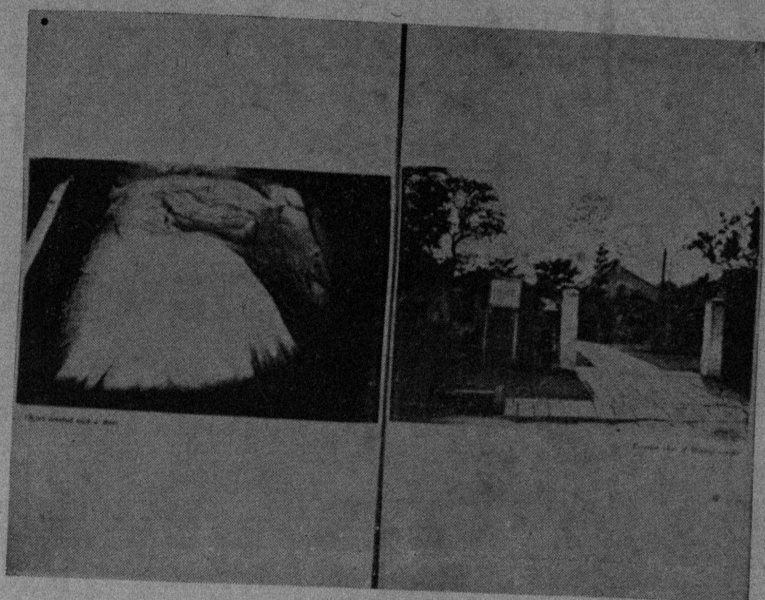
(পৃঃ ৩৪৭, ৩৪৮ দ্রষ্টব্য)

বামে—চাদরে ঢাকা কোন কিছুর ছবি (পৃঃ ২৪৫, ২৪৯ দ্রষ্টব্য)
দক্ষিণে—রেনকোজি মন্দিরের বহিঃদৃশ্য—(পৃঃ ৩৪৭, ৩৪৮ দ্রষ্টব্য)
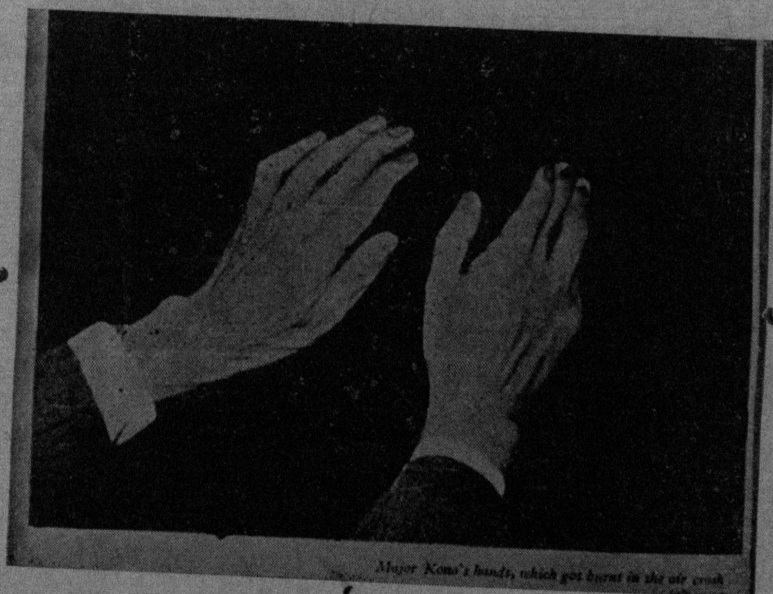
Major Kono's hands, which got burnt in the air crash

মেজর কোনোর হাতের ছবি—তদন্ত কমিটির তোলা

Photostat copy of list of treasure, signed by Col. Habibur Rehman
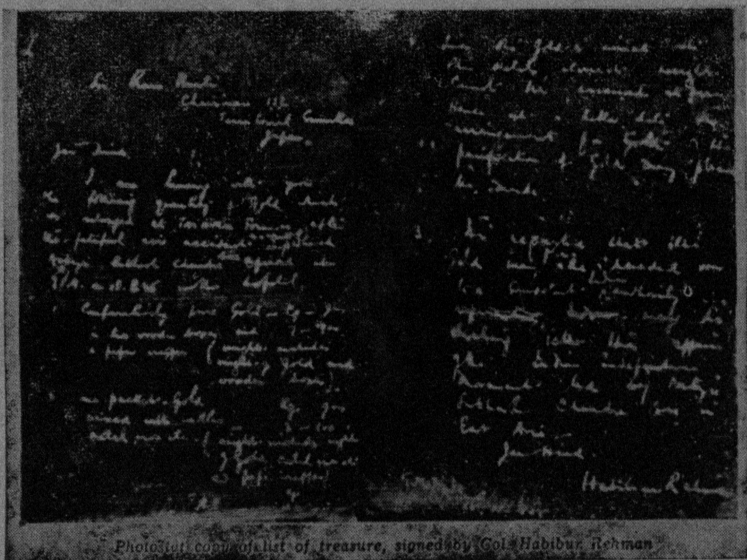
কর্নেল রহমানের স্বাক্ষরিত ধনরত্নের তালিকা—তদন্ত কমিটীর ছবি

Photostat copy of list of treasure, signed by Mr. S. A. Ayer

মিঃ আয়ার এর সই করা ধনরত্নের তালিকা

১
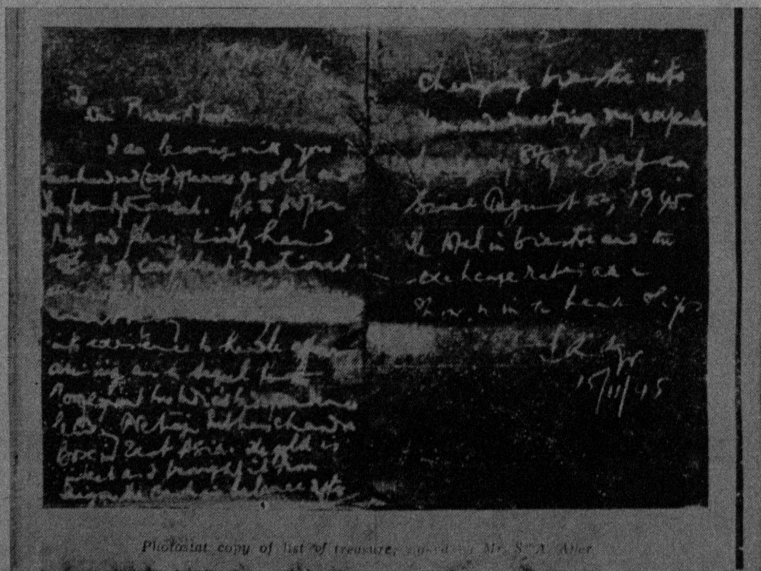
১৯৪৫ সালের ২৩শে আগস্ট ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন। ঐ দিনই জাপানের প্রখ্যাত সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'ডোমি নিউজ এজেন্সি' বিশ্বের সকল সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সব খবরের সেরা খবর প্রকাশ করে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিল। মাত্র কয়েক লাইনের ছোট একটি সংবাদ—"১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট তাইহোকুতে এক বিমান দুর্ঘটনায় চন্দ্রবোস নিহত হয়েছেন।" এমন এক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ যথেষ্ট বিলম্বে প্রচারিত হলেও রাজনৈতিক ঘূর্ণিবাত্যা ও মানসিক বিপর্যয় ঘটতে সামান্যতম অসুবিধাও দেখা দেয় নি। বিশ্বের রাজনীতি ক্ষেত্রে সেদিন কালবৈশাখীর প্রকোপ দেখা গেল। মুহূর্তের জন্য সবাই বোধহয় একবার থম্‌কে দাঁড়াল, এও কি সম্ভব—অতঃকিম্। শুধু একটি মুহূর্ত। তারপরই শুরু হল বিশ্ব-মন্থন। অজ্ঞাত কুলশীলার কৌলিন্য লাভ হ'ল। অখ্যাত তাইহোকু প্রখ্যাত হল। তাইহোকু হ'ল বিশ্বের রাজনীতির কেন্দ্রস্থল। সারা বিশ্বে এক গোপন তৎপরতা সুরু হ'ল। যে কোন মূল্যের বিনিময়ে চন্দ্র বোসকে আটক করার জন্য যাঁরা আগ্রহী তাঁরা ঘটনার সত্যতা নিরূপণের জন্য অবিলম্বে গোয়েন্দা প্রতিনিধি পাঠালেন। আর যাঁরা ঘটনা বা দুর্ঘটনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, তাঁরা পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য গোপন বৈঠকে বসলেন। তাইহোকু বিমান বন্দরের অঘটনের যে বিবরণ পাওয়া গেল তা পর্যালোচনা করে বিরোধী শক্তি কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেন না। কারণ জাপ সরকারের প্রকাশিত তথ্য ছাড়া অন্য কোন তথ্যই তখন পাওয়া গেল না। গোপন সূত্র থেকে যে সব তথ্য পাওয়া গেল, তার পূর্ণ বিশ্লেষণ করার পরও কোথায় যেন একটু সন্দেহের অবকাশ রয়ে গেল। ঘটনার বিবরণ যা

পাওয়া গেল, তা এতই সঙ্গতিহীন যে একটি চিন্তাই সবার মনে জেগে উঠল—এটি পূর্ব পরিকল্পিত নয়তো ? কিন্তু তারই বা প্রমাণ কোথায় ? তবে দুর্ঘটনায় চন্দ্রবোস-এর মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট প্রমাণ যখন পাওয়া গেল না তখন ভিন্নতর অনেক কিছু ভাববার অবকাশ থেকে গেল। তাইহোকুর রূপে রহস্যের ছোঁয়া লাগল। সুন্দরী তাইহোকু রহস্যময়ী হ'ল। আর ঐ রহস্যের কুহকে আকৃষ্ট হ'ল চন্দ্রবোস বিরোধী শক্তি।

একথা সত্য যে ১৯৪৫ সালের ২১শে মে ব্যাঙ্কক থেকে এক ঘোষণা পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ ঘোষণা পত্রে নেতাজী সুভাষচন্দ্র জানিয়েছিলেন যে তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপদেশমত অতঃপর তিনি ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র যাচ্ছেন। তিনি ভারাক্রান্ত হৃদয়েই ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করেছেন। ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি তাঁর আস্থা অটুট রইল। তাঁর ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করার কারণ মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি আরও বলেছেন যে, —১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ্ প্রতিষ্ঠা দিবসে তিনি যে শপথ নিয়েছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন ; সর্বশক্তি নিয়োগ করে তিনি ভারতের মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ২১শে মে'র বাণী ঘোষণা করেছিল যে প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার দরুণ ব্রহ্মদেশ থেকে মুক্তি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভবপর নয়।

দেশ মাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগকারী নির্ভীক যোদ্ধাগণ বিশ্ব-পরিস্থিতির পরিবর্তন সেদিন সম্পূর্ণভাবে বিচার করে মুক্তি যুদ্ধের ধারায় সময়ানুগ পরিবর্তনের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তাঁরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে আজাদ হিন্দ্ সরকারের প্রথম পর্বের লড়াই আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের লড়াই। অভিনব কর্মসূচী রূপায়নের জন্য নেতাজীর ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করে যাওয়ার ব্যবস্থা পাকাপাকি করা হয়। বিদায় লগ্নে নেতাজীকে খুবই চিন্তিত

দেখা গেল। কর্তব্য কর্মে অবিচল, কর্মযোগী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মুখে সেদিন দেখা গিয়েছিল আত্মপ্রত্যয়ের চিহ্ন, কিন্তু তাঁর কণ্ঠে ছিল বেদনার সুর। বিমান বন্দরে উপস্থিত মুক্তি যোদ্ধাদের উদ্দেশ করে তিনি বললেন যে, এখানে মিলিত না হলেও আমরা ভারতবর্ষে আবার মিলিত হব। জয়হিন্দ্।

নেতাজীর ২১শে মে'র বাণী বিরোধী শক্তির মনে এক নূতন শঙ্কা জাগালো। পরবর্তী পর্যায়ে কি ঘটতে পারে সে বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করার জন্য সবাই ব্যস্ত হলেন। কিন্তু কোন্ পথে বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করা যায়? আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সূত্রকে তাই আরও সুদৃঢ় করা হ'ল। বিশ্বের দিকে দিকে অতি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল সজাগ প্রহরীদের নিযুক্ত করা হ'ল। নির্দেশনামা—চন্দ্রবোস-এর পরবর্তী কর্মপন্থার পূর্ণ বিবরণ চাই। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের যাত্রার বিবরণ যথাযথ স্থানে গোপনে পৌঁছে যেতে লাগল। প্রতি মুহূর্তে উত্তেজনা আর প্রত্যেক পদক্ষেপে অজানা আশঙ্কা বজায় রইল। পরবর্তী পর্বে কি ঘটবে, তা সবার অজানাই থেকে গেল। হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রপাত। তাইহোকু সব যোগাযোগ সূত্রকে পরিহাস করল। কোন্ এক ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার বলে, বিমান ও বিমানের যাত্রীরা শূন্যে মিলিয়ে গেলেন। সুদীর্ঘ পাচ দিনের নীরবতা। ইতিমধ্যে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রলয় ঘটে গেছে। বিমান দুর্ঘটনার খবর যখন প্রচারিত হ'ল, তখন দেখা গেল তাইহোকু বিশ্বের এক প্রখ্যাত নগরীতে রূপান্তরিত হয়েছে। দূর দূরান্ত থেকে বিশেষজ্ঞ ও গোপন সন্ধানীদল ছুটে গেছে তাইহোকুর প্রান্তে। কিন্তু সেখানে পৌঁছোবার আগেই সব শেষ হয়ে গেছে। শুধু দেখা যায় সযত্নে রাখা খানিকটা চিতাভস্ম, চন্দ্রবোস-এর তথাকথিত শেষচিহ্ন। সর্বাত্মক উত্তেজনাময় ঘটনার এমন নাটকীয় পরিণতি দেখে মনের কোণে সন্দেহ জাগে যে এ কোন এক অভিনব পরিকল্পনার অংশ বিশেষ নয়ত? না এটি নিয়তির নিষ্ঠুর বিধান,—করাল কালের কুটিল ভ্রুকুটি।

তাইহোকুর রহস্য যেন ক্রমে দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠে। বিমান দুর্ঘটনায় এমন এক ব্যক্তিত্বের অবলুপ্তি ঘটল, কিন্তু তাতে তাইহোকুর রূপে কোন পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগল না। বরং তার অবয়বে যেন এক অকল্পনীয় দৃঢ়তার ছাপ ফুটে উঠল—যা ঘটেছে তা ব্যক্ত করা হয়েছে। যদি আমার বক্তব্য বিশ্বাস না করতে পার তবে খোঁজ করে দেখ। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঘটনার তথাকথিত বিবরণ মূলধন করেই চলতে হবে, কারণ এ ছাড়া অন্য কোন বক্তব্য রাখলেই অসুবিধায় পড়বে।

ইতিহাসের পর্য্যালোচনা শুরু হয়ে গেল। শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর কলকাতা ত্যাগের ঘটনার বিচার করে তথ্যানুসন্ধানকারীর দল নূতন আলোর সন্ধান পেলেন। ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যাওয়ার আগে সুভাষচন্দ্রকে তাঁর কলকাতার বাসভবনে অন্তরীণ অবস্থায় রাখা হয়েছিল। সেপাই সান্ত্রীর পাহারায় ঐ বাড়ীটা সেদিন এক দুর্ভেদ্য দুর্গে রূপান্তরিত হয়েছিল। রাজকর্মচারীদের সতর্ক ও শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে মানুষ তো কোন্ ছাড়, একটা মাছিরও ঐ বাড়িতে ঢুকে পড়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু তবুও অঘটন ঘটল। সবার দৃষ্টি এড়িয়ে সুভাষচন্দ্র বাড়ীর বাইরে এলেন। তারপর শুরু করলেন তাঁর সুনির্দিষ্ট পথযাত্রা। কয়েক বছরের পরিকল্পনার রূপায়ন হ'ল। সুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগের যাত্রাপথের পূর্ণ বিবরণ অনেকেই জানেন বলে দাবী করেন। কিন্তু দেখা গেছে যে তাঁরা ঐ দুর্গম যাত্রাপথের অংশমাত্রই জানেন। প্রকৃত তথ্য যেদিন প্রকাশিত হবে সেদিন দেখা যাবে যে কারও বিবরণের সঙ্গে ঐ যাত্রাপথের বিবরণের পূর্ণ মিল নেই।

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু তাঁর কলকাতার বাড়ী থেকে যাত্রা শুরু করেন ১৯৪১ সালের ১৬ই জানুয়ারী। এ খবর প্রচারিত হয় প্রায় দশদিন পরে, যখন সম্ভবতঃ তিনি তাঁর পরিকল্পিত গন্তব্য স্থানের প্রথম বিরতিস্থলে পৌঁছে গেছেন। বিমান দুর্ঘটনার সংবাদে দেখা যায় যে চন্দ্রবোস ১৮ই আগষ্ট বিমান দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন এবং ১৮ই-১৯শে

আগষ্টের রাত্রে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কিন্তু এ সংবাদ ডোমি নিউজ এজেন্সি প্রচার করেন ২৩শে আগষ্ট। অর্থাৎ দুর্ঘটনার সময় থেকে সুদীর্ঘ পাঁচদিন পরে। উভয় ক্ষেত্রেই, ঘটনা কাল থেকে ঘটনা প্রচারের সময়ের ব্যবধান অনেক। সময়ের ব্যবধানের অদৃশ্য যোগাযোগ অনুসন্ধানের সূত্রকে শিথিল না করে আরও জটিল করে তোলে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য পৃথিবীর পরিধি অনেক ছোট হয়ে এসেছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে যাওয়া অসম্ভব নয়। এখানে উভয় ঘটনার মধ্যে কয়েক ঘণ্টার নয়, কয়েক দিনের অবকাশ দেখা যায়। সুতরাং এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে স্বভাবতঃই কোন দ্বিধা থাকে না যে যথোপযুক্ত পরিকল্পনা যদি করা থাকে এবং ঐ পরিকল্পনা মাফিক যদি কাজ হয় তবে কয়েকদিনের সময়ই যথেষ্ট। ১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্রের কলকাতা ত্যাগ ও ১৯৪৫ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করে যাওয়ার মধ্যে কয়েকদিনের অবকাশের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষ ভাবনায় ভেঙ্গে পড়ে আর বিরোধী শক্তি নূতন করে ভাববার অবকাশ পায়।

১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্র যখন কলকাতা ত্যাগ করেন তখন রাজশক্তি সবরকম ব্যবস্থা অবলম্বন করে তাঁর গতিবিধি জানতে চেষ্টা করেন। এলগিন রোডের বাড়ীতে সুভাষচন্দ্র আর নেই একথা জানার পর প্রথম কলকাতা ও শহরতলিতে অনুসন্ধান চালানো হয়। তারপর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অনুসন্ধান চলে। কিন্তু রাজশক্তির তথ্যানুসন্ধান দপ্তরে যখন খবর আসে যে সুভাষচন্দ্রকে ভারতের মাটিতে পাওয়া গেল না, তখন আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা চক্রকে কাজে লাগানো হয়। সম্ভাব্য সব জায়গায় জোর তদন্ত চলল। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের অবস্থানের কোন খবর পাওয়া গেল না। চন্দ্রবোস ভারতের সীমানার বাইরে কোথায় যেন উবে গেলেন। রীতিমত ধর পাকড় চলল। নির্যাতনের কথা না উল্লেখ করাই ভাল। কিন্তু সব

চেষ্টাই ব্যর্থ হল। চন্দ্রবোসের সশরীরে অবস্থানেয় কোন খবর পাওয়া গেল না। ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ্‌গণের ছলাকলা শুরু হল। প্রচ্ছন্ন নীরবতার বাঁধ ভেঙ্গে একদিন প্রচার করা হ'ল যে, এক জরুরী সম্মেলনে যোগাদান করতে টোকিও যাওয়ার পথে, বিমান দুর্ঘটনায় চন্দ্রবোস নিহত হয়েছেন। বিরোধী শক্তির সূক্ষ্ম চালের তারিফ না করে পারা যায় না। চন্দ্রবোস ভারতের বাইরে গিয়ে বিরোধী শক্তির শত্রুদেশগুলিতেই আশ্রয় নিতে পারেন তা বুঝতে তাঁদের অসুবিধা হয়নি। চন্দ্রবোসের কোমল মনের কথাও তাঁরা জানতেন। তাই তাঁর মারা যাওয়ার কথা প্রচার করে, তাঁর সশরীরে অবস্থানের খবর পাওয়ার শেষ চেষ্টা তাঁরা করলেন। জাপান দেশটার নাম জুড়ে দেওয়ার কারণ সম্ভবতঃ একটিই যে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে জাপানই তাঁকে আশ্রয় দিতে পারেন। সুভাষচন্দ্র তখন জার্মানীতে। জার্মান সরকার চন্দ্রবোসকে সাহায্য করার বিষয় বিবেচনা করে দেখেছেন। সুভাষচন্দ্রের কাছে তখন সময়ের দাম অনেক। এক একটি দিন যেন এক একটি বছরের মত দীর্ঘ বলে মনে হয়। কর্মযোগী ক্রমশঃ চঞ্চল হয়ে উঠছেন। যদি জার্মান সরকারের কাছ থেকে তিনি সাহায্য না পান তবে অন্য কোন সরকারের সঙ্গে তাঁকে যোগাযোগ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই এমন সুযোগ তিনি হাতছাড়া করতে পারেন না। ইতিমধ্যে তাঁকে জার্মানীতে আটক করে রাখার গুজবও শোনা যাচ্ছিল। অধৈর্য হয়ে সুভাষচন্দ্র একবার মন্তব্য করলেন যে তিনি যেমনভাবে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে ভারতের বাইরে এসেছেন, প্রয়োজনে তিনি সবার অলক্ষ্যে অন্য দেশে চলে যাবেন, কোন শক্তিই তাঁর পথরোধ করতে পারবে না।

যাই হোক, বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর জার্মান সরকার ভারতের মুক্তি আন্দোলনে চন্দ্র বোসকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দিলেন। জার্মানীতে ফ্রী ইণ্ডিয়া সেণ্টার (FIC)

তৈরী হ'ল। প্রথম প্রয়োজন বেতারে প্রচার। বিরোধী শক্তি চন্দ্র বোসকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদে ভারতের জনগণের মনে এক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি রেডিও ষ্টেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯৪২ সালের ২৫শে মার্চ সেই শুভদিনটি এলো। সুভাষচন্দ্র জাতির উদ্দেশে বিদেশ থেকে বেতার ভাষণ দিলেন। প্রথমেই সুভাষচন্দ্র তাঁর বেঁচে থাকার কথা বললেন। টোকিওর পথে একটা বিমান দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করে তিনি বললেন যে একটা বিমান দুর্ঘটনায় বিধ্বস্ত হয়েছে। ঐ দুর্ঘটনায় কয়েকজন যাত্রীও নিহত হয়েছেন। হতভাগ্য বিমান যাত্রীদের দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির জন্য তিনি শোক প্রকাশ করেন। যেহেতু বিমান দুর্ঘটনার পূর্ণ বিবরণ তখন তার কাছে আসেনি তাই তিনি সবিস্তারে কিছু বলতে পারেন না। কিন্তু রাজশক্তির ঐ মিথ্যা প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মন্তব্য করেন যে বৃটিশ তাঁকে কেন মৃত দেখতে চান তা তিনি ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারেন।

বৃটিশরাজ ভারতের রাজনীতিবিদ ও স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের চিন্তাধারা ও ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁদের গতি প্রকৃতি সব সময়ই রাজশক্তির শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আরও শঙ্কার কারণ হয়েছিল বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর ভারতের বাইরে অবস্থান। বিপ্লবী নেতা তখন সুদূর জাপানে। এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা উচ্চগ্রামে বেজে চলেছে। প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯১৩ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত বিপ্লবী রাসবিহারী অপেক্ষা করে আছেন। বৃটিশরাজকে উচ্ছেদ করার সুযোগ যদি আসে তবে তা সানন্দে গ্রহণ করতে তিনি দ্বিধা করবেন না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে সে সুযোগ এসে গেল। রাজশক্তি সম্যকভাবেই জানতেন যে রাসবিহারী বসু জাপানের সাথে যোগ-সাজসে কোনও এক পথে নিশ্চয় আঘাত হানবার চেষ্টা করবেন। জাপানের সাথে রাসবিহারী বসুর মিত্রতা মিত্রশক্তির উদ্বেগের কারণ

হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চন্দ্র বোস-এর ভারত ত্যাগের পর ঐ দুশ্চিন্তার আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল। দুই বোস-এর মিলন যদি ঘটে তবে তার ফলে যে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠবে তা মুহূর্তের মধ্যে রাজশক্তিকে গ্রাস করে ফেলতে পারে। সে মিলন ভারতের ভাগ্যাকাশে এক মহামিলন হয়ে দেখা দেবে। ভারতীয়ের মনে জাগবে এক নূতন উদ্দীপনা। বিপ্লবের আগুনে ভারতে এক বৈপ্লবিক আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হবে, যার অগ্ন্যুৎপাতে বিরোধী-গোষ্ঠীর বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়ে পড়বে। এমন একটা অবস্থার কথা ভাবা যায় না। যে কোন উপায়ে হোক দুই বোস-এর মিলন রোধ করতেই হবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত চন্দ্র বোস-এর পথে বাধা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। জার্মান সরকারের সহায়তায় চন্দ্র বোস 'ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার' গড়ে তুলেছেন। রেডিও স্টেশনের সুবিধাও সেণ্টার লাভ করেছে। গোপন পথে রাজশক্তি সব খবর রাখার চেষ্টা করে চলেছেন। একদিন খবর এলো যে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের তরফ থেকে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ওদিকে বিপ্লবী রাসবিহারী জাপ সরকারের সাথে বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন যে জাপানের হাতে বন্দী ভারতীয়দের জাপান তাঁর হাতে ফিরিয়ে দেবেন। একদিকে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার আর অন্যদিকে 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ'। দু'টি সংগঠনই রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত। দুই বোস দুই প্রান্তে প্রস্তুত হচ্ছেন। এঁদের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন, আর এঁদের মুক্তি-যুদ্ধের ধারাও একইরকম। সুতরাং দু'জনের মিলনের সম্ভাবনা আর দূরে নয়। কিন্তু কেমনভাবে এঁদের মিলন এড়ানো যায়? বিরোধী শক্তি সুন্দর রাজনীতির ছলাকলা ছেড়ে গোপন ঘৃণ্য পথের আশ্রয় নিয়ে রাজনীতিকে কলঙ্কিত করতে দ্বিধাবোধ করলেন না। দিকে দিকে ঘাতক ছুটে চলল। কিন্তু ভবিতব্যকে এড়ানো যায় না। দুই কর্মযোগীর মহামিলনের সন্ধিক্ষণ ঘনিয়ে এলো। বিপ্লবী রাসবিহারী সুভাষচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানালেন। সুভাষচন্দ্র বিপ্লবী, সে তার আমন্ত্রণ

মাথা পেতে গ্রহণ করলেন। জার্মানী থেকে সিঙ্গাপুরে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হ'ল। ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারে সামরিক শিক্ষা প্রাপ্ত জওয়ানদের সমুদ্রপথে পাহারা দেওয়ার বিশেষ শিক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে সুভাষচন্দ্র বিপ্লবী নেতার সাথে দেখা করতে পা বাড়ালেন। জল, মাটি ও আকাশ পথে বিরোধী গোষ্ঠীর বিরামহীন সতর্ক প্রহরীরা চন্দ্রবোসকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। ছোট একটি সাবমেরিন নীল জলের অনেক নীচে ডুবে আঁকা-বাঁকা পথে 'মাইন্‌স' গুলোর সংঘর্ষ এড়িয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল। সুভাষচন্দ্র জাপানে এসে পৌঁছলেন। তারপর গেলেন সিঙ্গাপুরে। দুই বোসের মিলন হ'ল। বিপ্লবী রাসবিহারী সুভাষচন্দ্রের হাতে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডন্স লীগের দায়ীত্বভার তুলে দিলেন। ভারতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হল। বৃটিশরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে রুখে দাঁড়াবার সময় ঘনিয়ে এল।

বিরোধী শক্তি কিন্তু নীরব দর্শক হয়ে এতদিন অপেক্ষা করেন নি। গোপন তৎপরতা সমানে চলেছে। সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছোবার আগে ওখানকার ভারতীয়দের মাঝে প্রচারিত হয়েছে যে যিনি সিঙ্গাপুরে আসছেন তিনি আসল চন্দ্রবোস নন। বিরোধী গোষ্ঠী চন্দ্রবোসকে জাল বলে শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। এমন প্রচেষ্টায় কেবল রাজনীতির ছলাকলার ছোঁয়াই নেই, উপরোক্ত আছে ঘৃণ্য-বৃত্তির ইঙ্গিত। স্বার্থান্ধ মানুষ কি না করতে পারে! কিন্তু সুভাষচন্দ্রের পরিচয় তাঁর আকৃতি ও প্রকৃতি দিয়ে নয়, তাঁর পরিচয় গুণ দিয়ে। জাল চন্দ্রবোস তখনই থাকবেন যখন আসল চন্দ্রবোস বর্তমান আছেন। জাল চন্দ্রবোসের উপস্থিতির কথা প্রচার করে সাময়িক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা যায় কিন্তু তা পাকাপাকি ভাবে বহাল করা যায় না। সুভাষচন্দ্র যখন সমবেত জনতার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন যে তিনিই সুভাষচন্দ্র বসু, তখন কারও মনে আর সামান্যতম সংশয়ও রইল না। বিরোধী-গোষ্ঠীর শেষ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হ'ল।

এবার নূতন করে ভাববার প্রয়োজন দেখা দিল। চন্দ্রবোস যে সংগঠনের নেতৃত্ব নিয়েছেন, তাতে ভারতীয় জওয়ানের সংখ্যা অনেক। বৃটিশরাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের কথা তাঁর মুখে বহুবার শোনা গেছে। অস্ত্র ও খাদ্যের সংস্থান করতে পারলে তিনি যে সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত জওয়ানদের নিয়ে দিল্লীর পথে এগিয়ে আসবেন তাতে কোন ভুল নেই। বিপ্লবী রাসবিহারী জাপানের কাছ থেকে যথাযথ সাহায্যের আশ্বাস পেয়েছেন। চন্দ্র বোস-এর মত জনদরদী নেতাকে সাহায্য করতে জাপ সরকার বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করবেন না। এমন একটি পরিস্থিতিতে বিরোধী গোষ্ঠীর একমাত্র কাজ জাপানের ওপর নির্মম আঘাত হানা।

ইতিমধ্যে আজাদ হিন্দ্ সরকার গঠিত হয়েছে। চন্দ্র বোস-এর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—"আমায় রক্ত দাও আমি তোমায় স্বাধীনতা দেব"। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির পূর্ণ সহযোগিতায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজ বীর দর্পে ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে আসছে। আজাদ হিন্দ্-এর লড়াই-এর রসদ জোগাচ্ছে মূলতঃ জাপান। দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসা বীর জওয়ানদের রুখতে হ'লে জাপানকে করায়ত্ব করতে হবে। সমস্ত শক্তি নিয়ে মিত্র শক্তি তাই জাপানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। যুদ্ধের গতি মিত্রশক্তির অনুকূলে গেল। জাপান আত্মসমর্পণ করল। বিরোধী গোষ্ঠী উল্লসিত—এবার চন্দ্রবোস নিশ্চয় আত্মসমর্পণ করবেন।

জাপ সরকার আত্মসমর্পণ করলেন, কিন্তু আজাদ হিন্দ্ সরকার নীরব রইলেন। রাজশক্তির বিরুদ্ধে ঘোষিত যুদ্ধ ঘোষিতই রয়ে গেল, সে যুদ্ধের যবনিকা-পাত করা হ'ল না। অস্থায়ী সরকারের সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র কোন এক অলৌকিকশক্তি বলে কোথায় যেন অদৃশ্য হলেন। তথাকথিত মৃত্যু-গাঁথা প্রচারিত হ'ল ঠিকই, কিন্তু এক মুঠো চিতাভস্মে চন্দ্র বোস-এর কোন অস্তিত্ব বজায় নেই। একদিন যাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করার পর যিনি স্বয়ং নিজেকে

জীবিত বলে ঘোষণা করেছিলেন, আজ তাঁরই তথাকথিত মৃত্যুকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করার জন্য কে রইলেন? তাইহোকু'র রূপে কোথায় যেন একটু ছলনার ছোঁয়া লাগল, লাস্যময়ী নগরী হঠাৎ যেন রহস্যময়ী হয়ে উঠল। ভস্মাবশেষ সর্বাঙ্গে মেখে তাইহোকু বুঝিবা সন্ন্যাসিনী সাজল।

২

তাইহোকুকে ঘিরে যে রহস্যের জাল বিস্তৃত হ'ল তার স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য বিরোধী-শক্তি তৎপর হলেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে গোপন সংবাদ যথাযথভাবে সদর দপ্তরে পৌঁছতে লাগল। বিশেষজ্ঞগণ প্রতিটি সংবাদ-বিচার বিবেচনা করে রিপোর্ট তৈরী করতে লাগলেন। কিন্তু রহস্য সমাধানের সূত্র কোথায়? জাপ সরকারের প্রচারিত তথ্যের মধ্যে যথেষ্ট অসঙ্গতি বর্তমান। তাইহোকু নাটকের প্রতিটি অঙ্কে রহস্যের ছোঁয়া আছে। রোমহর্ষক মুহূর্তের অপূর্ব সমাবেশে তাইহোকু পর্ব অতুলনীয় কিন্তু তথাকথিত ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে অবাস্তবতার গহ্বরে। তথাকথিত দুর্ঘটনার কোন সমর্থনযোগ্য সূত্র পাওয়া যায় না।

বিরোধী শক্তি চন্দ্রবোসকে সম্যকরূপেই চিনতেন। তাঁরা জানতেন যে চন্দ্রবোস-এর পরিকল্পনার সত্যিকারের রূপ দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির জানা নেই। গোপনীয়তা রক্ষায় ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর বাঁ হাত জানত না যে তাঁর ডান হাত কি করবে। এমন মানুষের কর্মপন্থা নির্ধারণ করা সত্যিই অসম্ভব। তবুও চেষ্টা করে যেতেই হবে, যদি কোন সূত্র থেকে খবর পাওয়া যায়। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে বিরোধী শক্তিবর্গ পূর্ণোদ্যমে অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

কয়েক দিনের ব্যবধানে বহু-প্রতীক্ষিত রহস্য-সূত্রের সন্ধান পাওয়া গেল। ১৯৪৫ সালের ২৮শে আগষ্ট বি. বি. সি. বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হ'ল যে, যে বিমানটি চন্দ্রবোসকে নিয়ে অজানা গন্তব্য-স্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল, সেই বিমানটিকেই মাঞ্চুরিয়ার আকাশে উড়তে দেখা গেছে। এক বিস্ময়কর ঘোষণা। তাইহোকুর প্রান্তরে

যে বিমান বিধ্বস্ত হ'ল এবং যার আগুনে ইতিহাসের এক বৈপ্লবিক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল বলে আমরা জানলাম সেই বিমানটিকেই মাত্র কয়েকদিন পরে মাঞ্চুরিয়ার আকাশে উড়তে দেখা যাওয়া অবিশ্বাস্য ও অলীক ব্যাপার। সন্ধানী গোষ্ঠীবর্গের মনে আশার সঞ্চার হ'ল। নূতনতর কৌশলী দৃষ্টি নিয়ে তাইহোকুর রহস্যকে সকলে দেখতে শুরু করলেন। এই অধ্যায় যদি কোন এক অভিনব পরিকল্পনার অংশ বিশেষ হয়ে থাকে তবে মূল পরিকল্পনাটির স্বরূপ কি হতে পারে, এই চিন্তাই বিরোধী গোষ্ঠীর মনে দানা বাঁধল।

সুভাষচন্দ্রের জীবনের ব্রত ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও ভারতবাসীর মুক্তির জন্য আত্মত্যাগ করা। অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যে কোন পথ পরিক্রমণ করতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি। তাঁর প্রতিটি পরিকল্পনা ছিল সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত। অভিনবত্ব ও দুঃসাহসিকতার ছোঁয়ায় তাঁর এক পরিকল্পনার সাথে অন্য পরিকল্পনার মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই বিরোধী শক্তির কাছে তিনি সব সময়ই দুর্বোধ্য প্রহেলিকাময় এক ব্যক্তিসত্তা। নীচের ঘটনাটি থেকে এর এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

১৯৩৯ সালের শেষের দিকে সুভাষচন্দ্র এক নূতন ডাক দিলেন। ইংরাজকে ভারতবর্ষ থেকে তাড়াতে হবে, আর তার জন্য চাই এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। যত দিন যেতে লাগল, তাঁর ভাষা যেন তত জ্বালাময়ী হ'ল। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী চাই—এই মর্মে ঘোষণা দেওয়ার পর দেখা গেল যে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করার জন্য একটি অফিসও খোলা হয়েছে। রাজশক্তি স্বভাবতঃই চিন্তিত হলেন। বৃটিশরাজ কংগ্রেস সম্বন্ধে তেমন চিন্তিত ছিলেন না। অনেক নেতাদের সম্পর্কে রাজশক্তির ধারণা ছিল যে তাঁরা কাজের চেয়ে কথা বেশী বলেন। কিন্তু চন্দ্র বোস সম্বন্ধে তাঁরা ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলার ডাক ও সেইমত ব্যবস্থা নেওয়া দেখে ইংরাজ শঙ্কিত হলেন। দেখা গেল মেজর সত্যভূষণ গুপ্ত,

বিমল প্রতিভা দেবী ও অন্যান্যদের সহযোগীতায় সেচ্ছাসেবক সংগ্রহে তৎপর। কয়েকজনকে ঐ অফিসে যোগাযোগ করতেও দেখা গেল। শ্রীসুভাষচন্দ্র মেজর সত্য গুপ্তকে ডেকে বললেন, "সত্যবাবু এসব করতে হবে না।" ব্যস, সব ধামাচাপা পড়ল। দপ্তরটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। সুভাষচন্দ্রের কথার তাৎপর্য মেজর গুপ্ত অনুধাবন করলেন।

এদিকে সুভাষচন্দ্রের ভাষার তীব্রতা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে একদিকে রামগড় কংগ্রেসের বৈঠক বসেছে, আর অন্যদিকে সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে Anti-compromise Conference অনুষ্ঠিত হ'ল। ঐ সম্মেলনে সারাভারতব্যাপী এক অবিরাম সংগ্রামের ডাক দেওয়া হ'ল। বৃটিশরাজ সুভাষচন্দ্রের প্রতিটি পদক্ষেপ শ্যেনদৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখছিলেন। তাঁরা আশ্বস্ত হলেন। অন্য কয়েকজন নেতার মত সুভাষচন্দ্রও বাক্যবাগীশ। কথাড় তোড়ে তিনিও বাজীমাৎ করতে চান। ১৯৪০ সালের জুন মাসে ফরোয়র্ড ব্লক-এর সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র বললেন যে বৃটিশ ইউ-রোপের মাটিতে যত আঘাত পাবে, ততই ভারতের ওপর তাঁর সাম্রাজ্যবাদের বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়ে পড়বে। সুতরাং বৃটেনকে রক্ষা করার কথা বলা আমরা যেন বন্ধ করি। এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে ভারত প্রথম নিজের কথাই ভাববে। ভারতের জনগণের কর্তব্য এক অস্থায়ী জাতীয় সরকারের মাধ্যমে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী তোলা। বৃটিশরাজ সেদিন রাজনীতির ছলাকলায় সুভাষচন্দ্রের কাছে হেরে গেলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি ভারতের কাছে এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। সুভাষচন্দ্র এমন এক অবস্থার সম্ভাবনা ১৯৩৪ সাল থেকেই দেখে আসছিলেন। তাই যখন কংগ্রেসের মধ্যে থেকে তিনি নীতি ও পথের মীমাংসায় ব্যস্ত তখন গোপনে বিদেশী দূতাবাসের সঙ্গেও যোগাযোগ করে চলেছেন। এবার তাঁকে ভারতের বাইরে যেতেই হবে। রাজশক্তি তাঁকে কোন কারণেই ভারতের

বাইরে যেতে দেবেন না। সুভাষচন্দ্র গোপনে তাঁর ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যাওয়ার ব্যবস্থা পাকাপাকি করে ফেলেছেন। তাঁর পথ সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত। রাজশক্তি তাঁকে যে দৃষ্টিভঙ্গীতেই দেখে থাকুন, তিনি কিন্তু রাজশক্তিকে পুরোপুরি বিচার করে নিয়েছেন। গালভরা জ্বালাময়ী ভাষার আড়ম্বরে ইংরাজ তাঁর সম্বন্ধে ভুল বিচার করতে বাধ্য, আর সেই ভুলের সুযোগ তিনি নেবেন। ভারতের মুক্তিযুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রয়োজন, কিন্তু সে বাহিনী ভারতের মাটিতে তৈরী হবে না, হবে বিদেশের মাটিতে, তবে ভারতীয়দের নিয়েই। অস্থায়ী ভারতীয় সরকার গঠনের ডাক চন্দ্র বোসের অলীক কল্পনা নয়, ওটা তাঁর ভবিষ্যতের অদৃশ্য পরিকল্পনার ইঙ্গিত বিশেষ।

১৯৩৩ সালের ১০ই জুন লণ্ডনের ফিয়ার্স হ'ল-এ তৃতীয় ভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু বিদেশী সরকারকে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য জাতীয় আন্দোলনের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে অস্ত্রের সাহায্যে ক্ষমতা দখলের ইঙ্গিত করেন। ১৯৩৭ সালে তাঁকে কয়েকজন জার্মান নেতার সঙ্গে আলোচনা করতে দেখা যায়। নেতৃবৃন্দের কাছে চন্দ্র বোস জানতে চান যে জার্মান কবে বৃটেনের ওপর আঘাত হানবে, যাতে ঐ সময় ভারতও উপর্য্যুপরি বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে ধরতে পারে। চন্দ্র বোস দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তখন বলেন যে বৃটেন ভারতের বংশ পরম্পরাগত শত্রু। জার্মান ভারতকে সমর্থন করুক আর নাই করুক, ভারত বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেই। চন্দ্র বোসের এই আলোচনার বিষয় বস্তু রাজশক্তির অজ্ঞাত ছিল না। সব খবরই সযত্নে রাখা হচ্ছিল এবং বিচার বিশ্লেষণও করা হচ্ছিল, কিন্তু তবুও ভুল হ'ল। রাজশক্তি চন্দ্র বোসের কথা ও কাজের মধ্যে গরমিল খুঁজে পেলেন। আর চন্দ্র বোস তাঁর পথের অন্তরায় কাটিয়ে যথাযথ বন্দোবস্ত করে ফেললেন। সুভাষচন্দ্রের কথায়—"অতি ধীর ও গভীর চিন্তা সহকারে অগ্রপশ্চাৎ

ভাবিয়া, উপায়ান্তরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, অতিশয় সাবধানে ভালমন্দ ফলাফল বিচার করিয়া তবে একটা কর্মপদ্ধতি স্থির করিতে হয়। কিন্তু এত ভাবনা চিন্তা সত্বেও কাজটি ত্বরূহ হইয়া থাকে। তেমন সংশয় শঙ্কটে নেতামাত্রেই বুদ্ধির স্থিরতা ও সাহসের সঙ্গে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারে না। যত বিজ্ঞ বা বুদ্ধিমান হউক না কেন, উপযুক্ত পরিমাণ জ্ঞানের অভাব হইতে পারে, যত দিক দেখা দরকার, যত বিষয় জানা থাকা আবশ্যক, তাহাও সকলের পক্ষে সকল ক্ষেত্রে সম্ভব নাও হইতে পারে।”

সুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগের পরিকল্পনা যথাযথ বিচার বিবেচনা করেই করা হল। রাজশক্তি তাঁকে কারার অন্তরালে আটক করে রাখলেন। সেদিনটি ছিল ১৯৪০ সালের ২রা জুলাই। হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সুভাষচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করা হল। এবার শুরু হ'ল শক্তি ও বুদ্ধির লড়াই। রাজশক্তি চন্দ্রবোসকে কারাগারে আটক রাখতে বদ্ধপরিকর আর চন্দ্রবোস রাজশক্তির কারা প্রাচীরের বাইরে আসতে দৃঢ়সঙ্কল্প। লোহার গরাদের বাইরে তাঁকে আসতেই হবে, নতুবা সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। ভারতের বাইরে তাঁকে যেতেই হবে। শুধু স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীই নয় স্বেচ্ছাসেনাবাহিনীও গড়ে তুলতে হবে। তারপর অস্থায়ী সরকার গঠন করে বৃটিশরাজের ওপর আঘাত হানতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি ভারতের অনুকূলে। এমন সুযোগ যদি হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে ভারতের মুক্তি আন্দোলন বহু বছরের জন্য পিছিয়ে যাবে। কারান্তরাল থেকে তিনি ঘোষণা করলেন—“সরকার আসুরিক শক্তি প্রয়োগ করে আমায় কারাগারে আটকে রাখতে বদ্ধ-পরিকর। উত্তরে আমি বলছি—আমায় ছেড়ে দাও নইলে আমি মৃত্যুবরণ করব এবং আমিই ঠিক করব, আমি বাঁচতে চাই বা মরতে চাই।” বাংলার তদানিন্তন রাজ্যপালের কাছে লেখা এক চিঠিতে সুভাষচন্দ্র জানালেন যে ২৯শে নভেম্বর থেকে

তিনি অনশন আরম্ভ করবেন। আগের অনশনের মত এবারও তিনি শুধু লবণ জল পান করবেন। কিন্তু মনে করলে তাও তিনি বন্ধ করতে পারেন:

Though there may be no immediate, tangible gain, no sacrifice is ever futile. It is through suffering and sacrifice alone that a cause can flourish and prosper, and in every age and clime the eternal law prevails—"the blood of the martyr is the seed of the church.

In this mortal world, everything perishes and will perish—but ideas, ideals and dreams do not. One individual may die for an idea—but that idea will, after his death, incarnate itself in thousand lives. That is how the wheels of evolution move on and the ideas and dreams of one generation are bequeathed to the next. No idea has ever fulfilled itself in this world except through an ordeal of suffering and sacrifice.

To my countrymen I say—Forget not that the greatest curse for a man is to remain a slave. Forget not that the grossest crime is to compromise with injustice and wrong. Remember the eternal law—you must give life if you want to get it. And remember that the highest virtue is to battle against inequity, no matter what the cost may be.

To the Government of the day I say—'Cry halt to your mad drive along the path of the communalism and injustice. There is yet time to retrace your steps. Do not use a boomerang which will

soon recoil on you. And do not make another Sind out of Bengal.'

...I shall commence on my fast on the 29th November, 1940. As in my previous fasts I shall take only water with salt. But I may discontinue this later on, if I feel called upon to do so.

সেদিন সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন যে—'এর দ্বারা যদিও অচিরে কোন ফল পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, তবুও কোন দুঃখবরণ, কোন ত্যাগ কখনও বৃথা যায় না। শুধুমাত্র স্বার্থত্যাগ ও দুঃখবরণের মধ্য দিয়াই কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং সকল যুগে সকল পরিবেশেই এই চিরন্তন সত্য যে শহীদের রক্তেই ধর্মের বীজ' নিহিত।

এই নশ্বর জগতে সব কিছুই ধ্বংস হয় ও হইবে—কিন্তু কল্পনা, আদর্শ ও স্বপ্নের মৃত্যু নাই। একটি আদর্শ রক্ষার জন্য একজন মৃত্যুবরণ করিতে পারেন—কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সেই আদর্শ সহস্র জীবনে বিকশিত হইবে। ঐ পথেই বিবর্তনের চাকা ঘোরে এবং এক যুগের কল্পনা, স্বপ্ন ও মহান্ আদর্শ পরবর্তী যুগের মানুষ অনুসরণ করেন। দুঃখবরণ ও আত্মত্যাগের নির্যাতন ভোগ না করিয়া এই জগতের কোন আদর্শেরই পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে না।

ইহা হইতে বড় স্বস্তি আর নাই যে একজন এই জগতে শুধু এক মহান্ আদর্শের জন্য বাঁচিয়া আছেন ও আদর্শ বজায় রাখিতে গিয়া মৃত্যু-বরণ করিয়াছেন। এর চাইতে আরও বেশী স্বস্তি আর কোন্ ভাবনায় একজন পাইতে পারেন যে—তাঁর আত্মা তাঁরই অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করিতে, সহস্র আত্মার সৃষ্টি করিয়াছেন? ইহা হইতে বেশী আর কি পুরস্কার আত্মা আকাঙ্ক্ষা করিতে পারেন যে তাঁর মর্মবাণী, পর্বতে উপত্যকায়, প্রান্তরে প্রান্তরে, স্বদেশের দিকে দিকে এমন কি দূর সমুদ্র অতিক্রম করিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে প্রতিধ্বনিত হইবে? আদর্শের যুপকাঠে আত্মবলিদানের চেয়ে জীবনের মহৎ পরিণতি আর কি-ই বা হইতে পারে? তাই, এ

কথা সত্য যে দুঃখবরণ ও আত্মত্যাগ কখনও বিফলে যায় না। পার্থিব জীবনে কিছু হারাইলেও, অমর জীবনের অধিকারী হইয়া অনেক বেশী কিছু ফিরিয়া পাইবে। আত্মার আদর্শই এই। জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে ব্যক্তি বিশেষকে প্রাণবলি দিতেই হইবে। যাতে ভারতবর্ষ বাঁচে ও তাঁর স্বাধীনতা ও হৃত গৌরব ফিরিয়া পাইতে সক্ষম হয় সেজন্য আমাকে আজ মরিতেই হইবে।

তাই আমার দেশবাসীকে আমি বলি—ভুলিও না, ক্রীতদাস হইয়া বাঁচিয়া থাকা মানুষের জীবনের চরম অভিশাপ। ভুলিও না, অন্যায় ও অবিচারের সঙ্গে আপস করা মহা পাপ। এই চিরন্তন সত্য মনে রাখিও জীবন ফিরিয়া পাইতে চাইলে, জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। আর মনে রাখিও যে কোন মূল্যের বিনিময়ে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাটা মহৎ ধর্ম।

বর্তমান সরকারকে আমি বলি—সাম্প্রদায়িকতা ও অন্যায়ের অনুকূলে আপনাদের উন্মাদ প্রয়াস বন্ধ করুন। এখনও পশ্চাদপসরণ করার সময় আছে। এমন এক বুমেরাং অস্ত্র প্রয়োগ করিবেন না যা অচিরে আপনাদেরই প্রত্যাঘাত হানিবে। বাঙ্গলাদেশে আর এক সিন্ধুর সৃষ্টি করিবেন না।

ঐ চিঠিতে সুভাষচন্দ্র আরও লেখেন যে, টেরেন্স ম্যাক্‌সুইনি, যতীন দাস, মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়াছিলেন যে অনশনের ব্যাপারে কোন রকম হস্তক্ষেপ করবেন না। তিনি তাই আশা প্রকাশ করেন যে নিশ্চয় তাঁর ব্যাপারেও সরকার অনুরূপ সিদ্ধান্তই নেবেন, নতুবা তাঁকে জোর করিয়া খাওয়াইবার চেষ্টা করা হইলে তিনি তাঁর সাধ্যমত শক্তি দিয়া ঐ বল প্রয়োগের প্রতিরোধ করিবেন। অবশ্য তার পরিণতি আরও ভয়াবহ ও বিপর্যয়কর হইতে পারে।

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্বন্ধে রাজশক্তির কোনদিনই কোন সন্দেহ ছিল না। তাঁরা বুঝে ফেলেছিলেন যে সুভাষচন্দ্রের 'না'

কথার অর্থ 'কখনই না'। কিন্তু একথাও সম্ভবত সেদিন রাজশক্তির বিবেচনায় এসেছিল যে তাঁর মত একজন তাত্ত্বিক, বাক্যবাগীশ নেতাকে বাঁচিয়ে রাখলে খুব ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

যা হোক, নির্ধারিত দিনে সুভাষচন্দ্র অনশন শুরু করলেন। বৃটিশ-রাজ স্বভাবতই চিন্তিত হলেন। সুভাষচন্দ্র আর পাঁচজন রাজনীতি-বিদ্‌দের মত নন, এই ধারণা ইংরাজ সব সময়ই পোষণ করতেন। লক্ষ স্বেচ্ছাসেবকের ডাক দেওয়ার পর ইংরাজ তাঁকে বাগ্যবাগীশ ঠাউরে ফেলেছিলেন, তিন্তু তাঁর আন্তরিকতা ও আদর্শের জন্য সর্বস্ব ত্যাগের দৃঢ়তার কথাও ইংরাজের অজানা ছিল না। বহু প্ররোচনার পরও যখন সুভাষচন্দ্র অনশন ভাঙ্গলেন না তখন উচ্চ পর্যায়ে বিচার বিবেচনা করা হ'ল। সুভাষচন্দ্রের মত এমন একজন বাক্যবাগীশ রাজনীতিবিদ্‌কে মরতে দেওয়া যায় না। জেলের মধ্যে অনশনে সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হলে ভারতব্যাপী যে আন্দোলনের জোয়ার বয়ে যাবে তা রোধ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। ওদিকে সুভাষ বসু কারা প্রাকারের মধ্যে আটক থেকে অনশন ভাঙ্গতে নারাজ। অগত্যা একটি পথই খোলা আছে, তাঁকে লৌহ কপাটের বাইরে যেতে দেওয়া। কিন্তু একেবারে ছেড়ে দিলে তিনি যদি হঠাৎ কোন অঘটন ঘটান সেই শঙ্কা যে বৃটিশরাজের মনে ছিল না এমন নয়। দীর্ঘ ছয়দিন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ৪ঠা ডিসেম্বর ইংরাজ সুভাষকে বাড়ীতে থাকার সুযোগ দিলেন। এলগিন রোডের বাড়ী সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত হ'ল।

এবার ঘর ছেড়ে বাইরে যাওয়ার পালা। কারা প্রাচীরের বাইরে রাজশক্তির চোখ এড়িয়ে কিছু করা খুব অসুবিধাজনক হবে না, তবে ঝুঁকি তো সব কাজেই আছে, আর দেশমাতৃকার সেবায় ঝুঁকি তো নিতেই হবে। শেষ বারের মত সুভাষচন্দ্র তাঁর দুর্গম পথ পরিক্রমণের প্রকল্পটি দেখে নিলেন। সবই ঠিক আছে। ২৯শে ডিসেম্বর ভাইসরয়কে লেখা এক চিঠিতে তিনি জানালেন যে তিনি নির্জনে থাকতে চান এবং কারও সাথে দেখা সাক্ষাৎ করবেন না।

নির্জন বাসের সিদ্ধান্তে ইংরাজ স্বভাবতই স্বস্তি পেলেন। যদিও এই স্বস্তি ক্ষণস্থায়ী এবং চিরস্থায়ী অস্বস্তির সূচক হয়ে দেখা দিল।

অতীতের ইতিহাস বর্তমানের সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে। সুভাষচন্দ্র রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই রহস্যময়। অতীতের ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে যে শারীরিক অসুস্থতার জন্য সন্ধ্যার পর সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সংগঠনের কোন রকম কাজ করা থেকে মাঝে মাঝেই বিরত থাকতেন। ঐ অসুস্থতার পিছনে এক গূঢ় কারণ থাকত। সবার অলক্ষ্যে তিনি তখন কয়েকটি বিদেশী দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। বহুবার কারাবাস, নির্যাতন সময়ে সময়ে পুলিশী প্রহারের ফলে তাঁর শরীর ও স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। এই অসুস্থতা তাঁর পক্ষে হয়ত শাপে বর হয়। কারাগারে থাকা-কালীন সুভাষচন্দ্রের অনশন শুরু ও পরে বাড়ীতে অন্তরীণ থাকা-কালীন একা থাকার ইচ্ছা যে এক বিশেষ পরিকল্পনার অংশবিশেষ তা পরে প্রমাণিত হয়েছিল। দুর্গম পথের পথিক সুভাষচন্দ্রের পথ পরিক্রমণধারা বিরোধী-শক্তিকে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে তাঁর গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে চিন্তা করতে বাধ্য করে। বিমান দুর্ঘটনার খবর প্রচারিত হওয়ার পরমুহূর্ত থেকেই বিরোধী-গোষ্ঠী ঘটনা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠেন। ঘটনার মধ্যে রহস্য রোমাঞ্চের ছোঁয়া চন্দ্র বোসের দুর্গম পথযাত্রার ইঙ্গিত বহন করে। তাই প্রকৃত তথ্য জানার জন্য অনুসন্ধানের কাজ জোরদার করা হয়। চন্দ্র বোস কোথায় যেতে পারেন তা জানাই বিরোধী শক্তির প্রথম কাজ। রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করার ইচ্ছা চন্দ্র বোসের বহুদিন থেকেই ছিল। যদিও তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে কম্যুনিজম্ ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য নয়, তবুও তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভারতবর্ষের অবস্থা রাশিয়া নিশ্চয় উপলব্ধি করবে কারণ তার বিপ্লবের জ্বালা সে তখনও ভুলতে পারেনি। বার্লিন, রোম, প্রাগ, ওয়ারস, ইস্তাম্বুল, বেলগ্রেড, আরও অনেক দেশই চন্দ্র বোস ঘুরেছেন। কয়েকটি জায়গায় তিনি একাধিকবার গেছেন।

বিদেশী নেতাদের সাথে তিনি সবিশেষ আলাপ আলোচনাও করেছেন —উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন—মাতৃভূমিকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে হবে।*

যদি বিমান দুর্ঘটনার খবর ভিত্তিহীন হয় তাহলে তিনি কোথায় আত্মগোপন করে আছেন? চন্দ্র বোস বলেছিলেন যে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধ চালানোর উপযুক্ত কোন জায়গায় তিনি নিশ্চয় যাবেন। জাপ সহযোগিতার প্রশ্ন আর আসে না। জার্মানীর তরফ থেকে সাহায্য দেওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। তাহলে, চন্দ্র বোস কোথায় গেলেন? ১৯৪৫ সালের মে মাসে আজাদ হিন্দ্ মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে এক জরুরী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে রাশিয়ার সাথে যোগাযোগ করাই সবচেয়ে উত্তম পন্থা। ১৯৪১ সালে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে জার্মানীতে যাবার পথে চন্দ্র বোস রাশিয়া হয়ে গিয়েছিলেন। জানা যায় যে ২৮শে মার্চ তারিখে তিনি বিমানে মস্কো থেকে বার্লিন যাত্রা করেন। ঐ সময় রুশ নেতাদের সঙ্গে তাঁর কোন বৈঠক হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না। অবশ্য রাশিয়া তখন মিত্রশক্তির সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছিলেন। সুতরাং সুভাষচন্দ্রকে স্বাগত জানানোর মত পরিস্থিতি রাশিয়ার তখন ছিল না। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি আজাদ হিন্দ্ সরকারের প্রতিকূলে যাওয়ার দরুন রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৪৫ সালের জুন মাসে অন্তত: প্রচার যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য নেতাজী মালয়ে যান। কিন্তু পরিস্থিতির জটিলতা দেখে সবাই অন্য কোথাও যাওয়ার কথা চিন্তা করতে থাকেন। আজাদ হিন্দ্ সরকার সিদ্ধান্ত নেন যে নেতাজী মাত্র কয়েকজন সহযোগী নিয়ে রাশিয়ার সীমান্তে কোন জায়গার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার জন্য আজাদ হিন্দ্ সরকার জাপানকেও অনুরোধ করেন। যতদূর জানা

---

* ১৯২২ খৃঃঅঃ থেকে লেলিনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও হয়।

যায়, প্রথম প্রথম জাপ সরকার আজাদ হিন্দ্ সরকারের অনুরোধ রক্ষা করতে দ্বিধা প্রকাশ করেন। পূর্ব এশিয়ায় রাশিয়ার ক্রম-বর্ধমান আধিপত্য নেতাজী ও তাঁর মন্ত্রী পরিষদ বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখছিলেন। রাশিয়ার আধিপত্য বিস্তারই যে জাপ সরকারের ঈর্ষার কারণ, তাও নেতাজীর অজানা ছিল না। কিন্তু মিত্রশক্তি যদি জাপানের প্রতিরোধ ব্যূহ ভেদ করে ফেলেন তা হলে রাশিয়ার সাহায্যই একমাত্র সম্বল হবে। জাপসরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হ'ল যে আজাদ হিন্দ্ সরকারের দপ্তর মাঞ্চুরিয়াতে পাঠান হোক। জাপ সরকার কিন্তু এই প্রস্তাবে অসম্মতি জানালেন। রাশিয়ার মাঞ্চুরিয়ার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সংবাদ আজাদ হিন্দ্ সরকার রাখছিলেন। মাঞ্চুরিয়াতে আজাদ হিন্দ্ সরকারের দপ্তর সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কারণ রাশিয়ার আরও সান্নিধ্যে আসা তাতে কোন সন্দেহ নেই। যুদ্ধের পরিস্থিতি দেখে রাশিয়ার দিকে স্বভাবতই নজর রাখা হচ্ছিল।

১৯৪৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাপানের আত্মসমর্পণের খবর টোকিও বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। আজাদ হিন্দ্ সরকারের কাছে তখন একটি মাত্র সমস্যা, নেতাজীকে কোন নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া। রাশিয়া কতদূর এগিয়ে গেছে? 'দাইরেণ' পৌঁছতে তাদের আর কত সময় লাগবে? আজাদ হিন্দ্ সরকার আসল খবরের জন্য উদ্‌গ্রীব। রাত্রে কেবিনেটের জরুরী বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল, নেতাজীকে অবিলম্বে কোন নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

১৯৪৫ সালের ১৬ই আগস্ট সকাল ৯-৩০ মিনিট নাগাদ নেতাজী কয়েকজন সহযোদ্ধাদের নিয়ে বিমানে সোনান ত্যাগ করলেন। ১৭ই আগস্ট সায়গনে একটি জাপানী বোমারু বিমানে নেতাজীর জন্য মাত্র একখানি আসনের বন্দোবস্ত করে দেওয়া হল। ঐ বিমানটি মাঞ্চুরিয়ার দাইরেণ হয়ে টোকিও যাচ্ছিল। একখানি মাত্র আসন কোন কাজে আসবে না। নেতাজী একা চলে গেলে, তাঁর মন্ত্রী পরিষদ কোথায়

থাকবেন ? তাছাড়া, আরও ভাববার বিষয় ছিল যে নেতাজীর একা যাওয়া যুক্তিযুক্ত হবে কিনা। নেতাজী স্বয়ং কিন্তু একা যেতে অনিচ্ছুক। তাঁর মুক্তিযুদ্ধের নির্ভরযোগ্য সঙ্গীদের তিনি কোথায় রেখে যাবেন ? অথচ, কোন উপায়ও নেই। বিমানে বেশী আসন পাওয়া যাচ্ছে না। সময়ের দাম তখন সত্যিই অমূল্য। সবাইকে সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য নেতাজী যদি অপেক্ষা করেন তবে অনেক বেশী ঝুঁকি নিতে হয়। নেতাজী একাও যদি কোন নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে পারেন তবে ভারতের মুক্তিযুদ্ধ আবার কোন এক সময় শুরু করা সম্ভব হবে। কিন্তু নেতাজী যদি না থাকেন তবে এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। জরুরী বৈঠক হ'ল। সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল যে জাপ প্রতিনিধির কাছে অন্ততঃ আর একটি আসনের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হবে। নেতাজীর অনুরোধে জাপ প্রতিনিধি বিমানে আর একটি আসনের ব্যবস্থা করলেন। এবার কে যাবেন ঐ আসনটিতে ? সবাই নীরব। নেতাজীই কর্নেল হবিব-উর-রহমান-এর নাম প্রস্তাব করলেন। বিমানে উঠবার আগে নেতাজী বললেন, "জয়হিন্দ্। পরে আবার দেখা হবে।"

সংবাদে প্রকাশ, বিমানটি বিকালে ফরাসী ইন্দোচীন সীমান্তের ট্যুরেন বিমান বন্দরে নামে। পরদিন যাত্রা শুরু করে বিমানটি দুপুরের পরে ফরমোসার তাইহোকু বিমান বন্দরে নামে। ঐ দিনটি ছিল ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট। দুপুরের পরেই নাকি বিমানটি তাইহোকু থেকে আবার আকাশে ওড়ে। খানিক পরেই নাকি এক ভীষণ শব্দ শোনা যায়। বিমানটি খাড়াভাবে মাটিতে ভেঙ্গে পড়ে। বিমানের ধ্বংস স্তূপ থেকে নেতাজী কোনরকমে বাইরে আসেন। তাঁর পোষাকে আগুন ধরে যায়। বিমান যাত্রীদের সকলকেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসার কোন ত্রুটি নিশ্চয় তখন রাখা হয়নি। কিন্তু ভবিতব্যকে এড়ানো যায় না।

এত গতিশীল ঘটনার পরিণতি সাধারণত ট্র্যাজিক হয়। অবশ্য এর পরের ঘটনা আরও বেশী গতিশীল। চন্দ্র বোসের কাঠামোটিকে নিয়ে আর লাভ কি? জীবিত ব্যক্তিটির চেয়ে ব্যক্তিটির কাঠামো নিশ্চয় আরও সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই ওটার শেষকৃত্য করে ফেলে দেওয়া হ'ল। অবশ্য খুবই গোপনে—মিলিটারী সিক্রেট বলে কথা। মাত্র কয়েকদিন পরে ঐ বিমানটিকেই নাকি মাঞ্চুরিয়ার আকাশে উড়তে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ওখানে গিয়ে তদন্ত করা সম্ভব নয়, কারণ রাশিয়া তখন আরও এগিয়ে এসেছে।

তাইহোকু এমন এক রহস্যের আবরণ বিশ্বময় ছড়িয়ে দিল যে, বহু চেষ্টাতেও সঠিক প্রমাণ কোন সূত্র থেকেই পাওয়া গেল না। চকিতে এক ঝলক বিস্ময়ের আলো বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়ে, বিশ্ব রাজনীতি জগৎকে বিস্মিত ও শঙ্কিত করে, রূপসী তাইহোকু অবগুণ্ঠিতা হ'ল।

বাঁচবার সবচেয়ে বড় পথ—মরা।

৩

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি মিত্রশক্তির এত বেশী অনুকূলে চলে গিয়েছিল যে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পক্ষে প্রাণে বেঁচে থাকা তখন অসম্ভবই ছিল। নেতাজী বেঁচে আছেন, এ খবর মাটির মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় খবর, কিন্তু চন্দ্র বোস বেঁচে আছেন ভাবতে বিরোধী গোষ্ঠীর ঘুম বন্ধ হয়ে যায়। এমন এক অবস্থায় নিজেকে নিরাপদে রাখার জন্য নেতাজীর সামনে সবচেয়ে সহজ পথ ছিল মরার খবর প্রচার করা। বিরোধী শক্তি বাঁচার সহজ সরল থিয়োরীর কথা জানতেন। তাই চন্দ্র বোসের জাগতিক দেহটাকে খুঁজে বার করার জন্য তাঁরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। চন্দ্র বোসের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর, রাজশক্তির তত্ত্বাবধানে ভারত থেকে, মিঃ ডেভিড ও কর্ণেল ফিনের দুটি তথ্যানুসন্ধানকারী দল দূর প্রাচ্যে পাঠালেন। ঐ দুই দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সর্ব্বশ্রী এইচ্. কে. রায় ও কে. পি. দে। এঁরা তন্ন তন্ন করে এশিয়ার মাটিতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে খুঁজে বেড়ালেন। কিন্তু কোথায় চন্দ্র বোস? তাইহোকুর প্রান্তরে কেমন যেন একটা ধোঁয়াসার সমাবেশ। কর্নেল রহমানের দেখা তাঁরা পেলেন। তদন্তকারী দলের কাছে তথাকথিত ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি অঝোরে কাঁদলেন। তাঁর কান্নার বিবরণ দিতে গিয়ে একজন তদন্তকারী অফিসার পরবর্তীকালে মন্তব্য করেছেন যে, মানুষ এত সহজভাবে এমন সুন্দর কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে পারে, তা কর্নেল রহমানকে কাঁদতে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কর্নেল রহমানের বক্তব্যের উপসংহারে তাঁরা যোগ করলেন যে কর্নেল হবিব-উর-রহমানের বিবৃতি বিভ্রান্তিকর এবং সন্তোষজনক নয়। বোস সত্যই মৃত কিনা তা জানার জন্য তদন্তকারী দলের সবাই উদ্বিগ্ন।

রয়টার সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, ৪৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর সংবাদ পরিবেশন করলেন যে বৃটিশ ও মারকিন সামরিক মহল জাপ সরকার কর্তৃক প্রচারিত শ্রীবোসের মৃত্যু সংবাদ বিশ্বাস করেন না। শ্রীবোসের সম্মানার্থে এক শোক বাণী দেওয়ার জন্য শ্রীনেহেরুকে অনুরোধ জানানোর বিষয়ে মারকিন কর্তৃপক্ষ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে শ্রীবোসের বিচার হওয়া উচিত। মারকিন কর্তৃপক্ষ আরও বলেছেন যে জাপ রেডিও মারফৎ শ্রীবোসের মৃত্যুর কথা প্রচারিত হওয়ার কয়েকদিন পরেও শ্রীবোসকে সায়গনে দেখা গেছে বলে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। ৩রা সেপ্টেম্বর এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের এক খবরে প্রকাশ পেল যে শ্যাম সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ বলেছেন যে জাপ সরকার কর্তৃক প্রচারিত শ্রীবোসের মৃত্যুর খবর তাঁর পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। এ সব খবর বিরোধী গোষ্ঠীর অজানা নয়। তাঁদের দলিল দস্তাবেজে আরও অনেক খবরই ছিল। কাবুলের রুশ রাষ্ট্রদূত আফগানের খোস্টের শাসনকর্তাকে নাকি জানিয়েছেন যে মস্কোতে বহু কংগ্রেস সেবী আছেন, শ্রীবোসও তাঁদের অন্যতম। এখবরও তদন্তকারী দলের জানা। ওদিকে ১৯৪৬ সালের জানুয়ারীতে মহাত্মা গান্ধী বললেন যে, "নেতাজী সুভাষ জীবিত এবং তিনি কোথাও আত্মগোপন করে আছেন।" রাজশক্তি আরও খবর পেলেন যে গান্ধীজী যে সময় প্রকাশ্যে নেতাজীর জীবিত থাকার কথা বললেন সেই সময় শ্রীনেহেরু নাকি নেতাজীর কাছ থেকে একখানি চিঠি পান। ঐ চিঠিতে নেতাজী নাকি ভারতে ফিরে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করেন এবং চিত্রল হয়ে ভারতে ফেরার পরিকল্পনা জানান। প্রায় ঐ সময়েই নেতাজীর অগ্রজ ৺শরৎ চন্দ্র বসু বলেন যে, তাঁর ভাই জীবিত এবং প্রজাতন্ত্র চীনে আছেন বলে তাঁর ধারণা।

চন্দ্র বোস যেখানেই থাকুন, তাঁকে খুঁজে বার করাটাই বিরোধী-শক্তির প্রথম কাজ। বিমান দুর্ঘটনার খবর সত্যি হলে, তা

আশীর্বাদ স্বরূপ হ'ত, কিন্তু তা হয়নি। তদন্তকারী দল তাঁদের দলিলে লিখলেন যে শ্রীবোসের বেঁচে থাকার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। জাপ সরকারের আত্মসমর্পণ ও আজাদ হিন্দ্ সরকারের আত্মগোপনের পর কয়েকটি টেলিগ্রামের কপি তদন্তকারী দলের হস্তগত হয়। ঐ টেলিগ্রামগুলির মধ্যে অন্ততঃ চারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঐগুলি থেকে চন্দ্র বোসের আত্মগোপন ও তাঁর মৃত্যু সংক্রান্ত মিথ্যা কাহিনী প্রচারের পরিকল্পনা সম্বন্ধে ধারণা করে নেওয়া যায়। তদন্তকারী দল আরও লিখলেন যে ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাস থেকেই চন্দ্র বোস মাঞ্চুরিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য জাপ সরকারকে অনুরোধ জানাতে থাকেন। শ্রীবোস তাঁদের বলেন যে বার্মা থেকে ভারত অভিযান করা যখন সম্ভব নয় তখন তিনি মস্কো থেকে দিল্লী আসার অন্য কোন ব্যবস্থা করবেন। তিনি যখন সায়গনে পৌছান তখন ইসোদাও সায়গনে ছিলেন। এর থেকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে চন্দ্র বোসকে আত্মগোপন করতে দেওয়ার এবং তারপর তাঁর এক কল্পিত মৃত্যু কাহিনী প্রচার করে দেওয়ার এক বিরাট পরিকল্পনা জাপ 'হিকারি কিকানের' ছিল। মিত্র শক্তির তদন্তকারী দলের ঐ সময়কার রিপোর্টে বলা হয় যে শ্রীবোসের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায় টোকিও থেকে ডোমি নিউজ এজেন্সি মারফৎ। ১৯৪৫ সালের ২৩শে আগস্টের খবরে বলা হয় যে তাঁকে জাপানের হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয় এবং সেখানেই ১৮ই-১৯শের মধ্যরাত্রে তিনি মারা যান। ১৯৪১ সালে সুভাষ বোস কলকাতা ত্যাগ করে যাওয়ার দশ দিন পর তাঁর গৃহত্যাগের খবর জানা যায়, যখন তিনি নিরাপদ জায়গায় পৌছে যান। এখানেও দেখা যায় ১৮ই আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু এ খবর প্রকাশ করা হয়েছে ৫ দিন পর। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও ১৯৪১ সালের মত পরিকল্পনা থাকা অসম্ভব নয়। জাপান সরকার প্রচার করলেন যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে জাপানে কিন্তু সাক্ষীদের বিবৃতি থেকে জানা যায় যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে তাইহোকুতে।

এই মারাত্মক গোলযোগের সম্ভবত একটি ব্যাখ্যাই হয়, তাহ'ল চন্দ্র বোসের মৃত্যু হয়নি। একই ব্যক্তির একই দিনে দু জায়গায় মৃত্যু ঘটতে পারে না। তদন্তকারী দল টোকিওর ভস্ম দেখে মন্তব্য করেছেন যে ভস্ম থেকে প্রমাণ হয় না যে ঐ ভস্মই চন্দ্র বোসের। ওটা যে কোন লোকের হাতে পারে, এমনকি ঐ ভস্ম কোন মানুষের নাও হতে পারে।

ইন্টেলিজেন্স ডিভিসনের মেজর ইয়ংকে লেখা ১৯।২।৪৬ তারিখের এক চিঠিতে মিঃ ম্যাকরাইট জানান যে বোসের প্রচারিত মৃত্যু সম্পর্কে প্রাপ্ত সমস্ত তথ্যগুলির পরীক্ষা শেষ হয়েছে। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই ভীষণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর। কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হচ্ছে না। SACSEA Commission এর-রিপোর্টে জানা যায়, নিঃসন্দেহে ধরা যেতে পারে যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে চন্দ্র বোসের আত্মগোপন করার পরিকল্পনা ছিল। কমিশনের ৬ই নভেম্বরের রিপোর্টে জানা যায় যে জাপ সরকার বোসকে আত্মগোপন করতে সাহায্য করার দায়িত্ব নিয়েছিল। অপর পক্ষে মিঃ ম্যাকরাইটকে লেখা ১।৩।৪৬ তারিখের এক চিঠি থেকে জানা যায় যে চন্দ্র বোসের মরদেহের ব্যাপারে বিরাট বিভ্রান্তির মধ্যে পড়া গেছে। ইসোদা ও অন্যান্য আটক ব্যক্তিরা বলেছেন যে উনি (চন্দ্র বোস) তাইহোকু হাসপাতালে মাঝ রাতে মারা গেছেন এবং তাঁর দেহ ফরমোসার সামরিক কর্তৃপক্ষ টোকিওতে নিয়ে গেছেন। অথচ, ডোমি নিউজ এজেন্সি বলছেন যে তিনি জাপানে মারা গেছেন। এদিকে আবার হবিব-উর-রহমান বলছেন যে তাঁর মৃত্যু, দাহ ও কবর দেওয়া তিনটি কাজই তাইহোকুতে হয়েছে। বিবৃতিগুলির অসামঞ্জস্য এত বেশী যে পুরো ব্যাপারটাই বেশ সন্দেহজনক বলে মনে হয়। উপরন্তু মনে হয় যে এর পিছনে এক সুপরিকল্পিত চতুর ষড়যন্ত্র আছে যা অত্যন্ত সতর্কতা এবং দক্ষতার সাথে কার্যকরী করা হয়েছে। ঐ চিঠিতে আরও লেখা আছে যে খুবই সম্ভব যে, বোস অক্ষত দেহে

ফরমোসায় অথবা আশে পাশে কোথায়ও আত্মগোপন করে আছেন। এ ছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারা যায় না।

নেতাজী সম্পর্কে অবশ্য এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন ভারত-বৃটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের যুগ্ম তদন্ত বিভাগের অধিনায়ক কর্নেল ফিনে। তাঁর বক্তব্য—"শ্রীবোস সত্যই এবং স্থায়ীভাবে মৃত কিনা (whether Mr. Bose is actually and permanently dead), তা জানার জন্য সরকারের আরও তদন্ত করা উচিত।" চন্দ্র বোসকে নিয়ে খুবই শঙ্কা। শুধু মাত্র তাঁর মৃত্যুর খবর পেলেই চলছে না, তথ্য প্রমাণ থাকা চাই যে তিনি সত্যই মৃত এবং সেই মৃত্যু চিরস্থায়ী। একমুঠো চিতাভস্ম প্রমাণ করে না যে নেতাজী আর ইহজগতে নেই। জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের পল্ লুভারথুন মন্তব্য করেছেন*—A report says Subhas Chandra Bose died in a plane crash, but this report dose not meet with any credential."—এই বক্তব্য থেকে প্রমাণ হয় যে বিমান দুর্ঘটনার সমর্থনে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। বিমান দুর্ঘটনা সাজানো ঘটনা হলে নেতাজী নিশ্চয় কোথায় আত্মগোপন করে আছেন। ফরমোসা, সায়গন, চীন, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি জায়গায় তাঁকে দেখা গেছে বলে কিছু কিছু খবরও পাওয়া যায়। তবে, যেখানেই তিনি থাকুন চুপ করে বসে থাকার মত মানুষ তিনি নন। আবার তিনি অস্ত্র ধরে দাঁড়ানোর আগে তাঁকে আটক করার জন্য বিরোধী গোষ্ঠী দৃঢ় সঙ্কল্প। এখন বোসকে ঘিরে তাঁর আজাদ হিন্দ্ ফৌজ নেই। এমন সুযোগ বিরোধী গোষ্ঠির সামনে আর আসবে না। সন্ধানীদলগুলিকে আরও শক্তিশালী করা হ'ল। চন্দ্র বোসকে খুঁজে পেতেই হবে, তাঁকে নিশ্চয় খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু চন্দ্র বোসকে নিয়ে এত ভাবনা কেন, বিমান দুর্ঘটনার খবর প্রচারিত হওয়ার পরেই তো তিনি মৃত। আর ভারতবর্ষকে একদিন নিশ্চয় স্বাধীনতা

* German Military Intelligence Service 1956.

ফিরিয়ে দিতে হবে। কারণ ভারতের জনমনে স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার জন্য যে ঐকান্তিক কামনা ধীরে ধীরে দানা বাঁধছিল তা বেশীদিন যে অস্বীকার করে রাখা যাবে না, তা রাজশক্তি জানতেন। তবে চন্দ্র-বোসকে নিয়ে এত মাথা ব্যথা কেন? সমস্যা শুধু ভারতবর্ষকে নিয়েই নয় সমস্যা এশিয়াকে নিয়েও, আফ্রিকাকে নিয়েও, বিশ্বের মুক্তিকামী সব মানুষকে নিয়ে। চন্দ্র বোস যদি আবার সুযোগ করে নিতে পারেন তবে বিশ্বময় এমন এক আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়বে যা রোধ করার সাধ্য কোন শক্তিরই থাকবে না।

তাই চন্দ্র বোসকে আটক করা চাই। একদিন হঠাৎ জেঃ ম্যাক-আর্থার সরব হলেন। তিনি বললেন—He has again escaped. If he comes again, we will loose whole Asia.' অবাক কাণ্ড। যে চন্দ্র বোস বিমান দুর্ঘটনায় মৃত বলে ঘোষিত, তিনিই আবার নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে চলে গেছেন। আর যদি তিনি আবার ফিরে আসেন তাহলে এশিয়া হাতছাড়া হয়ে যাবে। এই উক্তি নিশ্চয় চন্দ্র বোসের অশরীরী আত্মার উদ্দেশ্যে করা হয়নি? তাহলে, চন্দ্র বোস জীবিতই আছেন। মিত্রশক্তি তাঁর অবস্থিতির খবর পেয়ে তাঁকে আটক করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, কিন্তু অপারেশন শুরু হওয়ার আগেই তিনি অদৃশ্য হয়েছেন। ম্যাক্-আর্থারের উক্তির মধ্যে 'আবার' শব্দটি বিশেষ অর্থপূর্ণ। এর আগে অন্ততঃ আর একবার চন্দ্র বোস নিশ্চয় মিত্রশক্তির দৃষ্টি এড়িয়ে চলে গেছেন। একবার নয়, বহুবার বিরোধী-গোষ্ঠী তাঁকে খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু তাঁকে আটক করা কখনও সম্ভব হয়নি। এই প্রসঙ্গে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের হাবিলদার হায়াৎ সিং নেগী'র বলা একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়।

হাবিলদার নেগীর কথায়—সেদিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শোচনীয় পরিণতি আমাদের ভাগ্যকে প্রায় নিয়ন্ত্রিত করে এনেছে। ব্রহ্মদেশ থেকে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ পশ্চাদপসরণ শুরু করেছে। নেতাজী

একটি জিপ গাড়ীতে পিছনের এক ক্যাম্পের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। আমি দেহরক্ষী হিসাবে তাঁর সঙ্গে গেলাম। পথে জিপ গাড়ীটা বিকল হয়ে গেল। এদিকে রাতের অন্ধকার নেমে আসছে। চারপাশে জঙ্গল। কাছেই একটা ভাঙ্গা বাড়ী খুঁজে পাওয়া গেল। বাড়ীটি গোলার আঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। নেতাজী ঐ বাড়ীটির মধ্যে একটু আড়ালে গেলেন। তিনি আমায় ডেকে বললেন, "নেগী আমার ব্যাগে দুধ, চিনি ও চা আছে, তুমি একটু জল গরম করে নিতে পার ?" আমি কিছু শুকনো ডালপালা জড়ো করে আগুন জ্বালিয়ে জল গরম বসালাম। ঐ সময় কয়েকজন পুঙ্গীকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। ব্রহ্মদেশে সন্ন্যাসীদের পুঙ্গী বলে। তাঁরা আমার কাছে এসে নেতাজীর খোঁজ জানতে চাইলেন। তাঁদের দেখে আমার কোন সন্দেহই মনে জাগেনি। তবে, নেতাজী যে ভাঙ্গাবাড়ীর মধ্যেই আছেন তা আমি তাঁদের জানাই নি। ইতিমধ্যে জল গরম হয়ে গিয়েছিল। আমি নেতাজীর ব্যাগ থেকে চা, চিনি আনতে ভিতরে গেলাম। পুঙ্গীদের বললাম একটু অপেক্ষা করতে। বাড়ীর ভিতরে গিয়ে নেতাজীকে যে অবস্থায় দেখলাম তা এখানে বলার প্রয়োজন নাই। শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে নেতাজীর সেই অপরূপ রূপ যতদিন আমি বেঁচে থাকব ততদিন আমার চোখে ভাসবে। জানি না পূর্ব জীবনে কত পুণ্য ফল আমার জমা ছিল, তাই নেতাজীর ঐ রূপ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। নেতাজীকে না ডেকে আমি নীরবে বাইরে চলে আসছিলাম, কিন্তু তিনিই আমায় ডাকলেন, 'নেগী, কিছু বলবে ?' আমি নেতাজীকে পুঙ্গীদের কথা জানালাম। তিনি তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। আমি পুঙ্গীদের নেতাজীর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। তাঁরা অনেকক্ষণ নেতাজীর সঙ্গে কথা বলে বাইরে এলেন। নেতাজী আমায় ডেকে বললেন, "দেখ নেগী, ওরা বৃটিশের গুপ্তচর। আমায় গুলি করে মারার জন্য এসেছে।" আমি বাইরে এসে দেখলাম যে পুঙ্গীরা কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে, এদিক ওদিক দেখছে।

ওঁদের গুলি করে মারার জন্য নেতাজীর কাছে নির্দেশ চাইলাম, কিন্তু তিনি অনুমতি দিলেন না। তিনি বললেন, ওঁরা আমাদের কিছু করতে পারবে না।" কিছুক্ষণ পরে পুঙ্গীরা আবার ফিরে এলেন। তাঁরা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন যে নেতাজী এসেছেন কি না? আমি কোন কথা না বলে নেতাজীকে দেখালাম। তাঁরা নেতাজীর কাছে গিয়ে আবার তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। তাঁরা জানালেন, "আমরা সুভাষ বোসের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমাদের খবর আছে যে তিনি এই পথেই আসছেন।" উত্তরে নেতাজী বললেন, "আপনাদের খবর ঠিক। অপেক্ষা করুন।" পুঙ্গীরা চলে গেলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার এলেন। অনেকবারই তাঁরা যাতায়াত করলেন। প্রত্যেকবারই তাঁরা এসে নেতাজীর সঙ্গে কথা বলেন আর ফিরে গিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে নেতাজীর ছবি বার করে দেখেন। অনেকক্ষণ পরে একটি গাড়ী পাওয়া গেল। নেতাজী ঐ গাড়িতে চড়ে চলে গেলেন, আর আমি বিকল জিপটা পাহারা দেওয়ার জন্য থেকে গেলাম। খানিক পরে, পুঙ্গীরা আবার এসে আমায় প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, নেতাজী সত্যিই আসবেন তো? কখন তিনি আসবেন?" তখন আমার খুব হাসি পাচ্ছিল। তাঁদের আমি বললাম, "নেতাজী তো এখানেই ছিলেন। এইমাত্র চলে গেলেন।" আমার কথা শুনে তাঁরা যেন আঁৎকে উঠলেন। আমি আবার বললাম, "যাঁর সাথে আপনারা এতবার এসে কথা বললেন, তিনিই তো নেতাজী।"

এই বিবরণ থেকে প্রমাণ হয় যে চন্দ্র বোসকে কাছে পেয়েও চিনতে না পারা সম্ভব। এমন ঘটনা আরও অনেক ঘটেছে। আবার এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড-এর গোয়েন্দা দল সুদীর্ঘ ছ'মাস ইউরোপের মাটিতে একজন হাঙ্গেরীয়ানের পিছনে অনুসরণ করেছেন। ঐ হাঙ্গেরীয় ভদ্রলোককে নাকি চন্দ্র বোসের মতই দেখতে ছিল। অন্য কোন নেতার জন্য কোন একজন

বিদেশীর পিছনে ঘোরার প্রয়োজন হ'ত না। কিন্তু চন্দ্র বোসের মত নেতার পক্ষে অসম্ভব বলে কিছুই বোধহয় নেই। হাঙ্গেরীয়ান ভাষা শিখে নিয়ে হাঙ্গেরীয়ানদের মত কথা বলা চন্দ্র বোসের পক্ষে সম্ভব বলেই, একজন হাঙ্গেরীয়ানের পিছনে গোয়েন্দা দলকে ছুটতে হয়েছিল। কিন্তু একদিন ভুল ভেঙ্গেছে। নেতাজীর অসাধারণ ছদ্মবেশ ধারণ করার ক্ষমতা বিরোধী-গোষ্ঠীর অজ্ঞাত নয়, তাই প্রতিটি ব্যক্তির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয়েছিল। কিন্তু নেতাজীকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, বা পাওয়া গেলেও তাঁকে চিনতে পারা যায়নি। অথচ তাঁকে রুখ্‌তেই হবে। সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা, কিন্তু নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে এশিয়া মহাদেশে জোট বাঁধার সম্ভাবনা। তিনি যদি এশিয়ার বাইরে কোথাও থেকে থাকেন, তবে তাঁর এশিয়ার মাটিতে ফিরে আসার পথ বন্ধ করে দিতে। আর যদি এশিয়ার মাটিতেই তিনি থেকে থাকেন তবে তাঁকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে বিরোধী-গোষ্ঠী তৎপর। চন্দ্র বোসের প্রথম পর্যায়ের লড়াই শেষ হয়েছে, কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের লড়াই-এ তিনি কোন্ অভিনবত্বের সুচনা করবেন, তা কারও জানা নেই।

ভারতের জনমনে নেতাজীর আসন কোথায় তা বিরোধী-গোষ্ঠী জানেন। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়ক ডাক দিয়েছিলেন— "দিল্লী চলো।" আর তাঁরই অধীনস্থ সৈন্যদের বিচার বসল দিল্লীর লালকেল্লায়। অপূর্ব পরিহাস। কিন্তু পরিহাসের মাত্রাটা যে একটু বেশী এবং অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে, তা বোঝা গেল বিচার শুরু হবার পর। ভারতের জনমনে এক নূতন প্রাণের সাড়া জাগল। একদিকে নেতাজীর জীবিত থাকার সমর্থনে বহু তথ্য প্রমাণ, আর অন্যদিকে ভারতের জনচিত্তে উত্তেজনা। সব মিলে পরিস্থিতিটা প্রতিকূলই হ'ল। মাইকেল এডওয়ার্ড রাজশক্তির স্বাধীনতা দেওয়া সম্বন্ধে লিখেছেন যে, লালকেল্লার প্রাকারে সুভাষচন্দ্রের ছায়ামূর্তি

কল্পনা না করলে বৃটেন এত তাড়াতাড়ি ভারতের স্বাধীনতা দিত কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।*

১৯৪৫ সালের শেষের দিকে ভারতের মাটিতে এক নূতন উত্তেজনা দেখা দেয়। ১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে কেমন যেন একটা অশান্ত অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। চারিদিকে কেমন যেন একটা সাজ-সাজ রব ওঠে। খবরে প্রকাশ যে নেতাজী তাঁর অজ্ঞাতবাস থেকে ঐ আন্দোলনের খবর পান। ১৯৪৫ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তাঁর এক বেতার ভাষণ শোনা যায়। ঐ ভাষণে তিনি বলেন—"We are under the shelter of one of the great powers of the world. We should not be disappointed. The first round of the battle is a failure. The battle of freedom is not easy. America won her independence after seven years fighting. Ireland won her independence after four years fighting. We are sure to be successful within two years. I will go to India on the crest of a third world war, and sit in the judgement upon those who are trying my officers and men at the Red Fort."

"আমরা পৃথিবীর কোন এক বৃহৎ শক্তির আশ্রয়ে আছি। আমাদের ভাঙ্গিয়া পড়ার কোন কারণ নাই। প্রথম পর্যায়ের লড়াই ফলপ্রসূ হয় নাই। স্বাধীনতা সংগ্রাম এত সহজসাধ্য নয়। সাত বছর যুদ্ধ করার পর আয়র্ল্যাণ্ড তার স্বাধীনতা পায়। চার বছর যুদ্ধ করার পর আয়র্ল্যাণ্ড তার স্বাধীনতা পায়। আগামী দুই বছরের মধ্যে আমরা নিশ্চয় সাফল্যলাভ করিব। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের তুঙ্গমুহূর্তে আমি ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইব, এবং যাঁরা আমার অফিসার ও যোদ্ধাদের লালকেল্লায় বিচার করিতেছেন, তাঁদের বিচার করিতে বসিব।"

উপরোক্ত বেতার ভাষণটি গভর্ণর কেসির রেডিও মনিটর

---

* The Last Years of British India—Michael Edward, P. 86

শ্রীপি. সি. কর বেতার যন্ত্র মারফৎ শুনতে পান। শ্রীচিন্তামনি কর ১৯৫৫ সালের ২৩শে জানুয়ারী অমৃত বাজার পত্রিকায় এক প্রবন্ধে এই বেতার ভাষণের উল্লেখ করেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতার জন্যই দুর্গম পথের পথিক হয়েছেন। তাঁর সংগ্রামের ফলাফল সম্বন্ধে রাজশক্তি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। ভারতকে স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতেই হবে, কিন্তু কোন্ পথে। নিঃস্বার্থভাবে কোন সরকারই কোন কাজে হাত দেয় না। বৃটিশরাজ ভারতের ব্যাপারে এমন এক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য, যাতে তাঁর স্বার্থ বজায় থাকে। চন্দ্র বোস ফিরে এলে নিশ্চয় প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি হবে। তাই বৃটিশরাজকে নূতনভাবে ভাবতে দেখা গেল। ১৯৪৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী লণ্ডন থেকে পাওয়া এক খবরে প্রকাশ পেল—In their talks with the Prime Minister at 10, Downing Street, some emphasis was placed by the Parliamentary Delegates on the Degree with which both Congress and Muslim League are being dominated by the I. N. A. movement. Another point pressed home was that the Indian situation is such that before long the initiative could pass out of the hands of Gandhi into those who believe in Bose's doctrine.

নেতাজীর মতবাদে বিশ্বাসী এমন লোকের হাতে ভারতের নেতৃত্ব চলে যেতে পারে ভেবে রাজশক্তি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তাই রাজশক্তির বিশ্বস্ত প্রতিনিধিরা ভারতে এলেন। তাঁদের বৈঠক শুরু হ'ল অনুমোদিত ও স্বীকৃত ভারতীয় নেতাদের সাথে। ভারতবর্ষের রূপ ও রং বদলের আলাপ জমল।

১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ ভারতের বিভিন্ন সংবাদ পত্রে কতকগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সংবাদ পরিবেশিত হয়। লাহোরের "সিভিল এ্যাণ্ড মিলিটারী গেজেট" এ কলিকাতায় আগত জনৈক চীনা

ভদ্রলোকের বক্তব্য প্রকাশিত হয়। ঐ চীনা ভদ্রলোক জানান যে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস জীবিত এবং তিনি মাঞ্চুরিয়ায় আছেন। ঐ সংবাদে আরও প্রকাশ পায় যে ১৯৪৫ সালের ১৯শে ডিসেম্বর নেতাজী সুভাষচন্দ্র মাঞ্চুরিয়া থেকে বেতার ভাষণ দিয়েছেন। মালয় থেকে প্রকাশিত 'সেবিকা' (২৮।৩।৪৬) সংবাদপত্রে লেখা হ'ল যে সুভাষচন্দ্রের মাঞ্চুরিয়া থেকে দেওয়া বেতার ভাষণ শোনা গেছে বলে লণ্ডন থেকে পাঠানো এক সংবাদে জানা যায়। আজাদ হিন্দ্ সরকারের প্রচার সম্পাদক এবং প্রেস ডাইরেক্টর শ্রীকে. ই. গণপতি বললেন যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র মাঞ্চুরিয়ায় আছেন (৪।৩।৪৬)। পাতিয়ালায়, এক জনসভায় ডঃ একরাম হোসেন নথিপত্র পেশ করে বললেন যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র জীবিত। বিমান দুর্ঘটনার খবর প্রচারিত হওয়ার পর তিনি নেতাজীর ব্যক্তিগত উপদেষ্টার কাছ থেকে পাওয়া এক তারবার্তায় জানতে পারেন যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র জীবিত এবং কোন এক নিরাপদ জায়গায় আছেন (৪।৪।৪৬)। ওদিকে ক্যাপটেন সুলতান দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সমবেত এক জনতাকে জানালেন যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র মারা যাননি। তিনি সশরীরে রাশিয়ায় আছেন এবং ভারতবর্ষকে মুক্ত করার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করছেন।

মাত্র কয়েকমাসের ব্যবধানে, তাইহোকুর ঘটনাকে অস্বীকার করে অনেক সংবাদ রাখা হ'ল। কিন্তু বিস্ময়ের আরও বাকী ছিল। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের ১৯শে বেতারে দু'টি বিশেষ বক্তব্য শোনা গেল। জানুয়ারী মাসে শোনা গেল—

"I am giving a very short speech about the Indian National week to India for my brothers and sisters in India. We must get freedom within two years, The British Imperialism is breaking down and it must concede independence to India. India will not be free by means of Non-violence. But I am quite respectful to Mr. M. K. Gandhi. The battle of

freedom is not easy. But I can assure you that we will get freedom of India very soon. I know that many Indians are waiting for me. I am quite sure to be successful within two years.

I have been informed of the news of the police firing at Calcutta. Many students are dead. My eyes were full of tears when I heard it. I know that man is mortal and the most glorious death is one when a person dies to save his country. The Indians who shed their blood for freedom could not die. My first order to my revolutionary friends in India is that they will hold a great meeting to commemorate the martyrs on the 25th instant."
ফেব্রুয়ারী মাসে শোনা গেল—"This is Subhas chandra Bose speaking. Jai Hind. It is for the third time I am addressing my Indian brothers and sisters after Japan's surrender. The Prime Minister of England is going to send Mr. Pethick Lawrence and two other Ministers from London with no object in view other than let the British Imperialism have a permanent settlement for all means to suck the total blood of India. Now among these three Londoners, one had to go back form India with a baffled heart only a few months ago. It is a sort of precaution, I am advising Indians not to pay any heed to these imposters. I am sure that Mr. Pethick Lawrence will have to submit an adequate explanation for all the mishaps and distresses of India by this time. The underlying intention of this endeavour by the three is nothing but to set a new trap of dependence in which India may fall very soon. So my earnest appeal to the Indians is that they should

in no case hear them but continue revolution against what is contrary to achieve freedom. I think many other Viceroys and Ministers will embark on India with the same motto for keeping us in dark room of dependence. But my Indians should not hear them.

Again I am announcing that within a short period of two years India will have the dawn of Independence. We will have complete freedom by that time and I will also come in the year 1947. Many of the Indians have declared me as the 'Netaji' of India but I am telling them that I am nothing but an humble son like others of Bharat-mata and am not at all worthy of being the same. The British Imperialism will have its utter destruction and it is now commenced. You see they have come down to utter shame by killing our children only for having their imperialism still above.—"

বেতারে ভেসে আসা কণ্ঠস্বরে সেই একই সুর—বৃটিশরাজ ভারতের স্বাধীনতা দিতে বাধ্য। চন্দ্র বোস কোন এক অজ্ঞাত স্থান থেকে ভারত মায়ের পূজার আয়োজন করে চলেছেন। একি মৃত বলে ঘোষিত ব্যক্তির জীবিত হওয়ার প্রয়াস, না অন্য কোন গূঢ় কারণ রয়েছে। জনসাধারণের মন থেকে তাঁর স্মৃতি মুছে দিতে পারলেই রক্ষা নইলে ঐ কণ্ঠস্বর কোন এক বিশেষ মুহূর্তে ঘরে ঘরে ধ্বনিত হতে থাকবে। চন্দ্র বোস আবার ভারতে ফিরবেন। তাঁর ফিরে আসার আগেই পরিবেশটাকে পাল্টে দিতে হবে। ভারতবাসীর মনের অবস্থা তখন অনুমানের বাইরে। একদিকে নেতাজী নিধনের যজ্ঞ ও অন্য দিকে স্বাধীনতার প্রলোভন। মহত্মাজীর কণ্ঠে একদিন শোনা গেল, "তোমরা আমাকে যে বিরোধী কথাই বল না কেন, আমি এখনও আমার অন্তরের অন্তস্থলে বিশ্বাস করি যে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস

বেঁচে আছেন (১৪।৩।৪৬)।" চন্দ্র বোস বেঁচে আছেন, একথা যত বেশী প্রচার হয়, তত বেশী বিরোধী তৎপরতা বেড়ে যায়। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে ভারতের ভাগ্য নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত সেই দিনটি এ'ল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট রাজশক্তি ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন। কিন্তু কোন্ সর্তে? যদি উত্তর পাওয়া যায় যে, রাজশক্তি নিঃসর্ত-ভাবেই ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন, তাহলে আরও একটা প্রশ্ন মনে জাগে, তাহ'ল নিঃসর্ত হস্তান্তরের জন্য নিশ্চয় কোন দলিল তৈরী হয়েছে। ঐ দলিলটি কোথায়? ক্ষমতা দেওয়া হ'ল, কিন্তু জনসাধারণ ঐ দেওয়ার সর্তগুলি জানল না। ভারতবর্ষ দু'ভাগ হ'ল। এমন দুর্লভ প্রাপ্তির ফল আমরা পেলাম। রক্তে রাঙা হ'ল ভারতের মাটি।—

খণ্ড ভারত স্বীকার করে নিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে চ্যালেঞ্জ জানানো হ'ল। নেতাজী বলেছিলেন যে নিয়মতান্ত্রিক পথে স্বাধীনতা এলে ভারত ভাগ হবে। হ'লও তাই। কিন্তু এই পথে স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া যদি অস্বীকার করা হ'ত তবে, রাজশক্তি সমস্যায় পড়তেন। ভারতের আপসকামী ক্লান্ত নেতারা, রাজশক্তিকে কোন সমস্যায় ফেলতে চান নি। ভারতের জনসাধারণ হতাশার মাঝেও প্রত্যাশা নিয়ে রাজধানীর দিকে তাকালেন। সর্বস্তরেই প্রশাসনিক ও বিধিব্যবস্থার পরিবর্তন হতে দেখা গেল। ভারতের পরিবর্তনশীল পরিবেশের মাঝে একটি বিশেষ নির্দেশ সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার প্যাটেল এক বিশেষ নির্দেশ পাঠালেন যে সেনাবাহিনীর যে সব অফিসার আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের যেন পুনর্নিয়োগ করা না হয়।* রাজনীতি-

* "Sardar Patel, India's first Home-Minister, explained to me in 1950 that he had been very carefull indeed not to reinstate any of the officers who had gone over to Subhas Bose's I. N. A. He also saw to it that they did not thrive

ক্ষেত্রেও তাঁরা যেন কোন আসন করে নিতে না পারে সেদিকেও নজর রাখা হ'ল। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের জওয়ানগণ মাতৃভূমির মুক্তির জন্য অনিশ্চিতের পথে পা বাড়িয়েছিলেন। মাইকেল এডওয়ার্ড তাঁর বইয়ে একজায়গায় লিখেছেন যে, স্বাধীনতা অন্দোলনের নেতৃত্বে যখন একটা আপসমূলক মনোভাব দানা বাঁধছিল, তখন সুভাষচন্দ্রের মত এক মহান ব্যক্তিত্ব সাহসের সঙ্গে ভিন্ন ও সশস্ত্র পথ বেছে নিয়েছিলেন বলেই ভারতের স্বাধীনতা এত তাড়াতাড়ি এসেছিল। "নেতাজীর নেতৃত্বে যাঁরা অস্ত্র তুলে ধরলেন তাঁদের দেশপ্রেমের নিদর্শন হিসাবে নিশ্চয় অন্য কোন পরিচয় পত্র দাখিল করার প্রয়োজন নেই, আর তাঁদের সামরিক শিক্ষাও অন্য কোন সামরিক বাহিনীর শিক্ষার তুলনায় হীন নয়। কিন্তু নূতন ভারত গড়ে তোলার জন্য তাঁদের কোন প্রয়োজন নেই দেখে স্বভাবতই সন্দেহ জাগে। হস্তান্তরের দলিলে তেমন কোন বিশেষ সর্ত আছে কি? অবশ্যই ভারতের অন্য অংশ পাকিস্তান সরকার কিন্তু আজাদ হিন্দ্ ফৌজের যোদ্ধাদের জন্য কোন বিধিনিষেধ আরোপ করেন নি।"

স্বাধীনতা পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই রাজনৈতিক মহলে ও উচ্চ সরকারী পর্যায়ে একটা গুঞ্জন শোনা গেল। ফিস্ ফিস্ করে কানে কানে একটি খবর ছড়িয়ে পড়তে লাগল নেতাজী নাকি বিয়ে করেছেন। মনে পড়ে স্বর্গত তুলসী গোঁসাই-এর কথা "রচনা হয়েছে, রটনা করতে বাকী আছে, নেতাজী নাকি বিবাহ করেছেন।" কিন্তু ইহা সর্বৈব মিথ্যা। রটনা আপনারা শীঘ্রই শুনতে পাবেন। তাঁর কথা সত্য হ'ল ১৯৪৯ সালের ২২শে এপ্রিল বেনারস থেকে হিন্দী ভাষায় "সন্মার্গ" পত্রিকায় একটি সংবাদ পরিবেশিত হ'ল। খবরটি ২১শে এপ্রিল নয়া

---

in politics. In Pakistan, by contrast, no stigma attached to the I. N. A. and I was later to meet high ranking officers who had been in I. N. A."

Reporting India—by Taya Zinkin, P. 14-15.

দিল্লী থেকে পাওয়া। ঐ খবরে জানানো হ'ল যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র জনৈক জার্মান ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর আট বছর বয়সের একটি পুত্র সন্তান আছে। নেতাজীর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু অস্ট্রিয়া ঘুরে এসেছেন। তাঁর অস্ট্রিয়া যাবার কারণই ছিল নেতাজীর বিয়ে সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া এবং তাঁর স্ত্রী (শ্রীমতী) শেঙ্কেল-এর সঙ্গে দেখা করা। জার্মান ভদ্রমহিলা সলজ্জভাবে শরৎবাবুকে জানান যে পুত্র রত্নটি নেতাজী তাঁকে উপহার দিয়েছেন। ছেলেটির গায়ের রং ও অবয়ব দেখে শরৎবাবু অভিভূত হয়েছিলেন। শ্রীমতী শেঙ্কেল তাঁর বিবাহের প্রমাণ স্বরূপ কাগজপত্র তাঁকে দেখান। পুত্র সন্তান সহ তাঁকে কলিকাতায় নিয়ে আসার এবং বসু পরিবারে স্থান দেওয়ার ইচ্ছা নাকি তাঁর ছিল।

এই সংবাদ প্রকাশের পর ফরোয়ার্ড ব্লক-এর উত্তর প্রদেশ শাখার তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক রামগতি গাঙ্গুলী শরৎবাবুকে একটি চিঠি লিখে জানতে চান যে বিয়ের ঘটনা সত্য কিনা এবং সত্য না হ'লে এর কোন প্রতিবাদ তিনি করবেন কিনা। শরৎবাবু উত্তরে জানান আপনার ২৪শে তারিখের লেখা চিঠি ও কাগজ পত্র পেয়েছি। আপনি কিভাবে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন? এই ধরণের লেখা আপনি সম্পুর্ণ অগ্রাহ্য করবেন।*

বিয়ে করাটা কোন গর্হিত কাজ নয়। কিন্তু নেতাজী তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনে বিয়ে করার অবসর পেয়েছিলেন কিনা, তাই সাধারণের বিচার্য বিষয়। ১৯২০ সালে সিভিল সার্ভিস পাশ করার পর শ্রীসুভাষ চন্দ্র বোস, তাঁর অগ্রজ শরৎ চন্দ্র বসুকে একটি চিঠি লেখেন—I must either chuck this rotten service and dedicate myself whole heartedly to the country's cause or I must bid adieu to all my ideals and aspirations···

---

* Netaji Mystery Revealed—by S. Goswami

সুভাষচন্দ্রের সামনে তখন ছুটি পথ খোলা। রাজার চাকুরী ছেড়ে দিয়ে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করা, অথবা আদর্শ ও ঐকান্তিক ইচ্ছাকে চিরতরে বিদায় জানানো। ঐ চিঠিতে তিনি আরও লেখেন যে তাঁর মনের জাগতিক কোন বাসনা নেই। ১৯৩৮ সালে রামগড়-এ সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে সুভাষ চন্দ্র বোস বলেন যে বিয়ে করার মত সময়ই তাঁর নেই। জার্মানীতে থাকাকালীন একজন ইটালীয়ান ভদ্রমহিলাকে তিনি বলেন—"ঐ (বিবাহ) জীবন যাপন করার মত সময় আমার নেই। ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে আমি বিয়ের বাঁধনে বাঁধা। তুমি আমার বোনের মত।" এই প্রসঙ্গে নেতাজী লিখিত ভাষণের উল্লেখ করা যেতে পারে।

ARZI HUKUMATE AZAD HIND

(The Provisional Government of India)

Fukuoka
29.11.44

My dear Boys,

On the eve of my taking off from soil of Nippon, I want to send you my love and all good wishes for the success of your works. I have no son of my own—but you are to me more than my own son—because you have dedicated your life to the cause, which is one and only goal of my life—the freedom of "Bharatmata." I am confident that you will always remain true to the CAUSE and to 'Bharatmata'

I am sorry that I could not see you again before leaving—but you know that I am always in spirit.

God bless you.
Jai Hind
Subhas Chandra Bose.*

নেতাজী লিখিত ভাষণ থেকে প্রমাণ হয় যে নেতাজীর কোন সন্তান ছিল না, অন্ততঃ ১৯৪৪ সালের ২৯শে নভেম্বরের আগে পর্যন্ত নিশ্চয়ই নয়। পুত্রটির বয়সের হিসাব করলে দেখা যায় যে তার জন্ম ১৯৪১ সালে। ঐ সময়ে নেতাজী 'ফ্রী ইণ্ডিয়া সেণ্টার' গঠনে করতে ব্যস্ত। ১৯৩০ সাল থেকে যাঁর বিয়ের কথা ভাববার অবসর হল না, তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে কর্মব্যস্ত মুহূর্তে বিয়ের কথা ভাবতে পারলেন, একথা ভাবতেও নিজেদের ছোট বলে মনে হয়। এই প্রচার যে বিশেষ কোন চক্রান্তের অংশবিশেষ তা বোধ হয় বলা যায়। নেতাজী বলেছেন—"আমি কূট চালের পিছল পথ ঘৃণা করি। আমি একটি আদর্শ ধরে দাঁড়িয়ে আছি। ব্যাস্, এইখানেই শেষ। আমি জীবনকে এত প্রিয় বলে মনে করি না যে তা রক্ষার জন্য আমি চালাকির আশ্রয় নেব।" সন্তানের পিতা হয়েও নেতাজী নিজেকে নিঃসন্তান বলেছেন। এমন জঘন্য কাজ নেতাজী সুভাষচন্দ্র কেন, কোন পিতার দ্বারা সম্ভব নয় তা সবাই স্বীকার করবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র বসু বেঁচে থাকাকালীন নেতাজীর বিয়ে সম্বন্ধে আর কোন খবর প্রকাশ করা হয়নি।

কিন্তু ইতিমধ্যে, এক গোপন নির্দেশনামা পাঠানো হ'ল বলে জানা গেল। নির্দেশনামটি পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হ'ল—

---

* টোকিওতে অবস্থিত শিক্ষারত "আজাদ্ হিন্দ্"-এর ক্যাডেট্‌সদিগকে লিখিত পত্র।

CONFIDENTIAL

M. 155211.1
H. Q. Bombay Sub-area
Colaba, Bombay—6
11th Feb., 1949

Subject—PHOTOS

It is recommended that Photos of Netaji Subhas Chandra Bose be not displayed at prominent places in unit Line, Canteens, Quarters Guard or Recreation Rooms.

Sd/-Major General staff.
P. N. K. V. L. P. N. KHANDUARI
TEL. 35081 Extn. 41

প্রতিরক্ষা দপ্তরের এই গোপন নির্দেশনামা বিস্ময়কর। মতবাদের বিভেদ যতই থাকুক না কেন, আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের ত্যাগ যে অতুলনীয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। মুক্তি ফৌজের সর্বাধিনায়ক তো একতা, ত্যাগ ও বলিদানের প্রতীক। তাঁর ছবিকে নিষিদ্ধ করে দেওয়ার অর্থই তো জওয়ানদের মন থেকে নেতাজী স্মৃতি মুছে দেওয়া। কিন্তু ছবি সরিয়ে দিলেই কি নেতাজীকে ভোলা যায়? নেতাজীর সেই বাণী—'আমার নিজের কথা এই যে ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর, আমি যে শপথ নিয়াছিলাম তাতে অবিচল থাকিয়া, আমার ৩৮ কোটি দেশবাসীর মুক্তির জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া যাইব।"

ভারতের মানুষ মুক্তি চায়। নেতাজী বলেছেন যে দেশবাসীর মুক্তির জন্য তিনি জীবন পাত করবেন। তাই নেতাজীকে সবাই

ফিরে পেতে চায়। নেতাজী যেখানেই থাকুন, যে অবস্থায়ই থাকুন, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবেনা তা কি মাটির মানুষ ভাবতে পারে? শরৎ বসু মহাশয় বলেছেন, "আমি যা দেখেছি, যা জেনেছি, তার ওপর নির্ভর করে জোর করেই বলতে পারি যে সুভাষের মৃত্যু হয়নি।"

১৯৪৭ সালে তিনি বলেছেন, সুইস্ সাংবাদিক ডঃ লিলি এবেগের মতে (যিনি যুদ্ধের সময় জাপানে ছিলেন) ইংরাজ ও আমেরিকান সরকার কিংবা অনুসন্ধানীরা তাইহোকু দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে মনে করে। আমার হাতের কাছে তথ্য না থাকায় নেতাজী এখন কোথায় আছেন তা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি এবং ভবিষ্যতেও করব, তা হ'ল নেতাজী জীবিত। নেতাজীর দেশে ফিরে আসার মত পটভূমি ও সময় এখনও হয়নি (নেশন)। ১৯৪৯ সালের ২৪শে জুলাই তিনি বললেন, "আমি আগে যা মন্তব্য করেছি, যা বলেছি, তার কোন প্রকার পরিবর্তন করবার নেই। আমি বিশ্বাস করি যে সে বেঁচে আছে।"

৪

ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ভারতবর্ষের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থায় অনেক সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া গেল। ভারতের মানুষ, আশা নিরাশার দোলায় দুলল। কিন্তু নেতাজীর কথা তাঁদের মনের কোনে জেগেই রইল। নেতাজী যে ভারতবর্ষেরই মানুষ, সবারই একান্ত আপনজন, জনগণের নেতার নেতা। কেউ গোপনে, আবার কেউ প্রকাশ্যে নেতাজীর জীবিত থাকার সম্ভাবনার কথা জানতে থাকলেন। আবার অনেকে নেতাজীর 'বাঁচা-মরার' তর্ক থেকে সযত্নে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখে, তাঁর তথাকথিত বিয়ে ও সন্তান প্রসঙ্গে উগ্র আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। তথাকথিত বিয়ে ও সন্তান প্রসঙ্গে সারগর্ভ ও দরদী আলোচনার বহর দেখে বারবার শরৎবাবুর একটি মন্তব্যই কানে বাজতে লাগল—"এটা একটা জঘন্য প্রয়াস, যার উদ্দেশ্য সুদূর প্রসারী।" আন্তর্জাতিক রাজনীতিজ্ঞান সম্পন্ন, পৃথিবীর বিখ্যাত প্রবীণ আইনজীবী নিশ্চয় শুধুমাত্র খবরের ওপর নির্ভর করেই ঐ মন্তব্য করেন নি, নিজে সব দেখে, সব ঘটনা জেনে রাজনীতির জটিল কষ্টি-পাথরে সব বিচার বিশ্লেষণ করে তবেই তিনি বলেছিলেন যে এক জঘন্য প্রচেষ্টা চলছে চরিত্র হনন করতেই হবে। সব ব্যবস্থা এত সুপরিকল্পিত ও নিখুঁতভাবে করা হচ্ছিল যে, আইনের মাপকাঠিতে তার বিচার করা কঠিন ছিল। তাই, শরৎবাবু মন্তব্য করেছিলেন—How can you take any action ?

শরৎচন্দ্র বসু বেঁচে থাকাকালীন সব প্রচেষ্টাই বেশ কিছুটা ঢিমে তালে সুড়ঙ্গ পথে চালানো হচ্ছিল। কিন্তু তাঁর পরলোক গমনের পর

আবার কোন একটা পর্যায়ে তৎপরতা শুরু হয়ে গেল। সোরগোল শোনা গেল, সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের দপ্তরগুলিতে ১৯৫১ সালে, ভারতের প্রায় সবগুলি খবরের কাগজে একযোগে ছাপা হ'ল যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস বিয়ে করেছিলেন। নেতাজীর বিয়ের শুভ সংবাদ (?) ১৯৪৯ সালেই জানানো হয়েছিল। মাত্র দু' বছরের ব্যবধানে এমন খবর ভুলে যাওয়ার কোন কারণ ঘটেনি, তবুও সবাই আগ্রহভরে খবরটি পড়লেন। এবারের খবরে একটা নূতনত্ব লক্ষ্য করা গেল—নেতাজী সুভাষচন্দ্র এমিলি শেঙ্কেল নাম্নী জনৈকা বিদেশীনিকে বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁর ঔরসজাত একটি আট বছরের কন্যা সন্তান বর্তমান। খবরটি পড়তে পড়তে আবার মনে পড়ল নেতাজীর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু আর বেঁচে নেই। ১৯৪৯ সালে প্রচারিত সংবাদে জানা গিয়েছিল যে নেতাজীর ঔরসজাত সন্তানটি পুত্র সন্তান। কিন্তু ১৯৫১ সালের সংবাদে জানা গেল যে সন্তানটি কন্যা সন্তান। মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে পুত্র সন্তানটি কবে কিভাবে কন্যা সন্তানে রূপান্তরিত হ'ল তা জানা গেল না। বিশ্ববিদিত, লোকপ্রিয় এমন এক ভাগ্যবানের রূপান্তর সম্পর্কে কোন বুলেটিন প্রকাশ করা হয়নি। অবশ্য আগেকার খবরে ভুল থাকতে পারে, কিন্তু সেই ভুল সংশোধন করে ভ্রমসংশোধনের কোন টীকাও জুড়ে দেওয়া হয়নি।

কিন্তু অবাক হওয়ার মত উপাদান আরও আছে। অঙ্কশাস্ত্র নাকি বড়ই জটিল—এই উক্তির স্বার্থকতা দেখা গেল অনিতার বেলায়। ১৯৪৯ সালের খবরের ভিত্তিতে পুত্র সন্তানটির বয়স দাঁড়ায় আট বছর। সময়ের ব্যবধানে পুত্র সন্তানটি কন্যা সন্তানে রূপান্তরিত হতে দেখা যায়, কিন্তু বয়সের তফাৎ একটুও হয়নি। বয়সের এমন জটিল হিসাব অঙ্কের জটিলতম রূপের পরিচায়ক। শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে বয়স কমিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ আছে। অনিতার ক্ষেত্রে, দু'বছর বয়স কমিয়ে দেওয়ার কারণ তেমন কিছু,

না এর পিছনে অন্য কোন বিশেষ তাৎপর্য আছে তা বিচার করে দেখা দরকার।

১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে অনিতার বয়স আট বছর হলে তার জন্ম হয়েছিল ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ। ঐ সময় শ্রীসুভাষ চন্দ্র বোস বার্লিনে গিয়ে পৌঁছান। তাঁর বার্লিনে পৌঁছানোর খবর তখন বিশেষভাবে গোপন রাখা হয়েছিল। ঐ সময় তিনি কখনও সিনোর অর্ল্যাণ্ডো মাৎজাওত্তার বা কখনও নামগোত্রহীন এক ব্যক্তি হিসাবে আত্মগোপন করে থেকেছেন। যদি ধরে নেওয়া যায় যে সুভাষ চন্দ্র বিদেশের মাটিতে পা রেখেই সব ফেলে পূর্ব পরিচিতা এমিলি শেঙ্কেলের খোঁজে ছুটে গেছেন, তাহলেও আর একবার অঙ্কে যোগ বিয়োগটা মিলিয়ে দেখে নিতে হয়। ১৯৪১ সালের ২৮শে মার্চ সুভাষ চন্দ্র মস্কো হয়ে বার্লিনে এসে পৌঁছান বলে জানা যায়। মাত্র কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মানবদেহে প্রাণ সঞ্চার করে তাকে পৃথিবীর আলো দেখানো, জীববিদ্যার ক্ষেত্রে অভিনব বিপ্লব, সৃষ্টির ইতিহাসে এ এক বিস্ময়কর ঘটনা। এবার পরিষ্কার বোঝা যায় ১৯৫১ সালেও সন্তানটির বয়স আট বছর রইল কেন। প্রথম রটনার পর ভুল ধরা পড়েছিল নিশ্চয়। দিন, মাস ও বছরের হিসাবটা তখন খুঁটিয়ে দেখা হয়নি বলেই, দ্বিতীয় দফায় ঐ ভুলটা শুধরে দেওয়া হল। কিন্তু অনিতার জন্ম যদি ১৯৪৩ সালে হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলেও গোলমাল থেকে যায়।

সুভাষচন্দ্রের কথায়—"তাঁরা বলে আমি স্বপ্ন দেখি, আমি স্বাপ্নিক কেমন? আমি চিরকাল স্বপ্ন দেখেছি, এমন কি আমার শৈশবেও। সারা জীবন স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু আমার স্বপ্নের সেরা স্বপ্ন, আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় স্বপ্ন, ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন।" ভারতের স্বাধীনতার জন্য সুভাষচন্দ্র ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্গম ও বিপদ সঙ্কুল পথের পথিক। তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য রাজশক্তির ওপর চরম আঘাত হানতে যখন তিনি তৈরী হচ্ছিলেন, তখন গোপনে

নারী সঙ্গ ভোগ করার মত অবসর সময় তিনি করে নিয়েছিলেন, এ কথা ভাবতেও নিজেদের অনেক হীন বলে মনে হয় না কি? নেতাজীর চরিত্রের এমন একটা দিক কারও চোখে বিশেষ করে কোন বিদেশীর চোখে ধরা পড়লে তাঁরা নিশ্চয় চন্দ্র বোসের একাগ্রতা ও ঐকান্তিক ইচ্ছা সম্বন্ধে সন্দীহান হয়ে উঠতেন।

সুভাষচন্দ্রের জীবনে ছলনাময়ীদের কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল। ভারতবর্ষ থেকে অন্তর্ধানের পর বার্লিনে থাকাকালীন সময়কার একটি ঘটনার উল্লেখ করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না। একদিন বিকালের দিকে সুভাষচন্দ্র বাগানে পায়চারি করছিলেন। হঠাৎ গোলাপ গাছের ঝোপের আড়াল থেকে এক সুন্দরী তন্বী তাঁকে সম্ভাষণ করে সামনে এসে দাঁড়ালেন—"হ্যালো, মিঃ বোস! আপনি আমায় চিন্‌তে পারছেন? টিয়ার গার্টেন-এর সেই লেকের পাড়ের ইয়ুথ ক্লাবে গতমাসে আমাদের দেখা হয়েছিল। বার্লিনে লেখাপড়া করছেন, আমার এমন কয়েকজন ভারতীয় বন্ধু আপনার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন।" সুভাষচন্দ্র তন্বীটিকে চিন্‌তে চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁর মনে পড়ল না কবে, কোথায়, কখন তাঁকে তিনি দেখেছিলেন। অবশ্য মনে না পড়াটাই স্বাভাবিক, কারণ তন্বীটিকে তিনি কখনই দেখেননি। কিন্তু তন্বীটি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তিনি তাঁর মিথ্যা কাহিনীকে সত্য বলে চালানর জন্য আরও কিছু মিথ্যা কাহিনীর অবতারণা করে বললেন, "ঐ দিন আমি আপনাকে ফরোয়ার্ড ব্লক সম্বন্ধেও কিছু প্রশ্ন করেছিলাম। মিঃ বোস, এবার আপনার মনে পড়ছে?"—সুভাষচন্দ্র আবার ভাবলেন, কিন্তু কিছুই মনে পড়ল না। তন্বীটি কিন্তু নাছোড়-বান্দা—"বেশ, আমি আপনাকে মনে করিয়ে দেবই। আচ্ছা, আপনার মূল্যবান সময়ের অপচয় করার জন্য আপনি কিছু মনে করছেন না তো? রোজকার মত আজও কি আপনি ব্যস্ত? যদি কিছু মনে না করেন, আমি আপনার কাছ থেকে কিছু ঘটনা জেনে

দিতে চাই।" উত্তরে সুভাষচন্দ্র জানালেন যে অন্যান্য দিনের চেয়ে সেদিন তিনি কমই ব্যস্ত। তরুণীটি তখন জানালেন যে, সুভাষচন্দ্র যে অন্য দিনের মত ব্যস্ত নন তা তিনি সুভাষচন্দ্রের একান্ত সচিবের কাছ থেকে জেনে নিয়েছেন। এবার সুভাষচন্দ্র হেসে বললেন, "আপনি আমার দিনের কর্মসূচী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল বলে মনে হচ্ছে। আপনি কে? আপনার নাম কি?" তরুণী তার নাম জানালেন, মিস্ হেলেন ওয়াগনার। তিনি আরও জানালেন যে, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজনীতি বিষয়ক অর্থনীতি ও ইতিহাস নিয়ে সবেমাত্র তিনি স্নাতকোত্তর পড়া শেষ করেছেন। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ঐদিনই দেখা করার কারণ তিনি জানালেন যে, সুভাষচন্দ্র যে দিন সাতেকের মধ্যেই রাশিয়ার সমর এলাকা পরিদর্শন করতে যাচ্ছেন তা জানতে পেরে তিনি সময় নষ্ট না করে ঐদিনই দেখা করতে এসেছেন। আগে থেকে যোগাযোগ করে দেখা করতে না আসার দরুণ মিস্ ওয়াগনার ক্ষমা চাইলেন। তিনি আরও বললেন যে হঠাৎ তাঁর নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করার ইচ্ছা হ'ল। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে বিদেশীদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার দুঃসাহসিক অভিযানে সুভাষচন্দ্র ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে আর একবার তাঁকে দেখতে এবং অন্তরের একটি বিশেষ বাসনা জানাতেই তিনি এসেছেন। সুভাষচন্দ্র বলেন, "আপনার ক্ষমা চাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আগে থেকে যোগাযোগ করে আমার সাথে দেখা করার অসুবিধা আছে, তা আমি জানি। এখন বলুন, আপনি কেন এসেছেন?" মিস্ ওয়াগনার দরদী গলায় শুরু করলেন যে, ম্যাক্স মুলার-এর 'ইণ্ডিয়া, হোয়াট ক্যান্ ইট্ টিচ্ আস্' এবং পল্ ডুসেন্-এর 'ফিলসফি অফ্ দি উপনিষদ্স' পড়ার পর থেকেই তিনি ভারতের সাথে একাত্মতাবোধ করতে থাকেন। মোনির উইলিয়াম্স, রিস্ ডেভিড্স, শিলার প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তিদের লেখা পড়ে তিনি ভারতের মহান্ আদর্শের প্রতি অনুগত হয়ে পড়েন। ভারতের সেই প্রগতিশীল

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক হলেন, চন্দ্র বোস। মিস্ ওয়াগনার আরও জানালেন যে তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা হ'ল ভারতের মুক্তি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করা এবং তাঁর জীবন ও সব শক্তি ভারতের জন্য উৎসর্গ করা। আবেগময়ী ভাষায় কথা শেষ করে মিস্ ওয়াগনার টল্‌তে লাগলেন এবং হঠাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। মিস্ ওয়াগনার-এর অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়াটা ভাবাবেগের আতিশয্য নয়, সম্পূর্ণ সুন্দর এক অভিনয়। সুভাষচন্দ্র খুবই বিব্রত বোধ করলেন। তরুণীটির বক্তব্য তাঁকে খুবই অভিভুত করেছিল। তিনি তাঁকে মাটি থেকে তুলে নেওয়ার কথা একবার ভাবলেন। একবার চেষ্টাও করলেন তাঁকে তুলে নিতে। তখন, মিস্ ওয়াগনার ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলে চলেছিলেন তা বোঝা যাচ্ছিল না। সুভাষচন্দ্র তাঁর চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ডাকতে ব্যস্ত হলেন। তখন মিস্ ওয়াগনার হঠাৎ চোখ খুলে তাকালেন। খুব আস্তে আস্তে তিনি বললেন, "দয়া করে আমায় একা রেখে যাবেন না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি সুস্থ হয়ে উঠব। আমাকে একটু উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করুন।" সুভাষচন্দ্র তাঁকে খুব সন্তর্পণে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলেন। মিস্ ওয়াগনার কিন্তু তখন মাতালের মত টলছেন। আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি সুভাষচন্দ্রকে বললেন "দয়া করে আমাকে একটু হেঁটে যেতে সাহায্য করুন, আমি একটু জল পান করব।" সুভাষচন্দ্র মিস্ ওয়াগনারকে ধরে নিয়ে গিয়ে একটি ইজিচেয়ারে বসিয়ে দিলেন। রাত তখন প্রায় আটটা। বাড়ীর চাকর বাকরেরা সবাই সেদিন রাত্রে এক বিচিত্রানুষ্ঠানে গেছে, তাই সুভাষচন্দ্র স্বয়ং তাঁকে এক গেলাস জল এনে দিলেন। এক নিঃশ্বাসে গেলাসের সবটুকু জল শেষ করে মিস্ ওয়াগনার একটু সুস্থ বোধ করলেন বলে প্রকাশ করলেন। এবার তিনি হাত বাড়ালেন। অর্থাৎ উঠে দাঁড়ানোর জন্য তিনি একটু সাহায্য চান। সুভাষচন্দ্র মিস্ ওয়াগনারকে সাহায্য করতে তাঁর হাত ধরলেন। অত্যন্ত সন্তর্পণে পা ফেলে মিস্

ওয়াগনার ইজিচেয়ার থেকে উঠে সুভাষচন্দ্রের পাশে এসে বসলেন। হঠাৎ মিস্ ওয়াগনার সুভাষচন্দ্রকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন, "সুভাষচন্দ্র! হে প্রভাত সূর্য! একবার, শুধু একবার, আমার চোখে চোখ রাখ। আমি তোমারই। শুধু তোমার। আমায় তুমি গ্রহণ কর। আমায় তুমি নিজের করে নাও। আমি তোমার। নিঃসঙ্কোচে, আমি তোমারই। চিরদিনের জন্য আমি তোমার।" এমন একটা পরিস্থিতির জন্য সুভাষচন্দ্র প্রস্তুত ছিলেন না। মিস্ ওয়াগনার থেকে পলকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে তড়িতাহতের মত ছিট্‌কে বেরিয়ে তিনি দেয়ালের কাছে দাঁড়ালেন। সুন্দরী তরুণীর ছলাকলার কারণ তাঁর কাছে পরিষ্কার হ'ল। তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, "মিস্ ওয়াগনার, আপনি এই মুহূর্তে এখান থেকে বেরিয়ে যান। আপনার জন্য আর এক মুহূর্তের সময়ও আমি নষ্ট করতে পারব না।" সুভাষচন্দ্রের আত্মপ্রত্যয়ের শিখায় মিস্ ওয়াগনার-এর উগ্র বাসনার আগুন নিষ্প্রভ হয়ে এ'ল। সুভাষচন্দ্র লাস্যময়ী মিস্ ওয়াগনারকে জানালেন যে তিনি তাঁর ছোট বোনের মত। বোন ছাড়া অন্য কোন দৃষ্টি নিয়ে তিনি তাঁকে দেখতে পারেন না। এই ঘটনার পিছনে একটি বিশেষ কারণ ছিল যা না লিখলে এমন নাটকীয় ঘটনার সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। মিস্ ওয়াগনার তন্বী, সুন্দরী এবং শিক্ষিতা। নিজের রূপ যৌবন ও তাঁর আকর্ষণ ক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ সচেতন ছিলেন। তিনি বার্লিন শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির ঈর্ষার পাত্রীও ছিলেন। বেশ কয়েকজন গোঁড়া আদর্শবাদীর মনে তিনি ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর শিকার ছিল গোঁড়া আদর্শবাদীর দল। শ্রীসুভাষচন্দ্র বোস-এর বার্লিনে পৌঁছানোর খবর পাওয়ার পর থেকেই মিস্ ওয়াগনার তাঁকে কাছে পাওয়ার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। ঐদিন তিনি তাঁর বান্ধবীদের বলেই এসেছিলেন সে সুভাষচন্দ্রকে যেভাবেই হোক তাঁর কামনা বাসনার মায়াজালে না বেঁধে তিনি ফিরবেন না। কিন্তু

ঘটনার পরিণতিতে দেখা গেল সুভাষচন্দ্রের আত্মপ্রত্যয় ও আদর্শের যূপকাঠে মিস্ ওয়াগনার-এর হাস্যলাস্য ছলনাময়ী জীবনের বলি হ'ল। জীবনের পবিত্রতা সম্বন্ধে এক নূতন জ্ঞান লাভ করে তিনি ফিরে গেলেন। এই ঘটনা থেকে চিরন্তন সুভাষচন্দ্রকে প্রত্যক্ষ করা যায়। বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নির্ভিক যোদ্ধা কত দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে রুখে দাঁড়ান—এ তারই এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

একথা সত্য যে এমিলি শেঙ্কেল নাম্নী জনৈকা বিদেশীনির সাথে শ্রীসুভাষ চন্দ্র বোস এর পূর্ব পরিচয় ছিল। শ্রীমতী শেঙ্কেল এক সময়ে স্বর্গত ভি. জি. প্যাটেলের সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করেছিলেন। ১৯৩৩-৩৪ সালে সুভাষচন্দ্র যখন চিকিৎসারত অবস্থায় ভিয়েনার নার্সিং হোমে ছিলেন তখন স্বর্গত প্যাটেলের নির্দেশে, শ্রীমতী শেঙ্কেল সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে সর্টহ্যাণ্ডে ডিক্টেশন নিয়ে টাইপ করে দিয়ে সুভাষচন্দ্রকে ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল বইখানি লিখতে সাহায্য করেন। সুভাষচন্দ্র জার্মানী এসে ফ্রী ইণ্ডিয়া সেণ্টার গঠন করবার সময় শ্রীমতী আবার তাঁর কাছে কাজ করতে আসেন এবং ১৯৪২ সালের জুন মাসের পর তিনি কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যান বলে জানা যায়।

শ্রীসুভাষচন্দ্র বোস জার্মানীতে গিয়েছিলেন ভারতের মুক্তি সংগ্রামের জন্য সাহায্য চাইতে, নারীসঙ্গ লাভের জন্য নয়। বিদেশের মাটিতে পা দিয়েই তাঁকে নিরন্তর কর্মব্যস্ত দেখা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অপূর্ব সুযোগ যদি তিনি গ্রহণ করতে না পারেন তাহলে ভারতের স্বাধীনতা পাওয়া সুদূর পরাহত হবে, তাই একদিকে তিনি ফ্রী ইণ্ডিয়া সেণ্টার গঠন করে নিতে ব্যস্ত ও অপরদিকে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করে জাপানের সহযোগিতায় পথ করে নিতে তিনি তৎপর। এমন এক কর্মব্যস্ত মুহূর্তে তিনি নারী সঙ্গ ভোগ করেছেন বলে যাঁরা প্রচার করেছেন, তাঁরা তাঁদের অন্তরের এক

স্বণ্যরূপ প্রকাশ করতে সফল হয়েছেন। ইতিহাস এঁদের কখনই ক্ষমা করবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা যখন রাজশক্তির প্রতিকূলে বেজে চলেছিল তখন সুভাষচন্দ্র নারী সঙ্গের স্বপ্ন দেখেন নি, দেখেছেন ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন। ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবরের ঐতিহাসিক মুহূর্তের কথা আজ অনেকের নিশ্চয়ই মনে পড়ে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়করূপে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ঐ দিন শপথ নেন। হিন্দুস্থানী ভাষায় ভগবানের নামে যখন তিনি ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর আনুগত্যের শপথবাণী পাঠ করেন তখন তাঁর কণ্ঠ ভাবাবেগে বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষায় —"নেতাজী যখন ভগবানের নামে ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর আনুগত্যের শপথ নেন, তখনকার দৃশ্যটি ছিল খুবই হৃদয়স্পর্শী। হিন্দুস্থানীতে যখন তিনি শপথবাণী পাঠ করতে শুরু করেন তখন তাঁকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে দেখা যায়। যে গুরুভার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তার সম্যক উপলব্ধি তিনি করতে পারছিলেন বলে মনে হচ্ছিল। কয়েকটি মাত্র শব্দ পড়ার পর তিনি এত অভিভূত হয়ে পড়েন যে রুমাল দিয়ে তাঁর চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া কয়েক ফোঁটা জল মুছে ফেলেন।" ভারতমাতার সংগ্রামী সৈনিকদের সর্বাধিনায়ক, ভারতবর্ষের জননায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চোখের কোণ বেয়ে কয়েক-ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে, নেতাজী কাঁদেন; সমবেত জনতাও কাঁদেন। নেতাজী যে জনগণের নেতা। ভারতমাতার স্বাধীনতা ও জনগণের মুক্তির ব্রতে তিনি যে জীবন উৎসর্গ করেছেন। অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর অন্য কোন চিন্তা নেই, থাকতেও পারেনা। এমিলি শেঙ্কেলের সাথে কোন বাঁধনে বাঁধা পড়লে স্বধীনতা সংগ্রামের পথে কোন লাভের প্রশ্ন নেই বরং ভারতের সাধকের সাধনায় ভাঁটা পড়তে পারে। একাগ্রতায় ছেদ পড়তে পারে, সুতরাং একথা নির্ভেজাল সত্য যে শেঙ্কেলের কথা ঘটনা নয়—রটনা মাত্র।

এমিলি শেঙ্কেলের সাথে বিয়ের ব্যাপারে যাঁরা সোচ্চার তাঁরা আজ পর্যন্ত কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পত্র দাখিল করতে পারেননি। বিয়েটা কোথায় হয়েছিল ? কবে, কখন হয়েছিল ? এবং কারা সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, তা আজও জানা যায়নি। জার্মানী থেকে নেতাজীর সাবমেরিনে যাত্রা ঐ সময়ে সবচেয়ে বিপদসঙ্কুল ছিল। নিশ্চিত মৃত্যুকে অস্বীকার করে সাবমেরিনে যাত্রা করার আগে শ্রীমতী শেঙ্কেলকে লেখা কোন চিঠি পাওয়া যায় নি। বিপদ কাটিয়ে নিরাপদে পৌঁছানোর পর নেতাজী শ্রীমতী শেঙ্কেলকে কোন চিঠি দিয়েছেন বলেও জানা যায় না। আর জাপানের আত্মসমর্পনের পর অনিশ্চিত পথযাত্রা শুরু করার আগে নেতাজী শ্রীমতী শেঙ্কেলকে কোন চিঠি দিয়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। নেতাজীর জীবনে বিপদসঙ্কুল মুহূর্ত বহু এসেছে, কিন্তু সাবমেরিনে চড়ে যাত্রা শুরু, নিরাপদে পৌঁছানো ও হঠাৎ অনিশ্চিতের পথে যাত্রা করা সবচেয়ে বেশী স্মরণীয় বলেই মনে হয়। কোন পিতা বা কোন স্বামী এমন এক অবস্থার মুখোমুখি হলে তাঁর সন্তানদের বা স্ত্রীকে তাঁর শেষ কথা বা উৎকণ্ঠা নিরসণ করার মত কোন খবর দেবেন না তা বিশ্বাস্য নয়। শ্রীমতী শেঙ্কেলের তথাকথিত বিবাহ কাহিনী যদি সত্য হ'ত তাহলে এমন কিছু তথ্য প্রমাণ তিনি নিশ্চয়ই দাখিল করতে পারতেন।

আরও একটি চমকপ্রদ ঘটনা আছে যা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের দু'জন উচ্চপদস্থ অফিসারের মধ্যে প্রণয় ঘটে। অফিসার দু'জনের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন এক্ষেত্রে নেই কারণ তাঁদের নামের চেয়ে ঘটনার তাৎপর্যই বেশী। অফিসার দু'জনই বিয়ে করবেন বলে মনস্থির করে ফেলেন এবং নেতাজীর কাছে এই খবরটি পৌঁছায়। নেতাজী সানন্দে তাঁদের বিয়ের সম্মতি দেন, কিন্তু কয়েকজনের কাছে তিনি মন্তব্য করেন, "আমি এই ভেবে অবাক হচ্ছি যে, এঁরা বিয়ের কথা ভাববার সময় পেলেন কখন ?"

নেতাজী জনসমক্ষে থাকাকালীন তাঁর বিয়ের সুখবর (?) কারও কাছে গিয়ে পৌঁছয় নি। ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট তারিখে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের রহস্যজনক অন্তর্ধানের পর থেকে সুদীর্ঘ ছ'বছর এই তথাকথিত বিবাহ ও সন্তান প্রসঙ্গে কোন কথা শোনা যায় নি। এর কারণ সম্ভবতঃ ছ'টি। ভারতের জনগণের কানে তখনও সুভাষচন্দ্রের সেই বক্তব্য স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল—"এই নশ্বর জগতে সব কিছুই ধ্বংস হয় ও হবে—কিন্তু কল্পনা, আদর্শ ও স্বপ্নের মৃত্যু হয় না। একটি আদর্শের জন্য একটি প্রাণ বিসর্জিত হতে পারে, কিন্তু সেই আদর্শ তাঁর মৃত্যুর পরে সহস্র জীবনে রূপায়িত হয়। এইভাবে বিবর্তনের চক্র ঘোরে এবং এক যুগের কল্পনা, আদর্শ ও স্বপ্ন, পরের যুগের মানুষ অনুসরণ করে। দুঃখ ও আত্মবিসর্জনের ব্যথা না ভুলে এ জগতের কোন আদর্শই পূর্ণ হয় নি।" বিয়ে করাটা জাগতিক ভোগের অঙ্গ বিশেষ। সুভাষচন্দ্র জাগতিক কোন ভোগের কথা ভাববার অবকাশই পাননি তা সবারই জানা। জনগণের বিশ্বাসের ওপর হঠাৎ আঘাত হানাটা যুক্তিযুক্ত হবে না চিন্তা করেই বেশ কিছুটা সময় কাটানোর প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, যাতে জনগণ ইতিহাস কিছুটা বিস্মৃত হয়। দ্বিতীয়তঃ, তথাকথিত বিয়ে ও সন্তানের ঘটনাকে সত্য বলে প্রচার করার জন্য বহু প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। চন্দ্র বোস হঠাৎ অন্তর্ধান করেছিলেন। কিন্তু বিয়ে ও সন্তানের কথা সত্য হলে, তাঁরা তো মিত্র শক্তি অধিকৃত এলাকার মধ্যেই ছিলেন, তবে তাঁদের খোঁজ পেতে এত সময় লাগল কেন? উত্তর একটাই, তা হ'ল রচনা ও রটনার জন্য যথেষ্ট সময় ও সুযোগের প্রয়োজন। নেতাজী বলেছিলেন—"I have no son of my own।" আমরা এই উক্তির পরিভাষা করলাম নেতাজীর কোন পুত্র সন্তান নাই। পুত্র সন্তান নাই কথার অর্থ এই নয় যে তাঁর কন্যা সন্তানও নাই। এই অপপ্রচার না করে যদি প্রচার করা হ'ত যে, সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের কথা চিন্তা করে বিদেশের মাটিতে পাড়ি দেননি, তিনি গিয়েছিলেন এমিলি

শেফেলের টানে। তাহ'লে, বোধহয় খুব অশোভন হ'ত না, অন্ততঃ—আমাদের মত কুলোকের কুচিন্তা তাই বলে।

নেতাজীর রহস্যজনক অন্তর্ধানের পর যদিও তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল, তবুও ১৯৫১ সাল থেকে ভারতের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁকে কেন্দ্র করে বহু তথ্য ও বক্তব্যের ভিত্তিতে অনেক রচনাই প্রকাশিত হতে থাকল। সব রচনাগুলিরই মূল বক্তব্য ছিল "বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তি-হীন।" কিছু কিছু প্রবন্ধ ও সংবাদে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সশরীরে অবস্থানের খবরও ছাপা হ'ল। নেতাজীপ্রিয় ভারতবর্ষের মানুষ তাঁকে ফিরে পাওয়ার আশায় ব্যাকুল হলেন। কেমন একটা চাপা আশা ও উত্তেজনা সবার মনে দানা বাঁধল।

১৯৫২ সালের ৫ই মার্চ ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু তাঁর ব্যক্তিগত মতামত জানালেন। লোকসভায় তিনি বললেন, "আমি নিঃসন্দেহ যে নেতাজীর মৃত্যু সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই বিষয়ে কোন রকম তদন্ত অনুষ্ঠিত হতে পারে না।"*—ভারতের জনগণ যে নেতাজী সম্পর্কে আসল তথ্য জানার জন্য ক্রমেই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা তা প্রমাণ করে। নেতাজী রহস্যের পূর্ণ তদন্ত সবাই চাইছিলেন, কিন্তু পণ্ডিত নেহেরু নিঃসন্দেহ ছিলেন যে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে।

*** Nehru Disbelieve Subhas Bose is Death.**

Jhansi, Sept. 11—Asked by a Congressman at Jhansi about the reported death of Subhas Chandra Bose, Pandit Nehru said that like many others people, he also did not believe the story. "I have received a number of reports which have raised in me grave doubts and I disbelieve authenticity of the news." Pandit Nehru declared—A. P. I. Hindusthan Standard, Sept. 13, 1945,

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নিঃসন্দেহ হওয়া সত্বেও ভারতের জনগণ সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। ভারতের পত্র পত্রিকায় কখনও নেতাজীর রাশিয়ার অবস্থানের কথা, আর কখনও বা চীনে অবস্থানের কথা প্রকাশিত হতে থাকে। জনগণের মনে হঠাৎ কখনও জেগে ওঠে তৎকালীন ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের বক্তব্য। রাশিয়া থেকে ভারতে ফিরে তিনি বলেছিলেন যে তাঁর কাছে খুবই আনন্দের একটি খবর আছে। খবরটি যে কি তা তিনি অবশ্য প্রকাশ করেন নি, কিন্তু তাঁর উক্তি থেকে অনেকেই অনেক কিছু ধারণা করে নিয়েছিলেন।

জাপানের এক মন্দিরে নাকি নেতাজীর ভস্মাবশেষ সযত্নে রাখা হয়েছে। তাই নিয়ে একটু বেশী মাতামাতিও শুরু হ'ল। সর্বভারতীয় ফরোয়ার্ড ব্লকের তৎকালীন ডেপুটি চেয়ারম্যান মথুরা লিঙ্গম থেবর হঠাৎ গর্জে উঠলেন। এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি দাবী করলেন যে সুভাষ চন্দ্র বোস জীবিত আছেন। একথাও তিনি বললেন যে ১৯৫০ সালে তিনি সিনাং-এ গিয়ে নেতাজীর সঙ্গে দেখাও করেছেন। স্বর্গীয় শরৎ চন্দ্র বসু, নেতাজীর সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। তিনি আরও দাবী করলেন যে ১৯৫০ সালের পর থেকে তিনি নেতাজীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। রেঙ্গুন-এ যে তামিল সম্মেলন হয়েছিল, তাতে যোগ দিতে যাওয়ার পথে ইন্দো-বার্মা-চীন সীমান্তে নেতাজীর সঙ্গে তাঁর আবার দেখা হয়েছিল। তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুকে তিনি তাঁর বক্তব্য মিথ্যে প্রমাণ করার চ্যালেঞ্জ জানালেন। স্বর্গত থেবর-এর সেদিনের চ্যালেঞ্জ জনগণকে আরও আশাবাদী করে তুলল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বেঁচে আছেন কিনা তা সবাই জানতে চান। যদি তিনি বেঁচে থেকে থাকেন, তাহ'লে কোথায় আছেন, কেমন আছেন, তা জানবার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব। তিনি ভারতের মাটিতে ফিরে আসুন তা অনেকেই কামনা করেন। কেউ চায় যে ঘরের

ছেলে সুস্থ দেহে ঘরে ফিরে আসুক। আবার কারও কাম্য এই যে, তিনি ভারতের মাটিতে ফিরে সবার সমস্যা সঙ্কুল জীবনে স্বস্তি এনে দিন। অনেকের এই ভেবে শঙ্কাও হয় যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বেঁচে আছেন। অন্যায়, অত্যাচার ও কসাই-এর বৃত্তি নিয়ে যাঁরা শুধু ভোগ-সর্বস্ব জীবন যাপন করেন এবং প্রভুত্বের সিংহাসনে বসে মানবতার প্রতি অবমাননা করেছেন, তাঁদের কাছে নেতাজীর জীবিত থাকার খবর অভিশাপের মত। নেতাজী সুভাষচন্দ্র যদি বেঁচে থেকে থাকেন তবে তাঁর মৃত্যু কামনা ও চেষ্টা করার লোকের সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু যাঁরা তাঁকে ফিরে পেতে চান, তাঁদের সংখ্যা যে অনেক অনেক গুণ বেশী। তাই সুভাষচন্দ্রের ভাবমূর্তি, তাঁর আদর্শরূপ যেভাবেই হোক নষ্ট করে দিতে হবে। আদর্শের কথা শুনিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের চরম মুহূর্ত তিনি ভারতবর্ষের কথা ছাড়াও অন্য কিছু ভাববার অবকাশ পেয়েছেন, অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামের লড়াই এর সময় তিনি নারীসঙ্গ লাভের চিন্তাও মনে স্থান দিয়েছেন, কাজেই তিনি খুবই একজন সাধারণ মানুষ, আহা-মরি কেউ একজন নন। এমন একটা চিন্তাধারা নিয়েই, তাঁকে ঘিরে সাজানো হয়েছে ষড়যন্ত্রের কাঁটা, আর অন্যদিকে ভারতের নেতার নেতা, সব পরিস্থিতি পুরোপুরিভাবে অনুধাবন করে তাঁর চারপাশে বিছিয়ে দিয়েছেন রহস্যের সুক্ষ্ম জাল।

রহস্যের ছোঁয়া সৃষ্টি করেছে বিভ্রান্তি, আর ষড়যন্ত্রের বিচিত্র সংমিশ্রণে এসেছে অনিশ্চয়তা। মাটির মানুষ কান পেতে শোনার চেষ্টা করে ভবিষ্যতের কথা, আর নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে উদাস হয়ে যায়। জনগণের মাঝে গুঞ্জন ওঠে নেতাজী কোথায়? নেতাজী সুভাষচন্দ্রের তথাকথিত মৃত্যু সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ নাই। তাই জনগণ তার কথা বলেন। হঠাৎ কখনও শোনা যায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতের মাটিতেই অবস্থান করছেন। খবরটি উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়, কারণ তিনি জীবিত থাকলে তাঁর পক্ষে ভারতের মাটিতে ফিরে আসা অসম্ভব নয়। বিদেশের মাটিতে থাকাকালীন তিনি ভারতের

সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে তোলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি—"Despite all the restrictions imposed by the C. I. D. that is the Secret Service, I have remained in constant touch with my countrymen at home. To day I can go so far as to inform you that during the last twelve months a large number of representives have been sent into India from outside from all directions. Some of them have been captured and shot. But many more have been able to evade arrest and according to latest reports they are working satisfactorily. (4. 7. 43.)—গোয়েন্দা দপ্তর থেকে সব রকম বিধিনিষেধ আরোপ করা সত্বেও নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর দেশবাসীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। ভারতবর্ষের বাইরে থেকে বিভিন্ন পথে বহু প্রতিনিধিকে তিনি ভারতে পাঠিয়েছেন। এঁদের কয়েকজন বন্দী হয়েছেন এবং কিছু গুলিতে নিহতও হয়েছেন। তবুও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নি। কারণ বহু প্রতিনিধি গ্রেপ্তার এড়িয়ে গেছেন। কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে নেতাজী সুভাষচন্দ্র সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হতেন। যদি যোগাযোগ ব্যবস্থা যথাযথ থেকেই থাকে বা পুনরুজ্জীবিত করা হয় তাহলে ভারতের মাটিতে ফিরে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব। নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে অনিশ্চয়তার ধোঁয়া কাটানোর জন্য জনমনে তদন্তের কথা জাগে।

ভারতবর্ষের লোক সভায় আবার নেতাজী রহস্য সম্পর্কে তদন্তের দাবী ওঠে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু ১৯৫৫ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর বলেন যে শুধু অনুসন্ধানের কাজ অর্থাৎ সন্তোষজনক অনুসন্ধান যতটুকু করা সম্ভব, তা শুধুমাত্র জাপান সরকারের দ্বারাই সম্ভব। ঘটনাস্থল জাপান এবং সেখানেই সব তথ্য প্রমাণ আছে। জাপান সরকারের ওপর অনুসন্ধান কমিটি তৈরী করার কাজ চাপিয়ে দেওয়া

যায় না। তবে জাপান যদি অনুসন্ধান করতে মনস্থ করে তাহলে ভারত তার সঙ্গে সহযোগিতা করবে এবং সম্ভাব্য সবরকম সাহায্য দেবে। কিন্তু ভারত সরকার জাপানের সীমানার মধ্যে গিয়ে অনুসন্ধানে লিপ্ত হতে পারে না, বিশেষ করে যখন সব সম্ভাব্য সাক্ষীরাই হয় জাপ সরকারের কর্মচারী অথবা ঐ সরকারের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। এই বিষয়ে জাপ সরকারের কাছ থেকে প্রস্তাব আসা উচিত এবং যদি তা আদৌ আসে তবে স্বভাবতই ভারত সরকার জাপ সরকারকে সম্ভাব্য সাহায্য দেবে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য শুধুমাত্র বিস্ময়করই নয়, উপরন্তু সকল প্রকার রাজনৈতিক শিষ্টাচার ও রাষ্ট্রনৈতিক বিধির পরিপন্থী। লোকসভার মাননীয় সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুনেছেন এবং জনগণ পত্রপত্রিকা মারফৎ তা পড়েছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র কি ভারত সন্তান নন ? তিনি কি ভারতের জনগণের নেতা, না জাপানের নেতা ? অবশ্য জাপ সরকারের তরফ থেকে নেতাজী সম্পর্কে তদন্ত করাটা বিচিত্র নয়, কারণ তিনি এশিয়ার জনগণের কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু জাপ প্রচারিত সংবাদকেই যখন ভিত্তিহীন বলে অস্বীকার করা হচ্ছে তখন তাঁদের তরফ থেকে কোন তদন্ত করার কথা ভাবা যায় না। সমস্ত ঘটনাটাই যদি সাজানো হয়ে থাকে, তাহলে জাপ সরকার অবশ্য আসল ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। সুতরাং যে রহস্যের সৃষ্টি করতে তাঁরা সাহায্য করেছেন সেই রহস্য নিরসন সম্পর্কে তদন্ত করার কথা তাঁদের তরফ থেকে আসতেই পারে না। নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে তদন্ত করার দায়িত্ব ভারত সরকারের ওপরই বর্তায়।

আর একটি প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে ওঠে তাহল, জাপ সরকারের কাছ থেকে তদন্ত করার প্রস্তাব পেলে ভারত সরকার সম্ভাব্য সাহায্য দেবে বলে অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। সম্ভাব্য সাহায্য কথাটির মধ্যে একটু ইঙ্গিত প্রকাশ পায় বলে মনে হয়। এমন কোন বিধিনিষেধ বা অসুবিধা কোথাও আছে কি, যার জন্য সব রকম সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি না দিয়ে সম্ভাব্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

মনে পড়ে যায় ভারতের কমনওয়েল্‌থে ঢুক্তির কথা। ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে ভারত কমনওয়েল্‌থে যায়, ঐ বছরের ঐ মাসটাই কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হয়। ঐ মাসেই খবর পাওয়া গিয়েছিল যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র নাকি এমিলি শেঙ্কেলকে বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁর ঔরস জাত এক পুত্র সন্তান বর্তমান। সবই যোগাযোগ ফল। একটি ঘটনার সাথে আর একটি ঘটনার আকাশ জমিন ফারাক, কিন্তু তবুও তিথি, নক্ষত্র দু'টি ঘটনার মধ্যে কেমন যেন একটা মিল ঘটিয়ে দিতে চায়।

৫

ভারতের স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন যে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস মৃত। ঐ সম্পর্কে কোন তদন্ত হতে পারে না। আবার তাঁরই কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল যে নেতাজী সম্পর্কে তদন্তের উদ্যোগ জাপান সরকারের তরফ থেকেই আসা উচিত। যদি তা আসে তবে স্বভাবতই সম্ভাব্য সাহায্য ভারত সরকার তাঁদের দেবেন। স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যগুলি লোকসভার জনপ্রতিনিধিদের সামনেই পেশ করেছিলেন। লোকসভার অঙ্গন তখন জনপ্রতিনিধিদের গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠেছিল কিনা তা বর্তমান লেখকের জানা নেই, তবে মাননীয় প্রতিনিধিদের প্রতিবাদে লোকসভা মুখর হয়ে ওঠেনি বা পরিত্যক্ত হয়নি। একথা সত্যি যে সমস্বরে সকলে সেদিন গর্জে ওঠেন নি যে সরকারের সন্দেহাতীত প্রমাণ কোথায়? নেতাজী সুভাষচন্দ্র জাপানী নন, তিনি ভারতীয়। গরজটা জাপানের নয়, ভারতেরই হওয়া উচিত।

১৯৫৫ সালের ৬ই অক্টোবর কলকাতায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য তদন্ত করার দাবীতে এক জনসভার আয়োজন হয়। ঐ সভার আহ্বায়ক নেতাজী মেমোরিয়াল কমিটি। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী শাহনওয়াজ খাঁন। ঐ সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, এক বেসরকারী নেতাজী তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে এবং ঐ বেসরকারী কমিশন জাপান ও অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিতে গিয়ে যাতে নেতাজী সম্পর্কে যথাযথ তদন্ত করতে পারেন তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সভায় আরও প্রস্তাব নেওয়া হয় যে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ শ্রীসুরেশ চন্দ্র বসুকে বেসরকারী তদন্ত কমিশনের সঙ্গে যুক্ত

হওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হবে। শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু এই প্রসঙ্গে তাঁর ডিসেণ্টসিয়েণ্ট রিপোর্ট বইয়ে লিখেছেন যে শ্রীখাঁন বিহারে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং নেতাজী মেমোরিয়াল কমিটির সভায় গৃহীত প্রস্তাবের একটি নকল তাঁকে দেন এবং সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেন। শ্রী বসুকে বেসরকারী তদন্ত কমিটির নেতা রূপে যোগ দিয়ে তদন্তে সাহায্য করার অনুরোধও জানান হয়। শ্রীখাঁন অভিমত জ্ঞাপন করেন যে নেতাজী জীবিত না মৃত তা ভারতবাসীর জানা উচিত। তিনি আরও বলেন যে, পণ্ডিত নেহেরুকে তিনি যথা সময়ে ব্যাপারটি অবহিত করাবেন। যদিও পণ্ডিতজী নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে কোন সরকারী তদন্তের পক্ষপাতী নন, কিন্তু বেসরকারী তদন্তে তাঁর কোন আপত্তি নেই। দিল্লী ফিরে গিয়ে শ্রী খাঁন পণ্ডিত নেহেরুকে অনুরোধ জানাবেন যাতে তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে নির্দেশ দেন তদন্ত কমিটির কাজে যথাযথ সাহায্য করার জন্য। প্রধান মন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করার পরেই শ্রীখাঁন কলকাতায় এক সভা ডাকবেন এবং বাকি সদস্যদের ঐ সভাতেই নির্বাচন করা হবে। বেসরকারী তদন্ত কমিটির কাজ চালাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কমিটির সদস্যদের বিদেশের বহু জায়গায় গিয়েই তদন্ত করে দেখতে হবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীখাঁন মন্তব্য করেন যে, অর্থের ব্যাপারে ভাবনার কোন কারণ নেই, বহু লোকের কাছ থেকে টাকা পাওয়া যাবে। শ্রীসুরেশ চন্দ্র বসুর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার পর শ্রীখাঁন সাহেব দিল্লীতে ফিরে গেলেন। বেসরকারী তদন্ত কমিশন গঠন করার প্রচেষ্টার ইতিহাস ঐ পর্যন্ত। এই প্রসঙ্গে শ্রীসুরেশ চন্দ্র বসু মন্তব্য করেছেন যে "The danger of a non-official Committee coming into existence and functioning soon and which was expected to announce a finding that Netaji was not dead as the sponsors of that Committee were generally of that view, set our

administrators in Delhi a Thinking." বেসরকারী তদন্ত কমিটি গঠনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল দেখে দিল্লীর প্রশাসন শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। ঐ কমিটি গঠিত হওয়ার পর যদি তাঁরা যথাযথ তদন্ত করতেন তবে নেতাজী মৃত নন, এই কথাই ঘোষিত হওয়ার নম্ভাবনা বেশী ছিল কারণ কমিটি উদ্যোক্তারা ঐ রকম ধারণাই পোষণ করতেন। দিল্লীর প্রশাসকগণের শঙ্কার ফলশ্রুতিই হল সরকারী তদন্ত কমিশন।

১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতবর্ষে এবং বিদেশের বহু পত্র পত্রিকায় নেতাজী সম্পর্কে এত বেশী প্রামাণ্য তথ্য প্রকাশিত হচ্ছিল যে, তৎ-কালীন প্রধানমন্ত্রীর সন্দেহাতীত ভাবে নিশ্চিত মৃত্যু প্রমাণিত হওয়ার উক্তি জনমনে কোন রেখাপাত করতে পারে নি। নেতাজী প্রসঙ্গে যত বেশী তথ্য প্রকাশিত হচ্ছিল সরকারের অভিমত তত বেশী ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হচ্ছিল। অনেকেই এই অভিমত পোষণ করেন যে 'নেতাজী জীবিত নন, মৃত'—এই বক্তব্য সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল সরকারী তদন্ত কমিশনের। যদিও বেসরকারী তদন্ত কমিটি গঠন করার প্রচেষ্টা চলছিল, কিন্তু একথা সত্য যে সরকারী পর্যায়ে বহু ব্যক্তি তাইহোকু রহস্য সম্বন্ধে তদন্ত করেছেন, এবং তাদের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে তাইহোকু দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয় নি।

নেতাজী তদন্ত প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে শ্রীশাহনওয়াজ খাঁন সম্বন্ধে কিছু বলা খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না। শ্রীখাঁন যখন নেতাজী মেমোরিয়াল কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করতে আসেন তখন তিনি একজন পার্লামেণ্টারী পদে প্রতিষ্ঠিত। নেতাজী মেমোরিয়াল কমিটি সভায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে বেসরকারী পর্যায়ে এক পূর্ণ তদন্ত করার প্রস্তাব উঠেছিল। প্রস্তাবটি ছিল সর্বসমর্থিত। জনমনে নেতাজী সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জানার যে ব্যাকুলতা ছিল, তারই বহিঃপ্রকাশ দেখা দিয়েছিল ঐ সভায়। সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবমতে শ্রীখাঁন শ্রীসুরেশচন্দ্র বসুর সঙ্গে দেখা

করতে গিয়েছিলেন। শ্রীবসু'র কাছে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে উপযুক্ত সময় হয়েছে, ভারতবাসীর এবার জানা উচিত নেতাজী সুভাষচন্দ্র জীবিত না মৃত। কোন্ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে বা কোন্ সম্ভাবনার কথা ভেবে শ্রীখাঁন ঐ ধরণের মন্তব্য করেছিলেন তা বোঝা যায় না। নেতাজী সুভাষচন্দ্র জীবিত এই প্রকৃত সত্য যখন প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছিল, তখনই কি সঠিকভাবে কিছু জানানোর সময়জ্ঞান শ্রীখাঁন-এর হয়েছিল? শ্রীখাঁন-এর মন্তব্যের মর্মার্থ বলা সম্ভব নয় তবে যখন তিনি বে-সরকারী কমিটির দায়ভার স্বেচ্ছায় নেন তখন তিনি একজন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী। শ্রীখাঁন শ্রীবসুকে জানান যে পণ্ডিত নেহেরু নেতাজী সম্বন্ধে সরকারী তদন্তে রাজী নন, তবে বেসরকারী তদন্তে তাঁর কোন আপত্তি নেই। শ্রীখাঁন-এর এই বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর উক্তির আরও কয়েকটি কথা যোগ করে দেওয়া যাক। তিনি বলেছিলেন যে দিল্লী ফিরে গিয়ে তিনি নেহেরুজীকে সমস্ত বিষয় জানাবেন এবং তাঁকে যথাযথ সাহায্যের জন্য অনুরোধ করবেন। তারপর তিনি কলকাতায় আর একটি সভা ডাকবেন এবং তদন্ত কমিটির জন্য বাকি কয়েকজন সদস্যকে ঐ সভা থেকেই নির্বাচন করে নেবেন। শ্রীখাঁন-এর নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে তদন্ত করার প্রয়াসকে জনগণ ভূয়সী প্রশংসা জানাতেন যদি না তাঁর দিল্লীর সুপারিশের পরেই সরকারী তদন্ত কমিশন গঠনের খবর না পাওয়া যেত।

বাংলা তথা ভারতের জনগনের মনের কথা শ্রীখাঁন নিশ্চয় পুরোপুরি উপলব্ধি করেছিলেন। দিল্লীতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কাছে তিনি জনগণের আগ্রহের কথা নিশ্চয়ই বিশদভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। শ্রীখাঁন-এর বক্তব্য থেকেই জানা গিয়েছিল যে প্রধানমন্ত্রী সরকারী তদন্ত কমিশন গঠন করতে রাজী নন কিন্তু বেসরকারী তদন্ত কমিশনে তাঁর কোন আপত্তি নেই, সেই প্রধানমন্ত্রী সরকারী তদন্ত কমিশন গঠন করার কথা লোকসভায় ঘোষণা

করলেন। ঐ কমিশনে শ্রীসুরেশচন্দ্র বসুকে সদস্য হিসাবে রাখা হ'ল। শ্রীসুরেশ চন্দ্র বসু অবশ্য চেয়েছিলেন যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিচারক ডঃ রাধাবিনোদ পালকেও সদস্যরূপে নেতাজী তদন্ত কমিশনে নেওয়া হোক, কিন্তু তা হয় নি। শ্রীখাঁন, ডঃ পাল-এর সদস্যরূপে মনোনয়নের প্রসঙ্গে শ্রীবসুকে বলেন যে তিনি (শ্রীখাঁন) প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। ডঃ পাল-এর মনোনয়নের কোন সম্ভাবনা নেই। প্রধানমন্ত্রী মনে করেন না যে তাঁকে (ডঃ পালকে) কমিটির সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়া যেতে পারে, কারণ তিনি (ডঃ পাল) ইতিমধ্যেই তাঁর মতামত গঠন করে ফেলেছেন যে বিমান দুর্ঘটনা আদৌ ঘটেই নি। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক বিচারক ডঃ পাল-এর মতামত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন কিন্তু শ্রীখাঁন এর বক্তব্য বোধহয় তিনি ভুলে যাননি। ১৯৫১ সালের ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী জন্মোৎসব সমাবেশে তিনি বলেছিলেন 'আগামী বৎসর যখন আমরা নেতাজীর ৫৬তম জন্মোৎসব পালন করব তখন নেতাজী স্বয়ং আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন। নেতাজী বেঁচে আছেন এবং তিনি ফিরে আসবেন, এই ধারণা পোষণ করা যদি সরকারী তদন্ত কমিশনের সদস্য মনোনীত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক না হয় তবে ডঃ পাল-এর বিমান দুর্ঘটনার কাহিনী সত্য নয়, এমন একটা মতামত সদস্য মনোনীত না হওয়ার কারণ হয়ে দেখা দিল কেন ? ডঃ পাল যে ধারণাই পোষণ করুন না কেন, একথা ঠিক যে তিনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আইনজ্ঞ ও আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক। তাঁর মনের কোণে যে ধারণাই বাসা বেঁধে থাকুক না কেন সাক্ষ্য প্রমাণের ওপর নির্ভর করেই তাঁকে রায় দিতে হবে। ডঃ পাল-এর বিচারক জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে সবিশেষ ধারণা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে তদন্ত কমিশনের সদস্যরূপে মনোনীত করা গেল না কিন্তু শ্রীখাঁন মনোনীত হলেন। এই মনোনয়নের তাৎপর্য খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করা বৃথা। শ্রীখাঁন স্বয়ং একজন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী। ভারতের তৎকালীন প্রধান-

মন্ত্রীর মনের কথা তিনি জানতেন। নেতাজী মেমোরিয়াল কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করতে আসার আগেই তিনি প্রধানমন্ত্রীর মতামত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। সভার বিবরণ দিল্লীতে গিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়ার পর তিনি আবার কলকাতায় ফিরে এসে বেসরকারী তদন্ত কমিশনের সদস্য নির্বাচন করার জন্য আবার সভা ডাকবেন বলে বলেছিলেন। শ্রীখাঁন তাঁর বিবরণ যে যথাযথ স্থানে পেশ করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু বেসরকারী কমি-শনের বদলে ঐ বিবরণ সরকারী কমিশন গঠনে সাহায্য করেছিল। শ্রীখাঁন রিপোর্ট পেশ করেছিলেন নেহেরুজীর কাছে। অর্থাৎ একজন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী রিপোর্ট দেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। শ্রীশাহনওয়াজ খাঁন কিন্তু আজাদ হিন্দ্-এর আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাই মনে পড়ে শ্রীমতী তায়া জিন্‌কিনস্ এর বক্তব্য—"Sardar Patel, India's first Home Minister, explained to me in 1950 that he had been very careful indeed not to reinstate any of the officers who had gone over to Subhas Bose's I. N. A. He also saw to it that they did not thrive in politics." সর্দার প্যাটেল স্বয়ং শ্রীমতী তায়া জিন্‌কিনস্‌কে বলেছিলেন যে সুভাষ বোসের আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যে সব অফিসার যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের যাতে পুনর্নিয়োগ করা না হয় সেদিকে তিনি যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন। তিনি আরও নজর রেখেছিলেন যাতে তাঁরা রাজনীতিক্ষেত্রে সফলতা লাভ করতে না পারেন। শ্রীশাহনওয়াজ খাঁন বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ক্যাপ্টেন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অফিসার পদে তিনি আসীন হয়েছিলেন তাও সকলের জানা। ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্য মাফিক কাজ হলে তাঁর কোন পদেই বহাল হওয়া উচিত নয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোন উচ্চ-পদে নয়, শ্রীখাঁনকে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে সফল হতে দেখা যায়।

শ্রীখাঁন এর বিপুল উৎসাহ ও বেসরকারী তদন্ত কমিটির গঠন করার গুরু দায়িত্বভার নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার কারণ কিছুটা অনুমান করে নেওয়া যায় বলে মনে হয়।

শ্রীখাঁন-এর বিশদ বিবরণ দাখিল করার দু'মাসের মধ্যে, ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু লোকসভায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে সরকারী তদন্ত কমিশন গঠন করার সরকারী সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। সরকারী আজ্ঞা পাওয়া মাত্র কমিশনের চেয়ারম্যান অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন। স্বদেশ ও বিদেশের বহু জায়গা কমিশনের সদস্যরা ঘুরে বেড়ালেন ও বহু ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে এলেন। বহু সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে কমিশনের রায় লেখা হ'ল। নেতাজী দরদী মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন তাঁদের প্রিয় নেতার খবর পাবার আশায়। কমিশনের বহু প্রত্যাশিত রিপোর্ট লোকসভায় পেশ করা হ'ল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় জানালেন যে যদিও কিছু বেশ অসামঞ্জস্য রয়ে গেছে কিন্তু সরকারী কমিশনের রিপোর্ট মতে নেতাজী ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট, তাইহোকুতে এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। কমিশন যে রিপার্ট পেশ করলেন, তা মাননীয় নেতারা নিশ্চয় পড়েছেন। জনগণের কাছে ঐ রিপোর্ট পৌঁছোয় নি বলেই সরকারের ঐ বক্তব্য জনমনে কোন রেখাপাত করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। কিছু অসামঞ্জস্য থাকা সত্বেও নেতাজী নিহত বলে ঘোষণা করাটা কেমন বে-আইনি বলে মনে হয়েছিল। মূল রিপোর্ট সম্বন্ধে জনগনের কৌতূহল স্বকাবতঃই রয়ে গেল। ঐ রিপোর্টটিতে কি লেখা আছে দেখা যাক।—

নেতাজী তদন্ত কমিটি—১৯৫৬

শাহনয়য়াজ কমিশন তাঁদের রিপোর্টের প্রস্তাবনায় নেতাজী তদন্ত কমিশন গঠন করার কারণ ব্যক্ত করেছেন। কমিশন লিখেছেন যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস তাঁর জীবদ্দশায় অসম সাহসিক কার্যাবলির দ্বারা ভারতের জনগণের মন হরণ করেছিলেন। তাঁর অসম সাহসিকতার পরিচায়ক ভারত থেকে জার্মানী চলে যাওয়া, সাবমেরিণে দূর প্রাচ্যে যাত্রা এবং তাঁর আজাদ হিন্দ্ বাহিনী নিয়ে ব্রহ্মদেশে বৃটিশের সঙ্গে যুদ্ধ। এমন এক স্মরণীয় উজ্জ্বল অধ্যায় ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে হঠাৎ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'ল। তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ের খবরগুলো টুক্‌রো টুক্‌রো ও বিচ্ছিন্নভাবে এসেছিল, কখনই বিশদভাবে পুরোপুরি কোন খবর আসে নি। তাই জনসাধারণ চাইছিলেন যে সমস্ত ঘটনার পূর্ণ তদন্ত হোক এবং তা জনগোচরে আনা হোক। জনগণের এই ইচ্ছা বিভিন্ন সময়ে লোকসভায় ধ্বনিত হয়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর লোকসভায় ঘোষণা করেছিলেন যে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য একটি সরকারী কমিটি নিয়োগ করা হবে। সেই মতে, ১৯৫৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ভারত সরকার নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে এক কমিটি নিয়োগ করেন।

১। শ্রীশাহনওয়াজ খাঁন, এম. পি. (মেজর জেনারেল, আই. এন্. এ.), পরিবহন ও রেল মন্ত্রীর পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী।

২। সুরেশ চন্দ্র বসু, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস-এর অগ্রজ।

৩। শ্রীএস. এন্. মৈত্র, আই. সি. এস্. চীফ্ কমিশনার, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। শ্রীএস. এন. মৈত্র ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মনোনীত।

কমিটির বিচার্য বিষয় ছিল—

"১৯৪৫ সালের ১৬ই আগস্ট নাগাদ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস-এর

ব্যাঙ্কক পরিত্যাগ করে যাওয়ার পরিস্থিতি, বিমান দুর্ঘটনার ফলে তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে অভিযোগ, এবং ঐ ঘটনার সাথে যুক্ত পরবর্তী ঘটনাবলি সম্পর্কে তদন্ত করা এবং সেই সম্পর্কে ভারত সরকারকে অবহিত করা।”

তদন্ত কমিটির রিপোর্টের শুরুতেই ‘তাঁর জীবদ্দশায় কথাটি পড়ে মনে হয় মৃত্যুকাহিনী লেখার জন্য কমিশন অবিচল। আর কমিশনের বিচার্য বিষয়ে ‘বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে অভিযোগগুলি’ তদন্ত করে দেখে রিপোর্ট করার কথা পড়ে মনে হয় শুধু মৃত্যুর কথা শোনার জন্যই যেন সবাই ব্যাকুল। দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে এই প্রচার যেমন প্রাধান্য লাভ করেছিল, বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়নি এবং তারই পাশাপাশি আদৌ কোন বিমান দুর্ঘটনার মুখে পড়ে নি এই প্রচারগুলিও প্রাধান্য লাভ করেছে। কমিটির বিচার্য বিষয়গুলি আরও বিশদভাবে লেখা হলে অনেক সংশয়েরই নিরসন হ’ত। কিন্তু তা করা হয় নি। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ১৯৫৬ সালের ৪ঠা মে ভারতের লোকসভায় এক প্রশ্নোত্তরের কথা। লোকসভার সদস্য শ্রীআমজাদ আলি সরকারকে প্রশ্ন করেন, “একথা কি সত্যি যে নেতাজী তদন্ত কমিশনে কিছু সাক্ষীকে নেতাজীর অন্তর্ধান সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়েছে, আর অন্য সাক্ষীদের ডাকা হয়েছে কি পরিস্থিতিতে নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে তা বলতে।” উত্তরে ভারতের বহির্বিষয়ক দপ্তরের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী শ্রীসাদাত আলি খাঁন বলেন—“None of the communication to the witnesses asking them to appear before the committee used the words disappearance of Netaji. The terms of reference of the committee were to enquire and report on the circumstances concerning the departure of Netaji Subhas chandra Bose from Bangkok about the 16th August 1945, his alleged death as a result of an aircraft accident and subsequent develop-

ments connected therewith. These terms were purposely chosen to cover all aspects. শ্রীসাদাত আলির বক্তব্য থেকে জানা গেল যে সাক্ষীদের কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার আমন্ত্রণ পত্র পাঠানোর সময় 'নেতাজীর অন্তর্ধান' শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়নি, কিন্তু কমিশনের বিচার্য বিষয়গুলি উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই বেছে নেওয়া হয়েছে। ভারত সরকার যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই নেতাজী তদন্ত কমিশন গঠন করেছেন তা জনসাধারণ মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে চায় কিন্তু বিভিন্ন ঘটনাবলী যখন মনে পড়ে, এবং রিপোর্টের লেখাগুলি যখন একের পর এক পড়া হতে থাকে তখন ধারণা কেমন যেন গোলমেলে মনে হয়, বিশ্বাসে ভাঙ্গন ধরে। প্রস্তাবনার শুরুতেই, নেতাজীর জীবনের শেষ মুহূর্তগুলির খবর, ইত্যাদি পড়ে একটি কথাই মনে হয় মৃত্যু গাঁথা লেখার জন্যই বুঝি কলম ধরা হয়েছে, অবশ্য কমিশনের সদস্যগণ অন্য কোন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ঐ শব্দগুলি প্রয়োগ করেছেন কিনা তা বোঝা যায় না।

প্রস্তাবনা পর্বের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে লেখা হয়েছে যে কমিটি এপ্রিলের প্রথম দিকে তাঁদের কাজ শুরু করেন এবং জুলাই-এর শেষের দিকে তাঁদের পরিক্রমা শেষ করেন। নেতাজীর শেষ জীবনের কার্যক্রম সম্বন্ধে, ভারতবর্ষ ও দূরপ্রাচ্যের যে সব ব্যক্তিবর্গের কাছে প্রয়োজনীয় খবরাখবর ছিল তাঁদের সকলকেই সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করাই ছিল কমিটির মুখ্য উদ্দেশ্য। বিশ্ব যুদ্ধের পর সামরিক ও অসামরিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুষ্ঠিত নেতাজী অনুসন্ধান কমিটিগুলির গোপন রিপোর্টও তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন। সরকারী দলিলপত্র পরীক্ষা করার পর কমিটি নেতাজী সম্বন্ধে প্রকাশিত বই ও প্রবন্ধ সমূহ বিচার করে দেখেছেন। সর্বসাকুল্যে, কমিটি ৬৭ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য নিয়েছেন। ১নং আনেক্সারএ সাক্ষীদের নামের এক পূর্ণ তালিকা দেওয়া আছে। এঁদের মধ্যে ৩২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয় টোকিওতে (জাপান), ৪ জনকে ব্যাঙ্কক-এ (থাইল্যাণ্ড) ৩ জনকে

সাইগন-এ (ভিয়েতনাম) এবং বাকি ২৮ জনকে দিল্লী ও কলকাতায় (ভারত)। শেষের দিকে নেতাজীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এমন বহু ব্যক্তিকে ভারতীয় মিশন এবং যে সব দেশে কমিশন গেছেন সেই সব দেশের সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের মাধ্যমে সরাসরি ভারতে এবং সেই সব রাষ্ট্রেই সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কমিটির সামনে হাজির হতে অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া, প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কমিটি জনগণকে তাঁদের কাছে কোন খবর থাকলে তা যেন কমিটির কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে তদন্ত কমিটির কাজ চলাকালীন ভারতীয় ও জাপানী পত্র পত্রিকায় এঁদের কার্যাবলি সম্বন্ধে বহু খবর প্রকাশিত হয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সম্বন্ধে জনগণের আগ্রহের পরিমাপ এ থেকে করা যায়। কমিটি, শ্রী এস. এ. আয়ার, শ্রীদেবনাথ দাস এবং কর্নেল হবিব-উর রহমান সমেত, নেতাজীর ব্যাঙ্কক থেকে শেষ যাত্রার সঙ্গী ছ'জনের মধ্যে পাঁচ জনের সাক্ষ্য ভারতেই গ্রহণ করেন। কমিটির কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কর্নেল রহমান পাকিস্তান থেকে ভারতে আসেন। কমিটি আজাদ হিন্দ্ ফৌজের চীফ্ অফ্ জেনারেল স্টাফ, জেনারেল জে. কে. ভোঁসলেকেও জেরা করেন। যাঁরা নেতাজী সম্পর্কে খবর জানতেন কমিশন শুধু তাঁদেরই জেরা করেন নি, যাঁরা নেতাজী সম্পর্কে তাঁদের মতবাদ জানাতে পারেন এমন ব্যক্তিদেরও কমিটি জেরা করেছেন। সকলকেই সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কমিটির কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য প্রথম ডাকা হয় মাদ্রাজ বিধানসভার সদস্য শ্রী এম. থেবরকে। যিনি বহুবার বলেছেন যে নেতাজীর সঙ্গে মাত্র কিছুদিন আগেও তাঁর যোগাযোগ হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্রীথেবর কমিটির সদস্যদের কাছে তাঁর গোপন তথ্য প্রকাশ করতে অস্বীকার করেন। কমিটির সদস্যগণ ২৬শে এপ্রিল ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন এবং প্রথম যাত্রাবিরতি করেন ব্যাঙ্ককে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যাঙ্কক ছিল এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এবং ব্রহ্মদেশ থেকে পশ্চাদপসরণের পর

এটা ছিল নেতাজীর সরকারের কেন্দ্রীয় কার্যালয়। সর্দার ঈশার সিং, পণ্ডিত রঘুনাথ শর্মা প্রমুখ ব্যক্তি যাঁরা নেতাজীর সময়ে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের অন্যতম সদস্য ছিলেন তাঁদের ওখানে জেরা করা হয়। সাইগনও আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র এবং ওখান থেকেই নেতাজীর বিমান যাত্রা শুরু হয়। সাইগনে যাঁদের জেরা করা হয় তাঁদের মধ্যে অন্যতম সাক্ষী হলেন শ্রীআনন্দমোহন সহায়—যিনি আজাদ হিন্দ্ সরকারের সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন এবং বর্ত্তমানে হ্যানয়ের ভারতীয় কন্‌সাল-জেনারেল। কমিটি সদস্যগণ সাইগন থেকে ভিয়েতনাম সীমান্তের ট্যুরেন-এ যান শুধু একবার চোখে দেখবার জন্য যেখান থেকে ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট সকালে নেতাজীর বিমান অন্তিমযাত্রা করে।

প্রস্তাবনার তৃতীয় অনুচ্ছেদে লেখা হয়েছে যে কমিটি সদস্যগণ ৫ই মে জাপানের টোকিওতে পৌঁছান এবং সেখানে একমাস অতিবাহিত করেন। তাঁরা দেখেন যে তখন জাপানের ঘরে ঘরে নেতাজীর নাম করা হয় এবং তাঁর সম্পর্কে প্রেস ও জনসাধারণ যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেন। জাপ পররাষ্ট্র দপ্তরের মাধ্যমে যে সব সাক্ষীদের তলব করা হয়েছিল, তারা ছাড়াও বহু জাপানী ভদ্রলোক সংবাদ পত্রের বিজ্ঞপ্তি পড়ে স্বেচ্ছায় সাক্ষ্যদান করেন। প্রমাণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে শ্রীজে. নাকামুরা যিনি একজন দোভাষী ছিলেন এবং নেতাজীর মৃত্যু শয্যায় তাঁর পাশেই ছিলেন, তিনি সত্তর বছর বয়স হলেও টোকিও থেকে প্রায় ১২০০ কিলোমিটার দূরের কিউস্যু থেকে স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য দিতে আসেন। জাপানী জনসাধারণ যে ধরণের ঔৎসুক্য দেখিয়েছেন এবং জাপানী সাক্ষীরা একজন দোভাষীর মাধ্যমে বহু সময় ধরে জেরার জবাব দিয়ে যে ধৈর্য ও শালীনতার পরিচয় রেখেছেন তা দেখে কমিটির সদস্যগণ খুবই অবাক হন। সাক্ষীরা এসেছেন জনজীবনের বিভিন্ন স্তর থেকে। ওদের মধ্যে কেউ ছিলেন প্রাক্তন সৈনিক, কেউবা প্রাক্তন জেনারেল, কেউ ব্যবসায়ী

আবার কেউবা লরি চালক। সৌভাগ্য বশতঃ কমিটি বিমান দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া ছ'জন জাপানীদের মধ্যে চারজনকে জেরা করার সুযোগ পান।

চতুর্থ-নং অনুচ্ছেদে কমিটি লিখেছেন যে বিমান দুর্ঘটনা, নেতাজীর মৃত্যু ও তাঁর শেষ-কৃত্যের জায়গা ফরমোসা পরিদর্শন করার জন্য কমিটির সদস্যগণ উদগ্রীব ছিলেন। ওখানে যাওয়ার অসুবিধা ছিল কারণ ভারত সরকার ও ফরমোসা কর্তৃপক্ষের মধ্যে কূটনৈতিক পর্যায়ে কোন সম্পর্ক ছিলনা। ভারত সরকারকে এ-বিষয়ে অবহিত করা হলে সরকারী মুখপাত্র কমিটিকে জানান যে ফরমোসায় যাওয়া তাঁরা সম্ভব বলে মনে করেন না। সুতরাং সে চেষ্টা ত্যাগ করা হয়।

পঞ্চম অনুচ্ছেদে লেখা হয়েছে যে সাক্ষীদের জেরা শেষ করার পর কমিটি সংগৃহীত প্রমাণগুলি বিচার করতে আরম্ভ করেন এবং নেতাজীর জীবনের শেষ পর্যায়ের ইতিহাস সম্পর্কে লেখা কাগজপত্র সংগ্রহ করতে ও পড়তে শুরু করেন। বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরেই ঐগুলি লেখা হয়েছিল এবং বেশীর ভাগই ছিল গোপন গোয়েন্দা রিপোর্ট। নেতাজী ও আজাদ হিন্দ্ বাহিনী সম্পর্কে লেখা বইগুলিও পড়ে দেখা হয়। তারপর, কমিটির সদস্যগণ তাঁদের মধ্যে সমস্ত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন এবং শ্রীসুরেশ চন্দ্র বসু সহ তিনজন সদস্যই যে সব বিষয়ে একমত হন তা লিপিবদ্ধ করা হয়। সেদিনটি ছিল ১৯৫৬ সালের ৩০শে জুন। এই কাগজটিতে তিনজন সদস্যই সহি করেন। তার একটা কপি আনেক্সার ১-এ পাওয়া যাবে। সব সদস্যরাই একমত হন যে, ফরমোসার তাইহোকুতে এক বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল, যাতে নেতাজী প্রাণ হারান; তাঁকে সেখানেই দাহ করা হয়, এবং টোকিওর রেনকোজি মন্দিরে রাখা চিতাভস্ম খুব সম্ভব তাঁরই ভস্মাবশেষ। এর পরই শ্রীবসু ব্যক্তিগত কারণে ভিন্নমত পোষণ করেন এবং রিপোর্টে সহি দেন না।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে কমিটি লিখলেন যে সাক্ষ্য প্রমাণ ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করার পর ঘটনাটি এরূপ দাঁড়ায়—

শেষ পর্যায়ে যখন জাপানের পরাজয় নিশ্চিত বলে মনে হয় তখন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস তাঁর সংগ্রাম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে মাঞ্চুরিয়া হয়ে রাশিয়াতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তিনি মাঞ্চুরিয়াগামী এক বিমানে ১৬ই ব্যাঙ্কক ত্যাগ করেন এবং ১৯৪৫ সালের ১৭ই আগস্ট সাইগন ত্যাগ করেন। ঐ বিমানটিই ১৮ই আগস্ট ফরমোসার তাইহোকুতে বিধ্বস্ত হয় এবং তাতে আগুন ধরে যায়। ভীষণভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে নেতাজী ঐ রাত্রেই তাইহোকুর এক হাসপাতালে মারা যান। তাঁর মরদেহ তাইহোকুতেই দাহ করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে তাঁর ভস্মাবশেষ বিমানে করে টোকিও নিয়ে যাওয়া হয় এবং রেনকোজি মন্দিরে জমা রাখা হয়। নেতাজী তাঁর যাত্রাপথে কিছু ধনরত্ন নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তার পরিমাণ জানা যায়নি। তাঁর ধনরত্নের একটা অংশ রক্ষা পায় এবং পরে তা উদ্ধার করা হয়। এই ছবিটি তুলে ধরার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে রিপোর্টটি নিম্নোক্ত সূত্রগুলির ওপর বিচার বিবেচনা করে লেখা হবে।

১) নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস-এর শেষ পরিকল্পনা
২) তাইহোকুতে (ফরমোসা) বিমান দুর্ঘটনা
৩) নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস-এর মৃত্যু
৪) নেতাজীর মরদেহ দাহ
৫) নেতাজীর চিতাভস্ম
৬) ধনরত্ন

প্রত্যেকটি সূত্র অধ্যায়ক্রমে স্বতন্ত্রভাবে বিচার বিবেচনা করা হয়েছে।

প্রত্যেক অধ্যায়েই চেয়ারম্যান ও অন্য সদস্য যিনি রিপোর্টে সই

দিয়েছেন, তাঁর সিদ্ধান্ত দেওয়া আছে। শেষ অধ্যায়ে (৭) প্রস্তাব করা হয়েছে যে নেতাজীর ভস্মাবশেষ যথাযথ সম্মানের সাথে ভারতে নিয়ে আসা উচিত। রিপোর্টটি দু'টি অংশে লেখা হয়েছে—

এ-অংশ—রিপোর্ট (তিনটি আনেক্সার সহ)

আনেক্সার-১—সংশ্লিষ্ট কাগজ পত্রের নকলসমূহ

আনেক্সার-২—ফটোগ্রাফগুলি

আনেক্সার-৩—নক্সাগুলি এবং পরিকল্পনা

বি-অংশ—সাক্ষীদের জবানী (কয়েকজন সাক্ষীর ফটোগ্রাফ)

সপ্তম অনুচ্ছেদে লেখা আছে যে সক্ষীদের মধ্যে অনেককেই জাপানে জেরা করা হয়েছে। জাপান পররাষ্ট্র দপ্তরের (গাইমুশো) তৎপর সাহায্য ও সহযোগীতা না পাওয়া গেলে সাক্ষীদের খুঁজে পাওয়া ও তাঁদের কমিটির সামনে উপস্থিত করা সম্ভব হ'ত না। জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ শিগিমিৎস্যু যিনি নেতাজীর সময়েও ঐ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি কমিটিকে সব রকমের সহযোগিতা ও সৌহার্দ দেখিয়েছেন। কমিটি, জাপ সরকার, মিঃ সিগিমিৎস্যু এবং জাপ পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মীদের সাহায্য ও সহৃদয়তার জন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চান। টোকিওর ভারতীয় দূতাবাস খুবই সহযোগিতা করেছেন। কমিটি বিশেষভাবে শ্রী জে. রহমান-এর উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন কারণ তিনি কমিটির সাথে জাপানে যুক্ত থেকে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। ব্যাঙ্কক ও সাইগন-এর ভারতীয় মিশন থেকেও সাহায্য পাওয়া গেছে। কমিটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রালয়, বহির্বিষয়ক দপ্তর, এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ইণ্টেলিজেন্স ব্যুরোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন তাঁদের গোপন-গোয়েন্দা রিপোর্টগুলি দেখতে দেওয়ার জন্য। শ্রী আর. দয়াল কমিটির চেয়ারম্যান-এর একান্ত-সহকারী হিসাবে তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁকে কমিটির কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুব খাটতে হয়েছে এবং তাঁর কাজ সবদিক দিয়েই সন্তোষজনক হয়েছে এবং পরিশেষে, স্বদেশে ও বিদেশে কমিটির

কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য এবং বর্ত্তমান সময়ের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের প্রাথমিক পর্যায়ে বিচার বিবেচনা করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তদন্ত কমিটি ভারত সরকারকে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। নেতাজী তদন্ত কমিটির মূল রিপোর্টে সহি দিয়েছেন কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীশাহনওয়াজ খাঁন ও শ্রী এস্. এন্. মৈত্র। চেয়ারম্যান সাহেবের নামের পাশে ছাপা হয়েছে মেজর জেনারেল, আই. এন. এ। আজাদ হিন্দ্ ফৌজে তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। শ্রীখাঁন বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ক্যাপ্টেন পদে ছিলেন এবং তাঁর বাহিনীর নাম ছিল, ১।১৪ পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট। আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগ দেওয়ার পর তাঁর পদোন্নতি ঘটে, তিনি কর্নেল হন। কর্নেল এবং মেজর জেনারেল পদমর্যাদার মধ্যে তফাৎ অনেক। এই প্রসঙ্গে শ্রীসুরেশ চন্দ্র বসু তাঁর ডিসেণ্টসিয়েণ্ট রিপোর্টে লিখেছেন যে শ্রীখাঁন তঁরে কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে মেজর জেনারেল খেতাবটি তাঁর নিজের নেওয়া। যা হোক চেয়ার-ম্যান সাহেব তাঁর সদস্যদের নিয়ে পূর্ণোদ্দমে নেতাজী তদন্তের কাজ করেছেন। খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে নেতাজীর জীবনের শেষ মুহূর্তগুলির বিশদ ইতিহাস খুঁজে বার করার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীখাঁন বলেন যে নেতাজী তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষভাবে সব কিছু বিচার করে দেখবেন। পত্রপত্রিকায় তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান-এর নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর জবানী পড়ে জনগণ আশ্বস্ত হয়েছিলেন। টোকিওতে পৌঁছে কমিটি জনগণের উদ্দেশ্যে আবার প্রেসনোট দিয়েছিলেন। প্রেস ট্রাষ্ট অফ ইণ্ডিয়ার ৪ঠা মে, ১৯৫৬ সালের রিপোর্টে বলা হয়েছে—Major General Shah Nawaz Khan, Chairman of the Netaji Enquiry commitee along with members of the team arrived here today to investigate into the mystery of Netaji's death. On being interviewed by the reporters, the Chairman said his mission was mainly to interview

people who might offer any direct evidence of Shri Bose's death. শ্রীখাঁন নিরপেক্ষভাবে সব কিছু বিচার করে দেখবেন বলে বলেছিলেন কিন্তু টোকিওতে পৌঁছে তিনি জানালেন যে তাঁর উদ্দেশ্য হ'ল বিশেষ ভাবে সেই সব ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাত করা যাঁরা শ্রীবোস-এর মৃত্যু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দাখিল করতে পারেন। তাহ'লে, পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী শ্রীসাদাত আলি খাঁন-এর কথা সত্যের অপলাপ নয়। কোন ব্যক্তিকেই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার নাম করে ডাকা হয়নি, তবে পি. টি. আই খবরের ভিত্তিতে বোঝা যায় যে নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে যাঁরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দাখিল করতে পারবেন চেয়ারম্যান সাহেব তাঁদেরই ডাকবেন বলে জানিয়েছিলেন। কমিশনের বিচার্য বিষয় যে উদ্দেশ্য-মূলকভাবেই পছন্দ করা হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কমিটি নেতাজীর জীবনের শেষ পৃষ্ঠা লেখার দায়িত্ব নিয়ে সেইসব ব্যক্তিদের অবশ্যই ডাকতে উৎসুক হবেন যাঁরা সম্যকভাবে জানেন যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র মৃত, এতে অবাক হওয়ার মত উপাদান কমই আছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র মৃত এমন প্রমাণ না নিয়ে, অন্য কোন প্রমাণ দাখিল করার উদ্দেশ্যে যাঁরা কমিটির কাছে এসেছেন, তাঁদের সাক্ষ্য যে নেওয়া হয়নি, তেমন প্রমাণও আছে। সে বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে।

কমিটির বিশেষ ইচ্ছা ছিল ফরমোসার তাইহোকুতে যাওয়ার কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি যেহেতু ভারত সরকার তাঁদের জানান যে ফরমোসায় যাওয়াটা তাঁরা সম্ভব বলে মনে করেন না, কারণ ফরমোসার সঙ্গে ভারতের কোন কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। তাইহোকুতে না গিয়ে ওখানকার রহস্যময় ঘটনার সত্যতা নিরূপণ করা কতদূর সম্ভব তা ভাববার বিষয়। অবশ্য কমিটি তাঁদের রিপোর্টে বলেছেন যে সাক্ষীরা অধিকাংশই জাপানী। সাক্ষীরা জাপানের লোক বলে তাঁদের জাপানেই জবানবন্দী নেওয়া যাবে এ যুক্তি মানবার মত। কিন্তু সাক্ষীরা যে সব

সত্যি কাহিনী বলবেন তার নিশ্চয়তা কোথায়? কমিটির বিমান দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করার ইচ্ছার কথা লিখতে গিয়ে, চেয়ারম্যান সাহেবের একবারের জন্যও কি মনে পড়েনি যে 'ট্রাঙ্ককলে' তিনি দিল্লীর সঙ্গে একবার যোগাযোগ করেছিলেন? সুদূর টোকিও থেকে দূর পাল্লার টেলিফোনে সেদিন যে কথাগুলো ভেসে এসেছিল এবং ভেসে গিয়েছিল রিপোর্ট লেখার সময় কি সবই বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গিয়েছিল? কমিটি জাপ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সৌহার্দ্য ও সহযোগীতার কথা ভুলতে পারেন নি। জাপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ শিগিমিৎসু নেতাজীর মুক্তি সংগ্রামের সময়ও জাপ সরকারে ঐ একই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তা কমিটির অজানা নয়। মিঃ শিগিমিৎসু নেতাজী তদন্ত কমিটিকে ফরমোসা যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিতে চেয়েছিলেন। চেয়ারম্যান সাহেব ঐ প্রস্তাব সরাসরি বাতিল করে দিতে পারেননি। তিনি ওভারসীস্ ট্রাঙ্ক কলে তৎকালীন প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী ফরমোসা যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেওয়ার প্রস্তাব শুনে পরিষ্কার নির্দ্দেশ দেন যে ফরমোসা যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। নাটক যে মঞ্চে অভিনীত হয় সেখান পর্যন্ত না গেলে নাটকের রূপ বোঝা যায় না। যদি অভিনেতার কথা শুনেই কোন নাটক বোঝা যেত তাহলে নাটক দেখার জন্য দর্শক সমাগম হ'ত না। কমিটি নেতাজী সম্বন্ধে তদন্ত করতে বহু দেশ ঘুরেছেন। তাঁরা যখন ফরমোসার তাইহোকুতে গিয়ে তদন্ত করলেন না, তখন বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজনই বা কি ছিল? ভারতের রাজধানীতে বসে বিমান দুর্ঘটনার সাক্ষীদের লিখিত বিবরণ বিচার বিবেচনা করে একটা রিপোর্ট লিখে দিলেই তো চলত।

দেশ বিদেশের সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে কমিটি যখন বৈঠকে বসলেন তখন যে সব বিষয়ে তিনজনই একমত হতে পেরেছিলেন তা লেখা হয়েছিল এবং ঐ লেখা কাগজে সবাই নাকি সহি দিয়েছিলেন। এই সম্বন্ধে শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন

যে ১৯৫৬ সালের ২৩শে জুন তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান তাঁর মতামত জানতে চান। উত্তরে শ্রীবসু জানান যে সমস্ত প্রমাণাদি পর্যালোচনা না করে তিনি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন না। শ্রীখাঁন কিন্তু এই উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারেন না। তিনি আবার বলেন যে তাঁর (শ্রীবসু) রায় জানা তাঁর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, অন্যথায় তাঁর পক্ষে রিপোর্টের খসড়া করা সম্ভব হবে না। ২৫শে জুন তারিখে শ্রীখাঁন শ্রীবসুকে আবার একই প্রশ্ন করেন এবং তাঁর সঠিক মতামত জানতে চান। এবারও কিন্তু শ্রীবসু তাঁর অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। ২৭শে জুন, শ্রী এ, এম্. এন্. শাস্ত্রীর সাক্ষ্য নেওয়ার পর ৩০শে জুন তারিখে কমিটির বৈঠক বসে। ঐ বৈঠকে রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। শ্রীবসু লিখেছেন যে তিনি ঐ বৈঠকে প্রস্তাব রেখেছিলেন যে তদন্ত কমিটির রিপোর্টের খসড়া সম্বন্ধে সব প্রস্তাবগুলি রেকর্ড করা প্রয়োজন। তিনি বলেন যে নেতাজীর মাঞ্চুরিয়া যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। রাশিয়ায় গিয়ে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাও তাঁর ছিল। তাঁর পরিকল্পনা সমর্থন করেই জাপ সরকার বিমানে তাঁকে মাঞ্চুরিয়ায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। নেতাজীকে রাশিয়ার সীমান্তে পৌঁছে দেওয়ার জন্য লেঃ জেনারেল সিডিকে নিয়োগ করা হয়, কারণ ঐ এলাকা সম্পর্কে তাঁর সম্যক জ্ঞান ছিল। শ্রীবসুর এই প্রস্তাবের সঙ্গে শ্রীমৈত্র যোগ করেন যে নেতাজী তাঁর ঐ পরিকল্পনা নিয়ে আজাদ হিন্দ্ সরকারের কেবিনেট মন্ত্রীদের সঙ্গেও আলোচনা করেছিলেন। শ্রীবসু শ্রীমৈত্রের এই মন্তব্য নোট করলেন। তারপর শ্রীবসু প্রস্তাব রাখেন যে এবার তাঁদের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে যে বিমানটি সত্যই কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিল কিনা। যদি ধরে নেওয়া হয় যে বিমান দুর্ঘটনা আদৌ ঘটেনি তাহলে পরের ঘটনাগুলি সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রমাণের কোন গুরুত্ব থাকে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীবসু লিখেছেন যে তাঁর সহকর্মীরা এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারেন নি।

তাঁরা মন্তব্য করেন যে ব্যাপারটাকে এত হাল্কাভাবে ছেড়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ বিশদভাবে বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে। কমিটির সদস্যগণের মধ্যে আলোচনা চলতে থাকে এবং শ্রীবসু সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঐ আলোচনার নোট রাখতে থাকেন। অবশ্য কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীখাঁনও আলোচনার নোট রাখতে থাকেন, কিন্তু শ্রীমৈত্র কোন নোট রাখেন নি। শ্রীবসু তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন যে সদস্যদের প্রস্তাবগুলি তিনি নোট করেন, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা করে কোন নোটই তিনি রাখেন নি, কারণ তিনি তাঁর নিজস্ব প্রস্তাবগুলি জানতেন এবং অন্যান্য প্রস্তাবগুলি অবশ্যই তাঁর সহকর্ম্মীদেরই হবে।

শ্রীবসু আরও লিখেছেন যে তিনি ভেবেছিলেন যে কমিটির চেয়ারম্যান স্বয়ং তদন্ত রিপোর্ট লিখবেন এবং দু'জন সদস্য তাঁকে সাহায্য করবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল কমিটির চেয়ারম্যান তদন্ত রিপোর্ট লেখার জন্য শ্রীমৈত্রের নাম প্রস্তাব করলেন। শ্রীবসু এতে যদিও খুব অবাক হয়েছিলেন কিন্তু দ্বিমত পোষণ করেন নি। তারপর আলোচনা চলে, রিপোর্ট লেখা, রিপোর্টের আলোচনা ও রিপোর্ট পেশ করার সম্ভাব্য তারিখ নিয়ে। শ্রীবসু ঐ আলোচনারও নোট রাখেন। ঐ সময়ে শ্রীমৈত্র শ্রীবসুর লেখা নোট পড়তে চান। শ্রীমৈত্র আলোচনার কোন নোটই রাখেন নি। শ্রীবসু তাঁর নোট শ্রীমৈত্রকে পড়তে দিলে তিনি ওটা টাইপ করিয়ে নেন এবং শ্রীবসুকে সহি দিতে অনুরোধ জানান। শ্রীখাঁন ও শ্রীমৈত্র ঐ টাইপ নোট-এ তাঁদের সহি দেন। তদন্ত কমিটির রিপোর্টের আনেক্সার-এ'তে তিনজন সদস্যের সহি করা একটা নোট জুড়ে দেওয়া আছে। ঐ নোটের ওপর তারিখ দেওয়া হয়েছে, ৩০শে জুন, ১৯৫৬ সাল, কিন্তু স্বাক্ষরকারীদের সহির তারিখ, ২রা জুলাই, ১৯৫৬ সাল। শ্রীবসু দাবী করেছেন যে তাঁর লেখা নোট এ শুধু ৩০-৬-৫৬ তারিখ দেওয়া ছিল, কিন্তু ঐ নোট-এ কোন শিরোনামা ছিল না। ব্যক্তিগত

প্রয়োজনে তিনি যে নোট রেখেছিলেন তাতে তিনজনেরই মতামত লেখা হয়েছিল। শ্রীবসু অভিযোগ করেছেন যে তদন্ত রিপোর্টে তাঁর সহি নিয়ে রিপোর্টকে সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত করে নেওয়ার জন্য ভারতের কতিপয় উচ্চপদস্থ অফিসার যখন সব প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হন, তখন তাঁর (শ্রীবসু'র) ব্যক্তিগত নোটকে তুরুপের তাস হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তাঁকে সহকর্মীদের দেওয়া রিপোর্টে সহি করতে বাধ্য করার বহু চেষ্টা হয় এবং এমন অভিযোগও করা হয় যে তিনি যে নোট-এ সহি দিয়েছেন তাতেই বলা আছে যে সাক্ষীদের পরীক্ষা করে তিনি (শ্রীবসু) স্থির নিশ্চিত যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র মৃত। এই ব্যাপারে পত্র পত্রিকার সাহায্যও নেওয়া হয়েছিল। ১৯৫৬ সালের ৯ই আগস্ট সংবাদ পত্রে পরিবেশিত ইউ. পি. আই. এর এক সংবাদে বলা হয় যে, তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে কমিটির দু'জন সদস্য ইতিমধ্যেই সহি দিয়েছেন। জানা গেছে যে, বিশেষ কারণবশতঃ তৃতীয় সদস্য সহি নাও দিতে পারেন। অবশ্য কমিটির দখলে তাঁর সহি করা এক বিবৃতি আছে যাতে তিনি ব্যক্ত করেছেন যে সাক্ষীদের পরীক্ষা করে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন যে নেতাজী মৃত। শ্রীবসু আরও লিখেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ১৯৫৬ সালের ১৫ই আগস্ট তাঁকে তাঁর দপ্তরে দেখা করার অনুরোধ জানান। উল্লিখিত তারিখে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের সঙ্গে শ্রীবসুর সুদীর্ঘ আলোচনা হয়। আলোচনার শেষে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীও তাঁকে রিপোর্টে সহি দিতে বলেন। ডাঃ রায় তাঁকে আরও জানান যে ৩০শে জুন তারিখের যে বিবৃতিতে তিনি সহি দিয়েছিলেন তাতে বলা হয়েছে যে নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি (শ্রীবসু) স্থির নিশ্চিত। কমিটির ৩০শে জুনের বৈঠকের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শ্রীবসু লিখেছেন যে নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে ঐদিন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নি। প্রমাণ স্বরূপ, তিনি ৩০শে জুন তারিখের বিবৃতির ৭নং অনুচ্ছেদের উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও লিখেছেন যে ঐ অনুচ্ছেদে সর্বশ্রী

খেবর ও গোস্বামীর বিবৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে যে নেতাজী জীবিত না মৃত এ সম্পর্কে যখন বিচার বিবেচনা করা হবে তখন ওঁদের বিবৃতিগুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং পরে আরও বিশদভাবে স্বতন্ত্র আলোচনা হবে। শ্রীবসু মন্তব্য করেছেন যে এ শুধু সত্যের অপলাপ করাই নয়, পরন্তু স্বেচ্ছাকৃত মিথ্যা বিবৃতি। তিনি দাবী করেছেন যে, তাঁর নোট-এ তারিখ দেওয়া ছিল ৩০শে জুন, ১৯৫৬, এবং তার কোন শিরোনামা ছিল না। আর তিনি প্রশ্ন করেছেন যে তাঁর সহি দেওয়ার তারিখ ৩০শে জুন না লিখে ২রা জুলাই লেখা হল কেন?

শ্রীবসু তাঁর রিপোর্টে অনেক প্রশ্নই তুলেছেন, কিন্তু জনগণের প্রশ্ন অন্য। শ্রীবসুকে যখন তদন্ত কমিটির সদস্যপদে নিয়োগকরা হয়েছে তখন তাঁর নিজস্ব মতামত পেশ করার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁর আছে। তদন্ত কমিটির দু'জন সদস্য একমত হয়ে যে রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেছেন সেই রিপোর্টের সাথে ভিন্ন মত পোষণকারী সদস্যের রিপোর্টও পেশ হওয়া উচিত ছিল এবং তাই প্রচলিত প্রথা। নেতাজী তদন্ত কমিটি প্রচলিত বিধি নিষেধ লঙ্ঘন করে ইতিহাস সৃষ্টির সহায়ক হয়েছেন। তদন্ত কমিটিরই শুধু নয়, বিচার বিভাগের ক্ষেত্রেও যদি কোন বিচারপতি ভিন্নমত পোষণ করেন তবে তাঁর মতামত রায় লেখার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। নেতাজী তদন্ত কমিটির ক্ষেত্রে দেখা গেল কমিটির অন্যতম সদস্য ভিন্নমত পোষণ করার দরুণ তাঁর মতামত মূল রিপোর্টের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হ'ল না। শ্রীবসু তাঁর রিপোর্ট পুস্তকাকারে প্রকাশ করে তাঁর ভিন্ন মতামত জনগোচরে আনলেন। এমন রীতি বিরুদ্ধ কাজ কেন করা হ'ল সে প্রশ্নের উত্তর কে দেবেন?

তদন্ত কমিটি বহু ব্যক্তির কাজের উচ্চ-প্রশংসা করেছেন। ভারত সরকারের মনোনীত কমিটি ভারত সরকারকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। কমিটির চেয়ারম্যান-এর একান্ত সহকারীর কাজেরও

ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে, কিন্তু কমিটি সদস্য শ্রীএস. এন. মৈত্রর কাজের কোন উল্লেখ রিপোর্টে করা হয়নি। তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেই নেতাজী তদন্ত কমিটির রায় লিখেছেন। রায় লেখাটা কমিটির চেয়ারম্যান-এর কাজ, কোন সদস্যের নয়। তবুও একজন সদস্যই রিপোর্ট লিখেছেন বলে জানা যায়, যিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একজন প্রবীণ অফিসার। একজন প্রবীণ আই. সি. এস., যিনি স্বীকৃত সরকারী মুখপাত্র, তিনিই সরকারী তদন্ত কমিটির রিপোর্ট লিখেছেন, আর ঐ রিপোর্টে তাঁর সঙ্গে সহি দিয়েছেন সরকারী নেতাজী তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান, যিনি একজন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী, লোকসভায় সরকারের প্রতিনিধি।

তদন্ত কমিটি জাপ সরকার, জাপ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ শিগিমিৎসু ও তাঁর দপ্তরের কর্মচারীদের সৌহার্দ্য ও সহযোগীতা দেখানোর জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। ওঁদের সহযোগীতার কতটুকুই বা বিশদভাবে জানা যায়। ভারতের মুক্তি সংগ্রামে জাপানের সহযোগীতার কথা নিয়ে এক নূতন মহাকাব্য লেখা যায়। জাপ সরকারের সহযোগীতা সম্বন্ধে অনেকেই উষ্মা প্রকাশ করে থাকেন। ইতিহাস কিন্তু এ প্রসঙ্গে অন্য কিছু বলে। লালকেল্লার প্রাকারে আজাদ হিন্দ্ সরকারের সংগ্রামী সৈনিকদের ঐতিহাসিক বিচারের এক প্রহসন হয়েছিল। ঐ বিচার প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে আজাদ হিন্দ্ সরকারের পক্ষ সমর্থন করে সওয়াল প্রসঙ্গে স্বর্গত ভুলাভাই দেশাই বলেছিলেন—"I have attempted to prove and I have established that the I. N. A. though small in numbers, was fighting as allies of the Japanese Army and there is no ignorence in admitting that or in doing that, because the objectives at the time of both the armies was undoubtebly to free India from Britain.* প্রবীন আইনজ্ঞের চোখে পরিষ্কার ভাবে ধরা পরে

* I. N. A. Trial—Bhulabhai Desai

যে জাপান আজাদ হিন্দ্ সরকারের মিত্র ছিল, কারণ উভয় সরকারেরই লক্ষ্য ছিল ভারতকে বৃটেনের হাত থেকে উদ্ধার করা। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের শক্তি ও সামর্থ্য জাপানের তুলনায় কম থাকার দরুণ স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে মৈত্রী বন্ধন থাকলেও যুদ্ধের অবসানে তার রূপ কি দাঁড়াবে। স্বর্গত দেশাই-এর সওয়াল থেকেই এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। স্বর্গত দেশাই বলেছিলেন—
According to their agreement which I submit I have proved, any part of Indian territory which may be liberated would be immediately handed over to the I. N. A.···where is the question of being an instrument ? If, however, there was any instrument, it was the Japanese, because it is they who were assisting liberating India, with a view that the liberated parts of India would be handed back to the I. N. A.—"*
বৃটেনের কবল থেকে ভারতের যতটুকু অংশই মুক্ত করা হোক, তা আজাদ হিন্দ্ সরকারের হাতে তৎক্ষণাৎ অর্পিত হবে, এই সত্য স্বর্গত দেশাই প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজাদ হিন্দ্ সরকার জাপ সরকারের ক্রীড়নক হয়েছিলেন বলে বুঝতে পেরে যাঁরা গর্ববোধ করেন তাঁদের জন্য প্রবীণ আইনজ্ঞের উক্তিই যথেষ্ট। তিনি আইনের চুলচেরা বিচার করে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে যন্ত্র হিসাবে যদি কাউকে আখ্যা দেওয়া হয় তবে, জাপ সরকারকেই তা বলা যেতে পারে। জাপ সরকার ভারতের সেই সংগ্রামে সর্বাত্মক সাহায্য জুগিয়েছিলেন। বিমান দুর্ঘটনার কাহিনী মিথ্যা হলে ঐ ঘটনার পিছনে জাপ সরকারের যে প্রচ্ছন্ন হাত ছিল, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সুদীর্ঘ এগার বছর পরে নেতাজী তদন্ত কমিটি জাপানে তদন্ত করতে গিয়ে দেখা পেলেন মিঃ শিগিমিৎসুর। যিনি তখন জাপ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং সুদীর্ঘ এগার বছর আগে,

* I. N. A. Trial—Bhulabhai Desai

আজাদ হিন্দ্ সরকারের সেই আন্দোলনের দিনগুলিতে তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রীই ছিলেন। আজাদ হিন্দ্ সরকার জাপ সরকার থেকে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। স্বীকৃত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব থাকে পররাষ্ট্র দপ্তরের ওপর। পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে মিঃ শিগিমিৎসু দুই সরকারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষায় নিশ্চয় সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। কমিটি তাঁর কাছ থেকে সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা পেয়েছেন। এমন এক বিশিষ্ট ব্যক্তি যিনি দুই যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল তাঁর কোন জবানবন্দী কেন নেওয়া হল না, তা সরকারী কমিশনের চেয়ারম্যানই বলতে পারেন। মিঃ শিগিমিৎসু নেতাজী রহস্য সম্বন্ধে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম সাক্ষী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৬

নেতাজী তদন্ত কমিটি তাঁদের রিপোর্টের প্রথম অধ্যায়ে নেতাজীর শেষ পরিকল্পনা শিরোনামায় তথাকথিত শেষ যাত্রার পূর্ব ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

প্রথম অনুচ্ছেদে আর একবার কমিশনের বিচার্য বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কমিটি লিখেছেন যে তাঁদের শেষ পাতাটি লিখতে বলা হয়েছে, যা আজ পর্যন্ত অলিখিতই আছে। কিন্তু তা লিখতে হলে, প্রথম এবং মাঝামাঝি পাতাগুলির পটভূমি সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। ১৯৪২ সালের গোড়ার দিকে জাপ সৈন্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এক বিরাট অংশ দখল করে নেয়। ঐ অংশ এতদিন ইউরোপীয় শক্তির অধীনে ছিল। ঔপনিবেশিকতার নাগপাশ থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এক বিরাট অংশ মুক্ত করে দেওয়ার দরুণ জনমনে তখন জাতীয়তাবাদের চেতনা জাগে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে তখন ত্রিশ লক্ষ ভারতীয় বসবাস করতেন। তাঁরা এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। শ্রীরাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে তাঁরা ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ গঠন করেন। ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরের পতন হয় এবং ওখানে বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর যে বিরাট অংশ ছিল, তাঁরা সকলেই আত্মসমর্পণ করেন। জেনারেল মোহন সিং-এর অধীনে এঁদের নিয়েই প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয়। এই আন্দোলনে অবশ্য রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কোন নেতা ছিলেন না। প্রথম থেকেই নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস-এর জন্য এই আন্দোলন স্থগিত ছিল। ১৯৪১ সালে ভারতবর্ষ থেকে চলে গিয়ে তিনি তখন ইউরোপের মাটিতে অবস্থান করছিলেন। সাবমেরিনে এক সুদীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল সমুদ্র যাত্রা করে নেতাজী

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে গিয়ে পৌঁছান, এবং ১৯৪৩ সালের ৪ঠা জুলাই তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের দায়িত্ব নেন। অচিরেই তিনি আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়কের দায়ভারও নেন। ১৯৪৩ সালের ৫ই জুলাই, সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের এক সমাবেশে তিনি প্রথম সেই বিখ্যাত 'দিল্লী চলো' 'চলো দিল্লী'র যুদ্ধের ডাক দেন। ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকার গঠন করা হয়। এদিকে দেখা যায় জনগণের অদম্য উৎসাহ। জনগণ আজাদ হিন্দ্ আন্দোলনের সাথী হতে থাকেন, আর অর্থও পাওয়া যেতে থাকে। জাপ সেনাবাহিনী তখন বার্মা দখল করে নিয়েছিল এবং আসামের মধ্য দিয়ে ভারত অভিযান করার জন্য পরিকল্পনা করছিল। আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠানো হয়। তাঁরা ইম্ফল ও কোহিমার যুদ্ধে অকল্পনীয় বীরত্ব দেখান। নেতাজী সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং একাধিকবার জাপান পরিদর্শন করেন। যদিও তিনি পরাধীন জাতির মানুষ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনী চালনার জন্য জাপানের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন, তবুও যারাই তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁদের মনে তাঁর মহান্ ব্যক্তিত্বের এক ভাবমূর্তি আজও অমলিন। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও জাপানের ঘরে ঘরে আজও তাঁর নামগান শোনা যায়। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে সিঙ্গাপুরে আসার পর থেকে, ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে ব্যাঙ্কক পরিত্যাগ করে যাওয়ার সময় পর্যন্ত তিনি মাত্র বছর দুয়েক সময় পেয়েছিলেন। কিন্তু ঐ স্বল্প সময়ের মধ্যেই বহু গুরুত্বপূর্ণ মহৎ কাজের চেষ্টা চালানো হয়েছিল এবং আংশিক সফলতাও এসেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মাটিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এক মহাকাব্যের মত। এ সম্বন্ধে পূর্ণ ইতিহাস লেখা এখনও বাকি আছে। সমস্ত ইতিহাস বহু অধ্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হতে পারে যে, আশার আলো দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তা ভারতের মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে

সঙ্গেই নিভে যায় এবং ইম্ফল দখল করার যুদ্ধ ব্যর্থ হয়। ঐ ঘটনা ঘটে ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে। সীমিত বিমান আক্রমণ, ক্ষীণ সেনাবল ও খাদ্যের অকুলান তখন দেখা দিয়েছিল। তা ছাড়া শুরু হয়েছিল বর্ষার অবিরাম ধারা। জাপ সেনাবাহিনীর সঙ্গে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অগ্রবর্তী সেনাবাহিনীও আপার বার্মার চিন্দুইন-এর পাড়ে আটক হয়। নদীগুলিতে প্লাবন দেখা দিয়েছিল এবং অসুস্থ ও আহত সৈনিকদের তাঁদের সহসৈনিকেরা পিঠে করে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কমিউনিষ্ট ফোর্থ রুট আর্মির সমগ্র চীন ভূখণ্ড পার হয়ে ইয়েনান পর্যন্ত ঐতিহাসিক অগ্রগতির কথা অনেকেই শুনেছেন কিন্তু বার্মার ওপর দিয়ে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বীরোচিত পশ্চাদপসরণের কথা কম লোকই জানেন। যা হোক, নেতাজী কিন্তু ঐ ব্যর্থতার দরুণ ভেঙ্গে পড়েন নি। আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে সংগঠিত করার জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম শুরু করেন। এই সময় ব্যাঙ্কক-এ আয়োজিত এক জনসমাবেশে তিনি বলেন, "দিল্লী চলো, এখনও আমাদের সংগ্রামের ডাক। ইম্ফল হয়ে আমরা দিল্লী পৌঁছতে না পারলেও, একথা মনে রাখতে হবে যে রোমের মত, দিল্লী পৌঁছবার অনেক পথই আছে।"

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের আন্দোলনের কথা লিখতে গিয়ে তৃতীয় অনুচ্ছেদে কমিশন লিখেছেন যে, জাপ সরকারে রদবদল দেখা দিয়েছিল এবং জেনারেল তোজো'র স্থানে এসেছিলেন কাইসো। ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে নেতাজী তৃতীয় ও শেষ বারের মত জাপানে যান। তাঁর জাপান যাওয়ার কারণ ছিল নূতন সরকারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করা এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করা। কিন্তু ঐ সময়ে ইউরোপের মাটিতে এ্যাক্সিস শক্তির ও এশিয়ার মাটিতে জাপানের অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছিল। বৃটিশ সৈন্য ব্রহ্মদেশে অনেক অগ্রগতি করেছিল এবং মান্দালয় দখল করতে চলেছিল। মারকিন সৈন্য প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায়

তৎপর হয়ে উঠছিল। জাপানের জয়ের সম্ভাবনা ধীরে ধীরে কমে আসছিল।

নেতাজী শুরুতেই ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতার জন্য। তাঁর মিত্রদেশ জাপান বা জার্মান-এর ভাগ্যে যাই ঘটুক, ভারতের মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর সংগ্রাম চলবে। শেষবারের মত জাপান পরিদর্শন করে আসার পর থেকেই নেতাজী একটা সুবিধা-জনক স্থানের খোঁজ করছিলেন, যেখান থেকে তিনি বৃটেনের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে পারেন। তিনি দেখেছিলেন যে রাশিয়াই একমাত্র দেশ যে তাঁকে কোনরকম সাহায্য দিতে পারে। যুদ্ধের সময় রাশিয়া ও ইঙ্গ-মারকিন মৈত্রী যে খুবই সাময়িক ব্যাপার তা নেতাজী দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন এবং তাঁর উপদেষ্টা, আজাদ হিন্দ্ সরকারের সদস্য ও অফিসারদের সঙ্গে তিনি আলাপ আলোচনা করেছিলেন যে এই যুদ্ধান্তে অচিরেই রাশিয়া ইঙ্গ মার্কিন শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হবে। তিনি ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন যে আগামী দশ বছরের মধ্যে রাশিয়া ও ইঙ্গ-মারকিন শক্তির মধ্যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে। নেতাজী বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর পক্ষে রাশিয়াতে আশ্রয় নেওয়াই খুব যুক্তিযুক্ত হবে, এবং সেখান থেকে তিনি যথাযথ সময়ে আবার বৃটিশের বিরুদ্ধে ভারতের মুক্তি সংগ্রাম চালাতে পারবেন। ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে টোকিও থেকে ফেরার পথে সাংহাই এ নেতাজী শ্রীআনন্দমোহন সহায়-এর সঙ্গে দেখা করেন। শ্রীসহায় দীর্ঘকাল জাপানে ছিলেন। নেতাজী, শ্রীসহায়কে টোকিওতে গিয়ে ওখানকার সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত মিঃ জেকব মালিক-এর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে বলেন। শ্রীসহায় ১৯৫৬ সালে সাইগনস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তাঁকে সাইগনে জেরা করা হয়। তিনি বলেন যে, পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ শিগিমিৎসু এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ওজাওয়া সমেত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গেই তিনি ঐ বিষয়ে যোগাযোগ করেন। কিন্তু তাঁরা জানান যে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের

সঙ্গে যোগাযোগ করা বৃথা হবে। সুতরাং শ্রী সহায় সিঙ্গাপুরে ফিরে আসেন এবং নেতাজীকে তাঁর দৌত্যের ফলাফল জানান। কিন্তু প্রচেষ্টা ত্যাগ করা হয় নি।

১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে রেঙ্গুন থেকে পশ্চাদপসরণের পর এবং জার্মানীর পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই এক দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দেয়। রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর হয়ে যোগাযোগ করার জন্য নেতাজী জাপ সরকারকে একটি সরকারী চিঠি লেখেন। শ্রীদেবনাথ দাস কমিটিকে জাপ সরকারের লেখা উত্তরের একটা প্রতিলিপি দেন। ঐ চিঠি ১৯৪৫ সালের জুন মাসের কোন এক তারিখে লেখা হয়েছিল। জাপানের সঙ্গে নেতাজীর সহযোগীতার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঐ চিঠিতে লেখা হয়, "নিপ্পন সরকার মনে করে যে আপনার (ইয়োর এক্সেলেন্সি) হয়ে সরাসরি সোভিয়েত সরকারের সংস্পর্শে এসে কোন ফল পাওয়ার আশা নেই এবং তা করার কোন ইচ্ছাও নেই।" শ্রীদেবনাথ দাস জানান যে, ইতিমধ্যে বহু বিকল্প পরিকল্পনা বিচার বিবেচনা করে দেখা হয়েছিল। প্রথম পরিকল্পনা ছিল ভারতে ফিরে গিয়ে, দেশের মধ্যে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য তৈরী হওয়া; বিকল্পে, ইয়েনান (কমিউনিষ্ট চীন) চলে যাওয়া, এবং তৃতীয়তঃ, জাপানের মাধ্যমে রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা। তৃতীয় বিকল্পটিই নেতাজীর মনঃপূত হয়েছিল বলে মনে হয়। সরাসরি রাশিয়ার কাছে কোন প্রস্তাব দেওয়া অসুবিধা ছিল বলে মনে হয়; মাঞ্চুরিয়া রাশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্র এবং জাপানী সৈন্যের দখলে ছিল বলে ঐ জায়গায় চলে যাওয়াটাই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু সব প্রচেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, তাই নেতাজী শ্রীদেবনাথ দাসকে নির্দেশ দেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে গুপ্ত স্থান নির্ধারণ করে রাখতে, যেগুলি আত্মগোপন করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

কমিটি এই অধ্যায়ে ৪নং অনুচ্ছেদে লিখেছেন যে প্রায় একই

সময় আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট লীগের সদর দপ্তর চীনে স্থানান্তরিত করার প্রস্তাবও বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। এই প্রসঙ্গে জেনারেল ইসোদা গুরুত্বপূর্ণ খবর দিয়েছেন। ইনি জাপানী লিঁয়াসো মিশনের (হিকারি কিকান) অধিকর্তা ছিলেন এবং এঁর মাধ্যমেই জাপানের সঙ্গে সব পত্র বিনিময় করা হত। তিনি বলেছেন যে প্রথম প্রস্তাব ছিল যে সদর দপ্তরগুলিকে সাংহাই-এ স্থানান্তরিত করতে হবে, কিন্তু এই প্রস্তাব কার্যকারী করা হয়নি। একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে জাপানী সাউদার্ন আর্মি কম্যাণ্ড অনুমান করেছিলেন যে নেতাজী দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বাইরে চলে গেলে আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে আয়ত্বে রাখা কষ্টকর হবে। দ্বিতীয় বিকল্প প্রস্তাব ছিল, সদর দপ্তরগুলিকে সাইগণ-এ স্থানান্তরিত করা এবং সাংহাই ও পিকিং-এ বা উত্তর চীনের কোন সহরে শাখা অফিস খোলা। উত্তর চীনে শাখা অফিস খোলার কারণ, নেতাজী রাশিয়ার সীমানার কাছাকাছি যেতে পারবেন এবং সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা তাঁর পক্ষে অনেক সহজ হবে। জাপ সরকার ও জাপানের ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স প্রথমে এই প্রস্তাব গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু জেনারেল ইসোদা যখন তাঁদের বুঝিয়ে বলেন যে নেতাজী জাপানের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে ইচ্ছুক নন, তবে রাশিয়ার সঙ্গে একটা বিকল্প যোগাযোগ তিনি করতে চান, তখন তাঁরা ঐ প্রস্তাবে সম্মতি দেন। এই পরিকল্পনা ১৯৪৫ সালের মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে জাপ সরকারের সম্মতি লাভ করে। ইতিমধ্যে বৃটিশ সৈন্য মিক্‌টিলা'র মধ্য দিয়ে অগ্রগমন করেছে এবং রেঙ্গুনের পতন ঘটেছে। যতদিন থাকা সম্ভব ততদিন পর্যন্ত নেতাজী রেঙ্গুনেই ছিলেন। ১৯৪৫ সালের ২৪শে এপ্রিল যখন শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এল তখন তিনি রেঙ্গুন ত্যাগ করলেন। তিনি পশ্চাদপসরণ করে, ১৪ই মে ব্যাঙ্কক-এ এসে পৌছলেন। পশ্চাদপসরণের অধ্যায় শুরু হয়েছিল ইম্ফল থেকে, ১৯৪৪ সালের জুন মাসে, আর

তার শেষ হ'ল ব্যাঙ্কক-এ ১৯৪৫ সালের মে মাসে। আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ইতিহাসের এখানেই শেষ। তৃতীয় অধ্যায় কিন্তু সীমিত। ১৯৪৫ সালের ১৪ই মে নেতাজীর ব্যাঙ্কক আসার সময় থেকে ১৯৪৫ সালের ১৭ই আগস্ট তাঁর সাইগণ ত্যাগ করার সময় পর্যন্ত, মাত্র তিন মাস সময় পাওয়া গিয়েছিল। পূর্ব পরিকল্পনামতে কোন কিছু কার্যকর করার আগেই নেতাজী সিঙ্গাপুরে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর সিঙ্গাপুর যাওয়ার কারণ ছিল ভারতের উদ্দেশে বেতার বক্তৃতা দেওয়া যাতে ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল-এর সর্তগুলি মেনে না নেওয়া হয়। ঐ সময়ও নেতাজী এবং তাঁর উপদেষ্টাগণ হিসাব করে নিয়েছিলেন যে জার্মানীর পতন ও জাপানের আত্মসমর্পণের মধ্যে অন্ততঃ ছ'মাসের অবসর থাকবে। আশা করা গিয়েছিল যে ঐ সময়ের মধ্যে সদর দপ্তরগুলি আরও পূর্বে কোথাও স্থানান্তরিত করা যাবে এবং রাশিয়ার সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগে আসা যাবে। কিন্তু ১৯৪৫ সালের ৯ই আগস্ট রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং জাপানের মূল ভূ-খণ্ডের ওপর আমেরিকা আণবিক বোমা ফেলে। সব হিসাব নিকাশের ওলটপালট ঘটে যায় এবং জাপান ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগস্ট আত্মসমর্পণ করে।

কমিটির রিপোর্ট পড়তে পড়তে মনটা চলে যায় আজাদ-হিন্দ্ সরকারের আন্দোলনের দিনগুলিতে। মনে হয় যদি অতীতকে স্পষ্ট করে দেখার মত দৃষ্টি পেতাম তাহলে সব ঘটনাগুলি মিলিয়ে নেওয়া যেত। ভাবতে গিয়ে মনে পড়ে নেতাজী তদন্ত কমিটির স্বীকারোক্তি। কমিটির সদস্যদের শেষ পাতাটা লিখতে বলা হয়েছে। তাঁদের নিয়োগ কর্তার নির্দেশ মেনে তাঁরা নেতাজীর জীবনের শেষ পৃষ্ঠা লিখতে তৎপর হয়েছেন। নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যুর কথা তো ইতিমধ্যেই প্রচারিত হয়েছে এবং সেই সংবাদইতো ইতিহাসের শেষ পাতা, যে ১৮ই আগস্ট তাইহোকুতে এক বিমান দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হয়েছেন। তাহলে নূতন করে আবার শেষ পাতা লেখার কি

রইল ? একথা সত্য যে জাপ সরকার নেতাজীর মৃত্যুর কথা যেভাবে প্রচার করেছেন তাতে কোন সরকারই সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। আর ফরমোসা সরকার তো এ ব্যাপারে একেবারেই নীরব। যাঁদের পক্ষে বিমান দুর্ঘটনা ও নেতাজীর মৃত্যু (?) সম্বন্ধে বিশদ সন্দেহাতীত প্রমাণ দাখিল করা সম্ভব হ'ত তাঁরা যথেষ্ট নিষ্ক্রিয় রইলেন, আর এগার বছর পর দুর্ঘটনা স্থলে পা না দিয়ে অন্য বহু জায়গায় ঘুরে ঘটনার বিশদ ইতিহাস তদন্ত কমিটি বার করতে সক্ষম হলেন, একথা ভাবতে অবাক লাগে। কিন্তু বিশ্বাস করতে হয়, কারণ তদন্ত কমিটি তাঁদের তদন্ত রিপোর্ট পেশ করেছেন। সবই বিশ্বাস করতে হ'ত যদি বিশ্বাস করার মত যথেষ্ট উপাদান থাকত। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নেতাজীর নিশ্চিত মৃত্যুর কথা মনে পড়ে। তার সাথে তাঁরই মনোনীত কমিটি যখন বললেন যে তাঁদের শেষ পাতাটা লেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তখন মনে হয় যে নেতাজী মারা গেছেন এই কথা মনে রেখে ঘটনাগুলিকে প্রয়োজনমত সাজিয়ে নিয়ে অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসার ইতিহাসকে যতদূর সম্ভব বিশদভাবে লেখার নির্দেশই বোধহয় দেওয়া হয়েছে। কমিটি যখন ধারণা করেই নিয়েছিলেন তখন তদন্ত করার প্রয়োজন কি ছিল? অবশ্য একথাও ঠিক যে সব বিষয়ই পাকাপাকিভাবে করে রাখাটা শ্রেয়। আইনের বিধান বলে কথা। কমিটি আজাদ হিন্দ্ ফৌজের জয়গাঁথা খুবই দরদী ভাষায় লিখেছেন। তাঁরা ইতিহাস তুলে ধরতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কমিটি লিখেছেন যে নেতাজী পূর্ব এশিয়ার সব জায়গা পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং জাপান গিয়েছিলেন একাধিকবার। আর তৃতীয় অনুচ্ছেদে কমিটি লিখেছেন যে নেতাজী তৃতীয় ও শেষ বারের মত জাপান গিয়েছিলেন ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে। ভারতবর্ষে থাকাকালীন নেতাজী যে বহুবার গোপনে বিভিন্ন বিদেশী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালিয়েছিলেন তা রাজশক্তির শিক্ষিত গোয়েন্দা বাহিনীও ধরতে পারেন নি। আর নেতাজী কোথায় কোথায় গেছেন এবং

কতবার গেছেন সে ইতিহাস স্বয়ং নেতাজী ছাড়া অন্য কেউ জানতে পারেন বলে বিশ্বাস করে নেওয়া যায় না। শুধু বলা যেতে পারে যে নেতাজী প্রকাশ্যে তিনবার জাপানে গিয়েছিলেন এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার সব জায়গা পরিভ্রমণ করেছেন। নেতাজী কখনই তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তৃতভাবে কোন আলোচনা করতেন না। সব দায়িত্ব নিজের ওপর নিয়েই তিনি কাজ করতেন। প্রয়োজনে যথোপযুক্ত ব্যক্তিকে তিনি যথাযথ নির্দেশ দিতেন। তাঁর পরিকল্পনার রূপ দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি টের পেতেন না। সুতরাং প্রকাশ্যে তিনি যেখানেই গিয়ে থাকুন, তিনি গোপনে কোথায় কতবার গেছেন তা খুঁজে পাওয়াটাই হবে ইতিহাসের স্বরূপ উদ্ঘাটন। আর তা উদ্ঘাটন করতে পারলেই নেতাজীর পরিকল্পনার অনেকখানি জানা হয়ে যাবে। নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে একথাও জানা যায় যে নেতাজী একক প্রচেষ্টায় রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলেছিলেন। কমিটির সদস্যগণ ঐ গোপন দিকগুলি বিচার করে দেখলে পারতেন।

রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগে আসার ব্যাপারে কমিশন কয়েকটি খবর সংগ্রহ করেছেন। ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে নেতাজী শ্রীআনন্দ মোহন সহায়কে জাপানের সঙ্গে যোগাযোগ করার নির্দেশ দেন। ঐ প্রসঙ্গে শ্রী সহায় বলেছেন যে পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ শিগিমিৎসু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ওজাওয়া সমেত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যোগাযোগ করার বিষয়ে তিনি কথা বলেন, কিন্তু তাঁরা সকলেই জানান যে রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা কোন কাজের হবে না। এই বিষয়ে দ্বিতীয় সংবাদ পরিবেশন করেছেন জেনারেল ইসোদা, যিনি জাপানের লিয়াঁসো মিশনের অধিকর্তা ছিলেন। নেতাজী চেয়েছিলেন যে রাশিয়ার সীমান্তের কাছাকাছি তিনি তাঁর দপ্তরের শাখা অফিস প্রতিষ্ঠা করবেন যাতে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা তাঁর পক্ষে সুবিধাজনক হয়। জাপ সরকার ও জাপানের ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স প্রথমে

সম্মতি দেন নি, কিন্তু জেনারেল ইসোদার দৌত্যের ফলে তাঁরা দপ্তর স্থানান্তরের স্বীকৃতি দেন। এই ঘটনা ঘটে ১৯৪৫ সালের মে মাসের মাঝামাঝি। তৃতীয় সংবাদ পরিবেশন করেছেন শ্রী দেবনাথ দাস। ১৯৪৫ সালের জুন মাসের কোন এক সময়ে জাপ সরকার নেতাজীকে এক চিঠিতে জানালেন যে তাঁর পক্ষ হয়ে সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগে এসে কোন লাভ হবে বলে তাঁরা মনে করেন না এবং তেমন করার ইচ্ছাও তাঁদের নেই। এই তিনটি সংগ্রহ থেকে একথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে জাপ সরকার নেতাজীকে সোভিয়েত দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের যে দিন দিন অবনতি ঘটছিল তাতেও কোন সন্দেহ নেই। এবং একথাও সত্য যে জাপ সরকার চুংকিং সরকারের মাধ্যমে নেতাজীর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অসম্মত ছিলেন না। তবে, তাঁরা আশা প্রকাশ করেছিলেন যে নেতাজী নিশ্চয় নিপ্পন সরকারের ইচ্ছার সঙ্গে একমত হবেন। জাপ সরকার ও জাপ ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর অনিচ্ছা সত্ত্বেও জেনারেল ইসোদা নেতাজীর হয়ে দৌত্য করে তাঁদের মত পাল্টাতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে জানা যায়। এই দৌত্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। নেতাজী যে জাপানের অবস্থা উপলব্ধি করতে পারেন নি এবং তাঁদের ইচ্ছা অনুমান করতে পারেন নি তা নয়, সুতরাং বিশ্বাস করে নেওয়ার মত যথেষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় যে নেতাজীর অবশ্যই কোন পরিকল্পনা ছিল। এবং সেই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য সবার অলক্ষ্যে যথাযথ চেষ্টা তিনি অবশ্যই করেছিলেন। গোপনে একক চেষ্টায় সব দায়ভার নিজে নিয়ে পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ করাটাই নেতাজীর ধর্ম। তাঁর কাজ তিনিই ভাল বুঝতেন। প্রয়োজনে সব চেয়ে বিপদ সঙ্কুল পথে নির্দ্বিধায় এগিয়ে যেতে যেতে তিনি থমকে দাঁড়ান নি। লক্ষ্য ছিল

তাঁর একটাই, মাতৃভূমির স্বাধীনতা চাই। আর তার জন্য যা করণীয় অবশ্যই করতে হবে।

তদন্ত কমিটির রিপোর্টের প্রথম অধ্যায়ের ৫নং অনুচ্ছেদে শ্রীএস. এ. আয়ারের লেখা 'আন টু হিম-এ উইট্‌নেস্' বই থেকে পঞ্চম অধ্যায়ের কিছু অংশ উদ্ধৃত করে তখনকার তৎপরতা ও চাঞ্চল্যের বিবরণ তুলে ধরেছেন। নেতাজী তখন মালয়ের সিরামবান-এ। ১৯৪৫ সালের ১২ই আগস্ট, ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের ডঃ লক্ষমায়া ও শ্রীগণপতি একখানি গাড়ীতে করে এসে, নেতাজীকে জাপানের আত্ম-সমর্পণের মর্মান্তিক খবর দেন। নেতাজী তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গীমায় অত্যন্ত সহজভাবে খবরটি শোনেন। শ্রীআয়ার-এর ভাষায় "প্রথম তিনি স্মিতহাসি হেসে ছিলেন, তারপর তাঁর প্রথম কথাই হল : তাহলে এই দাঁড়াল। তারপর কি?" একজন চিরন্তন সৈনিক কথা বলছিলেন। তিনি ইতিমধ্যেই পরবর্তী কর্মপন্থা ও পর পর্যায়ের লড়াইয়ের কথা ভাবছিলেন। তিনি পরাজয় স্বীকার করে নেন নেই। জাপানের আত্মসমর্পণের অর্থ ভারতের আত্মসমর্পণ নয়। "নেতাজী অনতিবিলম্বে সিঙ্গাপুর ফিরে গেলেন এবং সারা দিন রাত ধরে তাঁর অধীনস্থ অফিসার ও উপদেষ্টাগণের সঙ্গে অবিরাম আলাপ আলোচনা চালালেন। তাঁদের উপদেশ সত্বেও নেতাজী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে তিনি পিছনেই থাকবেন এবং তাঁর সেনাবাহিনীর সঙ্গে সিঙ্গাপুরে আত্মসমর্পণ করবেন। ১৪ই আগস্টের সায়াহ্নে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকারের আর একজন সদস্য শ্রীএ. এন্. সরকার তাঁদের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। শ্রীসরকার ব্যাঙ্কক থেকে হিকারি কিকান-এর অধিকর্তা জেনারেল ইসোদা ও অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকারের জাপানী মন্ত্রী মিঃ হাচিয়ার কাছ থেকে কিছু খবর নিয়ে এসেছিলেন। শ্রীসরকার নেতাজীকে জানালেন যে জেনারেল ইসোদা ও মিঃ হাচিয়া তাঁকে মালয় এবং থাইল্যাণ্ড থেকে আরও পূর্বে এমন কোন জায়গায় চলে যাওয়ার জন্য সাহায্য করতে উদ্বিগ্ন যাতে তিনি ইঙ্গ-মারকিনদের

কবলিত না হন। অবশেষে নেতাজীকে রাজী করান সম্ভব হয়েছিল। তিনি যেন সিঙ্গাপুরএ না থেকে আরও পূর্ব দিকে অন্য কোন জায়গায় চলে যান। শ্রীআয়ার-এর ভাষায় পাকাপাকি সিদ্ধান্ত—"মালয়-এর বাইরে, অবশ্যই রাশিয়ার কোন এক জায়গায়, সম্ভব হলে রাশিয়াতেই। নেতাজী তখনই কেন টোকিও যাবেন তারও অনেক কারণ ছিল। তখনকার বিশেষ বিবেচ্য বিষয় ছিল, যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ জাপ সেনাবাহিনীর অংশ হিসাবে আত্মসমর্পণ করবে না স্বতন্ত্র সেনবাহিনী হিসাবে আত্মসমর্পণ করবে। নেতাজী ও তাঁর উপদেষ্টা মণ্ডলী উদ্বিগ্ন ছিলেন এই ভেবে যে, আত্মসমর্পণ স্বতন্ত্র ভাবেই করা উচিত কারণ আজাদ হিন্দ্ ফৌজ এক স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। সিঙ্গাপুরস্থ জাপানী সেনাধ্যক্ষ কোন উত্তর দিতে পারেননি, কারণ তাঁর কাছে তখনও কোন নির্দেশ আসেনি। সম্ভবত টোকিওর কর্মকর্তারাই এই বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত জানতে পারতেন। জাপানের ডায়েট-এর (পার্লামেন্ট) সদস্য মিঃ এন্. কিটাজাওয়াকে কমিটি জেরা করেছিলেন। যুদ্ধের সময় তিনি রেঙ্গুনস্থ জাপ দূতাবাসে কাউন্সিলর ছিলেন। তিনি বিবৃতি দেন যে আত্মসমর্পণের এক সপ্তাহ আগে জাপ সরকার তাঁদের মিত্র দেশগুলির প্রধানকে এই মর্মে অবহিত করেন যে তাঁরা সকলকে জাপানে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত। সেইমতে ফিলিপাইন এর রাষ্ট্রপতি লরেল, ব্রহ্মদেশের ডঃ বা ম, নানাকিন-এর চীন সরকারের প্রধান মিঃ চেনকুনপাও জাপানে আশ্রয় নেন। মিঃ কিটাজাওয়া যতদূর জানতেন মিঃ হাচিয়ার মাধ্যমে নেতাজীকেও এই প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় না যে নেতাজী এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন কি না, কারণ সবসময়েই ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা বিন্দুমাত্র না ভেবে তিনি সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করতেন। জাপ হিকারি কিকান-এর মিঃ কুনিজুকা, যিনি এই সংগ্রামের সময়ে নেতাজীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তিনি বলেছেন যে নেতাজী জাপানে আশ্রয় নেওয়ার পক্ষে ছিলেন না কারণ জাপান

একটা ছোট দেশ এবং মিত্রশক্তির সৈন্য অচিরেই সেখানে গিয়ে পৌঁছবে। নেতাজী শুধু ভদ্রতার খাতিরেই তা গ্রহণ করেন।

এই অনুচ্ছেদে কমিটি বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির জবানী উদ্ধৃত করে নেতাজীর অন্যত্র কোথাও চলে যাওয়ার নিদর্শন দেখিয়েছেন। নেতাজীকে অন্যত্র কোথাও নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে জাপ সরকারের একজন মন্ত্রী এবং একজন মিলিটারী জেনারেলকে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল। তাঁরা নেতাজীকে মালয় থেকে দূরে অন্য কোন নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষারত ছিলেন। ঠিক ঐ সময় নেতাজীর টোকিও যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল বলে নিশ্চিত বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। অবশ্য মাত্র সৌজন্য মূলক সাক্ষাতকারের জন্য টোকিও যাওয়ার কথা হয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা নিশ্চয় কার্যকরী করার সুবিধা হয়নি, কারণ নেতাজী যেদিন ব্যাঙ্কক থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন বলে জানা যায় তার দু'দিন আগেই জাপান আত্মসমর্পণ করেছিল। নেতাজীকে সম্ভবত মিঃ হাচিয়ার মাধ্যমে জাপানে আশ্রয় নেওয়ার কথা জানানো হয়েছিল বলে মিঃ কিটাজাওয়া মন্তব্য করেন। মিঃ হাচিয়াকে কমিটি ৮ই মে টোকিওতে জেরা করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই এই মন্তব্যের সত্যতা নিরুপণ করে নেওয়া যেত। কিন্তু কমিটি তা করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। শুধু ভদ্রতা রক্ষার জন্যই নেতাজী সম্ভবত টোকিও যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন বলে কমিটি যে মন্তব্য করেছেন তা যথাযথ সমর্থন লাভ করে না। অবশ্য একটা কথা ঠিক যে ব্যাঙ্কক থেকে টোকিও'র পথে না গেলে ফরমোসায় পৌঁছানো যায় না।

প্রথম অধ্যায়ের ৬নং অনুচ্ছেদে কমিটি লিখেছেন যে ১৯৪৫ সালের ১৬ই আগস্ট নেতাজী ব্যাঙ্কক-এ আসেন। এখানে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকার-এর জাপানী মন্ত্রী মিঃ হাচিয়া তাঁর সঙ্গে দেখা করে একটি বার্তা দেন যাতে জাপান সরকারের আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছিল। ঐ বার্তায় জাপ সরকার, তাঁদের যুদ্ধে সহযোগীতা

করার জন্য নেতাজীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। জাপান সরকার-এর তরফ থেকে তাঁকে কোন রকম সাহায্য করার প্রস্তাবও ঐ-বার্তায় ছিল। মিঃ হাচিয়া বলেন যে নেতাজী তাঁকে বলেছিলেন যে জাপ সরকার নিঃসর্তে আত্মসমর্পণ করার দরুণ তাঁদের পক্ষে তাঁকে কোন রকম নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব হবে না। সেজন্য তিনি রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বেশী আগ্রহী ছিলেন। এই ব্যাপারে ব্যাঙ্কক-এর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে বেশী কিছু সাহায্য করতে পারেন নি। তাঁদের পক্ষে শুধু সম্ভব হয়েছিল নেতাজীকে সাইগন পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জাপ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল তিরাউচির সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর নির্দেশ নেওয়া। ঐ কম্যাণ্ড-এর স্টাফ অফিসার কর্নেল ইয়ানো জানতেন যে নেতাজী আসছেন এবং তিনি রাশিয়া যেতে চান। তিনি বলেছেন যে ফিল্ড মার্শাল তিরাউচি নিজে সমাধান দিতে পারেন নি। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন যে নেতাজী টোকিওতে গিয়ে জাপ সরকারের সঙ্গে এ-বিষয়ে আলাপ আলোচনা করবেন। কমিটি এখানে মন্তব্য করেছেন যে নেতাজীর টোকিও যাওয়ার অনেকগুলি কারণ ছিল, যদিও তাঁর লক্ষ্য ছিল মাঞ্চুরিয়া হয়ে রাশিয়ায় যাওয়া। হিকারি কিকানের অধিকর্তা জেনারেল ইসোদা, যাঁর সঙ্গে নেতাজী ব্যাঙ্কক-এ ফিরে এসে আলোচনা করেছিলেন তিনি কমিটিকে জানিয়েছেন যে নেতাজী "রাশিয়ায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আমার পক্ষে সম্ভব সব রকম সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আমি নেতাজীকে দিয়েছিলাম। ...পরিশেষে যে পরিকল্পনা গৃহীত হয় তা হ'ল জাপ সরকারকে তাঁদের সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে নেতাজী প্রথম টোকিওতে যাবেন...এবং তারপর যাবেন মাঞ্চুরিয়া হয়ে রাশিয়াতে।"

মিঃ হাচিয়ার মাধ্যমে জাপ সরকারের যে বার্তা নেতাজীর কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল, তাতে জাপ সরকার নেতাজীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এবং একথাও সত্য যে

নেতাজীকে সাহায্য করার জন্য একজন জাপানী জেনারেল প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয়েছিলেন যিনি রাশিয়ার বিষয়ে জাপ সরকার-এর স্বীকৃত একজন বিশারদ। যেখানে দেখা যায় যে জাপ সরকার তাঁকে সাহায্য করার জন্য একজন জেনারেল এবং একজন মন্ত্রীকে তাঁর কাছাকাছি রেখেছেন এবং তাঁর কাছে সব রকম সাহায্য করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন সেখানে জাপ সেনাবাহিনীর একজন স্টাফ অফিসার এর উক্তি খুবই খাপছাড়া বলে মনে হয়। যে সরকার আত্মসমর্পণ করে ফেলেছিলেন, সেই সরকারই তাঁকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন এবং তাঁরই একজন অফিসার আবার তাঁকে টোকিওতে গিয়ে আলোচনা করার কথা বলছেন, এমন বিচিত্র ঘটনা নেতাজীর টোকিও যাওয়ার সম্ভাবনাকে দূর করে দেয়। কমিটি জেনারেল ইসোদার বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছেন। ঐ অংশটুকুর মধ্যে কিছুটা আবার বর্জন করাও হয়েছে। অবশ্য, বর্জিত অংশটুকুতে কি বক্তব্য ছিল তা জানা সম্ভব নয়। জেনারেল ইসোদা তাঁর বক্তব্যে একথা বলেন নি যে নেতাজী টোকিও যাচ্ছিলেন। তিনি বলেছেন যে নেতাজীর টোকিও যাওয়ার পরিকল্পনা হয়েছিল। পরিকল্পিত কর্মসূচীর পরিবর্তন যে কোন সময়ই হতে পারে। সুতরাং জেনারেল ইসোদার বক্তব্য নিশ্চিত প্রমাণ দাখিল করে না যে নেতাজী টোকিওর পথে যাচ্ছিলেন। কিন্তু একথাও ঠিক যে টোকিওর পথে না গেলে ফরমোসায় পৌঁছান যায় না, তা নেতাজী তদন্ত কমিটি জানতেন। এবং ফরমোসায় যাওয়ার কোন প্রয়োজন না থাকলে বিমান দুর্ঘটনা সেখানে ঘটতে পারে এমন সম্ভাবনাও দেখা দেয় না। সাইগন থেকে মাঞ্চুরিয়ার পথে গেলে ফরমোসায় পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাই টোকিও যাত্রা প্রথমেই প্রমাণিত হওয়া দরকার।

এই অধ্যায়ের ৭নং অনুচ্ছেদে কমিটি লিখেছেন যে তখন রাশিয়ার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার বা পূর্বাহ্নেই বিশদভাবে কোন পরিকল্পনা করার সময় ছিল না। রাশিয়ার সাথে জাপানের যুদ্ধ শুরু

হয়ে গিয়েছিল এবং রুশ সৈন্য মাঞ্চুরিয়ার দিকে এগিয়ে আসছিল। নেতাজী যদি মাঞ্চুরিয়ায় পৌঁছে যেতেন তাহলে, তাঁর ও তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর যাঁদের তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, তাঁদের কি পরিণতি হ'ত তা বলা যায় না। তিনি এই আশা করতে পারতেন যে তাঁদের প্রথমেই বন্দী করা হবে। পরে ভারতবর্ষের মুক্তি যোদ্ধা হিসাবে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং তারপর তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রাশিয়ার সহযোগীতা পেতে হবে। কর্মসূচী অনিশ্চিত ছিল, কিন্তু লক্ষ্য ছিল নিশ্চিত। নেতাজী স্বয়ং তাঁর শেষ যাত্রাকে "অনিশ্চিতের পথে যাত্রা" বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি কর্নেল হবিব-উর রহমান, মেজর আবিদ হাসান, কর্নেল গুলজারা সিং এবং কর্নেল প্রিতম সিং, শ্রী দেবনাথদাস এবং শ্রী এস. এ. আয়ার কে সঙ্গী হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন কিন্তু তাঁদের বলা হয়নি তাঁর গন্তব্যস্থল কোথায়। তাঁরা শুধু ভাসা ভাসা ভাবে জানতেন যে তাঁরা মাঞ্চুরিয়ার দিকে যাচ্ছেন। চীফ অফ্ জেনারেল স্টাফ জেনারেল ভোঁসলেকে নেতাজী আজাদ হিন্দ্ ফৌজের দায়িত্ব দিয়ে যান। জেনারেল ভোঁসলে কমিটিকে বলেছেন "তাঁর যাত্রারম্ভের আগে, আমি নেতাজীর কাছে অনুসন্ধান করেছিলাম যে জাপান সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি ঠিক করতে পেরেছেন কি না শেষ পর্যন্ত তিনি কোথায় যাবেন, এবং তাঁর উত্তর ছিল যে তিনি রাশিয়া যাওয়ার আশা করছেন, তবে ঐ বিষয়ে তিনি জাপ সরকারের সঙ্গে আরও কথা বলবেন।" সায়গনে নেতাজীর সঙ্গে লেঃ জেনারেল সিডির দেখা হল। তিনি মাঞ্চুরিয়ার কুয়ানটুং সেনাবাহিনীর চীফ অফ্ স্টাফ হিসাবে যাচ্ছিলেন। জেনারেল সিডি জাপানের রাশিয়ার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অন্যতম। মিঃ নেগিশির মতে, প্রস্তাব করা হয়েছিল যে নেতাজী জেনারেল সিডির সঙ্গে মাঞ্চুরিয়া যাবেন এবং তিনি আপাতদৃষ্টিতে ঐ প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। মিঃ নেগিশি দলের সঙ্গে সাইগন পর্যন্ত

এসেছিলেন। বিমাটি টোকিও যাচ্ছিল :—সাইগন—হিতো, তাইহোকু (ফরমোসো) দাইরেন (মঞ্চুরিয়া)—টোকিও। একটু সন্দেহ থেকে গিয়েছিল যে নেতাজী একই বিমানে টোকিও যাবেন, না দাইরেন-এ যাত্রা বিরতি করবেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রচ্ছন্ন অবনতি দেখা দিয়েছিল এবং জাপ সরকারের বিস্তৃত প্রশাসন ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পড়ছিল। জাপানের আত্মসমর্পণের দু'দিন পরে, নেতাজী বিমানে অনিশ্চিত গন্তব্য স্থলের দিকে চলেছিলেন। এটা বাস্তবিক অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত। এই মরণ-ঝাঁপ দেওয়ার পর তিনি আর ফিরে অসেন নি।

এই অনুচ্ছেদ পড়ে মনে হয় কমিটি কয়েকটি বিষয়ে বেশ চিন্তা করেছেন। নেতাজী তাঁর অনুচরদের নিয়ে মাঞ্চুরিয়ায় গেলে তাঁদের পরিণতি কি হ'ত তা কমিটির ভাববার বিষয়ের মধ্যে পড়েছে। কমিটি এই মাঞ্চুরিয়ায় যাওয়ার বিষয়ে আর একটি খবর জানতে পেরেছিলেন কিনা তা বোঝা যায় না, তবে অনুমান করে নেওয়া যায় যে খবরটা তাঁরা অবশ্যই জানতেন কারণ নেতাজীর সংগ্রামের ওপর লেখা বই তাঁরা পড়েছিলেন। নেতাজী মাঞ্চুরিয়া যাওয়ার জন্য যে খুবই উদ্গ্রীব ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। রাশিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপের দিকে তিনি যে লক্ষ্য রাখছিলেন এ কথাও সত্য। মাঞ্চুরিয়ার দিকে রাশিয়ার অগ্রগতির খবর পাওয়ার পর থেকে তিনি ঐ অগ্রগমনের বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করতেন। জাপানের আত্ম-সমর্পণের পর তাঁকেই অনুসন্ধান করতে দেখা গিয়েছিল যে রাশিয়ার মাঞ্চুরিয়ায় আসতে আর কত সময় লাগবে। রাশিয়ার মাঞ্চুরিয়ার দিকে অগ্রগতির খবর সংগ্রহে নেতাজীর আগ্রহ দেখে আকাশ-কুসুম চিন্তার অবকাশ থাকে না। দুর্গম বিপদ সঙ্কুল পথ পরিক্রমণ করতে গেলে বিপদের সম্ভাবনা অবশ্যই থাকে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য যে কোন রকম সাহায্য নিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি। ভারতের মানসম্ভ্রম বজায় রেখে আত্মসম্মান বিসর্জন

না দিয়ে নেতাজী রাজশক্তির শত্রুপক্ষের সাহায্য কামনা করেছিলেন। মাতৃভূমির মুক্তি সংগ্রামে তাঁর আবেদন ছিল মর্মস্পর্শী। পরাধীন জাতির স্বাধীন মুক্ত পৃথিবীতে বেঁচে থাকার মানবিক আবেদন ছিল তাঁর কণ্ঠে।

জার্মানীতে থাকাকালীন নেতাজী একদিন হের গোয়েরিং-এর সঙ্গে দেখা করে ফিরছিলেন। পথে এক বিদেশী পরিবারের সাথে তাঁর দেখা হয়েছিল। পরিবারের গৃহিণী তাঁকে নিছক কৌতুহলবশে কিছু প্রশ্ন করতে গিয়ে জানতে পেরেছিলেন যে সুভাষচন্দ্র হের গোয়েরিং-এর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন। বিদেশীনি অবাক হয়েছিলেন যে সুভাসচন্দ্রের মত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি হের গোয়েরিং-এর মত ব্যক্তির সঙ্গে কি করে আলাপ আলোচনা করার কথা ভাবতে পারেন। সুভাষচন্দ্র সেদিন বিদেশীনির কৌতুহল নিবৃত্ত করে বলেছিলেন যে জার্মান ফ্যাসিবাদ-এর সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। ইংরাজের যাঁরা শত্রু, তাঁরা সকলেই তাঁর মিত্র। ভারতের স্বাধীনতার জন্য সহযোগীতা পাওয়ার আশায় তিনি সবার কাছেই যেতে পারেন সেখানে মতবাদের কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর স্বপ্ন, শুধু মাতৃভূমির স্বাধীনতা আদায় করে নেওয়া।*

কোথায় কি ধরণের বিপদের সম্ভাবনা ছিল, সে সম্বন্ধে নেতাজী সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং সবদিক বিবেচনা করেই তিনি রাশিয়ার আশ্রয়ে যাওয়ার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু টোকিও যাওয়ার কথা তিনি কখনও বলেন নি। নেতাজী জাপানের সঙ্গে আরও আলাপ আলোচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু টোকিও না গিয়েও আলাপ আলোচনা চালানো সম্ভব ছিল তার প্রমাণও পাওয়া যায়। জাপ সরকারের প্রতিনিধি জেনারেল ইসোদা ও মিঃ হাচিয়া নেতাজীর সঙ্গে সব সময়ের জন্য যোগাযোগে ছিলেন। তাঁদের মাধ্যমে জাপ সরকারের মনোভাব জানা অসম্ভব ছিল না। জেনারেল

* Subhas Chandra Bose, As I saw him—Mrs. Kitty Kurty.

সিডির সঙ্গে নেতাজীর সায়গন এ দেখা হওয়াটা কমিটির চোখে হঠাৎ মনে হলেও, ওটা পরিকল্পনারই অঙ্গ। জেনারেল সিডিও যাচ্ছিলেন মাঞ্চুরিয়ায়. আর নেতাজীও ওখানেই যেতে আগ্রহী ছিলেন। আন্তর্জাতিক রীতিতে কোন রাষ্ট্রের প্রধানকে স্বাগত জানাতে ও তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে সামরিক অফিসারকে থাকতে হয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ছিলেন অস্থায়ী স্বাধীন সরকারের প্রধান। ঐ সরকার জাপ সরকারের স্বীকৃতি লাভ করেছিল। সুতরাং তাঁর সঙ্গে জাপ সামরিক অফিসার থাকা স্বাভাবিক, কারণ তখন তাঁকে নিরাপদস্থানে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছিল। সাইগন পর্যন্ত নেতাজীর সহযাত্রী ছিলেন একজন জেনারেল ও একজন মন্ত্রী এবং সায়গন-এর পর থেকে তাঁর সহযাত্রী ছিলেন অন্য একজন জাপ জেনারেল। যিনি রাশিয়ার ব্যাপারে অন্যতম জাপানী বিশারদ। নেতাজীকে জেনারেল সিডির সঙ্গে মাঞ্চুরিয়া যাওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল বলে মিঃ নেগিশি কমিটিকে জানিয়েছেন। আবার এ প্রশ্নও উঠেছিল যে নেতাজী দাইরেন-এ যাত্রা বিরতি করবেন কি না। শেষ পর্যন্ত নেতাজী জেনারেল সিডির সঙ্গে একই বিমানে গিয়েছিলেন বলে কমিটি জানতে পারেন। বিমানটি কোন পথ ধরে গিয়েছিল তা কমিটি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন বলে দাবী করলেও, আসলে বিমানের যাত্রাপথ নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি। নেতাজী কোন পথে গিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া এত সহজ ব্যাপার নয়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে সুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগ করে যাওয়ার বিশদ ইতিহাস আজও প্রকাশিত হয়নি। নেতাজীর কতকগুলি ধর্ম এত বেশী স্বাতন্ত্র বজায় রেখেছে যে অন্য কোন নেতাদের রাজনীতির ধারা দেখে তা বিচার করা সম্ভব নয়। বর্তমান সময়ের এক প্রতিভাবান ঐতিহাসিক ডঃ গিরিজা কুমার মুখার্জী তাঁর 'ইউরোপ এ্যাট ওয়ার' বইয়ে লিখেছেন —Subhas's one great desire in life was to face all the consequence of his action as far as possible without

involving others. This very often hurt his colleagues, for they too wanted to share equally his disappointments but he had moulded his character in such a pattern that he wanted to feel and make others also feel that he was the strongest of them all and I believe, it is for this reason that even many of his intimate co-workers felt a bit afraid of him. He naturally towered above everyone round him and men of talent who wanted to work with him often felt that his shadow on them was too great to allow them a personal development. Besides, that he kept his innermost secrets to himself, even those who thought that they knew him well, found after-wards that it was not true. His secrets were not necessarily of a personal nature but he guarded them zealously because he held the view that the success of a political action depended largely on its initial secret being carefully preserved, but to his co-workers this seemed to be unjust although soon they got used to his way of doing things. He was never expansive when he was thinking of some new steps, for although Subhas was a fearlesss man, I believe, he was terribly afraid of failure." ডঃ মুখার্জী বার্লিনেই সুভাষচন্দ্রের একান্ত সান্নিধ্যে এসেছিলেন। তাঁর লেখা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে সুভাষচন্দ্রের জীবনে এক অদম্য বাসনা ছিল অন্য কোন ব্যক্তিকে যতদূর সম্ভব কম করে জড়িয়ে, তাঁর কার্যাবলির সবরকম পরিণতির দায়িত্ব নিজে নেওয়া। নেতাজীর এই প্রকৃতির জন্য তাঁর সহকর্মীরা স্বভাবতই মনঃক্ষুণ্ণ হতেন কারণ তাঁরা নেতাজীর নৈরাশ্যের ভাগীদার হতে চাইতেন কিন্তু নেতাজীর চারিত্রিক গঠন এমনই ছিল যে তিনি নিজে অনুভব করতেন এবং অন্যদেরও

বোঝাতে চাইতেন যে তিনি সবার চেয়ে বেশী সহৃশীল। ডঃ মুখার্জী ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করেন যে এই কারণেই তাঁর বহু ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের তাঁর সম্বন্ধে শঙ্কা ছিল। যে সব প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গ তাঁর সঙ্গে কাজ করতে চাইতেন, তাঁরা প্রায়ঃশই উপলব্ধি করতেন যে সুভাষচন্দ্রের বিরাট ব্যক্তিত্ব তাঁদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। গোপনতা রক্ষার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র তাঁর নিগূঢ় তথ্য এত গোপন রাখতে পারতেন যে, যাঁরা ভাবতেন যে তাঁরা সুভাষচন্দ্রকে খুব ভালভাবেই জানেন তাঁরা পরে টের পেয়েছিলেন যে তাঁদের ধারণা সত্য নয়। গোপনতা রক্ষার ব্যাপারে নেতাজীর বক্তব্য ছিল এই, যে কোন রাজনৈতিক ক্রিয়া কলাপের সফলতা-বিফলতা দুই-ই যথেষ্ট যত্ন সহকারে রক্ষা করা প্রাথমিক গোপন তথ্যের ওপর নির্ভরশীল। কোন নূতন পদক্ষেপের কথা চিন্তা করতে থাকলে নেতাজী কখনই তা প্রকাশ করতেন না, কারণ যদিও তিনি নির্ভীকচেতা ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু ব্যর্থতা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সজাগ। তদন্ত কমিটি নেতাজী সুভাষচন্দ্রর এই প্রকৃতির সাথে কতটুকু পরিচিত হতে পেরেছিলেন তা বর্তমান লেখকের জানা নেই। তবে যেহেতু নেতাজী স্বয়ং তাঁর যাত্রাপথকে 'অনিশ্চিতের পথে যাত্রা' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন, তাই বোঝা যায় যে তিনি তাঁর পরিকল্পনা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। নেতাজী কোন পথে কোথায় যেতে চেয়েছিলেন তা স্বয়ং নেতাজী ছাড়া আর কেউ জানতোনা। অন্যেরা যাঁরা তাঁর সহযাত্রী হয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা শুধু তাঁদের গন্তব্যস্থলটুকু সম্বন্ধেই খবর জানেন, বাকি পথের হদিস দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। বিমানটি টোকিওর পথে যে যাচ্ছিল তাঁর কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। সাইগনে আকাশে দৃষ্টির আড়ালে চলে গিয়ে ওটা আবার স্বচ্ছন্দে নীচে নেমে আসতে পারে। তবে, দুর্ঘটনা যে কোন সময় ঘটতে পারে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন না করে বা সেখানকার সরকারের কোন রিপোর্ট সংগ্রহ না

করে যথাযথ তদন্ত করা হয়েছে কিনা তা ভাববার বিষয়। মনে পড়ে ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর তারিখের লোকসভায় প্রশ্নোত্তরের কথা। ডঃ রাম সুভগ সিং প্রশ্ন করেন—আমি কি জানতে পারি যে ঐ ব্যক্তিদের (তদন্ত কমিটির সদস্যগণ) ফরমোসা যাওয়ার জন্যও অনুরোধ করা হবে কি না, যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছিল। উত্তরে শ্রীনেহেরু বলেন "—না, তাঁদের সে অনুরোধ করা হবে না। দেখতে গেলে, তাতে বহু অসুবিধা আছে। আমরা কোন একটা জায়গা সে দেশের সরকারের সহযোগিতা ছাড়া পরিদর্শন করিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ মাননীয় সদস্য বুঝতে পারবেন যে ঐ জায়গা পরিদর্শন করে বিশেষ কাজ হবে না কারণ, তথাকথিত তথ্য প্রমাণ, সাক্ষী, ইত্যাদি, যদি তাঁরা উদ্ধার পেয়ে থাকেন তবে জাপানে থাকাই সম্ভব। ওটা ছিল একটা সামরিক বিমানক্ষেত্র এবং বহুদিন আগেই সমস্ত জাপানীদের ফরমোসা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সত্যই জাপানেই আছেন যাঁদের সেখানেই পাওয়া যাবে। শুধুমাত্র বিমান বন্দর দেখলে কোন খবর বা সাহায্য পাওয়া যাবে না।" বশংবদ তদন্ত কমিটি যে সরকারী নির্দেশমতে এগিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সাক্ষীদের জেরা করে যদি তাঁরা নিশ্চিত প্রমাণ করতে পারতেন তাহলে প্রশ্ন করার কোন অবকাশ থাকত না। কিন্তু তদন্ত করে তাঁরা যা দিয়েছেন, তাতে শুধু অসংখ্য অসঙ্গতির সমাবেশ দেখা যায়, সঙ্গতির সংখ্যা খুবই নগণ্য।

৭

তদন্ত কমিটি, তাঁদের রিপোর্টের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামাকরণ করেছেন—তাইহোকুতে (ফরমোসা) বিমান দুর্ঘটনা।

কমিটি লিখেছেন যে নেতাজী তাঁর পরিকল্পনা মত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বাইরে চলে যাচ্ছিলেন। তিনি ১৯৪৫ সালের ১৬ই আগস্ট কর্নেল হবিব-উর রহমান, কর্নেল প্রীতম সিং, শ্রী এস. এ আয়ার ও জাপানী দোভাষী মিঃ নেগিশির সঙ্গে সিঙ্গাপুর ত্যাগ করেন এবং ঐ দিন অপরাহ্নে ব্যাঙ্কক-এ পৌঁছান। সর্বশ্রী থিভে, চ্যাটার্জী ও রাঘবন তাঁকে অনুসরণ করবেন বলে ব্যবস্থা করা হয়। ব্যাঙ্কক-এ নেতাজী তাঁর অন্যতম মন্ত্রীবর্গ, সামরিক উপদেষ্টাগণ ও ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সদস্যদের সঙ্গে এক বৈঠকে বসেন এবং শেষবারের মত তাঁর নির্দেশ দেন। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কম্যাণ্ড-এ রাখা হয় জেনারেল ভোঁসলেকে এবং ব্যাঙ্কক-এ লীগের কাজ দেখবার জন্য সর্দার ইসার-সিং, পণ্ডিত রঘুনাথ শর্মা ও শ্রীপরমানন্দকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। চুলালোংগকর্ণ হাসপাতাল ও বিশ্ববিদ্যালয়, ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসন, ব্যাঙ্কক এবং থাই-ভারত কাল্চার্যাল লজ-কে বহু অর্থ দান করা হয় এবং সব অফিসার ও অন্যান্যদের দু'তিন মাসের বেতন মঞ্জুর করা হয়। নেতাজী তাঁর সহযাত্রী হওয়ার জন্য সামান্য কয়েকজন অসামরিক ও সামরিক উপদেষ্টা এবং অফিসারদের নির্বাচন করেন। তাঁরা হলেন :—কর্নেল হবিব-উর রহমান, মেজর আবিদ হাসান, কর্নেল প্রীতম সিং, কর্নেল গুলজারা সিং, শ্রীদেবনাথ দাস ও শ্রী এস. এ. আয়ার। জাপ লিঁয়াসো মিশন (হিকারি কিকান)-এর অধিকর্তা জেনারেল ইসোদার সঙ্গে স্থানান্তরে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। জেনারেল ইসোদা সমস্ত দলটিকে সাইগনে

নিয়ে যাওয়ার জন্য দু'টি বিমানের বন্দোবস্ত করেন। তখন সাউদার্ন আর্মির হেড কোয়ার্টার্স ছিল সাইগনে। ঐ আর্মির কম্যাণ্ড-এ ছিলেন ফিল্ড মার্শাল তিরাউচি। তাঁর অধীনে ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্ত জাপানী ফৌজ। সাইগন-এর পরের যাত্রাপথের যানবাহনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব ছিল ঐ কম্যাণ্ড-এর সদর দপ্তরের ওপর।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে নেতাজীর সঙ্গে কে কে যাবেন তা ঠিক করেছিলেন তিনি নিজেই। আর তাঁর যাত্রাপথের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা চলছিল জেনারেল ইসোদার সঙ্গে।

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে, কমিটি লিখেছেন যে ১৯৪৫ সালের ১৭ই আগস্ট সকালে নেতাজী ও তাঁর সহযাত্রীরা ব্যাঙ্কক-এ পৌছান। (সাক্ষীরা সামান্য বিভিন্ন সময় দিয়েছেন)। বিমান বন্দরে তাঁদের বিদায় জানাতে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের বহু অফিসার ও নেতারা এসেছিলেন। হিকারি কিকানের জেনারেল ইসোদা, আজাদ হিন্দ্ সরকার জাপানী দূত মিঃ হাচিয়া এবং দোভাষী মিঃ নেগিশি নেতাজীর সহযাত্রী হয়ে সাইগন পর্যন্ত আসেন। তিন চারটে স্যুটকেসে নেতাজীর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিষপত্র ছাড়া প্রায় ২৬ ইঞ্চি লম্বা দু'টি বড় স্যুটকেসও বিমানে তোলা হয়েছিল। বড় স্যুটকেস দুটিতে সোনার গয়না ও অন্যান্য দামী জিনিষ পত্র ছিল—পরে এই সম্বন্ধে আরও জানা যাবে। সমস্ত দলটি দু'টি বিমানে যাত্রা করে এবং নির্বিঘ্নে সাইগন-এ এসে পৌছায়। সাইগন-এ পৌছানোর সময় সম্বন্ধে সাক্ষীরা যে জবানী দিয়েছেন তাতে কিছু পার্থক্য আছে। শ্রীদেবনাথ দাস বলেন যে তাঁরা সকাল ৮টায় এসে পৌছান কিন্তু কর্নেল হবিব-উর রহমান-এর মতে সাইগন-এ পৌছানোর সময় বেলা ১০ টা। শ্রী এস. এ. আয়ারও ঐ সময় উল্লেখ করেন। বিমান বন্দর থেকে সমস্ত দলটি শহরের মধ্যে যায় এবং শ্রীছোটিরমল নামে জনৈক ভারতীয় ভদ্রলোকের দু'টি

বাড়িতে আশ্রয় নেন। ব্যাঙ্কক-এ গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সাইগন-এ নেতাজীর সময়ে যে সব ভারতীয়েরা উদ্যোগী হয়েছিলেন তাঁরা কেউই সেখানে ছিলেন না। রমণীও গোঁসাই নামে এক ভারতীয় দারওয়ানকে সেখানে তথাকথিত প্রত্যক্ষদর্শীর হিসাবে পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে নেতাজী মাত্র দু'জন জাপানী অফিসার এর সঙ্গে বাংলোতে এসেছিলেন এবং মধ্যাহ্ন ভোজ শেষ করে খুব তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিলেন। এই সাক্ষীটির জবানীকে এগার বছর পরে বিস্মৃতির আখ্যা দেওয়া যায়। শ্রীনারায়ন দাস নামে একজন, যিনি তখন সাইগন-এর ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বর্তমানে তানজিয়ার-এ আছেন, তিনি জানান যে রমণীও এই কাহিনী তাঁকেও বলেছিলেন। তাঁর জবানীর বিরোধিতা করে, কমিটির কাছে আরও অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের (সাক্ষ্য) প্রমাণ আছে, যাঁরা নেতাজীর সঙ্গে সাইগন পর্যন্ত এসেছিলেন। এই সাক্ষী আরও বলেছেন যে নেতাজী আসার দু'দিন আগে সর্বশ্রী আয়ার এবং চ্যাটার্জী সাইগন এর ঐ বাংলো ছেড়ে চলে যান এবং নেতাজী এসে তাঁদের সম্বন্ধে খোঁজ নিচ্ছিলেন। কমিটি লিখেছেন যে শ্রীআয়ার আসলে নেতাজীর সঙ্গেই এসেছিলেন।

সাইগনে পৌঁছানোর সময় নিয়ে দু'ঘণ্টার ব্যবধান দেখা যায়। কর্নেল রহমান ও শ্রীআয়ার এর দেওয়া সময়ের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু শ্রীদেবনাথ দাস ভিন্ন সময় দিয়েছেন। দু'এক ঘণ্টার ব্যবধানকে এগার বছরের ইতিহাসকে ভুলে যাওয়া সম্ভব বলে এড়িয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু এগার বছর কেন কয়েক এগার বছর পার হয়ে গেলেও ঘটনা ভুলে যাওয়া সম্ভব নয় বিশেষ করে যে ঘটনার সঙ্গে নেতাজীর মত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের যোগ আছে। তবুও লিখছি যে কমিটি শ্রীআয়ার এর লেখা যে বইটি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছেন, সেই 'আন টু হিম্ এ উইটনেস্' বইয়ে শ্রীআয়ার লিখেছেন

যে—"ব্যাঙ্কক থেকে দু'টি বিমানে সকলে সাইগনে আসেন। একটিতে ছিলেন নেতাজী, কর্নেল হবিব, কর্নেল প্রীতম্ সিং, শ্রীআয়ার জাপ লিঁয়াসো অফিসার ও মিঃ নেগিশি, এবং আর একটিতে জেনারেল ইসোদা, মিঃ হাচিয়া, কর্নেল গুলজারা সিং, মেজর আবিদ হাসান এবং শ্রীদেবনাথ দাস।" দু'টি বিমান নিশ্চয়ই একসঙ্গে ব্যঙ্কক থেকে যাত্রা করেনি এবং সাইগনে এসে পৌঁছয়নি। এবং শ্রীআয়ার ও কর্নেল রহমান ছিলেন একই বিমানে আর শ্রীদাস ছিলেন অন্য বিমানে। কমিটি তদন্ত করে জানতে পারেন যে সকলে শ্রীছোটিরমল এর বাড়ীতে আশ্রয় নেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীআয়ার এর বিবৃতি কিন্তু ভিন্নরূপ। তিনি তাঁর বইয়ে লিখেছেন যে সাইগন-এর উপকণ্ঠে, ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের গৃহ নির্মাণ দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রীনারায়ণ দাস-এর বাড়ীতে সকলে আশ্রয় নেন। কমিটি শ্রীনারায়ণ দাসকে জেরা করেছেন কিন্তু শ্রীআয়ারের বক্তব্য যাচাই করে নিয়েছেন বলে মনে হয় না। শ্রীআয়ার আরও লেখেন যে সাইগন বিমান বন্দরে একজন ভারতীয়র সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়েছিল, তাঁর নাম শ্রীচন্দ্রমল। তিনি ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের পরিবহন দপ্তরের সেক্রেটারী ছিলেন। কমিটি শ্রীচন্দ্রমল সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেননি। কমিটি রমণীও গোঁসাই এর বিবৃতির মূল্য দেননি কারণ তাঁদের কাছে আরও গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর ভিন্ন জবানী ছিল। নেতাজী সাইগন থেকে বিমানে চলে যাওয়ার পরে আবার সাইগন এ ফিরে আসাটা অসম্ভব ব্যাপার বইকি। কিন্তু যাঁরা সাইগন বিমান বন্দরে নেতাজীকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন তাঁরা কি নেতাজীকে নিয়ে বিমানটি আকাশে মিলিয়ে যাওয়ার পরও বিমান বন্দরে অপেক্ষা করছিলেন? নেতাজীর যাত্রা অবশ্যই কোন পরিকল্পনা মাফিক চলছিল। যদি কিছুক্ষণ পরে সাইগন এ ফিরে আসাটা তাঁর পরিকল্পনার অংশ হয়ে থাকে এবং দু'জন জাপ অফিসার-এর সঙ্গে কোন বাংলোতে যদি তিনি গিয়ে থাকেন তাহলে রমণীও গোঁসাই এর

সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়া অসম্ভব নয়। শ্রীগোঁসাই-এর জবানীর গুরুত্ব দিলে তাইহোকুর ঘটনা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। সুতরাং ঐ বিবৃতিকে তাইহোকুর রহস্য না জেনে কোন ভাবেই স্বীকার করে নেওয়া যায় না। কিন্তু বিভিন্ন জবানী থেকে তাইহোকুর কাহিনী সত্য বলে প্রমাণিত না হলে শ্রীগোঁসাই এর বিবৃতিকেই মূলধন করে নিতে হবে। আজাদ হিন্দ্ সংগ্রামের সময় যাঁরা উদ্যোগী ছিলেন তাঁদের বেশীর ভাগ ব্যক্তিকেই সাইগনে খুঁজে পাওয়া যায় নি। কিন্তু কয়েকজন যাঁদের কমিটি খুঁজে পেয়েছিলেন বলে রিপোর্ট পড়ে অনুমান করে নেওয়া যায় তাঁদের সংখ্যা কি মাত্র ত্ব'জন ? সাইগনে কমিটি ১লা ও ৩রা মে ছিলেন বলে জানা যায়। ২রা মে তাঁরা টুরেন-এ গিয়েছিলেন। আরও একটু খোঁজ করলে সাইগন থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যেত বলে মনে হয়।

তৃতীয় অনুচ্ছেদে কমিটি লিখেছেন যে সাইগন এ আশানুরূপ সব ব্যবস্থা কার্যকরী হয় নি। নেতাজী ও অন্য সকলকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোন বিশেষ বিমান পাওয়া যায়নি। নেতাজীর সাইগন এ যাওয়ার খবর হিকারি কিকান পূর্বাহ্ণেই ফিল্ড মার্শাল তিরাউচির সদর দপ্তরকে জানিয়েছিলেন। সাউদার্ন আর্মির স্টাফ অফিসার কর্নেল ইয়ানো বলেছেন যে ফিল্ড মার্শাল তিরাউচি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে নেতাজীর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টোকিওতে পৌছানো উচিত কিন্তু বিমানে স্থান সঙ্কুলান করতে অসুবিধা হওয়ার দরুণ তিনি ঠিক করেছিলেন নেতাজী একাই যাবেন। তখন সাইগন থেকে একটু দূরে দালাত এ সাউদার্ন আর্মির সদর-দপ্তর ছিল এবং সদর দপ্তরের নির্দেশমত কাজ করবার জন্য সাইগন এ অফিসাররা থাকতেন। বিমানে পরিবহনের ব্যবস্থা করতেন কর্নেল কোজিমা। কিন্তু নেতাজীর দলের সঙ্গে দেখা করেছিলেন সাউদার্ন আর্মির সদর দপ্তরের একজন স্টাফ অফিসার লেঃ কর্নেল টাডা, যিনি হিকারি কিকানের বিষয় দেখতেন। লেঃ কর্নেল টাডা জেনারেল ইসোদাকে জানিয়েছিলেন

যে সাইগন থেকে ঐ দিনই কিছুক্ষণের মধ্যে একটি বিমান ছাড়বে এবং নেতাজীর জন্য তাতে একটি মাত্র আসনই পাওয়া যাবে। ঐ খবর শুনে জেনারেল ইসোদা স্বভাবতঃই বিব্রত বোধ করেছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়েছিলেন দালাত পর্যন্ত, ফিল্ড মার্শাল তিরাউচির সঙ্গে কথা বলার জন্য। দালাত বিমান বন্দরে পৌঁছানোর পর, কর্নেল ইয়ানো জেনারেল ইসোদাকে জানান যে ফিল্ড মার্শাল এর সঙ্গে দেখা করে কোন লাভ নেই, তবে তিনি তাঁকে কিছুক্ষণ বিমান বন্দরে অপেক্ষা করার উপদেশ দিয়েছিলেন। কমিটি মন্তব্য করেছেন যে তিনদিন আগে জাপান আত্মসমর্পণ করার পর সদর দপ্তর বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল। কিছুক্ষণ পরে সাউদার্ন আর্মির চীফ অফ স্টাফ, জেনারেল নুমাতা জেনারেল ইসোদার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করেন এবং বলেন যে তিনি বিষয়টি ফিল্ড মার্শাল এর নজরে এনেছেন এবং খুব শীঘ্রই একটা বিমানে নেতাজীর আসন ছাড়া আরও দু'তিনটি আসনের ব্যবস্থা হবে। এই আশ্বাস পেয়ে জেনারেল ইসোদা সাইগনে ফিরে এলেন। কিন্তু ওখানে আবার লেঃ কর্নেল টাডার সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল। তিনি তাঁকে সেই নৈরাশ্যকর খবর দিলেন যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে নেতাজীর আসন ছাড়া আর মাত্র একটা আসন পাওয়া যাবে। প্রথম যখন মাত্র একটি আসনের প্রস্তাব করা হ'ল, নেতাজী তৎক্ষণাৎ তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি চাইলেন যে তাঁর দলের সব অফিসার ও উপদেষ্টারা তাঁর সঙ্গে যাবেন। এই বিষয়ে একদিকে নেতাজী ও তাঁর উপদেষ্টাগণের মধ্যে এবং অপরদিকে নেতাজী ও জাপানী অফিসারদের মধ্যে বহু আলাপ আলোচনা হ'ল। তাঁর উপদেষ্টাগণ ভেবে বললেন যে নেতাজীর একেবারে একা যাওয়া ঠিক হবে না। আজাদ্ হিন্দ্ সরকারের উপদেষ্টা শ্রীদেবনাথ দাস বলেন যে জাপানী অফিসাররা মত দেন যে মিত্র ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীর তৎপরতার দরুণ সাইগন কোন ভাবেই নিরাপদ স্থান নয়। সেই জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নেতাজীর সাইগন থেকে চলে যাওয়া উচিত।

যখন দ্বিতীয়বার দু'টো আসনের প্রস্তাব এলো তখন আবার আলাপ আলোচনা হ'ল। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কর্নেল প্রীতিম্ সিং বলেছেন যে এই আলোচনা চলার সময় জাপানীরা জানান যে আত্মসমর্পণের পর মিত্রশক্তি তাঁদের বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে সেইজন্য তাঁরা নিশ্চিত হতে পারছেন না যে ভবিষ্যতে বিমান পাওয়া যাবে কি না, তাই তাঁরা নেতাজীকে প্রস্তাবিত দু'টি আসন গ্রহণ করতে বলেন। পরিশেষে নেতাজী অনিচ্ছা সত্বেও দু'টি আসন গ্রহণ করেন, কিন্তু একটি সর্তে, তা হ'ল যাঁরা থেকে যাবেন তাঁদের জন্য পরদিনই পরিবহনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। জেনারেল ইসোদা তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

সাইগন এর আলাপ আলোচনা সম্বন্ধে শ্রী এস. এ. আয়ার যা লিখেছেন তা উদ্ধৃত না করলে সত্যাসত্য নিরূপণ করা সম্ভব নয়। শ্রী আয়ার লিখেছেন যে—"নেতাজী ও জাপ অফিসারদের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি একটু আলোচনা হ'ল এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে জেনারেল ইসোদা, মিঃ হাচিয়া এবং একজন প্রবীন জাপানী স্টাফ অফিসার বিমানে অবিলম্বে ফিল্ড মার্শাল তিরাউচির সদর দপ্তর দালাত এ যাবেন এবং ফিল্ড মার্শালকে জিজ্ঞাসা করবেন যে নেতাজী যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেই পরিকল্পনামতে কাজ করার জন্য তিনি নেতাজীকে কি ধরণের বিমানের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।"* জাপ অফিসাররা বিমানের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হলেন। ইতিমধ্যে নেতাজী শ্রীনারায়ণ দাস এর বাড়ীতে এসে উঠেছেন। শ্রীআয়ার আরও লিখেছেন যে—"নেতাজী মাত্র আধ ঘণ্টার মত বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এমন সময় জাপ লিঁয়াসো অফিসার এসে জানালেন যে একখানি বিমান অবিলম্বে ছাড়ার জন্য তৈরী আছে এবং তাতে একখানা মাত্র আসন আছে। নেতাজী জানতে চাইলেন যে বিমাটি কোথায় যাবে। কিন্তু মিঃ কিয়ানো সেই সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন না। তখন

* Unto Him A. Witness—S. A. Ayer P. 66.

নেতাজী বলেন যে ওঁকে (মিঃ কিয়ানো) ফিরে যেতে বল এবং যিনি ঠিক সংবাদ জানেন তাঁকে পাঠাতে বল। মিঃ হাচিয়া ও জেনারেল ইসোদা দালাত থেকে ফিরেছেন কিনা নেতাজী তাও জানতে চাইলেন। জাপ অফিসার কিন্তু জানালেন যে একটুও সময় নষ্ট করা যাবে না। তখন নেতাজী বললেন, "তাঁকে বলে দাও যে বিমানের গন্তব্যস্থল না জানা পর্যন্ত আমি যাব না। ওঁকে ফিরে যেতে বল এবং বিমান সম্বন্ধে সব জানে এমন কাউকে পাঠাতে বল।" শ্রীআয়ার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন যে বেচারা কিয়ানো যে গতিতে এসেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশী দ্রুত বেগে ফিরে গিয়েছিলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে আর একখানি গাড়ি এ'ল। সেই গাড়ী থেকে নেমে এলেন জেনারেল ইসোদা, মিঃ হাচিয়া ও ফিল্ড মার্শাল তিরাউচির একজন প্রবীন স্টাফ অফিসার। নেতাজীর সঙ্গে ওঁদের গোপন বৈঠক হ'ল। ঐ বৈঠকে উপস্থিত রইলেন আর একজন, তাঁর নাম কর্নেল হবিব-উর রহমান। কিছুক্ষণ পরে নেতাজী ঘরের বাইরে এলেন। কর্নেল রহমানও নেতাজীর সঙ্গে এলেন। অন্যেরা ঘরের মধ্যে রইলেন। আজাদ হিন্দ্ সরকারের সকলকে ডাকা হ'ল। সবাই ঘরে এসে ঢুকলে ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। নেতাজী সবার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন যে কয়েক মিনিটের মধ্যেই একখানি বিমান যাত্রা করবে এবং একটি বিশেষ জরুরী সিদ্ধান্ত এই মুহূর্তে নিতে হবে। জাপানীরা জানাচ্ছেন যে বিমানে একটি মাত্র আসন খালি আছে এবং এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তাঁকে (নেতাজীকে) একা যেতে হলেও তিনি যাবেন কি না। তিনি আর একখানি আসন পাওয়ার জন্য বহু চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তা পাওয়ার আশা খুবই কম। সবাই চিন্তিত হলেন। কিন্তু হাতে সময় বড় কম। নেতাজী আবার সকলকে প্রশ্ন করলেন। সকলে সিদ্ধান্ত নিলেন যে নেতাজী জাপানীদের কাছে আর একখানি আসনের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাবেন। যদি পাওয়া সম্ভব না হয় তবে নেতাজী

একাই যাবেন। নেতাজী যেখানে যাচ্ছেন সেখানে বাকি সবাইকে সত্বর পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য জাপানীদের বলতে নেতাজীকে অনুরোধ করা হ'ল। নেতাজী কোথায় যাচ্ছিলেন এই প্রসঙ্গে শ্রী আয়ার লিখেছেন যে—"আমরা জানতাম বিমানটি কোথায় যাবে এবং তিনিও জানতেন যে আমরা জানি বিমানটি মাঞ্চুরিয়ায় যাচ্ছিল।"* যাহোক, সকলে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর নেতাজী ও কর্নেল রহমান আবার সেই ঘরে ফিরে গেলেন। তদন্ত কমিটি সাইগন প্রান্তের যে কাহিনীর কথা লিখেছেন তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী শ্রী আয়ার এর বিবরণের পার্থক্য আছে। ফিল্ড মার্শাল তিরাউচির সদর দপ্তর দালাত এ গিয়েছিলেন জেনারেল ইসোদা, মিঃ হাচিয়া ও একজন সিনিয়র স্টাফ অফিসার। সেখান থেকে ওঁরা ফিরে এসে নেতাজীর সঙ্গে এক গোপন বৈঠকে বসেছিলেন। সেই বৈঠকের সাক্ষী ছিলেন মাত্র একজন, তাঁর নাম কর্নেল রহমান। কর্নেল রহমানের এই সম্পর্কে কোন বিবৃতি নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না। আলাপ আলোচনার সাক্ষী হিসাবে তাঁর বিবৃতি উদ্ধৃত করলেই যথেষ্ট হ'ত, কিন্তু তা করা হয় নি। মিঃ হাচিয়ার কোন বিবৃতিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় নি। জেনারেল ইসোদা দালাত এ গিয়েছিলেন ফিল্ড মার্শাল তিরাউচির সঙ্গে যোগাযোগ করে বিমানের বন্দোবস্ত করার জন্য, কিন্তু দালাত বিমান বন্দরে কর্নেল ইয়ানোর উপদেশমত তিনি ফিল্ড মার্শাল এর সঙ্গে দেখা না করেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি অপেক্ষারত থাকাকালীনই জেনারেল নুমাতার টেলিফোন এলো। আশ্বস্ত হয়ে সাইগনে ফিরে আসা মাত্র লেঃ কর্নেল টাডা তাঁকে আবার নিরাশ করলেন। কোন নাটকের গতি যদি এমন হ'ত তাহলে সমবেত দর্শক রুদ্ধশ্বাসে রঙ্গমঞ্চের দিকে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে

---

* But we knew and he knew that we knew. The Plane was bound for Manchuria—S. A. Ayer. Unto Him A witness, P.—69.

পারতেন, কিন্তু বাস্তব জগতে এমন ঘটনা বিরল। অবশ্য সাইগন প্রান্তে তেমন একটি বিরল ঘটনা ঘটেছিল বলে ধরে নিতে হবে। শ্রীআয়ার এর লেখায় জাপ লিঁয়াসো অফিসার মিঃ কিয়ানোর নাম পাওয়া যায়, কিন্তু কমিটির রিপোর্টে সেই নামের কোন উল্লেখ নেই। আর একটী বিষয় বিশেষ অবাক করে। তাহ'ল, জেনারেল ইসোদা, কথা বলেছিলেন লেঃ কর্নেল টাডার সঙ্গে! কিন্তু যিনি পরিবহনের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য তখন পর্য্যন্ত দায়ী ছিলেন সেই কর্ণেল কোজিমার সঙ্গে তাঁর কোন কথা হয় নি। জাপ সরকার নেতাজীর কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাঁকে সর্বতোভাবে প্রয়োজনীয় সাহায্য তাঁরা দেবেন, কিন্তু কমিটি যে তথ্য পেশ করেছেন তা সত্য হলে জাপান তাঁর কথা রাখে নি বলে ধরে নিতে হবে। অবশ্য কমিশন বলেছেন যে আত্ম-সমর্পণের পর জাপ সরকারের প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল। এই মন্তব্যের সত্যতা সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে, কারণ আত্ম-সমর্পণের পর জাপানে বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল এই অজুহাতে বহু ঘটনাকে রেহাই দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদে কমিশন লিখেছেন যে নেতাজী তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্য কর্নেল রহমানকে নির্বাচন করেন। দলের অন্য সকলে তাঁর এই সিদ্ধান্ত মেনে নেন, কারণ তিনি (কর্নেল রহমান) একজন সিনিয়র স্টাফ অফিসার এবং দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলেন। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কর্নেল প্রীতম সিং এবং কর্নেল গুলজারাসিংও অনুরূপ ঘটনা বলেন। বিমানে আরও বেশী আসন পাওয়ার আশা তখনও নেতাজী ছাড়তে পারেন নি। তিনি দলের সকলকে তাঁদের জিনিস পত্র গুছিয়ে নিয়ে বিমান বন্দরে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু সাইগন বিমান বন্দরে পৌঁছে সকলেই নিরাশ হয়েছিলেন। দু'টির বেশী আসন ছিল না। নেতাজীর মালপত্র তাঁর গাড়ী থেকে নামানো হয়। চীফ পাইলট বলেন যে মালপত্রগুলি খুবই ভারী ছিল এবং বিমানে তোলা যাচ্ছিল না কারণ

বিমানটি ইতিপূর্বেই বেশী মালপত্রে ভর্তি ছিল। সেজন্য নেতাজী নিজেই তাঁর মালপত্রের মধ্য থেকে বই ও জামা কাপড় ইত্যাদি বাদ দিয়ে দেন। সমস্ত দলটি দু'টি গাড়ীতে বিমান বন্দরে আসেন। নেতাজী প্রথম গাড়ীতে আসেন। এই সব ব্যবস্থা যখন করা হচ্ছিল, তখন বিমানটি বিমান বন্দরে অপেক্ষা করছিল। ঐ বিমানে যাওয়ার জন্য বহু জাপানী অফিসারও ওখানে ছিলেন। জাপানীরা যাত্রা শুরু করার জন্য অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু দ্বিতীয় গাড়ীটি এসে পৌছাতে দেরী হওয়ায় বিমান ছাড়তে প্রায় আধ ঘণ্টার মত দেরী হয়েছিল। এই গাড়ীতে গহনাপত্র ভর্তি দু'টি স্যুটকেস ছিল, এবং নেতাজী ওগুলি ছেড়ে যেতে অস্বীকার করেন। বিমানটি ইতিমধ্যেই ভর্তি হয়ে গিয়েছিল এবং আরও মাল তোলার ব্যাপারে প্রতিবাদ জানানো হয়। তা সত্বেও ভারি অলঙ্কার পত্রের বাক্সগুলি বিমানে তোলা হয়। বিমানের যাত্রীদের মধ্যে যে বিশিষ্ট মিলিটারী অফিসার ছিলেন তাঁর নাম লেঃ জেনারেল সিডি। তিনি বর্মা আর্মির চীফ অফ জেনারেল স্টাফ ছিলেন এবং কুয়ানটুং আর্মির চীফ অফ স্টাফ হিসাবে মাঞ্চুরিয়ায় যাচ্ছিলেন। জেনারেল সিডি নেতাজীকে অভ্যর্থনা জানাতে বিমানের বাইরে আসেন। জেনারেল সিডির সঙ্গে একই বিমানে যাওয়াটা যদিও হঠাৎ যোগাযোগের ব্যাপার কিন্তু মনে হয় যে নেতাজী জেনারেল সিডির সঙ্গে দাইরেন (মাঞ্চুরিয়া) পর্যন্ত যেতে চেয়ে ছিলেন। ঐ সময়ে নেতাজীর সদর দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত একজন দোভাষী মিঃ নেগিশি বলেন "জেনারেল সিডি'কে জাপ সেনা-বাহিনীতে রাশিয়ার ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ বলে গণ্য করা হ'ত এবং রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করার বিষয়ে তাকেই সুযোগ্য ব্যক্তি বলে সাব্যস্ত করা হয়েছিল। প্রস্তাব করা হয়েছিল যে নেতাজী তাঁর সঙ্গে মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত যাবেন।" এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে দোভাষীর কাজে যোগ দেওয়ার আগে তিনি মিৎসুবিশি নামে এক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন এবং বর্তমানে ঐ প্রতিষ্ঠানের

ভারতীয় শাখার সর্বময় কর্তা। জাপ বিমান বাহিনীর একজন লেঃ কর্নেল নোনোগাকি বলেন, "জেনারেল সিডিকে ঐ বিমানে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। নেতাজী তাঁর সঙ্গে মাঞ্চুরিয়ার দাইরেন পর্যন্ত যেতে রাজী হয়েছিলেন। সুতরাং বিমানটির নির্দিষ্ট যাত্রাপথের কোন পরিবর্তন হয় নি।" বিমানটি দুই ইঞ্জিন যুক্ত স্যালি ৯৭.২ ধরনের বোমারু বিমান এবং ঐটি সিঙ্গাপুরস্থ থার্ড এয়ার ফোর্স আর্মির অধীন ছিল। বিমানটি নূতন না পুরাতন বিমান ছিল সেই সম্বন্ধে মত বিরোধ আছে। ক্যাপ্টেন আরাই ও মেজর কোনোর মতে বিমানটি ছিল সর্বাধুনিক। জেনারেল ইসোদা বলেন যে বিমানটি আনকোরা নূতন বিমান ছিল। কিন্তু লেঃ কর্নেল নোনোগাকি বলেন যে বিমানটি ছিল পুরাতন বিমান। জেনারেল ইসায়ামা বলেন যে বিমানের ইঞ্জিনটি ঝরঝরে ছিল। গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতো বলেছেন যে তাইহোকুতে বিমানটি পরীক্ষা করার সময় চীফ পাইলট মেজর টাকিজাওয়া তাঁকে বলেছিলেন যে বিমানের পোর্ট ইঞ্জিনটি সাইগন এ বদল করে একটি আনকোড়া নূতন ইঞ্জিন বসানো হয়েছিল। একখানি আনকোড়া নূতন বিমানে ইঞ্জিন বদল করার প্রয়োজন হয় না। এখানেও দেখা যায় অনেক অসঙ্গতি।

শ্রীআয়ার এর লেখা থেকে জানা গেছে যে নেতাজী ও জাপ প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাইগনে যে বৈঠক হয়েছিল তাতে কর্নেল রহমান সব সময়ই উপস্থিত ছিলেন। শেষ বারের মত জাপ অফিসারদের সঙ্গে আলাপ করে বাইরে এসে নেতাজী বলেন, "আমরা আর একখানি আসন পাচ্ছি। হবিব আমার সঙ্গে চলুক। আমি ঠিক জানি যে ঐ বিমানে তাঁরা আর কোন আসন দেবেন না। কিন্তু আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করা যাক।" কর্নেল গুলজারা সিং ও শ্রীআয়ারকে নেতাজী তাঁর সঙ্গে মালপত্র নিয়ে যেতে বললেন, যদি বিমানে আরও দু'টি আসনের ব্যবস্থা করা যায় তবে ওঁরাও সঙ্গে যাবেন। বিমান

বন্দরে এসে শ্রীআয়ার দেখলেন যে জেনারেল সিডি ওখানে অপেক্ষা করছেন। তিনি প্রায় দু'ঘণ্টা আগে থেকেই ওখানে ছিলেন। তিনি নাকি ঐ বিমানেই যাচ্ছিলেন। শ্রীআয়ার লিখেছেন যে, যে বিমানটিতে নেতাজী যাবেন বলে ঠিক ছিল সেই বিমানটির ইঞ্জিন প্রায় এক ঘণ্টা আগে থেকেই চালু করা হয়েছিল। বিমান বন্দরে পৌঁছেও তাঁরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন কারণ দ্বিতীয় গাড়িটি তখনও এসে পৌঁছায় নি। তাতে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ছিল। দ্বিতীয় গাড়ী পৌঁছানোর পর নেতাজীর মালপত্র বিমানে তোলা হ'ল। তারপর নেতাজী লেঃ জেনারেল সিডির সঙ্গে করমর্দন করলেন। জেনারেল ইসোদা ও মিঃ হাচিয়াকে বিদায় জানালেন এবং তারপর তাঁর সদস্যদের দিকে ফিরে বললেন—"জয়হিন্দ্, আমি পরে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা করব।" শ্রীআয়ার আরও লিখেছেন যে বিমানবন্দরে বহু মাল-বাহী ও বোমারু বিমান রাখা ছিল। নেতাজী বিমানে ওঠেন এবং কর্নেল রহমান তাঁকে অনুসরণ করেন। কমিটি রিপোর্টে জানা যায় যে নেতাজী সবাইকেই মালপত্র নিয়ে বিমান বন্দরে ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য যেতে বলেছিলেন। কিন্তু শ্রীআয়ার লিখেছেন যে, মাত্র তাঁকে ও কর্নেল গুলজারা সিংকে নেতাজী মালপত্র নিয়ে বিমান বন্দরে যেতে বলেছিলেন। মালপত্র বিমানে তোলার ব্যাপারে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট মতে চীফ পাইলট আপত্তি জানিয়েছিলেন এবং নেতাজী তাঁর বইপত্র ও জামা কাপড় বার করে দেন বলে প্রকাশ পায়। কিন্তু শ্রীআয়ার এর লেখা থেকে মালপত্র সম্বন্ধে কোন আপত্তি হয়েছিল বলে জানা যায় না। গাড়ীতে বোঝাই করা নেতাজী ও কর্নেল রহমান-এর মালপত্র সরাসরি বিমানে তোলা হয়। যে বিমানে নেতাজী সায়গন ত্যাগ করেছিলেন বলে প্রচার করা হয়েছে সেই বিমানটি সম্বন্ধে জাপ অফিসারদের বিচিত্র বক্তব্য জেনে অবাক হতে হয়। একজন ক্যাপ্টেন ও একজন মেজর বলেছেন যে বিমানটি সর্বাধুনিক বিমান। একজন জেনারেল বলেছেন যে বিমানটি আনকোড়া নূতন

বিমান। আর অন্য একজন জেনারেল বলেছেন যে বিমানটির ইঞ্জিন পুরাণো ঝর্‌ঝরে ছিল এবং একজন গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ার বলেছেন যে তাইহোকুতে ইঞ্জিন পরীক্ষা করার সময় চীফ পাইলট তাঁকে বলেছিলেন যে সাইগন এ বিমানটিতে নূতন ইঞ্জিন লাগানো হয়েছিল। নিশ্চয় একাধিক বিমানে নেতাজী সাইগন ত্যাগ করেন নি। যে বিমানে নেতাজী সাইগন ত্যাগ করেছিলেন বলে প্রচার করা হয়েছে সেই বিমানের ইঞ্জিন সম্বন্ধে এত পরস্পর বিরোধী উক্তি কেন শোনা যায়? তদন্ত কমিটি বিমানটিতে ইঞ্জিন বদল করা হয়েছিল বলে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সূত্র কি তা বোঝা যায় না। তবে একথা ঠিক যে ইঞ্জিনে গোলযোগ দেখা না দিলে বিমান ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না, আর নূতন ইঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা কম। শ্রীআয়ার এর লেখা থেকে জানা যায় যে জেনারেল সিডি প্রায় দু'ঘণ্টা বিমান বন্দরে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি আরও লিখেছেন এক ঘণ্টা ধরে বিমানের ইঞ্জিনটি চলছিল। জেনারেল সিডি ঐ বিমানেই মাঞ্চুরিয়া যাচ্ছিলেন বলে জানা যায়। একটি বিমানের ইঞ্জিন বদল করতে কত সময় লাগে তা নিশ্চয় বিমান বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জেনে বলতে হবে না। ঐ বিমানেই যদি জেনারেল সিডি সাইগন এসে থাকেন তাহলে ইঞ্জিন বদল করার মত কয়েক দিনের সময় তিনি পাননি। সাইগনে যে ইঞ্জিন বদল করা হয়েছিল তা অবশ্য কোন ব্যক্তির জবানী থেকে জানা যায় না। কিন্তু এর চেয়ে বড় সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় অন্যদের জবানী থেকে। তাহ'ল, নেতাজী সাইগন এ আসার পর তাঁর যাত্রার ব্যবস্থা করার জন্য ফিল্ড মার্শল এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। জাপ সামরিক অফিসার ও রাষ্ট্রদূত নেতাজীর সঙ্গে যাত্রার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁদের আলোচনায় যোগ দেন কর্নেল রহমান। নেতাজী প্রথমে সকলকে জানান যে একখানি মাত্র আসন পাওয়া সম্ভব। পরে তিনি তাঁর আলোচনা শেষ করে এসে জানান যে আর একখানি আসন পাওয়া যাচ্ছে এবং ঐ আসনের

যাত্রী হবেন কর্নেল রহমান। পরিকল্পনা মতে কাজ ঠিক চলল। বিমান বন্দরে এসে নেতাজীর সাইগন পর্যন্ত সহযাত্রী জেনারেল ইসোদা ও মিঃ হাচিয়া বিদায় নিলেন এবং তাঁদের পরিবর্তে সহযাত্রী হলেন জেনারেল সিডি। যিনি জাপ সেনাবাহিনীর রাশিয়ার বিষয়ে বিশারদ বলে স্বীকৃত। সবকিছু পরিকল্পিত পথেই করা হচ্ছিল এবং নেতাজী সব জেনেও চুপ করে ছিলেন। কোথায় তিনি যাবেন তা তিনি বলেন নি কারণ ওটা গোপন ব্যাপার। তবে তাঁর যাত্রা ছিল অনিশ্চিত কারণ কোন্ পরিস্থিতিতে কি করতে হতে পারে, তাঁর নিশ্চিয়তা ছিল না। সাইগন থেকে পরিকল্পিত পথে সব কাজ হয়েছিল বলেই সাইগন এর ঐ কল্পিত বিমানটিকে নিয়ে শুরু হয়েছে বিচিত্র কাহিনী। জাপ সরকার তাঁর স্বীকৃত আজাদ হিন্দ্ সরকার-এর সর্বাধিনায়ক হিজ্ এক্সেলেন্সি চন্দ্র বোসকে রাষ্ট্রাধিনায়কের পূর্ণ মর্যাদায় যথাযথ স্থানে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাই রাষ্ট্রাধিনায়কের প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা দেখিয়ে ব্যাঙ্কক থেকে সাইগন পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে পাঠিয়ে ছিলেন একজন মন্ত্রী ও একজন জেনারেলকে এবং সাইগন থেকে তাঁর সহযাত্রী হয়েছিলেন একজন জেনারেল ও কয়েকজন পদস্থ অফিসার। যাহোক, বিমানটি কেমন ছিল তা সাক্ষীরা প্রমাণ করতে পারেন নি।

এই অধ্যায়ের পঞ্চম অনুচ্ছেদে কমিশন লিখেছেন যে জেনারেল সিডি ছাড়া ঐ বিমানে আরও পাঁচজন জাপানী অফিসার যাত্রী হয়ে যচ্ছিলেন। তাঁরা হলেন লেঃ কর্নেল টি. সাকাই, বর্মা আর্মির স্টাফ অফিসার লেঃ কঃ এস. নোনোগাকি, এয়ার স্টাফ অফিসার মেজর আই. টাকাহাসি, স্টাফ অফিসার এবং ক্যাঃ কে. আরাই, এয়ার ফোর্স ইঞ্জিনীয়ার। লেঃ কর্নেল সাকাই ১৯৫৬ সালের শেষের দিকে এক জরুরী মিশনে ফরমোসায় ছিলেন। অন্যেরা সিভিলিয়ান হয়েছেন। লেঃ কর্নেল নোনাগাকি ১৯৫৬ সালে টোকিওর একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিগিও বাওকি শোকাই লিমিটেড এর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হয়ে ওসাকায় ছিলেন। টোকিওতে মেজর কোনোর ছাপাখানার ব্যবসায় আছে।

মেজর টাকাহাসি কানাগাওয়া শহরে বসবাস করছেন। ক্যাপ্টেন আরাই টোকিও ও কিও বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার। বৈমানিক ছিলেন পাঁচ বা ছ'জন : চীফ পাইলট, মেজর টাকিজাওয়া, কো-পাইলট উইং অফিসার আয়োগি, নেভিগেটর, সার্জেন্ট ওকিশ্‌তা, রেডিও অপারেটর এন. সি. ও. টোমিনাগা এবং আরও দু-একজন ইঞ্জিনীয়ার যাঁদের নাম প্রকাশ পায়নি। নেতাজী ও তাঁর সহকারী কর্নেল হবিব-উর রহমান সহ ঐ বিমানে তের বা চোদ্দজন যাত্রী ছিলেন। নেতাজীর পরনে ছিল খাঁকি বুশসার্ট, ট্রাউজার এবং সু আর আই. এন্. এ. ক্যাপ ও ব্যাজ। যাঁরা বিমান বন্দরে এসেছিলেন, তিনি তাঁদের সাথে করমর্দন করে বিদায় নিয়ে বলেন যে তাঁরা অচিরেই তাঁর সাথে মিলিত হবেন। তারপর তিনি বিমানে ওঠেন এবং কর্নেল রহমান তাঁর অনুগমন করেন। শেষবারের মত তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীরা, যাঁদের তিনি সাইগনে রেখে গেলেন, তাঁরা তাঁকে দেখলেন।

যে বিমানে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র ও তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত অনুচর কর্নেল হবিব-উর রহমান সাইগন ত্যাগ করেছিলেন বলে প্রচার করা হয় ঐ বিমানটি জাপ সেনাবাহিনীর বোমারু বিমান এবং ঐ বিমানে আজাদ হিন্দ্ সকারের সর্বাধিনায়ক ও তাঁর বিশ্বস্ত সহকারী ছাড়া আরও অন্ততঃ এগারজন জাপানী সামরিক অফিসার ছিলেন বলে প্রকাশ এবং তাঁদের মধ্যে জেনারেল সিডি অন্যতম। একটি সামরিক বিমান এতজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে আকাশে উড়ল অথচ সামরিক বিভাগের তরফ থেকে বিমান যাত্রীদের কোন তালিকা রাখা হ'ল না। জাপ সরকারের প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল বলে ধরে নিলেও সুশৃঙ্খল সামরিক দপ্তরেও কি নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলার প্রয়োজন ছিল না? যাত্রী তালিকা না থাকার দরুণ কিভাবে প্রমাণ হয় যে যাঁদের নাম করা হয়েছে তাঁরা সত্যই ঐ বিমানের যাত্রী ছিলেন। একে অন্যের নাম বললেই তাঁকে বিমানের সহযাত্রী বলে স্বীকার করে নেওয়া যায় না। যাত্রী তালিকা না রাখাটা জাপ

সামরিক দপ্তরের কাজের ওপর কটাক্ষপাত করে। কিন্তু আত্মসমর্পণের পর জাপানের প্রশাসনে সত্যই এত বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়নি। যে বিমান কিছুক্ষণের মধ্যে হয়ত নীচে নেমে আসবে বা দালাতে গিয়ে নামবে তার যাত্রী তালিকা রাখার প্রয়োজন নিশ্চয় খুব বেশী নেই, কারণ ওটা নির্দ্ধারিত বিমান যাত্রা নয়। যাহোক নেতাজী তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিমানে ওঠার আগে যে কথা বলেছিলেন বলে কমিশন জানিয়েছেন, শ্রীআয়ার কিন্তু সে কথা বলেন নি। শ্রীআয়ার নেতাজীকে বিদায় জানাতে সাইগন বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর মত নির্ভরযোগ্য প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষায়—He said : "Well, Jai Hind, I will meet you later"। আমি পরে আপনাদের সঙ্গে দেখা করব, আর আপনারা অচিরেই আমার সঙ্গে মিলিত হবেন, এই দুই বক্তব্যের অর্থ ভিন্ন। নেতাজী যে পরিকল্পনা করেছিলেন তাতে সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা যে ছিল না তা তিনি জানতেন। প্রয়োজনে তিনি তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে দেখা করলেও করতে পারতেন কিন্তু তাঁর অনুগামীদের পক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি বলেন যে পরে তিনি তাঁদের সঙ্গে মিলিত হবেন। কমিটি নেতাজীর বক্তব্যের এই অর্থ নিশ্চয় বিচার করে দেখেছেন, কিন্তু লেখেন নি।

কমিটি রিপোর্টের এই অধ্যায়ের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ থেকে জানা যায় যে বিমানে যাত্রীদের বসার ব্যবস্থা করেছিলেন লেঃ কর্নেল নোনোগাকি। বিমানে আসন ব্যবস্থা না থাকার দরুণ যাত্রীদের মেঝের ওপরই বসতে হয়েছিল তবে, নেতাজীকে একখানি কুশন দেওয়া হয়েছিল। জেনারেল সিডি, নেতাজী ও কর্নেল রহমানকে সবচেয়ে ভাল আসনগুলি দেওয়া হয়েছিল। কো-পাইলট সাধারণতঃ যে আসনে বসেন জেনারেল সিডি সেই আসনে বসেছিলেন। বৈমানিকগণ বসেছিলেন বিমানের সামনের দিকে আর অন্য সামরিক বিভাগের যাত্রীগণ বসেছিলেন বিমানের পিছন দিকে। কর্নেল হবিব-উর রহমান বিমানে বসার আসন ব্যবস্থা

সম্বন্ধে এক বিশদ বিবরণ দিয়েছেন যা নীচে উদ্ধৃত করা হল এবং নক্সা এঁকেও তিনি তা বুঝিয়েছেন :

"বৈমানিকগণসহ বিমানে বার তেরজন যাত্রী ছিলেন। বিমানের সামনের দিকে সম্ভবত একজন কো-পাইলট, একজন রেডিও অফিসার এবং নেভিগেটর বসেছিলেন। পাইলটের আসন ছিল তাঁদের পিছন দিকে পোর্টসাইডে আর তাঁর উল্টোদিকে স্টার বোর্ড সাইডে বসেছিলেন জেনারেল সিডি। পাইলটের ঠিক পিছন দিকে বসেছিলেন নেতাজী এবং তাঁর উল্টোদিকে কেউই ছিল না কারণ ঐ জায়গায় পেট্রল ট্যাঙ্ক ছিল। আমি (কর্নেল রহমান) নেতাজীর ঠিক পিছন দিকে বসেছিলাম। কো-পাইলটের আসনে বসেছিলেন জেনারেল সিডি। ঐ আসনটি নেতাজীকে বসতে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাঁর বসার পক্ষে ওটা খুব ছোট বলে তিনি ওটাতে বসেননি। বিমান বহরের একজন অফিসার টারেট-এ দাঁড়িয়েছিলেন। এবং পিছন দিকে সম্ভবত চারজন জাপ বিমান বহরের বা সেনাবাহিনীর অফিসার ছিলেন। আমি (কর্নেল রহমান) লেঃ কর্নেল নোনোগাকি ও ক্যাপ্টেন আরাই ছাড়া অন্য কারও পদমর্যাদা সঠিকভাবে মনে করতে পারছি না। ঐ দু'জনের সঙ্গে দুর্ঘটনার পরে হাসপাতালে আমার দেখা হয়েছিল।"

কমিটি কর্নেল হবিব-উর রহমান এর চারজন সহযাত্রী, লেঃ কর্নেল নোনোগাকি, মেজর কোনো, মেজর টাকাহাশি এবং ক্যাপ্টেন আরাইকে জেরা করেছেন। বসার আসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন সাক্ষীদের জবানী বহুলাংশে মিলে যায়। নেতাজী, জেনারেল সিডি, ও কর্নেল রহমান এর বসার আসন সম্বন্ধে সবাই একই কথা বলেন এবং বৈমানিকগণ বিমানের সামনের দিকে ও অন্য অফিসারগণ যে বিমানের পিছন দিকে ছিলেন সে ঘটনাও বলেন। অবশ্য বৈমানিকদের সংখ্যা সম্বন্ধে কিছু অসামঞ্জস্য আছে। কেউ বলেন চারজন, আর কেউ বলেন পাঁচজন। মেজর কোনো সম্পর্কে অবশ্য এক গুরুত্বপূর্ণ মতদ্বৈধ আছে। কর্নেল হবিব-উর রহমান ও ক্যাপ্টেন আরাই এর মতে মেজর

কোনো বিমানের পিছন দিকে ছিলেন। কিন্তু মেজর কোনো বলেন যে তিনি নেতাজীর সামনে বসেছিলেন এবং বিমান যাত্রার সময় তাঁর (নেতাজী) সঙ্গে কথা বলেছেন। কর্নেল নোনোগাকিও এই বসার ব্যবস্থা সমর্থন করেন। ১৯৪৫ সালের ২৪শে আগস্ট তারিখে কর্নেল রহমান এর লিখিত জবানী, যা শ্রীজে, মূর্তি কমিটিকে প্রদান করেন তাতে অবশ্য লেখা ছিল যে নেতাজী ও পাইলটের আসনের মাঝখানে একজন জাপানী অফিসার বসেছিলেন। সুতরাং প্রায় নিশ্চিত হওয়া যায় যে মেজর কোনো বিমানের সামনের দিকেই বসেছিলেন।

যে বিমান সাইগনের আকাশে মিলিয়ে গিয়েছিল বলে প্রকাশ পেয়েছে সেই বিমানে কে কে গিয়েছিলেন তা জানা যায় না। বিমানটি মোট কতজন যাত্রীকে নিয়ে আকাশে উঠেছিল তাও সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলে মনে হয় না। পঞ্চম অনুচ্ছেদে তদন্ত কমিটি লিখেছেন যে বিমানে তের বা চোদ্দজন যাত্রী ছিলেন। কিন্তু কর্নেল রহমান কমিটিকে দেওয়া জবানীতে বলেছেন যে বার কি তেরজন যাত্রী ঐ বিমানে ছিলেন। কমিটি বিমানের যাত্রী সংখ্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন বলে মনে হয় না, কারণ কতজন যাত্রী বিমানে ছিলেন সেই বিষয়ে মত বিরোধ আছে বলে কোথাও মন্তব্য করা হয়নি। কমিটির বিরোধী সদস্য শ্রীসুরেশ চন্দ্র বসু, তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন যে কর্নেল রহমান তাঁর নক্সায় বারজন যাত্রী দেখিয়েছেন। কর্নেল নোনোগাকির মতে ঐ বিমানে তেরজন যাত্রী ছিলেন। ক্যাপ্টেন আরাইও অবশ্য তেরজন যাত্রীর কথাই বলেছেন। মেজর কোনো বলেছেন যে বিমানে চোদ্দজন যাত্রী ছিলেন। অপর একজন যাত্রী মেজর টাকাহাশি বলেছেন যে বিমানে বার কি চোদ্দজন যাত্রী ছিলেন। জাপ সরকারের দাখিল করা নক্সায় বার জন যাত্রী দেখানো আছে। যে বিমানটিকে নিয়ে এত আলোড়ন সেই বিমানের যাত্রীরা তাঁদের সহযাত্রীর সংখ্যা সঠিকভাবে বলতে পারেন না। কমিটি কার জবানীর ওপর নির্ভর করে বিমানে তের বা চোদ্দজন যাত্রী

তাইহোকু-

ছিলেন বলে মতামত পেশ করেছেন তা বোঝা যায় না, তবে জাপ সরকারের দাখিল করা নক্সা যে তাঁরা সমর্থন করতে পারেন নি তা সত্য। তাহ'লে ঐ বিমানে কতজন যাত্রী শেষ যাত্রা করেছিলেন তা সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হয় নি।

ঐ ঐতিহাসিক বিমান যাত্রায় যাত্রীরা কে কোথায় বসেছিলেন সেই প্রসঙ্গে বিভিন্ন সাক্ষীদের জবানী বহুলাংশে মিলে যায় বলে কমিটি মন্তব্য করেছেন। কিন্তু আবার এ কথাও লেখা হয়েছে যে মেজর কোনোকে নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ মতানৈক্য রয়েছে। কমিটি তদন্ত করে জানতে পেরেছেন যে উদ্দিষ্ট বিমানটিতে যথাযথ আসন ব্যবস্থা ছিল না। বিমানে বসার আসন না থাকলে বিমান যাত্রীদের স্বভাবতঃই হাত পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসতে হবে। জাপ সরকারের মাননীয় হিজ্ এক্সেলেন্সি বোস কে বিমানের মেঝেতে বসানো যায় না, তাই তাঁর জন্য 'কুশন' এর ব্যবস্থা করে দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যে বিমানে যথাযথ বসার আসন ছিল না বলে জানা যায় সেই বিমানে কর্নেল রহমান, জেনারেল সিডি ও নেতাজীকে বসতে সবচেয়ে ভাল আসন-গুলি কিভাবে দেওয়া হ'ল ? নেতাজী কুশন এ বসলে, এবং জেনারেল সিডি কো-পাইলটের আসনে বসলে, কর্নেল রহমান কোথা থেকে আসন পেয়েছিলেন তা বোঝা কষ্টকর। বিমানের বৈমানিকগণ সামনের দিকেই থাকেন, সুতরাং এ কথা না জানালেও ধরে নেওয়া যায়। নেতাজী ঠিক কোথায় বসেছিলেন সে বিষয়ে কমিটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলেও পাঠকদের পক্ষে তা বুঝে নিতে কষ্ট হয়। যে সব সাক্ষীরা বসার আসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বহুলাংশে একমত হয়েছেন বলে প্রকাশ, তাঁদের জবানীগুলি পেশ করা হ'লে বিষয়টি আরও বেশী বোধগম্য হ'ত। কর্নেল রহমান ও ক্যাপ্টেন আরাই এর মতে মেজর কোনো বিমানের পিছন দিকে ছিলেন। কিন্তু মেজর কোনো দাবী করেছেন যে তিনি নেতাজীর সামনে বসেছিলেন এবং যাত্রাপথে নেতাজীর সঙ্গে কথাও বলেছিলেন। কর্নেল রহমান এর দাবী সমর্থন পেয়েছে,

ক্যাপ্টেন আরাই এর বক্তব্যে, আর মেজর কোনোর দাবী সমর্থিত হয়েছে কর্নেল নোনোগাকির জবানীর দ্বারা। নেতাজীর বসার জায়গা সম্বন্ধে কর্নেল রহমান কমিটিকে যে বক্তব্য বলেছেন তা থেকে জানা যায় যে, নেতাজী পাইলটের ঠিক পিছনদিকে বসেছিলেন এবং তিনি (কর্নেল রহমান) বসেছিলেন নেতাজীর ঠিক পিছনে। নেতাজীর মুখোমুখি কারও বসার উপায় ছিল না কারণ ওখানে বিমানের পেট্রল ট্যাঙ্ক ছিল। কর্নেল রহমান ১৯৪৫ সালের ২৪শে আগস্ট তাইহোকুতে এক লিখিত বিবৃতিতে সহি দেন। ঐ সহি করা বিবৃতি শ্রীমূর্তির কাছে ছিল এবং যথা সময়ে তা কমিটিকে দেওয়া হয়। ঐ বিবৃতি মতে, "পাইলটের ঠিক পিছন দিকে একজন জাপানী অফিসার বসেছিলেন এবং তাঁর পিছনে বাঁ দিকে নেতাজী বসেছিলেন। তাঁর (নেতাজী) ঠিক ডান দিকে পেট্রল ট্যাঙ্কটি ছিল। আমি (কর্নেল রহমান) নেতাজীর পিছনে ছিলাম।" কর্নেল রহমান-এর তাইহোকু থেকে (?) সহি করা বিবৃতি আর কমিটির সামনে দেওয়া জবানীর মধ্যে তফাৎ অনেক। তাঁর ২৪শে আগস্টের বিবৃতি সঠিক বলে ধরে নিলেও নেতাজীর সামনে বসা ঐ জাপানী ভদ্রলোক যে মেজর কোনো তা প্রমাণ হয় না। কারণ একই বিমানের যাত্রী হয়েও মেজর কোনোর জবানী কর্নেল নোনোগাকি ছাড়া অন্য কারও দ্বারা সমর্থিত হয় না। বিমানে কে কোথায় বসেছিলেন সেই প্রসঙ্গে শ্রীসুরেশ চন্দ্র বসু লিখেছেন যে কর্নেল রহমান এর আঁকা নক্সা অসামরিক বিমান দপ্তরের একজন ড্রাফ্‌টসম্যান কপি করে দেন এবং ঐ কপিটি ঠিক হয়েছে এই মর্মে শ্রীখাঁন ১৪।৪।৫৬ তারিখে সহি দেন। ঐ নক্সায় দেখা যায় যে নেতাজী যেখানে বসেছিলেন, সেখান থেকে পেট্রল ট্যাঙ্কটা অনেক নিচে রয়েছে। ক্যাপ্টেন আরাই এর নক্সায় জেনারেল সিডি ও লেঃ কর্নেল সাকাইকে যথাক্রমে নেতাজী ও কর্নেল রহমান এর ডান দিকে দেখানো হয়েছে। কর্নেল নোনোগাকি তাঁর নক্সায় পাইলট এর পিছনে মেজর কোনোকে ও তাঁর পিছনে নেতাজীকে

দেখিয়েছেন। মেজর কোনোর ডানদিকে দেখানো হয়েছে জেনারেল সিডিকে এবং ডানদিকে আরও একটু নীচে পেট্রল ট্যাঙ্কটি দেখানো হয়েছে। কর্নেল রহমান এর বসার আসন তিনি বিমানের মাঝ বরাবর দেখিয়েছেন, ঠিক পেছনে নয়। শ্রীবসুর লেখা থেকে আরও জানা যায় যে মেজর কোনো বিমানে আসন ব্যবস্থা দেখিয়ে স্বয়ং একটি নক্সা কমিটির কাছে পেশ করেন এবং জাপ সরকারও তাঁদের রিপোর্টের সঙ্গে একটি নক্সা দিয়েছিলেন। কমিশন বিশদভাবে নক্সাগুলি সম্বন্ধে কোন আলোচনা রিপোর্টে তুলে ধরেন নি। সাক্ষীদের পেশ করা নক্সাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা না করেই কমিটি মতামত পেশ করেছেন যে, বিমানে বসার আসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন সাক্ষীদের জবানীর মধ্যে যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কমিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মতানৈক্যের মাঝেও মিল খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শ্রীবসু এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে সাক্ষীদের পরস্পর বিরোধী অসংলগ্ন জবানী এবং তাঁদের আঁকা নক্সায় বসার আসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে গড়মিলের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলতে বাধ্য যে সাক্ষীদের জবানীর ওপর সামান্যই নির্ভর করা যায়। সাক্ষীরা বিমানে বসার আসন সম্বন্ধে একমত হতে না পারলেও একটি বিষয়ে তাঁরা মতৈক্যে পৌঁছাতে পেরেছিলেন যে বিমানটির সাইগন থেকে তাইহোকু পর্য্যন্ত যাত্রা পথে যদিও যাত্রাবিরতি ঘটেছিল কিন্তু বিমানে বসার আসন ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন কোন সময়ই হয় নি। শ্রীবসু এই ক্ষেত্রে মন্তব্য করেন যে তিনি মনে করেন যে ওঁদের শেখানো হয়েছিল। কমিটি রিপোর্ট পড়ে বসার আসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে সত্যই আসা যায় না। কিন্তু কমিটি মিল খুঁজে পেয়েছেন বলে দাবী করেন। ব্যাঙ্কক থেকে শুরু করে সাইগন পর্যন্ত ঘটনার মধ্যে কোথাও গড়মিল নেই। সাইগন এর প্রান্তে শুরু হতে থাকে যত অবাস্তব ও অসংলগ্ন ঘটনার সমাবেশ।

৮

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম অনুচ্ছেদে কমিটি লিখেছেন যে ১৯৪৫ সালের ১৭ই আগস্ট অপরাহ্ণে সাইগন বিমান বন্দন থেকে বিমানটি বেশ ভালভাবেই আকাশে উড়েছিল। ঠিক কখন বিমানটি আকাশে উড়েছিল সে বিষয়ে কিছু মতানৈক্য আছে, কিন্তু বেশির ভাগ সাক্ষীই বলেছেন যে বিমানটি অপরাহ্ণে পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে যাত্রা করেছিল। বিমানটি ছাড়তে দেরী হওয়ার দরুণ সরাসরি ফরমোসায় না গিয়ে বিমানের পাইলট রাতটুকুর জন্য ইন্দো-চীন সীমান্তের টুরেন এ যাত্রাবিরতি করার সিদ্ধান্ত নেন। ঘণ্টা দু'য়েক এর মধ্যেই বিমানটি নিরাপদে টুরেন এ পৌঁছায়। নেতাজী ও অন্যান্য অফিসাররা শহরের সব চেয়ে বড় হোটেল এ রাতটা কাটান। কমিটি যে সব সাক্ষীদের জেরা করেছেন তাঁরা যদিও হোটেল এর নাম দিতে পারেন নি কিন্তু বিশ্বাস করার মত সঙ্গত কারণ আছে যে ঐ হোটেল-টির নাম "হোটেল মেরিন।" দূর প্রাচ্যে যাওয়ার সময় কমিটি এই হোটেল পরিদর্শন করেন। সাইগন থেকে যাত্রা করার সময় আকাশে ওঠার আগে বিমানটিকে রানওয়ের সমস্ত পথ ছুটে যেতে হয়েছিল। এর থেকে প্রমাণ হয় যে বিমানটিতে বহন ক্ষমতার বেশি মাল ছিল। টুরেন এ অন্যেরা যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন বিমানের চীফ পাইলট মেজর কোনোর সহায়তায় বিমানটিকে হাল্‌কা করে নিতে ব্যস্ত ছিলেন। মেজর কোনোর মতে কমপক্ষে বারটা এ্যান্টি এয়ারক্রাফ্‌ট মেশিনগান এবং সমস্ত গোলাবারুদ বিমান থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিছু অতিরিক্ত মালও ফেলে দেওয়া হয় এবং মোট ছ'শ কিলোগ্রামের মত ওজন কমিয়ে ফেলা হয়। তারপর এই

অফিসাররা বিমানটি পর্যবেক্ষণ করেন এবং সন্তুষ্ট হ'ন যে সব কিছুই ঠিকমত কাজ করছে।

তথাকথিত বিমানটি কয়েকজন বিশিষ্ট যাত্রীকে নিয়ে যাচ্ছিল। বিমানের পাইলট তাঁর নিজের সিদ্ধান্তমত বিমানটিকে টুরেন-এ নামিয়ে আনেন বলেই কমিটি জানতে পারেন। বিমানে কোন গোলযোগ দেখা দিলে পাইলট নিরুপায়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসাবে যুক্তিযুক্ত প্রয়োজনীয় যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তেমন কোন পরিস্থিতির নিশ্চয়ই উদ্ভব হয় নি। সাইগন থেকে ফরমোসা পর্য্যন্ত যেতে কত সময় লাগে তা একজন পাইলট এর নিশ্চয় জানা এবং বিমান বন্দরের কর্তৃপক্ষও তা জানতেন। যদি যাত্রাবিরতির প্রয়োজন হ'ত তাহল সাইগন এর কর্তৃপক্ষইতো পাইলটকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে দিতেন, কিন্তু তা যখন দেওয়া হয়নি তখন ধরে নিতে হবে যে সাইগন এর কর্তৃপক্ষ ছাড়া অন্যকোন মহল থেকে নিশ্চয়ই টুরেনএ যাত্রবিরতি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। টোকিওর প্রান্ত থেকে অবশ্যই নির্দেশ আসেনি। সুতরাং পরিষ্কার বোঝা যায় যে বিমান যাত্রীদের মধ্যেই কেউ নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সেই যাত্রীটি অবশ্যই জেনারেল সিডি। একজন জেনারেল ও মিত্ররাষ্ট্রের একজন প্রধানকে নিয়ে যাওয়ার পথে খেয়াল খুশীমত যাত্রাবিরতি ঘটানো অসম্ভব ব্যাপার, কারণ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তাঁদের নিরাপত্তার প্রশ্ন থেকে যায়। একজন পাইলট বিমানের ক্ষয়ক্ষতির কথা ভাবতে পারেন কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার কথাই বেশী ভাবতে হয়। হঠাৎ টুরেন এ যাত্রাবিরতি অবশ্যই সন্দেহের সৃষ্টি করে। বিমানের পাইলট স্বেচ্ছায় যাত্রা বিরতি ঘটান নি। তাঁর ওপর-ওয়ালাদের কেউ অবশ্যই তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং যদি নেতাজী ঐ বিমানে যাত্রা করে থাকেন তাহলে তাঁর ইচ্ছামতেই ঐ ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কারণ জাপ সরকার তাঁকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। নেতাজী

ও তাঁর সহযাত্রী অফিসাররা টুরেন এর সব চেয়ে বড় হোটেলেএ রাতের জন্য বিশ্রাম নিয়েছিলেন বলে কমিটি তদন্ত করে জানতে পারেন। সাক্ষীদের মধ্যে কেউ অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শীদের কেউই ঐ হোটেলে-এর নাম বলতে পারেন নি। সুদীর্ঘ এগার বছর পর একটা হোটেল এর নাম মনে রাখা সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু ঐ হোটেল এ নেতাজীও যে রাতের জন্য বিশ্রাম নিয়েছিলেন, তার প্রমাণ কমিটি কি ভাবে পেয়েছেন তা বোঝা যায় না। ঐ হোটেল এ এমন কোন ব্যক্তিকে সম্ভবত খুঁজে পাওয়া যায়নি যিনি এগার বছর আগেও ওখানেই কাজ করতেন, কারণ তেমন কোন নাম সাক্ষীদের তালিকায় পাওয়া যায় না। শ্রীসুরেশ চন্দ্র বসু'র লেখা থেকে টুরেন সম্বন্ধে আরও কিছু বক্তব্য পাওয়া যায় যা তদন্ত কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়নি। ক্যাপ্টেন আরাই নাকি তাঁর জবানীতে ব্যক্ত করেছেন যে বিমানের যাত্রীরা টুরেন এর সব চেয়ে বড় হোটেলে ওঠেন। রাত্রের ডিনার সবাই এক সঙ্গেই খান। খাবার টেবিলে বসে নেতাজী ও জেনারেল সিডি এশিয়া ও ইউরোপের পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও আলাপ আলোচনা করেন। মেজর টাকাহাশি, ক্যাঃ আরাই এর বক্তব্য আংশিক সমর্থন করে বলেন যে তাঁরা সবাই রাতটুকু কাটাবার জন্য হোটেলএ ছিলেন। তবে ঐ হোটেল এ তিনি নেতাজীকে দেখেন নি এবং রাত্রের ডিনার তিনি একাই খেয়েছিলেন। কর্নেল নোনোগাকি বলেছেন যে বিমানের যাত্রীরা সবাই ওখানকার সবচেয়ে বড় হোটেল এ ছিলেন। রাতের ডিনারও তাঁরা এক সঙ্গেই খেয়েছিলেন। নেতাজী ও জেনারেল সিডির প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে তাঁরা আলাপ আলোচনা করেছিলেন ঠিকই কিন্তু ওঁদের ভাষা ছিল জার্মান ভাষা। এঁদের জবানী থেকে প্রকাশ পায় যে টুরেন এ যাত্রা বিরতি ঘটানো হয়েছিল এবং কোন এক বড় হোটেলেএ সকলে রাতটুকু কাটিয়েছিলেন। কিন্তু অন্য কোন বিষয়ে এঁদের মধ্যে মতৈক্য প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে হয় না। আর

একটি গুরুত্বপূর্ণ গড়মিল দেখা যায় কর্নেল টি. সাকাই এর জবানীতে। ইনি ফরমোসা থেকে এক লিখিত জবানী দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। ঐ জবানীতে তিনি লেখেন যে সারারাত তিনি 'সাপ্লাই বেস বিলেট এ রাত কাটিয়েছিলেন। হোটেল এ সারারাত থাকার ব্যাপারে তিনি কিছুই লেখেন নি। এই প্রসঙ্গে শ্রীসুরেশচন্দ্র বসুর ভিন্ন মন্তব্য রয়েছে।* বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানী টুরেনএর ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ মতৈক্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে নি।

অষ্টম অনুচ্ছেদে তদন্ত কমিটি লিখেছেন যে ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট ভোর ৫টা নাগাদ টুরেন থেকে যাত্রা শুরু হয়। বিমানের যাত্রীরা ও বৈমানিকগণ বিমানের যে যেখানে বসেছিলেন ঠিক তেমনিভাবে আবার বসলেন। বিমানটি সাইগণ—টুরেন—হিতো (ফরমোসা)—তাইহোকু (ফরমোসা)—দাইরেন (মাঞ্চুরিয়া)—টোকিও যাওয়ার কথা ছিল। মেজর টাকাহাশির মতে, ঐ সময় বিমানে টোকিও যাওয়ার পথ ছিল মাঞ্চুরিয়ার দাইরেন হয়ে। বিমানটি বেশ হাল্‌কাই ছিল এবং টুরেন থেকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই আকাশে উঠেছিল। টুরেন থেকে হিতো পর্যন্ত যাত্রাপথে আবহাওয়া খুবই ভাল ছিল এবং বিমানের ইঞ্জিনটি ভালভাবেই কাজ করেছিল। প্রায় ১২,০০০ ফুট ওপর দিয়ে বিমানটি উড়ে যাচ্ছিল এবং সেইজন্যই বিমানের ভিতরের আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা ছিল। আবহাওয়া ভাল থাকার দরুণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে আরও বেশী পথ উড়ে গিয়ে হিতো পার হয়ে ফরমোসার রাজধানী তাইহোকুতে (তাইপে) অবতরণ করা হবে। মেজর কোনো কমিটিকে জানান যে বিমান যাত্রার পথে খবর পাওয়া গিয়েছিল যে রাশিয়া পোর্ট আর্থার দখল করে নিয়েছে। ঐ সময় শঙ্কা জেগেছিল যে অচিরেই রাশিয়ার

---

*"It is strange that these witnesses have given somewhat different versions, some of which cannot be reconciled in any way". Dissentient Report. P-II.

সৈন্যদল দাইরেন পৌঁছে যাবে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখানে পৌঁছানোর প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। অপরাহ্নে কোন এক সময় বিমানটি নিরাপদে ও সহজেই তাইহোকু বিমান বন্দরে নেমে এসেছিল। বিভিন্ন সাক্ষীদের জবানীতে বিমানটির মাটিতে নামবার সময় বেলা এগারোটা থেকে অপরাহ্ন দু'টোর মধ্যে বলা হয়েছে।

টুরেন থেকে যাত্রা করার সময় কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। যা শ্রীসুরেশ চন্দ্র বসুর লেখা থেকে জানা যায়। তিনি লিখেছেন যে কর্নেল রহমান বলেছেন যে টুরেন বিমানবন্দরে বিমানটি যখন আকাশে ওঠার জন্য তৈরী তখন নেতাজী ও তিনি বিমান বন্দরে এসে পৌঁছান। বৈমানিকরা ইতিমধ্যেই বিমানে উঠে পড়েছিলেন। বিমানের অন্যেরা সবাই একে একে বিমানে উঠলেন। বসবার আসন ব্যবস্থা একই রইল। কর্নেল রহমান তাঁর জবানীতে আরও বলেন যে তিনি কাউকে বিমানটি পরীক্ষা করতে দেখেন নি বা বিমানটি আকাশে ওঠার উপযুক্ত এই মর্মে দেওয়া কোন সার্টিফিকেট বার করতেও দেখেননি। মেজর কোনো কিন্তু কর্নেল রহমান এর এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, মেজর টাকিজাওয়া ও ঐ বিমানেই যাত্রী আর একজন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে তিনি বিমানটি পরীক্ষা করে দেখেন এবং বিমানটি আকাশে ওঠার উপযুক্ততার সার্টিফিকেট বার করে আনেন। তাইহোকু বিমান বন্দরের গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতো বলেন যে তিনি, মেজর টাকিজাওয়া ও পাইলট আয়োগির সঙ্গে বিমানের ইঞ্জিনটি পরীক্ষা করেন এবং যখন তাঁরা তিনজনেই একমত হন যে বিমানের ইঞ্জিনটি ঠিকমত কাজ করছে তখনই বিমানটিকে আকাশে উড়তে দেওয়া হয়। টুরেন বন্দরে বিমানটি পরীক্ষা করার ব্যাপারে মেজর কোনো ও ক্যাপ্টেন নাকামুরার বক্তব্য সত্যই বিচিত্র। দু'জনেই বিমানটিকে যথাযথভাবে পরীক্ষা করেছেন বলে দাবী করেছেন, কিন্তু একে অন্যের নাম করেন নি। টুরেন থেকে যাত্রা করে বিমানটি ফরমোসার হিতো বিমান

বন্দরে অবতরণ না করে সোজা তাইহোকু চলে গিয়েছিল। ফরমোসার হিতোতে অবতরণ না করার বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায় কিন্তু, তার নির্দেশ কে দিয়েছিলেন তা বোঝা যায় না। বিমানটির যাত্রাপথ পরিবর্তনের কারণস্বরূপ দু'জন সাক্ষী তদন্ত কমিটির কাছে দু'রকম বক্তব্য পেশ করেছিলেন বলে শ্রীসুরেশ চন্দ্র বসু লিখেছেন। কর্নেল নোনাগাকি জানিয়েছেন যে দক্ষিণ চীন এর সোয়ানটন এর কাছাকাছি শত্রু বিমানগুলি থাকার দরুণ তাঁদের বাঁকা পথে যেতে হয়েছিল এবং তাঁরা পূর্বদিকে উড়ে গিয়েছিলেন। আর মেজর কোনো বলেছেন যে রাশিয়া পোর্ট আর্থার দখল করে নিয়েছিলেন এবং দাইরেন দখল করে নেওয়ার আগে সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। কার বক্তব্য নির্ভরযোগ্য তা বলা কষ্টকর। বিমানটির টুরেন এ নামার কোন কথাই ছিল না, কিন্তু বিমানটি সেখানে নামল এবং বিমান থেকে কিছু মালও সেখানে নামানো হ'ল, কিন্তু যেখানে হিতো বিমান বন্দরে বিমানটির নামার কথা ছিল, সেখানে বিমানটি নামলো না, সোজা তাইহোকু চলে গেল। বিমানটির নির্ধারিত যাত্রাপথে হঠাৎ পরিবর্তন স্বভাবতঃই সন্দেহের সৃষ্টি করে এবং টুরেন এ যাত্রাবিরতি ঘটিয়ে রাতের মত বিমান যাত্রীদের হোটেল এ পাঠিয়ে বিমান থেকে মালপত্র নামানো এক নূতন সূত্রের সন্ধান দেয়। রাতের অন্ধকারে সেদিন টুরেন বিমান বন্দরে কি নাটক অভিনীত হয়েছিল তা শুধু প্রত্যক্ষদর্শীরাই বলতে পারেন। রহস্যময় বিমানের রহস্যজনক গতিবিধি সমস্ত ঘটনাকে আরও রহস্যময় করে তোলে। তাইহোকুতে বিমান অবতরণের সময় বেলা এগারটা থেকে অপরাহ্ন দু'টোর মধ্যে ঘটেছিল বলে সাক্ষীদের জবানী থেকে প্রকাশ পায় কিন্তু তিন ঘণ্টার ব্যবধান চিন্তার বিষয় এবং রহস্যটিকে আরও ঘনীভূত করে তোলে।

নবম অনুচ্ছেদে কমিটি লিখেছেন যে তাইহোকু বিমান বন্দরে অবতরণ করে সবাই বিমান থেকে নেমে আসেন এবং কাছাকাছি এক

তাঁবুতে বিশ্রাম নেন। স্যাণ্ডুইচ্ ও কলা দিয়ে তাঁদের দুপুরের আহার শেষ হয়েছিল। ঐ তাঁবুটি জনৈক জাপানী রাজকুমারের জন্যে খাটানো হয়েছিল, কারণ তাইহোকু হয়ে তাঁর যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। জাপ সম্রাটের কাছ থেকে বিভিন্ন সেনাবাহিনীর কম্যাণ্ডারদের আত্মসমর্পণ করার নির্দেশগুলি ঐ রাজকুমার বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। বিমানটি অনেক ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার দরুণ কর্নেল রহমান এর শীত করছিল এবং বিমান থেকে নেমে তিনি পোষাক বদ্‌লে গরম কাপড়ের বুশ কোট, ব্রিচেস্ এবং টপবুট পরেন। নেতাজীকেও তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে তাঁর শীত করছিল না। কর্নেল রহমান তাঁকে একটী গরম পুলওভার দেন। তবে নেতাজী ওটা পরেছিলেন কিনা তা বোঝা যায় না। বিভিন্ন সাক্ষীদের মতে তাইহোকু বিমান বন্দরে যাত্রাবিরতির সময়ের পার্থক্য আধঘণ্টা থেকে দু ঘণ্টার মত। এই সময়ের মধ্যে বিমানটিতে তেল ভরে নেওয়া হয়েছিল। বিমানের ইঞ্জিনটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছিল। এ কাজ করেছিলেন চীফ পাইলট মেজর টাকিজাওয়া। তাঁকে সাহায্য করেছিলেন মেজর কোনো এবং ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামা-মোতোর নেতৃত্বে বিমান বন্দরের গ্রাউণ্ড স্টাফ। বিমান দুর্ঘটনার সঙ্গে বিমানটির ইঞ্জিনের অবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ থাকার দরুণ কমিটি মেজর কোনো ও ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতো'র জবানীর প্রয়োজনীয় অংশগুলি উদ্ধৃত করেছেন। মেজর কোনোর ভাষায়—"মিঃ টাকিজাওয়া ভিতর থেকে পরীক্ষা করেছিলেন এবং আমি (মেজর কোনো) বাইরে থেকে পরীক্ষা করেছিলাম। আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে বিমানের বাঁ দিকের ইঞ্জিনটি যথাযথভাবে কাজ করছিল না। আমি সেজন্য বিমানের ভিতরে গিয়েছিলাম এবং ইঞ্জিনটি ভিতরে পরীক্ষা করে আমি দেখেছিলাম যে তা ভালভাবেই কাজ করছিল।...একজন ইঞ্জিনিয়ারও বিমানের সঙ্গে যান। এ যাত্রাও তিনি বিমানের সঙ্গে যাচ্ছিলেন। আমার তাঁর নাম মনে

নেই। তবে তিনিও ইঞ্জিনটি পরীক্ষা করেছিলেন এবং ওটার আকাশে ওঠার সামর্থ্য আছে বলে অভিমত দিয়েছিলেন।" তাইহোকু বিমান বন্দরে বিমান রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতোর উপর। তিনি বলেছেন—"অপরাহ্ন প্রায় ১-২০ মিঃ এর সময় মেজর টাকিজাওয়া ও কো-পাইলট আয়োগি বিমানে উঠেছিলেন এবং তা পরীক্ষা করছিলেন। আমি বিমানটির ঠিক সামনেই দাঁড়িয়েছিলাম। যখন তাঁরা ইঞ্জিনটি চালু করেছিলেন, তখন আমি দেখতে পেলাম যে একটাতে গোলযোগ রয়েছে। বাঁদিকে ইঞ্জিনটায় যে গোলযোগ আছে তা বুঝে আমি তাঁকে (মেজর টাকিজাওয়া) হাত তুলে ইঙ্গিত করেছিলাম। ইঞ্জিনটার গোলযোগ সম্বন্ধে আমার ইশারা দেখে মেজর টাকিজাওয়া আমার কথা শোনার জন্য বাইরে ঝুঁকে পড়েন। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে বাঁদিকের ইঞ্জিনটার গোলযোগ আছে এবং তা ঠিক করতে হবে। তখন মেজর টাকিজাওওয়া ইঞ্জিনের গতিবেগ কমিয়ে দেন এবং বলেন যে ইঞ্জিনটি আনকোড়া নূতন এবং সাইগনেই ওটা বদল করা হয়েছে। ইঞ্জিনের গতিবেগ কমিয়ে দিয়ে তিনি মিনিট পাঁচেক ধরে ওটার কলকব্জা সংশোধন করেন। মেজর টাকিজাওয়া দু'বার ইঞ্জিনটি পরীক্ষা করেছিলেন। সংশোধন করার পর আমি নিজে আশ্বস্ত হয়েছিলাম যে ইঞ্জিনের অবস্থা ঠিকই আছে। মেজর টাকিজাওয়াও আমার সঙ্গে একমত হন যে ইঞ্জিনগুলিতে আর কোন গোলযোগ নেই।

তাইহোকুতে ইঞ্জিন পরীক্ষার ব্যাপারে তদন্ত কমিটি তিনজনের নাম করেছেন। কোন্ সূত্র ধরে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তা বোঝা যায় না। মেজর কোনোর জবানী থেকে মেজর টাকিজাওয়া ও একজন ইঞ্জিনিয়ারএর কথা জানা যায়। ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতোর বিবৃতি থেকে প্রকাশ পায় যে কো-পাইলট আয়োগি ও মেজর টাকিজাওয়ার সঙ্গে তিনি বিমানটি পরীক্ষা করেছিলেন। একে অন্যের নাম উল্লেখ করেন নি। বিমানের

ইঞ্জিনের গোলযোগ কে দেখিয়ে দিয়েছিলেন তা বোঝা যায় না। ইঞ্জিনটি কে পরীক্ষা করেছিলেন, মেজর কোনো, মেজর টাকিজাওয়া, মেজর নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতো, কো-পাইলট আয়োগি, না নাম না জানা ইঞ্জিনিয়ার? কমিটি সাক্ষীদের হাতে পেয়েও তাঁদের এই বিষয়ে বিশদভাবে জেরা করেন নি, তাই মন্তব্য করাটা সম্ভবতঃ যুক্তিযুক্ত হবে না। তদন্ত কমিটি অবশ্যই যথাযথভাবে তাঁদের জেরা করেছিলেন। কিন্তু শুধু মুখস্থ করে পরীক্ষা দিতে বসলে অনেক কিছু বাদ পড়তে পারে। অসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও তার ভিতর থেকে সত্য খুঁজে নেওয়া অবশ্যই যথার্থ বিচারকের কাজ। বিমানটি পরীক্ষা করার দাবীদার যখন বেশী তখন সকলকেই বিশ্বাস করে নেওয়াটা সব সংশয়ের অবসান ঘটাতে পারে। গোলযোগ সব স্তরেই থেকে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং নগ্ন সত্য যে তাইহোকুর প্রান্ত থেকেই অসংলগ্নতার সমাবেশ শুরু হয়েছিল। তাই তাইহোকুর প্রান্তরে ও পর পর্বে যে ঘটনা ঘটেছিল বলে জানা যায়, তাতে সামঞ্জস্যের বড় বেশী অভাব দেখা যায়।

এই অধ্যায়ের দশম অনুচ্ছেদে তদন্ত কমিটি তথাকথিত শেষ যাত্রার শেষ পর্বের কাহিনী সম্বন্ধে রিপোর্ট দিয়েছেন। যাত্রীরা সবাই দুপুরের খাওয়া সেরে বিশ্রাম নেওয়ার পর আবার বিমানে গিয়ে উঠলেন। বিমানে যে যেখানে বসেছিলেন ঠিক সেখানেই গিয়ে তাঁরা আবার বসলেন। বিমানের বৈমানিকগণ সামনের দিকে বসলেন, আর মেজর কোনো বসলেন পাইলটের পিছন দিকে, এবং তাঁদের পিছন দিকে বসলেন নেতাজী ও কর্নেল হবিব-উর রহমান। জেনারেল সিডি বসলেন বিমানের ষ্টার বোর্ড সাইডে এবং অন্য সব জাপানী অফিসাররা বিমানের পিছন দিকে গিয়ে বসলেন। যদিও ইঞ্জিনগুলি পরীক্ষা করা হয়েছিল কিন্তু তাইহোকু বিমান বন্দর থেকে বিমানটির আকাশে ওঠা স্বাভাবিক হয়নি। বিমানটির আকাশে ওঠার ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল বিবরণ দিয়েছেন ওখানকার গ্রাউণ্ড

ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতো যিনি বিমানটিকে লক্ষ্য করছিলেন। বিমানের ভিতরের যাত্রীরা বেশী কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না কারণ বিমানটিতে বাইরের দিকে দেখার জায়গা খুব কমই ছিল। বিমানটির ছাড়ার সময় সম্বন্ধে সাক্ষীদের মধ্যে কিছু মতানৈক্য আছে, কিন্তু অনেকে যাত্রায় সময় অপরাহ্ন দু'টো থেকে আড়াইটার মধ্যেই বলেছেন! ক্যাপ্টেন নাকমুরা ওরফে ইয়ামামোতো তাঁর জবানীতে বলেছেন—"সবাই বিমানে বসবার পর বিমানটি রানওয়ের একদিকে এগিয়ে গেল। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানোর পর ইঞ্জিনগুলির গতিবেগ সর্বোচ্চ করে দেওয়া হয় এবং তারপরই কমিয়ে আনা হয়। ইঞ্জিনের যোগ্যতা পরীক্ষা করে নেওয়ার জন্য সব জাপানী বিমানেই এই ধরণের যাচাই করা হ'ত। ইঞ্জিনগুলি ঠিকমত কাজ করছিল বলে আশ্বস্ত হওয়ার পরই বিমানটির গতিবেগ বাড়ানো হয়েছিল এবং রানওয়ে ধরে বিমানটি এগিয়ে গিয়েছিল। রানওয়ের দৈর্ঘ্য ছিল ৮৯০ মিটার। ভারী বোমারু বিমানের ক্ষেত্রে সাধারণত রানওয়ের অর্ধেক পথ যাওয়ার পরই লেজের দিকটা উঠে যায় কিন্তু এক্ষেত্রে রানওয়ের ৩।৪ অংশ না যাওয়ার আগে বিমানের লেজের দিক ওঠেনি। ঐ সময় আমি রানওয়ের থেকে ৩০ মিটার দূরে এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম। রানওয়ের শেষ প্রান্ত থেকে প্রায় ৫০ মিটার আগে বিমানটি মাটি ছাড়ে এবং খাড়াভাবে আকাশে উঠতে থাকে।" কমিটি আরও লিখেছেন যে বিমানটি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশিষ্ট নেতা ও তাঁর সহযাত্রীদের সাইগন থেকে টুরেন এ এবং সাউথ চায়না সীর ওপর দিয়ে টুরেন থেকে ফরমোসা পর্যন্ত নিরাপদে বহন করে নিয়ে এসেছিল এবং কারও ধারণা ছিল না যে কোন সঙ্কেত না দিয়ে তাইহোকু বিমান বন্দর ত্যাগ করার পর এত অল্প সময়ের মধ্যে বিমানটি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

তদন্ত কমিটি ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতোর বিবৃতির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ কাজ যুক্তিযুক্তই হয়েছে

কারণ তাইহোকু বিমান বন্দরে দাঁড়িয়ে বিমানটির শুরু থেকে শেষ অঙ্কের অভিনয় তিনি দেখেছিলেন বলে দাবী করেছেন। শ্রীসুরেশ চন্দ্র বসু এই প্রত্যক্ষদর্শীর জবানী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখেছেন যা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতো তদন্ত কমিটির সামনে বলেছিলেন যে ১৯৪৫ সালের ১৭ই আগস্ট বা ১৮ই আগস্ট তাইহোকুতে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছিল। মিঃ সুভাষ চন্দ্র বোস, জেনারেল সিডি ও অন্যান্য অনেকে ঐ দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। তিনি আরও বলেছিলেন যে ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট যে ঐ দুর্ঘটনা ঘটে নি সে বিষয়ে তিনি শতকরা ৯০ ভাগ নিশ্চিত কারণ ঐ দিনই ফিলিপাইন থেকে প্রায় তিরিশটি মারকিন বিমান তাইহোকুতে এসেছিল এবং অনেকগুলি জাপানী বিমান তাইহোকু বিমান বন্দরে নেমে ছিল এবং বিমান বন্দর থেকে ছেড়েছিল এবং সবগুলি বিমানই তিনি নিজে দেখা শুনা করেছিলেন। শ্রীবসু লিখেছেন যে ১৭ই আগস্ট, ১৯৪৫ সাল তারিখটি তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান এর মনঃপূত না হওয়ার দরুণ তিনি ছলাকলা শুরু করে দেন।* তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান ক্যাঃ নাকামুরার সঙ্গে দুর্ঘটনার তারিখ নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। ১৮ই আগস্ট তারিখে মারকিন ও জাপানী বিমানের আনাগোনা হয়ে থাকলে ঐ তারিখেই যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল তার প্রমাণ থাকে না। তাইহোকু বিমান বন্দরের গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ার স্বয়ং যদি দুর্ঘটনার তারিখ ১৮ই আগস্ট ১৯৪৫ বলে সমর্থন না করেন, তাহলে অবশ্যই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন নাকামুরার বক্তব্য কিছুটা সংশোধিত হ'ল। তিনি জবানী দিলেন যে, ১৮ই আগস্ট তাইহোকু বিমান বন্দরে কোন মারকিন বিমান আসে নি। আর বিমান দুর্ঘটনা সম্বন্ধে তিনি

---

* As the date, viz. 17-8-45, did not fit in with what the Chairman wanted, he started manipulations—Dissentient Report. P 83

জানালেন ১৯৪৫ সালের ১৭ই আগস্ট, ১৮ই আগস্ট বা ১৯শে আগস্ট তারিখে বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল। বিমানটি বিমান বন্দরের কোন্ জায়গায় দাঁড়িয়েছিল এবং কোন্ পথ ধরে রানওয়েতে এসেছিল তা বোঝাতে ক্যাপ্টেন নাকামুরা কর্নেল নোনোগাকি দু'জনেই নক্সা এঁকে ছিলেন। দুজনের নক্সার মধ্যে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। রানওয়ের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে দু'টি ভিন্ন মত পাওয়া যায়। শ্রীবসু লিখেছেন যে, ক্যাপ্টেন নাকামুরা বলেছেন যে বিমান বন্দরের দৈর্ঘ্য ছিল ৮৯০ মিটার কিন্তু এয়ার ফোর্স অফিসার মেজর কোনো বলেছেন যে বিমান বন্দরের দৈর্ঘ্য ছিল ১৬০০ মিটার। নেতাজী তদন্ত কমিটি এত বিশদভাবে সব বিষয় আলোচনা করে রিপোর্ট লেখেন নি। যে সব তথ্য প্রমাণের ওপর নির্ভর করা যায় এবং যাতে বিশ্বাস জাগাবার মত যথেষ্ট উপাদান আছে সেগুলির ওপর আস্থা রেখে রিপোর্ট লিখেছেন। সুদীর্ঘ এগার বছর পার হয়ে যাওয়ার বিস্মৃতির অতল গহ্বরে অনেক ঘটনা তলিয়ে যেতে পারে এবং সময়ের ঠিক ঠিক হিসাব মনে নাও পড়তে পারে, কিন্তু একথা ঠিক যে তাইহোকুর প্রান্তরে তথাকথিত বিমানের যাত্রী বলে প্রকাশিত ব্যক্তিরা কি দিয়ে দুপুরের খাওয়া শেষ করেছিলেন তা তাঁদের মনে ছিল কিন্তু ঘটনার বিশদ বিবরণ দাখিল করতে গিয়ে একে অন্যের জবানীর সঙ্গে সামান্য সামঞ্জস্যই বজায় রাখতে পেরেছেন।

একাদশ অনুচ্ছেদে তদন্ত কমিটি লিখেছেন যে বিমানটি তখন সবেমাত্র আকাশে উঠেছে ওমনি এক বিরাট বিস্ফোরনের আওয়াজ শোনা গেল এবং বিমানটি বাঁ দিকে কাত হয়ে পড়ল। "কর্নেল রহমান বলছেন যে ঐ আওয়াজ কামানের গোলা ছোঁড়ার আওয়াজের মত মনে হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গেই বিমানের প্রপেলার ও বাঁদিকের ইঞ্জিনটি খসে পড়ে যায়। ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতো বিমানটিকে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি বলেছেন,—"আকাশে ওঠার ঠিক পরেই বিমানটি বাঁদিকে কাত হয়ে পড়েছিল এবং আমি বিমান

থেকে কিছু পড়তে দেখেছিলাম। পরে আমি দেখেছিলাম যে ওটা বিমানের প্রপেলার।” মেজর কে, সাকাই কিছুক্ষণ পরে ঘটনাস্থলে এসেছিলেন। তিনি বলেছেন যে বিমানের বাঁ দিকের ইঞ্জিনটিকে তিনি মাটিতে প্রোথিত অবস্থায় দেখেছিলেন। বিমানের পাইলট মেজর টাকিজাওয়া ও কো-পাইলট আয়োগি বিমানটিকে ঐ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। বিমান যতটা উঁচুতে উঠেছিল তত কম উচ্চতায় গোলযোগ সংশোধন করা যায় নি। বিমানের ভিতরের যাত্রীরা উচ্চতা সম্বন্ধে বিভিন্ন হিসাব দিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ সাক্ষীই বলেছেন যে বিমানটি খুব বেশী হলে ৩০ মিটার উপরে উঠেছিল। ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতো সবচেয়ে ভালভাবেই দৃশ্যটি দেখেছিলেন। তিনি উচ্চতা হিসাব করে বলেছেন, ৩০ থেকে ৪০ মিটার। ভারত সরকারের ডাইরেকটরেট জেনারেল অফ সিভিল এ্যাভিয়েসন দপ্তরের ইন্সপেক্টর শ্রী এ এম্. এন্. শাস্ত্রী, এক প্রশ্নোত্তরে বলেছেন যে বিমানটি রানওয়ে শেষ হওয়ার ৫০ মিটার আগে মাটি ছেড়ে আকাশে উঠতে শুরু করেছিল বলে ধরে নিলে, ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতোর দেওয়া ৩০ থেকে ৪০ মিটার উচ্চতার হিসাব তাঁর কাছে ঠিক বলেই মনে হয়। একটা করুণ আর্তনাদ করে বিমানটি খাড়াভাবে ঝাঁপ দিয়েছিল। বিমানের ভিতরের যাত্রীদের পরণে সীটবেল্ট ছিল না, তাই তাঁরা তাঁদের ভারসাম্য হারিয়েছিলেন। মালপত্রগুলি গড়িয়ে নীচের দিকে এসেছিল। কর্নেল হবিব-উর রহমান বলেছেন যে কিছু মালপত্রের প্যাকেট তাঁর পিঠে এসে পড়ে। ক্যাপ্টেন আরাই তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেছেন যে মাটি তাঁর দিকে ছুটে আসছিল। মেজর কোনো উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে বিমানের ইগ্‌নিশান সুইচ্‌টা বন্ধ করে বিমানটিকে আগুন থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর ভারসাম্য বজায় না থাকার দরুণ তিনি ব্যর্থ হন। তিনি দু'তিনবার তাঁর প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হন। বিমানটি

মাটিতে পড়ে বিধ্বস্ত হয় এবং তৎক্ষণাৎ বিমানের সামনের দিকে আগুন ধরে যায়। শ্রী এ. এম্. এন্. শাস্ত্রীর মতে ৫০ মিটার ওপর থেকে মাটিতে পড়তে সময় লাগে মাত্র তিন সেকেণ্ড। কর্নেল নোনোগাকির মত আরও কয়েকজন সাক্ষী বলেছেন যে বিমানটি কন্‌ক্রিটের রানওয়ের ওপর পড়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল; অপরপক্ষে, কর্নেল হবিব-উর রহমান বলেছেন যে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছিল বিমান বন্দর থেকে দু'এক মাইল দূরে। গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ার ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতোর জবানীই সম্ভবত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। তিনি বলেছেন যে বিমানটি কন্‌ক্রিট রানওয়ে থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে পড়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য মেজর সাকাই এর দ্বারা সমর্থিত হয়। মেজর সাকাই তখন তাইহোকু বিমান বন্দর প্রতিরক্ষার কম্যাণ্ড এ ছিলেন। তিনি বলেছেন যে রানওয়ে প্রান্ত থেকে ২০।৩০ মিটার দূরে তিনি বিমানটির ধ্বংসাবশেষ পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। অন্য একজন যাত্রী, মেজর টাকাহাসিও বলেছেন যে কন্‌ক্রিটের রানওয়ের ঠিক বাইরে কিন্তু বিমানবন্দরের সীমানার মধ্যে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছিল।

তাইহোকুর প্রান্ত থেকে বিমানটি যদি আকাশের নীল দিগন্তে মিলিয়ে যেত তবে বুঝি অনেক ভাল হত। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভাবনায় মানুষ শুধু অনেক কল্পনার জাল বুনত। কিন্তু তা হয় নি। তাইহোকুর প্রান্তে বিমানটি হঠাৎ মাটির বুকে নেমে এসে ছড়িয়ে দিল এক রাশি ধুলো। তাইহোকুর অনেকটা মাটি হঠাৎ মিশে গেল আকাশে বাতাসে। পরিবেশটা কেমন যেন আলো আঁধারে ছেয়ে গেল। ঐ পরিবেশের ছাপ বুঝি ওখানে যাঁরা ছিলেন তাঁদের ওপরই পড়েছিল আর যাঁরা ওখানে যান তাঁদেরও বুঝি রেহাই নেই। ওখানকার মানুষগুলিকে তাই কেমন যেন খাপছাড়া লাগে। মনে হয় ওঁরা বুঝি কোন এক অন্য জগতের মানুষ, যেখানে আছে শুধু আত্মত্যাগের সুখতৃপ্তি। ওঁরা যা বললেন তার মধ্যে অনেক কিছু না বলা থেকে

যায়, এবং ঐ না বলা অধ্যায়টুকু জুড়ে নিলে সৃষ্টি হয় এক মহাকাব্য। যে কাব্যচরিত্রগুলি প্রাণবন্ত এবং একে অন্যের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অথচ তাঁরা একই পরিবারভুক্ত।

তাইহোকুর প্রান্তে ১৮ই আগস্ট যে ঘটনা ঘটেছিল তার শুরু থেকেই বৈচিত্রের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখা যায়। হতভাগ্য ও সৌভাগ্যবান যাত্রীদের নিয়ে ঐ ভারী বোমারু বিমানটি কতটা ওপরে ওঠার অবকাশ পেয়েছিল প্রথমে তাই বিচার করে দেখা যাক। বিমানের ভিতরের যাত্রীরা তদন্ত কমিটির কাছে বিভিন্ন উচ্চতার কথা বলেছেন। তবে বেশীরভাগ সাক্ষীই তাঁদের হিসাব পেশ করেছেন, ৩০ মিটারের মত। কর্নেল নাকামুরা তাঁর জবানীতে ৩০ থেকে ৪০ মিটারের (১২০ ফিট) মত-উচ্চতার কথা বলেছেন। শ্রীসুরেশচন্দ্র বসুর লেখা থেকে জানা যায় যে কর্নেল রহমান উচ্চতা সম্বন্ধে প্রথমে কয়েকশ' ফিটের কথা বলেন ও পরে তা সংশোধন করে নিয়ে এক হাজার ফিট বা তারও বেশী উচ্চতার কথা বলেন। ক্যাপ্টেন আরাই এর হিসাবমত ৫০০ মিটার (১৬০০ ফিট) উচ্চতায় বিমাটি উঠেছিল। কর্নেল নোনোগাকির মতে উচ্চতা ছিল ২০ মিটারের (৬০ ফিট) মত। মেজর কোনোর মতে উচ্চতা ছিল ৩০ মিটারের (১০০ ফিট) মত। বিমানটি ঠিক কত ওপরে উঠেছিল তা সাক্ষীদের অনেকেই বলেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের মধ্যে দু'টি দল পরিষ্কারভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। একদল বিমানের উচ্চতা ৬০ থেকে ১৫০ ফিটের মধ্যে ছিল বলে দাবী করেছেন, আর অন্যদল দাবী করেছেন ১০০০ থেকে ১৬০০ ফিটের মধ্যে ছিল। বিমানটি কতক্ষণ আকাশে ছিল তাও বিচার করে দেখা দরকার। ক্যাপ্টেন নাকামুরার জবানীমতে বিমানটি আকাশে ওঠামাত্র বিমান থেকে কিছু একটা ভেঙ্গে নীচে পড়ে যায়। শ্রীবসুর লেখা থেকে জানা যায় যে কর্নেল রহমান বলেছেন যে বিমানটি ৫।৬ মিনিট ধরে আকাশে ছিল। দু'জনের জবানী থেকে বিমানটির আকাশে থাকার সঠিক সময় নির্ধারণ করা যায় না।

তাইহোকুর আকাশে কর্নেল রহমান হঠাৎ কামানের গোলার আওয়াজের মত একটা আওয়াজ শুনেছিলেন বলে তদন্ত কমিটিকে জানান। ক্যাপ্টেন নাকামুরা তদন্ত কমিটির কাছে যে জবানী দিয়েছেন তাতে কোন আওয়াজ শুনেছেন বলে জানান নি। ক্যাপ্টেন আরাই তাঁর জবানীতে বলেন যে তিনি দু'টো জোর আওয়াজ শুনেছিলেন। কর্নেল নোনোগাকি বলেছেন যে তিন চারটে জোর আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। লেঃ কর্নেল সাকাই এর লিখিত বিবৃতিতে কোন বিস্ফোরণ বা জোর আওয়াজের কথা বলা ছিল না।* সাক্ষীদের বিবৃতি থেকে সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হয় যে সত্যই কোন আওয়াজ হয়েছিল কি না। তবে বিমান থেকে কোন অংশ ভেঙ্গে নীচে পড়লে কোনরকম আওয়াজ হওয়াটা স্বাভাবিক সুতরাং ধরে নেওয়া যাক আওয়াজ হয়েছিল। কিন্তু বিমান থেকে কি জিনিষ নীচে পড়ে গিয়েছিল? তদন্ত কমিটি জানিয়েছেন যে বিমানের প্রপেলার ও বাঁ দিকের ইঞ্জিন ভেঙ্গে পড়েছিল। ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতো লক্ষ্য করেছিলেন যে বিমান থেকে নীচে পড়ে যাওয়া জিনিষটি ছিল বিমানের প্রপেলার। মেজর কে. সাকাই বিমান বন্দরে এসে বিমানের বাঁ দিকের ইঞ্জিনটি মাটিতে পোঁতা অবস্থায় দেখেছিলেন। ক্যাপ্টেন নাকামুরা বলেছেন প্রপেলার এর কথা আর মেজর কে. সাকাই বলেছেন ইঞ্জিনের কথা। বিমানের ইঞ্জিন আর প্রপেলার এক জিনিষ নয়। দু'জনেই ঘটনাস্থলে এসেছিলেন কিন্তু একই জিনিষ দু'জনে দেখেন নি, এমন ঘটনা বিশ্বাস করা কষ্টকর। তদন্ত কমিটি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে এঁদের দু'জনের জবানীর সমন্বয় এনে দিয়েছেন। কিন্তু আরও একটু গোলযোগ রয়েছে। নেতাজী তদন্তকমিটির সদস্যগণ শ্রীআয়ারের লেখা বই পড়েছেন বলে জানা যায়। সুতরাং একথা সত্য

---

*'...no mention about an explosion or a loud noise or bang, or the propeller or the engine of the left side falling off···Dissentient Report P. 199

যে তাঁরা ঐ বইয়ে লেখা কর্নেল রহমানএর বিবৃতিও পড়েছেন। ঐ বিবৃতির অংশ বিশেষ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কর্নেল রহমান বলেন, "আমরা তখন সবেমাত্র রানওয়ে পার হয়েছি এবং দু'তিনশ ফিট উঁচুতে উঠেছি। আমাদের বিমান তখন বিমান বন্দরের সীমানায়। দু'এক মিনিটের জন্য আমরা আকাশে ছিলাম।" তারপর এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। কি ঘটল তা কর্নেল রহমান বুঝতে পারছিলেন না। তিনি ভেবেছিলেন যে তাইহোকু থেকে আকাশে ওঠার সময় হয়তো শত্রুপক্ষের কোন বিমান তাঁদের খুঁজে বার করেছে এবং ছোঁ মেরে নীচে নেমে এসে নির্ভুল নিশানায় তাক করে গুলি করেছে। এবার পাইলট কি করবেন? তিনি কি বিমানটিকে নীচে নামিয়ে আনতে পারবেন? বিমানটি কি মাটিতে পড়ে বিধ্বস্ত হবে? আসলে কিন্তু আসে পাশে কোন শত্রু বিমান ছিল না। কর্নেল রহমান এর ভাষায়—"আমি পরে জানতে পেরেছিলাম যে বাঁ দিকের ইঞ্জিনের একটি প্রপেলার ভেঙ্গে গিয়েছিল। বাঁ দিকের ইঞ্জিনটি অকেজো হয়ে গিয়েছিল। শুধু স্টার বোর্ডের ইঞ্জিনটি তখনও কাজ করছিল। ইতিমধ্যে বিমানটি কাঁপছিল এবং বিমানের পাইলট স্টার বোর্ড ইঞ্জিনের ওপর বিমানের ওজনের ভারসাম্য বজায় রাখার চরম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যথেষ্ট তাড়াতাড়ি আমরা নীচে নেমে আসছিলাম। আমি চারপাশ দেখে নেতাজীর দিকে তাকালাম। তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিলেন। বিমানটি যদি বহু পথ পার হয়ে এসে নির্বিঘ্নে অবতরণ করত তাহলেও বোধহয় তাঁকে এর চেয়ে বেশী ধীর স্থির দেখাতো না। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে তিনি আমার মুখে নিদারুণ বেদনার ছাপ দেখেছিলেন। আমি এই ভেবে অবাক হই যে তখন সত্য আমি কিছু ভেবেছিলাম কি না। তবে, আমি নিশ্চয় ভেবেছিলাম যে মৃত্যু ঘনিয়ে আসতে আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড বাকি। এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বিমানটি খাড়াভাবে পড়ে বিধ্বস্ত হয় এবং কিছুক্ষণের জন্য আমি জ্ঞান হারাই।" কর্নেল রহমান এর এই জবানী

থেকে বাঁ দিকের ইঞ্জিন অকেজো হয়ে যাওয়ার কথা জানা যায়, ভেঙ্গে মাটিতে পড়ার কথা তিনি বলেন নি। শ্রীআয়ার এর কাছে জবানীতে তিনি ২০০ থেকে ৩০০ ফিট ওপরে ওঠার পর আওয়াজ শোনা যাওয়ার কথা বলেছেন এবং আকাশে দু' এক মিনিট থাকার পর এই ঘটনা ঘটেছিল বলে জানান। কমিটির কাছে দেওয়া বিবৃতির সঙ্গে এই বিবৃতির তফাৎ অনেক। কমিটি কর্নেল রহমান এর তাইপে থেকে দেওয়া লিখিত বিবৃতিও প্রয়োজনে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এই বিবৃতির কোন উল্লেখ করেন নি। বিমানটির আকাশ থেকে মাটিতে নেমে আসতে সময় লেগেছিল মাত্র তিন সেকেণ্ড। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে মেজর কোনো দু'তিনবার বিমানের ইগ্নিসন সুইচ বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। পাইলট বিমানটির ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছিলেন এবং কর্নেল রহমান নেতাজীর মুখের ভাব লক্ষ্য করেছিলেন। কর্নেল রহমান নেতাজীর পিছনে বসেছিলেন বলে দাবী করেছেন। বিমানটি মাটিতে নেমে আসতে থাকলে নেতাজী সম্পূর্ণ অবিচল থেকেও তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন বলে তিনি জানিয়েছেন। সবই বিশ্বাস করতে হবে এবং সবাব জবানীই বিশ্বাস করার যোগ্য, কারণ ওঁরাই হচ্ছেন ইতিহাসের সাক্ষী।

কমিটি সাক্ষীদের জবানীর মধ্যে যেখানেই অসঙ্গতি দেখেছেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেখানেই সঙ্গতি এনে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যেখানে বিবৃতির মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছেন তখনই তা বর্জ্জন করেছেন। তাই লেঃ কর্নেল টি. সাকাইর লিখিত বিবৃতির গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতো মাটিতে দাঁড়িয়ে বিমানটিকে বাঁ দিকে হেলে পড়তে দেখেছিলেন, কিন্তু লেঃ কর্নেল সাকাই বিমানের মধ্যে বসে উপলব্ধি করেছিলেন যে বিমানটি ডান দিকে কাত হয়েছিল। বিমানের বাইরের প্রত্যক্ষদর্শীরা ও বিমানের যাত্রীদের অনেকেই প্রপেলার বা ইঞ্জিন ভেঙ্গে পড়তে দেখেছিলেন কিন্তু লেঃ কনেল সাকাই দেখেছিলেন যে

বিমানের পিছন দিকের চাকাটা হঠাৎ বৃত্তাকারে বাঁ দিকে ছিট্‌কে চলে যায়। এই দেখেই তিনি জ্ঞান হারান। সাক্ষীদের এমন জবানী পাওয়ার পরও আমরা খুঁজে বেড়াই প্রপেলার ও ইঞ্জিন ভেঙ্গে যাওয়ার পর কি হ'ল। বিমানটি আকাশ থেকে নেমে এসে মাটিতে পড়ল। সাক্ষীরা সবাই একবাক্যে বলেছেন যে বিমানে কোন আসন ব্যবস্থা ছিল না এবং সবাইকে মেঝেতে হাত পা ছড়িয়ে বসতে হয়েছিল। বিমানটি যে খাড়াভাবে নীচে নেমে এসে মাটিতে পড়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল তাতে সাক্ষীরা দ্বিমত নন। যে বিমানের যাত্রীরা মেঝেতে হাত পা ছড়িয়ে বসেছিলেন সেই বিমান খাড়াভাবে নীচে নামতে আরম্ভ করলে যাত্রীরা কে কোথায় থাকবেন? কমিটি অনুভব করেছেন যে বিমান খাড়াভাবে নেমে এলে যদি যাত্রীদের সীট বেল্ট না থাকে তাহলে তাঁরা বেসামাল হয়ে পড়বেন। কর্নেল রহমান এর পিঠের ওপর বিমানের মালপত্র এসে পড়েছিল তাই রিপোর্টে লেখা হয়েছে। কিন্তু শ্রীআয়ারের কাছে কর্নেল রহমান যে জবানী দিয়েছিলেন তাতে তিনি জানিয়েছিলেন যে কয়েক সেকেণ্ড পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি বুঝতে পারেন যে বিমানের মালপত্র তাঁর পিঠের ওপর এসে পড়েছে। বিমানটি যখন মাটিতে নেমে আসছিল তখন বিমানের যাত্রীদের মধ্যে মেজর কোনো একটা সুইচ বন্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন। কর্নেল রহমান নেতাজীর দিকে দেখ-ছিলেন। নেতাজীও তাঁকে দেখেছিলেন আর লেঃ কর্নেল সাকাই অজ্ঞান হয়ে বিমানের মেঝেতে পড়েছিলেন। বিমান খাড়াভাবে নেমে আসার সময় মালপত্র গড়িয়ে এসেছিল বলে তদন্ত কমিটিও তদন্ত করে বার করেছেন কিন্তু বিমানের যাত্রীরা কেউই কারও গায়ের ওপর এসে পড়েন নি বা গড়িয়ে বিমানের ককৃপিটের দিকে চলে যান নি তাও নিশ্চয় তদন্ত কমিটি জানতে পারেন। কর্নেল রহমান শুধু নন, অন্য যে কোন যাত্রীর সঙ্গে যদি অন্য যাত্রীর ধাক্কা লাগত তাহলে ঘটনার স্বাভাবিকতা বজায় থাকত। কিন্তু তেমন কোন সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।

নীল আকাশের পালা শেষ করে বিমানটি পৃথিবীর মানুষগুলিকে নিয়ে মাটিতে নেমে এলো। এখানেও আবার অনেক প্রশ্নের আনা-গোনা। ঠিক কোথায় বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছিল। কর্নেল নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতোর মত নির্ভরযোগ্য সাক্ষী, যিনি আগাগোড়া বিমানটির গতিবিধি শ্যেন দৃষ্টিতে লক্ষ্য রেখেছিলেন তিনি বিমানটিকে রানওয়ে থেকে ১০০ মিটার দূরে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। লেঃ কর্নেল নোনোগাকি বলেছেন যে বিমানটি রানওয়ের ওপর বিধ্বস্ত হয়েছিল। কর্নেল হবিব-উর রহমান বলেছেন যে বিমানটি বিমান বন্দরের বাইরে এক থেকে দু'মাইল দূরে বিধ্বস্ত হয়েছিল। মেজর টাকাহাশি বলেছেন যে বিমান বন্দরের কন্‌ক্রিট রানওয়ের ঠিক বাইরে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছিল। বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার পরে বিমান বন্দরে এসে মেজর সাকাই রানওয়ে থেকে ২০।৩০ মিটার দূরে বিমানটি পড়ে থাকতে দেখেন। এই বক্তব্যগুলি থেকে বিমানটি ঠিক কোথায় পড়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল তা সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় না। কর্নেল রহমান এর বিবৃতির এই অংশটুকুর ওপর তদন্ত কমিটি খুব গুরুত্ব আরোপ করেছেন বলে মনে হয় না। ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতোর জবানীর ওপর তাঁরা যথেষ্ট নির্ভর করেছেন বলে বোঝা যায়। মেজর সাকাইর জবানী নাকি ক্যাপ্টেন নাকামুরার বিবৃতিকে সমর্থন করেছেন। মেজর টাকাহাশির বক্তব্যও এঁদের বিবৃতির কাছ ঘেসেই রয়েছে। কন্‌ক্রিট রানওয়ের ঠিক বাইরে, কন্‌ক্রিট রানওয়ের শেষ প্রান্ত থেকে ২০।৩০ মিটার দূরে এবং কন্‌ক্রিট রানওয়ে থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে, এই তিন বক্তব্যের মধ্যে মিল কোথায়? বিমান বন্দরের সীমানার মধ্যেই বিমান দুর্ঘটনা হয়েছিল বলে এরা দাবী করেছেন কিন্তু এঁদের ঘটনা-স্থল সম্বন্ধে বিবৃতিতে ফারাক অনেক। মেজর সাকাই ও ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতো তাইহোকু বিমান বন্দরে এসে দাঁড়িয়ে দুর্ঘটনার অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলে প্রকাশ। এঁরা

কেউই কিন্তু বিমানের যাত্রী ছিলেন না। এঁদের দু'জনের বক্তব্যের সামঞ্জস্য কিভাবে খুঁজে পাওয়া গেল? রানওয়ে থেকে একশ মিটার দূরে আর ২০।৩০ মিটার দূরে এই দু'টি বক্তব্যের মধ্যে তফাৎ অনেকটা পথের। কিন্তু তদন্ত কমিটি শেষ পর্য্যন্ত এই গোলযোগের সমাধান বার করতে সফল হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীসুরেশ চন্দ্র বসু লিখেছেন যে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীশাস্ত্রীকে প্রশ্ন করেন যে কিছু সাক্ষীদের বিবৃতির মধ্যে অসংলগ্নতা রয়েছে। তাঁর (শ্রীশাস্ত্রী) কাছে সাক্ষীদের যে বিবৃতিগুলি এবং অন্যান্য তথ্য প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, তা থেকে একজন বিমান বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি কোন্ বিবৃতি বা বিবৃতিগুলি যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন? উত্তরে শ্রীশাস্ত্রী জানান যে সমস্ত ঘটনা সামগ্রিকভাবে বিচার করলে, মেজর কোনোর বক্তব্যের শেষ অংশটুকু, যেখানে বিমানটি কিভাবে মাটিতে পড়েছিল তা বলা হয়েছে ঐটুকু বাদ দিয়ে, মেজর কোনোর বিবৃতি ও ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতোর বিবৃতি তাঁর মতে যুক্তিযুক্ত। এমন যুক্তি সত্যই উপভোগ্য। শ্রীবসু বলেছেন এ এক মজার ব্যাপার।* জনৈক সাক্ষীর বিবৃতির কোন অংশ যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করা হবে, এহং বাকি অংশ অযৌক্তিক বলে বর্জ্জিত হবে, এমন সিদ্ধান্ত সত্যই অকল্পনীয়। নেতাজী তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান সম্বন্ধে শ্রীবসু বলেছেন যে—"The intention of the Chairman was "Anyhow" to come to the finding that the plane actually crashed and that Netaji died as a result therefrom and that in pursuance of this intention or this, he regulatnd his conduct to the best of his

---

* I am constrained to state that this is a funny manner of believing only one portion and disbelieving the remaining portion of the statement of a witness relating entirely to the same simple point viz., the manner in which the plane crashed to the ground. Dissentient Report. P. 109-110

abilities.* তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান যেভাবেই হোক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছিলেন যে বিমানটি সত্যই বিধ্বস্ত হয়েছিল, এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র ঐ দুর্ঘটনায় নিহত হন। শ্রীবসুর মন্তব্যের যথার্থতা যেন সমস্ত বিবরণের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত তাইহোকু পর্বের কোথাও সাক্ষীদের মতৈক্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না অথচ সবাই প্রত্যক্ষদর্শী।

তদন্ত রিপোর্টের দ্বাদশ অনুচ্ছেদে কমিটি লিখেছেন যে বিমানটি খাড়াভাবে নীচে নেমে এসে বাঁ দিকে কাত হয়ে পড়ে বিধ্বস্ত হয় এবং বিমানের সামনের দিকে আগুন ধরে যায়। সাক্ষীদের জবানী থেকে জানা যায় যে বিমানটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দু'ভাগে ভেঙে পড়ে। ক্যাপ্টেন আরাই, লেঃ কর্নেল নোনোগাকি এবং মেজর কোনো বলেছেন যে মাটিতে পড়ে বিমানটি ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে যায়। বিমানটির ঠিক কোন অংশে ভেঙ্গে দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় তা তাঁরা নক্সা এঁকে বুঝিয়েছেন। দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার ঠিক পরেই মেজর সাকাই ঘটনাস্থলে এসে বিমানের ধ্বংসাবশেষ দেখেছিলেন। তিনিও এই বক্তব্য সমর্থন করেন। অপরপক্ষে কর্নেল হবিব-উর রহমান এর মতে বিমানটি সামনের দিকে ভেঙ্গে টুক্‌রো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতো দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে বিমানটি অক্ষত অবস্থায় ছিল, কোথায়ও ভাঙ্গেনি। তিনি অবশ্য আরও বলেন যে আগুন বিমানের সামনের দিকেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিমানটি মাটিতে পড়ার দরুণ তার কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং সাক্ষ্য প্রমাণের গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে এবং সম্ভাবনা বিচার বিবেচনা করে বিশ্বাস করে নেওয়া যেতে পারে যে ফিউজলেস-এর পিছন দিকেও বড় রকমের ক্ষতি হয়েছিল। বিমানের অন্য কোন জায়গা ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গিয়ে থাকলেও থাকতে পারে। বিমানের ভগ্নাবশেষ এর ছবি পরীক্ষা করে মনে হয় না যে

* Ibid P. 109

বিমানের কোন ভাঙ্গা অংশ আলাদা হয়ে পড়েছিল, তাছাড়া কর্নেল নোনোগাকি যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে বিমানের দু'টো ভাঙ্গা অংশ দু'দিকে ছিট্‌কে চলে গিয়েছিল তারও কোন সমর্থন পাওয়া যায় না।

আকাশ থেকে কোন বিমান খাড়াভাবে মাটিতে পড়লে তার কোন ক্ষয়ক্ষতি হবে না এমন কথা কেউই বলবেন না। সাক্ষীরা সবাই খাড়াভাবে বিমানটিকে নীচে নেমে আসতে দেখেছিলেন এবং তারপর কি ঘটেছিল তাও হলপ করে ব্যক্ত করেছেন। কমিটির কাছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষী হলেন ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতো। বিমান বন্দরে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি বিমানটিকে মাটিতে নেমে আসতে দেখেছিলেন। মেজর সাকাই দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার খানিক পরেই বিমান বন্দরে এসে বিমানের ভগ্নাবশেষ দেখেছিলেন। বিমানের ভগ্নাবশেষ এর কথা অনেকেই দেখেছেন বলে বলেছেন, কিন্তু ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতো বিমানটিকে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় দেখেছিলেন বলে নিশ্চয়তার সঙ্গে বলেছেন। বিমানটির তাইহোকু বিমানবন্দরে আসার পর থেকে মাটিতে পড়ে বিধ্বস্ত হওয়া পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতোর জবানী তদন্ত কমিটির কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। বিমান বিশেষজ্ঞ শ্রীশাস্ত্রীও ক্যাপ্টেন নাকামুরার জবানী যুক্তিযুক্ত বলে মতামত পেশ করেছেন, কিন্তু এক্ষেত্রে, অর্থাৎ বিমানটি সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল তা বিশ্বাস-যোগ্য নয়। আকাশ থেকে মাটিতে পড়লে বিমানের কোন ক্ষতি হবে না তা হতেই পারে না। ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতোর জবানীর ঐ কথাটুকু বিশ্বাসযোগ্য নয়। বিমানের ইঞ্জিন অকেজো হয়ে মাটিতে পড়লে ক্ষয়ক্ষতির প্রশ্ন অবশ্যই আসে কিন্তু যদি তেমন কোন ঘটনা না ঘটে থাকে তবে ক্ষয়ক্ষতির প্রশ্নই ওঠে না। তদন্ত কমিটি অনেক সম্ভাবনার কথা বিচার করে দেখেছেন কিন্তু অনেক কিছু বুঝেও বুঝতে চান নি। কমিটি তদন্ত করে জেনেছেন যে বিমানটি খাড়াভাবে নীচে নেমে এসে বাঁ দিকে কাত হয়ে পড়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল, কিন্তু

মেজর কোনো বলেছেন যে বিমানটি ডান দিকে কাত হয়ে পড়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং ডান দিকের পাখাটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।* বিমান বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে মেজর কোনোর বিবৃতি নির্ভর যোগ্য। কিন্তু, কোন্ দিকে কাত হয়ে পড়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল সেই প্রমাণের জন্য মেজর কোনোর বিবৃতির ওপর নির্ভর করা হয় নি। এঁদের ত্ব'জনকে বাদ দিলে থাকেন ক্যাপ্টেন আরাই, লেঃ কর্নেল নোনোগাকি, কর্নেল রহমান ও অন্যেরা। নক্সা এঁকে এঁদের অনেকেই বোঝাতে চেয়েছেন ঠিক কোন জায়গা থেকে বিমানটি ত্ব'টুকরো হয়ে গিয়েছিল। এঁদের মতৈক্য দেখা গেছে ত্ব'টুকরো হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে, কিন্তু ঠিক কোন্ জায়গা থেকে বিমানটি ত্ব'টুকরো হয়ে যায় সে বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শীরা একই জায়গা দেখান নি। কর্নেল রহমান বলেছেন যে বিমানের সামনের দিক ভেঙ্গে টুক্‌রো হয়ে গিয়েছিল। অন্যেরা বিমানের মাঝামাঝি বা পিছন দিক ভেঙে টুক্‌রো হয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। লেঃ কর্নেল নোনোগাকি জানিয়েছেন যে বিমানটি ভেঙে ত্ব'টুকরো হয়ে যায় এবং ত্ব'টুক্‌রো ত্ব'দিকে ছিট্‌কে চলে যায়। কিন্তু মেজর টাকাহাশি বলেছেন যে রানওয়ের বাইরের বিমানটি মাটিতে পড়ে এবং তারপর স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়ায়।** মেজর টাকাহাশির বক্তব্য থেকে প্রমাণ হয় না যে বিমানটির কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। তাইহোকুর প্রান্তে তথাকথিত বিমানটি মাটিতে নেমে থাকলে তার কি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তা সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়নি। বিমানটির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়ে যে ছবি তদন্ত কমিটির রিপোর্টের পাওয়া যায়, তা কর্নেল রহমান পেশ করেছেন বলে জানা যায়। ছবিতে একটি

---

* The plane then crashed on its right side and the right wing was completely smashed. Dissentient Report. P, 105

** The plane tilted to the left side and crashed on the ground in front of and outside the runway and then came to its normal position which he has shown clearly in his sketch. Dissentient Report P. 104

বিমানের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু কর্নেল রহমান তাঁর জবানীতে বলেছিলেন যে সমতল ভূমির ওপর পড়ে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছিল। যে ছবি প্রমাণ হিসাবে তিনি দাখিল করেছেন তাতে পাহাড়ী এলাকায় বিমানের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ঐ ছবিতে রানওয়ে বা বিমান বন্দরের কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় নি। কর্নেল রহমান অবশ্য নিজে ছবিগুলি তোলেন নি, ওগুলি জাপানীদের তোলা। এমন বিচিত্র সাক্ষ্য প্রমাণের ওপর নির্ভর করে কিভাবে বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল বলে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় তা বোঝা দুষ্কর। ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতো, মেজর সাকাই, কর্নেল রহমান, মেজর কোনো, লেঃ কর্নেল নোনোগাকি, মেজর টাকাহাশি, ক্যাপ্টেন আরাই, প্রমুখ ব্যক্তিরা স্বচক্ষে বিমানের দুর্দশা দেখেছিলেন। সুদীর্ঘ এগার বছর পার হয়ে যাওয়ার দরুণ সময়ের খানিকটা গোলমাল হলেও হতে পারে কিন্তু যে দৃশ্য তাঁরা দেখেছিলেন তা নিশ্চয় ভুলে যাওয়ায় কথা নয়। সবাই একই দৃশ্য দেখেছিলেন কিন্তু একের জবানীর মধ্যে অনৈক্য প্রমাণ করে যে আসলে যা ঘটেছিল তা তাঁরা দেখেন নি, যা তাঁদের বলতে বলা হয়েছে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে তাঁরা তাই বলেছেন।

আর এ সম্বন্ধে অর্থাৎ সাক্ষ্যগুলির অসামঞ্জস্য বিষয়ে কমিটির আগ্রহান্বিত সাফাই গাওয়া সমন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে এমন একটা জীবনসংশয়কর বিপর্যয়মূলক ঘটনা নেহাৎ মস্তিষ্ক বিকৃত না হলে মাত্র এগার বৎসর ব্যবধানে ভুলে যেতে পারে না।

৯

দ্বিতীয় পর্বের ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদে নেতাজী তদন্ত কমিটি বিমান যাত্রীদের ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ দিয়েছেন। ঐ বিমান দুর্ঘটনায় বিমান যাত্রীদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল? বিমান দুর্ঘটনা বিভিন্ন যাত্রীকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। বিমান দুর্ঘটনা থেকে নাকি সাতজন রক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁদের পাঁচজনকে কমিটি জেরা করেন এবং ষষ্ঠ ব্যক্তি লেঃ কর্নেল টি. সাকাই এর লিখিত জবানী পান। লেঃ কর্নেল নোনোগাকি বিমানের টারেট এ বসেছিলেন এবং তিনিই সবচেয়ে ভাগ্যবান বলে প্রমাণিত হয়েছেন। বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার পর তিনি প্রায় অক্ষত অবস্থায় বিমানের বাইরে নিক্ষিপ্ত হন। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি দৌড়ে জ্বলন্ত বিমান থেকে দূরে চলে যান এবং একটা পাথরের স্তূপের আড়ালে আশ্রয় নেন। বিধ্বস্ত বিমানটি শেষ পর্যন্ত ওখানে এসেই থেমে যায়। লেঃ কর্নেল সাকাই, মেজর টাকাহাশি এবং ক্যাপ্টেন আরাই বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়া মাত্র জ্ঞান হারান, কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসামাত্র বুঝতে পারেন যে তাঁরা মাটিতে শুয়ে আছেন এবং তাড়াতাড়ি জ্বলন্ত বিমান থেকে সরে যান। পরিষ্কার বোঝা যায় যে তাঁরা বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। এর ফলে তাঁরা আঘাত পান এবং অগ্নিদগ্ধ হন। লেঃ কর্নেল সাকাই বিবৃতি দিয়েছেন যে তাঁর মাথা ও অন্য অনেক জায়গা ছড়ে গিয়েছিল এবং মুখ ও হাত পুড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা গুরুতর ছিল না। মেজর টাকাহাশির পায়ের গোড়ালি মোচ্‌কে গিয়েছিল। ক্যাপ্টেন আরাই এর আঘাত গুরুতর ছিল। তাঁর মুখের ডান দিক, দু'হাতেরই ওপর দিকটা এবং সামনের দিক পুড়ে গিয়েছিল। এগার বছর পরেও তিনি যখন কমিটির সামনে হাজির হন তখন এই পোড়া দাগগুলি দেখা যাচ্ছিল।

মেজর কোনো যে খুবই সচেতন ছিলেন এবং সবই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করেছিলেন তা পরিষ্কার বোঝা যায়। বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার মুহূর্তে মেজর কোনো বিচলিত না হয়ে সম্পূর্ণ সচেতন থেকে লক্ষ্য করেছিলেন যে অন্যেরা কি করছিলেন। তিনি বলেছেন "বিমানটি যখন মাটিতে পড়ছিল তখন বিমানের ভিতরের পেট্রল ট্যাঙ্কটা পড়ে যায় এবং এগিয়ে আমার ও মিঃ বোস এর মাঝখানে আসে। আমি পিছনদিকে তাকিয়ে ছিলাম কিন্তু এই ট্যাঙ্কটার দরুণ মিঃ বোসকে দেখতে পাই নি। বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার পর আমি জেনারেল সিডিকে দেখতে পেয়েছিলাম। তাঁর মাথার পিছনদিকে একটা কাটা ক্ষত হয়েছিল। যে ষ্টিয়ারিং দিয়ে মেজর টাকিজাওয়া অপারেট করছিলেন তার দ্বারাই মুখে ও কপালে আঘাত পেয়েছিলেন। এন্. সি. ও. আয়োগি বুকে আঘাত পেয়েছিলেন। তাঁর রক্ত ঝরছিল এবং তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। আমার ও এন্. সি. ও. আয়োগির মাঝখানে আর একজন ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। তাঁর ভাগ্যে কি ঘটেছিল তা আমি জানি না। ইতিমধ্যে ভীষণভাবে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং আগুনের তাপ সহ্য করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। আমি বিমানের ওপরকার প্লাষ্টিকের ঢাকনা ভেঙ্গে ফেলি এবং সেখান দিয়ে বাইরে চলে আসি। আগুনের প্রকোপ এত বেশী ছিল যে বাইরে আসার সময় আমাকে দু'হাত দিয়ে চোখ দু'টো বাঁচাতে হয়েছিল, যার ফলে আমার হাত, মুখ ও পা পুড়ে গিয়েছিল। আমি যখন বাইরে আসছিলাম তখন একটা নল থেকে ছিটকে আসা পেট্রলে আমার গা ভরে যায়। ঐ নলটা পেট্রল ট্যাঙ্কের সঙ্গে বিমানের ইঞ্জিনকে জুড়ে দিয়েছিল। ঐভাবে ছিটকে পরা পেট্রলে আগুন ধরে যায়। আমি প্রায় ৩০ মিটার পথ দৌড়ে চলে যাই এবং তারপর মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলি। সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার বাইরের জামা কাপড়ও খুলে ফেলি, কারণ তাতেও আগুন লেগে গিয়েছিল। এইভাবে, আমি আমার শরীরে যে আগুন জ্বলছিল তা নিভিয়ে

ফেলেছিলাম।" এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে মেজর কোনো ১৮ মাস চিকিৎসাধীনে ছিলেন এবং সুদীর্ঘকাল চিকিৎসার পরও এগার বছর পর যখন তিনি কমিটির সামনে হাজির হন তখন তাঁর মুখের চামড়া ভীষণভাবে পোড়া দেখাচ্ছিল। তিনি সবগুলি দাঁতই হারিয়েছেন এবং নকল দাঁত লাগিয়েছিলেন। তাঁর ডান হাতের চারটে আঙ্গুল অর্থাৎ বুড়ো আঙ্গুল ছাড়া বাকি কটা আঙ্গুলের ক্ষতি হয় এবং বিকৃত হয়ে যায়। তিনি, তাঁর ডান হাত মুঠো করতে পারতেন না। তাঁর বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলটারও ক্ষতি হয় এবং ঐ হাতও ভালভাবে মুঠো করতে পারতেন না। তাঁর দু'টো হাতই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। মেজর কোনোর হাত দু'টোর ছবি তোলা হয়। ঐ ছবিই ঘটনার সাক্ষী।

কোন দুর্ঘটনা ঘটলে সবাই সমানভাবে কখনই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কয়েকজন ভাগ্যবান অল্পের জন্য বেঁচে যান। লেঃ কর্নেল নোনোগাকি ঐ রকম ভাগ্যবানদের একজন। অক্ষত অবস্থায় তিনি বিমানের বাইরে ছিটকে পড়েন। ভাগ্যবানদের দ্বিতীয় তালিকায় নাম ওঠে লেঃ কর্নেল সাকাই, মেজর টাকাহাশি ও ক্যাপ্টেন আরাই এর। এঁরা বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়েছিলেন, কিন্তু জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পরই বুঝেছিলেন যে মাটিতে শুয়ে আছেন। এই চারজন যাত্রীই কমবেশী আহত হন এবং আগুনে পুড়ে যান। বিমান থেকে ছিটকে বাইরে পড়লে আঘাত লাগা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু ওঁদের আগুন লাগল কি করে? অবশ্য বিমানের আগুন যদি বিভৎসরূপ ধারণ করে তাহলে অনেক দূর পর্যন্ত তা ছড়িয়ে পড়তেও পারে। কিন্তু বিমানের যাত্রীদের শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি যে ঐ বিমান দুর্ঘটনাতেই হয়েছিল তার প্রমাণ কোথায়? সাক্ষীরা যা বলেছেন তা যদি বিশ্বাস করে নিতে হয় তাহলে অসঙ্গতি আরও বেড়ে যায়। ক্যাপ্টেন আরাই বলেছিলেন যে প্রায় ৫০০ মিটার অর্থাৎ ১৬০০ ফিটের মত ওপর থেকে বিমানটি পড়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল। তাঁর ঐ জবানী তদন্ত কমিটি সমর্থন করেন নি, কিন্তু তাঁর শারীরিক ক্ষয়ক্ষতির বিষয় মেনে

নিয়েছেন। মেজর কোনো যে বিবৃতি দিয়েছেন তারও অংশ বিশেষ কমিটি গ্রহণ করেছেন, বাকিটা বর্জন করেছেন। তিনি বলেছেন যে বিমানটি ডান দিকে কাত হয়ে পড়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল, কিন্তু ঐ বক্তব্য কমিটির কাছে যুক্তিযুক্ত হয়নি। তাঁর বিবরণের বাকি অংশ কমিটি যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করেছেন। মেজর কোনো যে বক্তব্য রেখেছেন তা পড়তে পড়তে মনে হয় নিউটন বেঁচে থাকলে তাঁকে যথেষ্ট চিন্তায় পড়তে হ'ত। বিমানটি যে খাড়াভাবে নীচে নেমে এসেছিল তাতে কোন সাক্ষীই দ্বিমত প্রকাশ করেন নি। বিমানটি নীচে নেমে আসার সময় বিমানের ভিতরে পেট্রল ট্যাঙ্কটা গড়িয়ে মেজর কোনো ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মাঝখানে চলে এসেছিল। তাহ'লে ধরে নিতে হয় যে ঐ বিমানে হয় আলাদা একটা পেট্রল ট্যাঙ্ক রাখা ছিল নয়তো বিমানের পেট্রল ট্যাঙ্কটা নাটবোল্ট দিয়ে যথাযথভাবে আটকানো ছিল না। বিমানটি খাড়াভাবে নামতে থাকার দরুণ পেট্রল ট্যাঙ্কটা গড়িয়ে গেল, কিন্তু গড়িয়ে গিয়েও বিমানের সামনে না এসে মাঝপথে থেমে যায়। এমন অবস্থা ভাবতেও একটু অসুবিধা হয়। বিমানের যাত্রীদের সঙ্গে কোন সীট বেল্ট ছিল না এবং বিমানে কোন বসার আসনও ছিল না। যাত্রীরা যে সবাই বিমানের মেঝেতে বসেছিলেন, তাও সক্ষীরা বলেছেন। যে বিমান খাড়াভাবে নীচে নেমে এসেছিল সেই বিমানের মাত্র একটা পেট্রল ট্যাঙ্ক গড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু ঐ ট্যাঙ্ক গড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে পাইলটের গায়ের ওপর পড়ে নি। মেজর কোনো বিমানের সামনের দিকে আর নেতাজী সুভাষচন্দ্র ছিলেন তাঁর পিছনে। পেট্রল ট্যাঙ্কটা গড়িয়ে পড়ে মেজর কোনোকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় নি বা তাঁকে নিয়ে বিমানের সামনে গিয়ে পড়ে নি, অথচ বিমানটি খাড়াভাবে নামছিল। এমন বিচিত্র ঘটনা সত্যই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। মেজর কোনো যে খাড়াভাবে নেমে আসা বিমানের ঠিক জায়গায় বসে থেকে কিভাবে সব শ্যেন দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছিলেন তা ভাবতেও অবাক

লাগে। অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা করে, পদার্থ বিজ্ঞানের মূলসূত্র মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে মেজর কোনো ও তাঁর সহযাত্রীরা ভুল প্রমাণ করতে সফল হয়েছেন। খাড়াভাবে নীচে বিমানের যাত্রীরা ও মালপত্র বিমানের সামনের দিকে গড়িয়ে আসবে না, এমন তথ্য পদার্থ বিজ্ঞানীরা পেলে অবশ্যই নূতন করে পরীক্ষা শুরু করে দিতেন। বিমানটি খাড়াভাবে নীচে নেমে আসার সময় কর্নেল রহমান নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন, কিন্তু নেতাজী ঠিক পিছনে বসে থাকা সত্বেও তিনি নেতাজীর গায়ের ওপর এসে পড়েন নি। বিমানটি মাটিতে পড়ে বিধ্বস্ত হওয়া মাত্র কর্নেল রহমান জ্ঞান হারান এবং জ্ঞান ফিরে আসামাত্র তিনি বুঝতে পারেন যে বিমানের মালপত্র তাঁর পিঠের ওপর এসে পড়েছিল। তাহলে বিমানটি যখন খাড়াভাবে নীচে নেমে আসছিল তখন কর্নেল রহমান এর পিঠের ওপর পিছনে বসে থাকা কোন বৈমানিক বা মালপত্র এসে পড়ে নি। মেজর কোনো বিমানটি নীচে নেমে আসার সময় তিনবার বিমানের ইগ্‌নিসন্ সুইচ্‌টা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এবং দেখেছিলেন নেতাজী ও জেনারেল সিডি কোথায় ছিলেন ও দুর্ঘটনার পরে লক্ষ্য করেছিলেন, মেজর টাকিজাওয়া, এন্. সি. ও. আয়োগি ও অন্যান্যদের কি দুর্গতি হয়েছিল। বিমানটি খাড়াভাবে নীচে নেমে আসার জন্য তিনি ভারসাম্য হারান নি। বিমানটি মাটিতে পড়ে দু'টুক্‌রো হয়ে গিয়েছিল এবং আগুনও ধরেছিল। বিমানটিতো ভেঙেই গিয়েছিল, তাহলে তিনি ভাঙা জায়গা দিয়ে না বেরিয়ে ওপরের ঢাকনা ভেঙে বেরুলেন কেন? খাড়াভাবে মাটিতে পড়ে বিমান বিধ্বস্ত হলে, তার প্লাষ্টিকের ঢাকনা অক্ষত থাকার সম্ভাবনা থাকে কি? যদি তিনি ঢাক্‌না ভেঙেই বাইরে এসে থাকেন তাহলে ঐ ঢাক্‌না কি দিয়ে ভেঙ্গেছিলেন? বিমান ভেঙ্গে পড়ার পর মেজর কোনো যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব আগুনের তাপ সহ্য করে সহযাত্রীদের দুর্দশা দেখেছিলেন, তারপর বাইরে আসার সময় আগুনের তাপ থেকে চোখ দুটো বাঁচাতে গিয়ে মুখ ও পা

পুড়েছিল। তারপর বিমানের বাইরে আসার পথে পেট্রলে ভিজে গিয়ে সমস্ত শরীরে আগুন নিয়ে প্রায় ৯০ ফিট ছুটে গিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়েছিলেন এবং তাঁর জ্বলন্ত জামাকাপড়ও খুলে ফেলেছিলেন। শুধু ওপরের জামাকাপড় খুলে ফেলতেই কাজ হয়েছিল, ভিতরের জামাকাপড় খুলতে হয় নি। আগুন গায়ে মেজর কোনো ছুটে যাওয়ায় আগুনের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু এক্ষেত্রে তেমন কিছু ঘটে নি। সবই বিচিত্র ঘটনা। কোথাও স্বাভাবিকতার লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে বলে মনে হয় না। অবশ্য বিজ্ঞানের সূত্র যেখানে ভুল প্রমাণিত হয়েছে সেখানে যা স্বাভাবিক বা যা সম্ভব তা ঘটবে বলে আশা করা যায় না। মেজর কোনোর শরীরের ক্ষত ও পোড়া দাগ সত্যই বীভৎস কিন্তু কর্নেল রহমানও নাকি নেতাজীর শরীরের আগুন নেভাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়েছিলেন। কমিটি মেজর কোনোর শরীর পরীক্ষা করেছেন বলে মনে হয়, কিন্তু কর্নেল রহমান এর শরীর দেখলে দেখতে পেতেন যে তাঁর ডান হাতের কব্জির ঠিক ওপরদিকে সামান্য পোড়ার দাগ আছে। যাঁরা কর্নেল রহমানকে দেখেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে ঐ দাগ এ্যাসিডে পোড়ার দাগ।

যাহোক, রিপোর্টের চতুর্দশ অনুচ্ছেদে কমিটি কর্নেল হবিব-উর রহমান ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পরিণামের কথা লিখেছেন। দুর্ঘটনার ঠিক পরে নেতাজী ও কর্নেল রহমান এর ভাগ্যে কি ঘটেছিল তা কর্নেল রহমান জানিয়েছেন। তাঁর ভাষায়—"কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বিমানটি মাটিতে পড়ে বিধ্বস্ত হ'ল। বিমানের সামনের অংশ ভেঙ্গে টুক্‌রো হয়ে গেল এবং আগুন ধরে গেল। নেতাজী আমার (কর্নেল রহমান) দিকে ফিরলেন। আমি বললাম, সামনের দিক দিয়ে বেড়িয়ে যান; পিছনের দিকে বেরুবার কোন রাস্তা নেই। (আগে সে নিক্‌লে, পিছে সে রাস্তা নহী হ্যায়)। আমরা বিমানের প্রবেশ পথ দিয়ে বেরুতে পারি নি কারণ ঐ পথ মালপত্র ও অন্যান্য

জিনিষের চাপে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই, নেতাজী আগুনের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ; সত্য বলতে কি, তিনি আগুনের ভিতর দিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন। ঐ জ্বলন্ত শিখার মধ্য দিয়ে আমিও তাঁকে অনুসরণ করেছিলাম। বাইরে এসে দেখলাম নেতাজী আমার থেকে মাত্র দশগজ দূরে আমার উল্টোদিকে, অর্থাৎ পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর জামা কাপড়ে আগুন ধরে গিয়েছিল। আমি ছুটে গিয়ে খুব কষ্ট করে তাঁর বুশ সার্ট বেল্টটা খুলে দিয়েছিলাম। তাঁর ট্রাউজার এ বেশী আগুন লাগে নি তাই ওটা খুলে ফেলার প্রয়োজন হয় নি। তাঁর গায়ে গরম সোয়েটারটা ছিল না। খাঁকি ড্রিলের পোষাক তাঁর পরণে ছিল। আমি তাঁকে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছিলাম এবং লক্ষ্য করেছিলাম যে তাঁর মাথায় সম্ভবত বাঁ দিকে একটা গভীর ক্ষত হয়েছিল। আগুনের তাপে তাঁর মুখ ঝল্‌সে গিয়েছিল এবং চুলগুলো আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। তাঁর মাথায় ক্ষতটা প্রায় চার ইঞ্চি লম্বা। আমি রুমাল চাপা দিয়ে তাঁর ক্ষত থেকে রক্তপাত বন্ধ করতে চেষ্টা করেছিলাম। আমার নিজের হু'টো হাতই ভীষণভাবে পুড়ে গিয়েছিল। আগুনের ভিতর দিয়ে বাইরে আসার সময় আমার মুখের ডান দিকটা পুড়ে গিয়েছিল। আমার কপাল কেটে গিয়ে রক্ত বার হচ্ছিল এবং শক্ত কোন কিছুর ধাক্কা লেগে আমার ডান হাঁটুর ডান দিকটা দিয়েও রক্তপাত হচ্ছিল। বিমানটি মাটিতে পড়ে বিধ্বস্ত হওয়ার সময় বিমানের মেঝেতে ধাক্কা লেগে আমার মাথাটা ফেটেছিল। আমার জামাকাপড়ে কিন্তু আগুন লাগে নি। নেতাজীর জামাকাপড় খুলতে গিয়ে আমার হাত দুটো ভীষণভাবে পুড়ে যায়। দশ বছর পরেও, আমার হু'টো হাতেই কব্জি পর্য্যন্ত গভীর ক্ষতের দাগ রয়েছে। পরবর্তীকালে আমার লোমগুলিও উঠে গিয়েছিল। বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলের নখটা আজও ভালোভাবে গজায়নি।" (নেতাজী তদন্ত কমিটি নোট দিয়েছেন—কমিটির সদস্যগণ তাঁর হাত হু'টো পরীক্ষা করে ভীষণ পোড়া ক্ষতের

দাগ দেখেছেন। মুখের ডান দিকে ঠিক ডান কানের নীচে পোড়া দাগও দেখা গেছে। ডান পায়ে এবং কপালেও ক্ষতের দাগ রয়েছে।)

কর্নেল রহমান আরও বলেন, "নেতাজীকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে আমিও তাঁর পাশে শুয়ে পড়েছিলাম। আমি পরিশ্রান্ত হয়েছিলাম এবং তীব্র ব্যথা অনুভব করছিলাম। প্রায় ২০ গজ দূরে আমি একজন জাপানী যাত্রীকে দেখেছিলাম। তাঁর খুব রক্তপাত হচ্ছিল এবং তিনি গোঙাচ্ছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে নেতাজী হিন্দুস্থানী ভাষায় আমায় জিজ্ঞাসা করেন: আপ্‌কা য্যাদা তো নহী লগী? (তোমার বেশী লাগেনি তো?) আমি উত্তরে বললাম আমি বুঝতে পারছি যে আমি ভাল হয়ে যাব। তাঁর সম্বন্ধে তিনি বলেন যে তিনি বুঝতে পারছেন যে তিনি বাঁচবেন না। উত্তরে আমি বললাম, "না, ভগবান আপনাকে রক্ষা করবেন। আমি নিশ্চিত জানি যে আপনি ভাল হয়ে উঠবেন।" তিনি বলেন, 'না আমি তা মনে করছি না।' তারপর তিনি বললেন—"যখন তুমি দেশে ফিরিয়া যাইবে, তখন দেশবাসীকে জানাইও যে আমি শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত আমার মাতৃভূমির মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিয়াছি; তাহারা যেন সংগ্রাম চালাইয়া যায়, এবং আমি নিশ্চিত বলিতেছি যে অচিরেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে। ভারতবর্ষকে কেহ দাসত্বে আবদ্ধ রাখিতে পারিবে না।" (যব আপ্‌নে মুল্‌ক ওয়াপিস জায়েঁ তো মুল্‌কি ভাইয়োঁ কো বাতানা কি ম্যাঁ আখরি দম তক্ মুল্‌ক কি আজাদী কে লিয়ে লড়তা রহী হুঁ, বহ যঙ্গে আজাদী কো জারী রাখেঁ। হিন্দুস্থান জরুর আজাদ হোগা; উস্‌কো কোই গোলাম নহী রখ সকৃতা)।

কর্নেল রহমান এর জবানীর অংশ বিশেষ তুলে ধরে তদন্ত কমিটি মন্তব্য করেছেন যে কর্নেল রহমানের বলা কথাগুলিই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের শেষ বাণী এবং ঐ বাণী নেতাজী তাঁর স্বভাব সুলভ ভঙ্গীমাতেই দিয়েছেন। কমিটির মন্তব্য থেকে মনে হয়—যে তাঁরা নেতাজীর সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত। এই প্রসঙ্গে বিষদ আলোচনার

প্রয়োজন আছে। তবে একটি বক্তব্য না রাখলে বোধহয় কিছু ত্রুটি থেকে যাবে। নেতাজীর চরিত্রের সঙ্গে যদি কমিটি সম্যকভাবে পরিচিত থাকতেন তাহলে, তদন্তের প্রয়োজনে বহু পরিশ্রম না করেই রায় দিতে পারতেন যে আদৌ কোন বিমান দুর্ঘটনা ঘটে নি। ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য যে শপথ নিয়েছিলেন তা কমিটির অজানা নয়। যুদ্ধের গতি প্রকৃতি দেখে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক নিশ্চয় কোন পরিকল্পনা করেছিলেন। মুক্তি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে অবশ্যই যোগাযোগের ওপর যথেষ্ঠ নির্ভর করতে হয়েছিল। যোগাযোগ করলে যোগবিয়োগ করারও দরকার হয়ে পড়ে এবং তারই ফলশ্রুতি বিয়োগ ফল, অর্থাৎ আমি আর নেই। 'আমি' না থাকার মধ্যে পরাজয়ের গ্লানি নেই, আছে বিরোধী গোষ্ঠীর জন্য অনিশ্চিত ভবিষ্যতের শঙ্কা। আমি আর নেই বলার মধ্যে অন্য কেউই যেন বিরোধী গোষ্ঠীর পাশবিক অত্যাচারে জর্জরিত না হয়ে পড়ে, তারই জন্য সুন্দর, রোমহর্ষক, ভয়াবহ, জটিল ও হাস্যরসাত্মক এক ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী অনেক কিন্তু একের সঙ্গে অন্যের জবানীর গড়মিলও আকাশ পাতাল ফারাকের চেয়েও বেশী। কর্নেল রহমান কমিটির কাছে যে জবানী দিয়েছেন সেই জবানীর সঙ্গে তাঁর অন্য জবানীগুলির তারতম্য পর্বত প্রমাণ। শ্রী এস্. এ. আয়ারের কাছে তিনি বলেছিলেন যে বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়া মাত্র তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন।* কমিটি কর্নেল রহমান এর যে বিবৃতি উদ্ধৃত করেছেন তাতে জ্ঞান হারানোর কোন ইঙ্গিত নেই। বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার পর বিমানের প্রবেশ পথ দিয়ে বাইরে আসা যায় নি বলে কর্নেল রহমান বয়ান রেখেছেন। বিমানের

---

* And in less than a few seconds the plane crashed on its nose and then everything went dark for a while—when I recovered consciousness.—etc. Unto Him A Witness. P. 112

মালপত্র না কি ঐ দরজার ওপর এসে জড়ো হয়েছিল। বিমানটি খাড়াভাবে নীচে নামতে থাকলে বিমানের পিছন দিকে প্রবেশ পথ কিভাবে বন্ধ হয়ে যায় তা বোঝা যায় না। এখানেও সেই একই ঘটনা, বিমানের যাত্রীরা যেমন কেউ কারও গায়ে এসে পড়েন নি প্রায় তেমনিভাবে বিমানের পিছনে রাখা মালপত্র সামনের দিকে গগিয়ে না এসে বিমানের দরজায় আটকে যায়। শ্রীআয়ার এর কাছে কর্নেল রহমান বলেছিলেন যে বিমানের বাইরে এসে নেতাজী দশ পনের ফিট দূরে দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠার সাথে কর্নেল রহমান এর খোঁজ করছিলেন। কিন্তু কমিটির কাছে কর্নেল রহমান বলেছেন যে নেতাজীকে অনুসরণ করে বিমানের বাইরে এসে তিনি দেখেন যে নেতাজী প্রায় দশ ফিট দূরে উল্টোদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। কর্নেল রহমান এর জন্য নেতাজীর উৎকণ্ঠা থাকাটা স্বাভাবিক, কিন্তু যদি সত্যই উৎকণ্ঠিত হওয়ার মত কোন ঘটনা ঘটত তাহলে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বিমানের দিকে তাকিয়ে তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত অনুচরের জন্য অপেক্ষা না করে উল্টোদিকে তাকিয়ে থাকবেন কেন? এখানেও স্বাভাবিকতার ছোঁয়া নেই। কমিটির কাছে যে ছবি কর্নেল রহমান তুলে ধরেছেন, তাহ'ল জামা কাপড়ে আগুন জ্বলছে আর নেতাজী উদাসীনভাবে পশ্চিমদিকে মুখ করে নির্বিকার হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন একটা অবস্থা যে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার লক্ষণ, 'কিন্তু তা হয় নি। কর্নেল রহমান শ্রীআয়ার এর কাছে বলেছিলেন যে নেতাজী তাঁর বুশকোট ও কোমরের বেল্টগুলি খুলে ফেলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন এবং কর্নেল রহমান ছুটে গিয়ে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু কমিটির কাছে তাঁর বক্তব্য ভিন্ন। শ্রীআয়ারের কাছে দেওয়া জবানী মতে নেতাজীর পোষাকে পেট্রোল ছিট্‌কে পরার দরুণ সমস্ত শরীরে আগুন ধরে যায় এবং দুটো বেল্টই খোলার প্রয়োজন হয়। কিন্তু কমিটির কাছে দেওয়া জবানীতে কোমরের বেল্ট খোলার প্রয়োজন দেখা যায় না কারণ ট্রাউজারে বেশী আগুন লাগে নি। কমিটির

কাছে কর্নেল রহমান বলেন যে নেতাজীর মুখ আগুনের তাপে ঝল্‌সে গিয়েছিল, মাথার চুলগুলি পুড়ে গিয়েছিল এবং মাথায় একটা চার ইঞ্চি লম্বা গভীর ক্ষত হয়েছিল। কিন্তু শ্রীআয়ার এর কাছে তিনি বলেছিলেন যে নেতাজীর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর হৃদ্‌কম্পন প্রায় স্তব্ধ হয়ে এসেছিল। লোহার আঘাতে নেতাজীর মুখ হয়েছিল ক্ষত-বিক্ষত আর আগুনের ছোঁয়ায় তা ঝল্‌সে গিয়েছিল। মাথা ফেটে গিয়ে রক্তপাত হওয়ার কোন কথাই তিনি এখানে তোলেন নি। কমিটির কাছে তিনি বলেন যে, তিনি নেতাজীকে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছিলেন, আর শ্রীআয়ারকে তিনি বলেছিলেন যে কয়েক মিনিট পরে নেতাজী অবসন্ন হয়ে তাইহোকু বিমান বন্দরের মাটিতে শুয়ে পড়েন। এই বক্তব্যগুলির মধ্যে পরিষ্কার পরস্পর বিরোধী কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু আরও কিছু বলার আছে। যে বিমান, বিমান বন্দর থেকে এক থেকে দু' মাইল দূরে কোথাও বিধ্বস্ত হয়েছিল বলে কর্নেল রহমান জানিয়েছেন, নেতাজী যদি সেই বিমানেরই যাত্রী হয়ে থাকেন তবে তাইহোকু বিমান বন্দরের মাটিতে তিনি কিভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন তা বোঝা যায় না।* কর্নেল রহমান** শ্রীআয়ার এর কাছে যে বিবৃতি দিয়েছেন সেই বিবৃতির সঙ্গে নেতাজী তদন্ত কমিটির কাছে দেওয়া বিবৃতির তফাৎ অনেক। তাইওয়ান থেকে দেওয়া লিখিত বিবৃতি, যা কমিটি আনেক্সার এ তুলে দেওয়া হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে নেতাজীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত জামাকাপড়ে আগুন

---

* "A few minutes later he collapsed and lay on the ground of the Taihoku Aerodrome"—Col. Rehman. Unto Him A witness. P. 113.

** Col. Habibur Rehman has said that the crash took place one or two miles outside the aerodrom—Netaji Enquiry committee Report Ch II para 1.

"I laid him down on the ground—Col. Rehman:
Ibid Ch. II para II

ধরে গিয়েছিল এবং তিনি নেতাজীকে জামাকাপড় খুলে ফেলতে সাহায্য করেছিলেন। এই বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর অন্য বক্তব্যগুলির মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। শ্রীআয়ার এবং তদন্ত কমিটির কাছে দেওয়া কর্নেল রহমান এর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে বিমানের সামনের দিকে আগুন ধরে গিয়েছিল, কিন্তু তাইহোকুতে লিখিত বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে বিমানের সামনে ও পিছনে দু'দিকেই আগুন ধরে গিয়েছিল। লিখিত বিবৃতিতে নেতাজীর অজ্ঞান হয়ে যাওয়া মাটিতে শুইয়ে দেওয়া, মাটিতে পড়ে যাওয়া, অথবা ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে কোন বাণী, ইত্যাদির উল্লেখ নেই।* শ্রীআয়ার এর কাছে দেওয়া বিবৃতিতে অজ্ঞান হয়ে তাইহোকু বিমান বন্দরেয় মাটিতে পড়ে যাওয়ার কথা লেখা আছে। কমিটির কাছে দেওয়া বিবৃতিতে তাইহোকু বিমান বন্দরের এক থেকে দু' মাইল দূরের মাটিতে শুইয়ে দেওয়ার কথা লেখা আছে, কিন্তু তদন্ত কমিটির কাছে ছাড়া অন্য কোথাও নেতাজীর 'শেষ বাণীর' উল্লেখ পর্য্যন্ত নেই। বরং শ্রীআয়ার এর কাছে দেওয়া বিবৃতি পড়ে মনে হয় তিনি নিজে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। তাহ'লে? নেতাজী ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে যে কথাগুলি বলেছিলেন বলে কর্নেল রহমান তদন্ত কমিটির কাছে জানিয়েছেন, তার সত্যতার প্রমাণ কোথায়?

কর্নেল রহমান সম্বন্ধে শ্রীসুরেশ চন্দ্র বসু কিছু মন্তব্য করেছেন, এই প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করা প্রয়োজন। শ্রী বসু লিখেছেন যে কর্নেল রহমান এর পারিবারিক ইতিহাস খুবই ভাল। তিনি এক অভিজাত বংশের মানুষ। তাঁর পূর্বপুরুষগণ বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীতে ছিলেন। এবং তিনিও ব্রহ্মদেশ অভিযানে বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীতে ছিলেন। ১৯৪২ সালের গোড়ার দিকে জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করার

---

* The next thing I knew was that I lying on a Hospital bed next to Netaji—Col. Rahman, Unto him A Witnass. P. 113

সময় তাঁর পদমর্যাদা ছিল ক্যাপ্টেন। তিনি আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগ দেন এবং তাঁর প্রথম নিয়োগ হয় অফিসারস্ ট্রেনিং স্কুলের কম্যাণ্ডার হিসাবে। নেতাজী তাঁর কাজে খুবই সন্তুষ্ট হন এবং ১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে তিনি ডেপুটি চীফ্ অফ স্টাফ পদে উন্নীত হন। তিনি সব সময়ই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন এবং টোকিও ও অন্যান্য জায়গা পরিদর্শন করতে নেতাজীর সহযাত্রী হয়েছিলেন। বৃটিশ ও মারকিন গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে কর্নেল রহমান তাঁর সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্বা ও আনুগত্যের জন্য বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার হিসাবে প্রশংসা পেয়েছেন। এই রিপোর্টগুলি থেকে আরও জানা যায় যে বিভিন্ন তদন্তকারী অফিসার তাঁকে বহুবার জেরা করেছেন। সবাই বিশ্বাস করতেন যে কর্নেল রহমানই একমাত্র ব্যক্তি যিনি নেতাজী সম্বন্ধে অনেক খবরই দিতে পারেন, কারণ তিনিই একমাত্র ভারতীয় যাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল নেতাজীর একান্ত সান্নিধ্যে থেকে তাঁর সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত যাওয়ার। সবারই জেরা করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নেতাজীর অবস্থান সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানার, কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন নি জাপ সরকারের প্রচার করা বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে সমস্ত ব্যাপারটাই ধাপ্পা। আসলে নেতাজী জীবিত এবং কোথাও আত্মগোপনে করে আছেন। তদন্তকারী অফিসাররা শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে কর্নেল হবিব-উর রহমান তাঁর নেতার প্রতি অনুরক্ত থাকার দরুণ যা জানতেন তা অকপটে প্রকাশ করেননি। তাঁর পক্ষে জানা খুবই সম্ভব ছিল এমন কিছু ঘটনা তিনি স্বেচ্ছাকৃতভাবে গোপন করেছেন এবং তিনি স্বেচ্ছায় এমন কিছু বিবৃতি দিয়েছেন যা তাঁদের (তদন্তকারী অফিসারগণ) কাছে সত্য বলে মনে হয়নি। শ্রী বসু তাই অভিমত জ্ঞাপন করেছেন যে কর্নেল হবিব-উর রহমান যা বলেছেন তা তাঁর প্রিয় নেতার গোপন নির্দেশমত বলেছেন এবং তাঁর উদ্দেশ্য তাঁর প্রিয়

নেতাকে নিরাপদ স্থানে নিরাপদে চলে যেতে সাহায্য করা।* তাঁকে যা বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাই তিনি বলবেন। এবং কোন পরিস্থিতিতেই তিনি এমন কিছু বলবেন না যা তাঁর প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় নেতা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের স্বার্থের বিরোধী হয়। কর্নেল হবিব-উর রহমান সম্বন্ধে নেতাজী তদন্ত কমিটি বহু তথ্যই জানেন, এবং তারা এও জেনেছেন যে তাইহোকুতে ঐ বিমানটি খাড়াভাবে মাটিতে নেমে এসেছিল কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তি খানিকটা কাজ করেছিল একটা পেট্রল ট্যাঙ্কের ওপর, তাছাড়া অন্য কোন মালপত্র বা যাত্রীদের ওপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাজ করে নি।

আর স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন তথ্য প্রমাণের ওপর নির্ভর না করেও নিশ্চিত রায় দেওয়া যায়, কিন্তু যাঁরা ইতিহাস লিখতে প্রয়াসী হয়েছেন তাঁরা সবটুকুই লিখবেন এবং তারপর রায় দেবেন।

পঞ্চদশ অনুচ্ছেদে লেখা হয়েছে যে লেঃ কর্নেল সাকাই ও ক্যাপ্টেন আরাই উল্লেখ করেন নি যে দুর্ঘটনার ঠিক পরেই তাঁরা নেতাজীকে দেখেছিলেন। লেঃ কর্নেল নোনোগাকি কিন্তু নেতাজীর কথা বলেছেন। তিনি বিবৃতি দিয়েছেন, "বিমান দুর্ঘটনার পর আমি যখন প্রথম দেখি তখন তিনি বিমানের বাঁ দিকে পাখার বাম প্রান্তের কোন এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর জামাকাপড়ে আগুন জ্বলছিল এবং তাঁর সহকারী তাঁর (নেতাজীর) কোটটা খুলতে চেষ্টা করছিলেন। তাড়াতাড়ি তিনি নেতাজীর কোটটা খুলে ফেলেছিলেন, কিন্তু উলের সোয়েটারটা খুলতে তাঁর অসুবিধা হচ্ছিল। নেতাজী পেট্রল ট্যাঙ্কের কাছাকাছি বসেছিলেন বলেই পেট্রলে তাঁর পোষাক ভিজে গিয়েছিল। তাঁর সমস্ত শরীরে আগুন জ্বলছিল বলে মনে হয়ে-

---

* I am, therefore, convinced that Col. Habibur Rehman would state only what he was ordered to by Netaji to state and that he could not state anything that would go against the interest of his beloved and respected leader, Netaji Subhas Chandra Bose. Dissentient Report P. 119

ছিল।” মেজর কোনো বলেছেন যে তিনি নেতাজীকে বিমানের খুব কাছে উল্টোদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন। পা দুটো ফাঁক করে সোজা হয়ে হাত দুটো নীচের দিকে শক্ত মুঠো করে নেতাজী দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়েছিলেন। পরনে ছিল খালি একজোড়া জুতো। মেজর কোনো নেতাজীর গায়ে আগুন জ্বলতে দেখেন নি। মেজর কোনো আরও বলেছেন যে তিরিশ মিটার দূরে দাঁড়িয়ে তিনি আগুনের উত্তাপ পাচ্ছিলেন, কিন্তু মাত্র কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়েও নেতাজী যেন আগুনের উত্তাপ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। কর্নেল রহমান তাঁকে জ্বলন্ত বিমানের কাছ থেকে সরিয়ে নেন। মেজর টাকাহাশি কিছুটা অন্যধরণের বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে তিনি নেতাজীকে বিমানের সামনের দিক থেকে বাঁ দিক দিয়ে বাইরে আসতে দেখেছিলেন। তাঁর জামা কাপড়ে আগুন ধরে গিয়েছিল এবং তিনি তাঁর কোটটা খুলতে চেষ্টা করেছিলেন। তারপর তিনি (মেজর টাকাহাশি) নেতাজীর কাছে এগিয়ে যান এবং তাঁকে মাটিতে গড়াগড়ি খাইয়ে জামা কাপড়ের আগুন নিভিয়ে ফেলেন। তিনি বলেন লেঃ কর্নেল রহমান সেখানে ছিলেন, কিন্তু তিনি (কর্নেল রহমান) সম্পূর্ণ নিস্ক্রিয় ছিলেন। তিনি আরও বলেন যে নেতাজীর পোষাকে কিছু কিছু জায়গায় পেট্রল ছিটকে পড়েছিল, এবং সেই জায়গাগুলিই পুড়ে গিয়েছিল। তাঁর পরণের ট্রাউজারটা সামান্যমাত্র পুড়ে গিয়েছিল। অন্য সাক্ষীরা বলেছেন যে নেতাজীকে তাঁর পোষাক খুলে ফেলতে হয়েছিল এবং তিনি নগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু মেজর টাকাহাশি বলেছেন যে নেতাজীর পরণে পোষাক ছিল। নেতাজীর পোষাকে আগুন ধরেছিল সে বিষয়ে সমস্ত প্রত্যক্ষদর্শীরাই একমত হয়েছেন। নেতাজীর পোষাকের আগুন নেভাতে কে সাহায্য করেছিলেন, সেই প্রশ্নে, মনে হয় খুব সম্ভবত কর্নেল রহমানই সেই ভাগ্যবান যিনি তাঁর নেতাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন।

কর্নেল রহমান এর বিবৃতি লেঃ কর্নেল নোনোগাকি ও মেজর কোনোর প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। মেজর টাকাহাশির বিবৃতির চেয়ে ঐ বিবৃতিগুলিই বেশী যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ার ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতো এক সম্পূর্ণ ভিন্ন বিবৃতি দিয়েছেন। অবশ্য তিনিও বলেছেন যে নেতাজীর পোষাক পেট্রল পরে ভিজে গিয়েছিল এবং ছিঁড়ে ফেলতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি দাবী করেছেন যে তিনি নিজে (ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতো) বিধ্বস্ত বিমান থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করেছিলেন, এবং নেতাজীকেও তিনিই উদ্ধার করেন। তাঁর এই বক্তব্য কারও দ্বারা সমর্থিত হয়নি এবং সেই কারণেই এই বিবৃতি সুদীর্ঘ সময় পার হয়ে যাওয়ার দরুণ স্মৃতি লোপ পেয়েছে বলে বর্জন করা যেতে পারে।

কমিটির রিপোর্ট পড়তে পড়তে মনে হয়, তথাকথিত বিমানের মানুষগুলো কি বিচিত্র ভাবে তাঁদের পুনর্জীবন লাভ করল। একটা বিমান খাড়াভাবে নীচে এসে মাটিতে পড়ে ধ্বংস হল, যদিও ঠিক কোথায় পড়ে ধ্বংস হ'ল তার প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবুও আকাশ থেকে যদি মাটির দিকে নেমেই থাকে তবে নিশ্চয় কোথাও পড়ে ওটা ধ্বংস হয়েছিল। বিমান যাত্রীদের কারও সাথে সীট বেল্ট ছিল না, কিন্তু তবু কেউই গড়িয়ে বিমানের সামনের দিকে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আহত হলেন না। বিমানটি মাটিতে পড়ে বিধ্বস্ত হওয়ার পর অবশ্য কম বেশী সবাই আহত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। বিমানটি বিধ্বস্ত হলে যাত্রীদের কমবেশী আঘাত লাগা সম্ভব। যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবী রেখেছেন তাঁদের জবানী থেকেই ঘটনার সত্যতা জেনে নিতে হবে। কমিটির কাছে দু'জন সাক্ষী লেঃ কর্নেল সাকাই ও ক্যাপ্টেন আরাই বিমান দুর্ঘটনার পরে নেতাজীকে দেখেছিলেন বলে দাবী করেননি। কমিটি তদন্ত রিপোর্টে লিখেছেন যে বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়া মাত্র লেঃ কর্নেল সাকাই, মেজর টাকাহাশি ও ক্যাপ্টেন

আরাই জ্ঞান হারিয়েছিলেন। শ্রীসুরেশ চন্দ্র বসুর লেখা থেকে জানা যায় যে বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়া মাত্র তিনি প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি দেখেছিলেন যে লেঃ কর্নেল সাকাই বিধ্বস্ত বিমানের চারপাশে 'সিডি! সিডি!' বলে চিৎকার করে দৌড়াচ্ছিলেন। তাহলে ক্যাপ্টেন আরাই অজ্ঞান হয়ে যান নি, একটু চেতনা ছিল। লেঃ কর্নেল নোনোগাকির জবানীমতে নেতাজী বিমানের বাঁ দিকের পাখার বাম প্রান্তের কাছাকাছি ছিলেন। বিমানটি বাঁ দিকে কাৎ হয়ে পড়ে বিধ্বস্ত হল, বিমানের বাঁ দিকের পাখা অবশ্যই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। তা হলে নেতাজী বাঁ দিকের পাখার প্রান্তের কাছে কি করে দাঁড়ান? কর্নেল রহমান নেতাজীর বুশ সার্টের বেল্ট খুলে ফেলতে খুব অসুবিধা ভোগ করেছিলেন বলে জানিয়েছেন, কিন্তু লেঃ কর্নেল নোনাগোকি কর্নেল রহমানকে নেতাজীর পরনোর কোট খুলতে দেখেছিলেন। এই দুই জবানীর মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। কর্নেল রহমান তাঁর বিবৃতিতে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে নেতাজীর পরণে গরম সোয়েটারটা ছিল না; কিন্তু লেঃ কর্নেল নোনোগাকি কর্নেল রহমানকে নেতাজীর উলের সোয়েটারটাও খুলতে দেখেছিলেন।

দু'জনের বক্তব্যের মধ্যে মিল কোথায়? কমিটি কিন্তু নেতাজী সোয়েটারটা পরেছিলেন কি না তা পরিষ্কার বোঝা যায়না বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন। দু'জনেই ঘটনার সাক্ষী কিন্তু একের বক্তব্যের সঙ্গে অন্যের বক্তব্যের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। লেঃ কর্নেল নোনোগাকির মতে নেতাজীর সমস্ত শরীরে আগুন ধরে গিয়েছিল, কিন্তু কর্নেল রহমান তাঁর ট্রাউজার খুলে ফেলেন নি, তাই প্রমাণ হয় যে সমস্ত শরীরে নিশ্চয় আগুন লাগে নি! মেজর কোনোও একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি ঘটনার যে বিবৃতি দিয়েছেন তার সঙ্গে অন্যের জবানীর মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তিনি নেতাজীকে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় শুধু জুতো পায়ে বিমান থেকে মাত্র কয়েকগজ দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন।

এঁর বক্তব্যের সঙ্গে লেঃ কর্নেল নোনোগাকি ও কর্নেল রহমান এর বক্তব্যের মিল নেই। কর্নেল রহমান স্বয়ং বলেছেন যে তিনি নেতাজীকে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছিলেন এবং তখন তাঁর (নেতাজীর) পরণে ট্রাউজার ছিল। তা'হলে কাকে সত্যের অপলাপ করছেন বলে দোষী সাবস্ত করা যায় ? কাউকেই নয় ; কারণ ঘটনাই যখন সত্য নয়, তখন সত্যের অপলাপ করার প্রশ্ন ওঠে না। কর্নেল রহমান স্বয়ং নেতাজীকে সাহায্য করেছিলেন বলে দাবী করেছেন এবং তাঁর দাবী কিছুটা সমর্থিত হয়েছে কর্নেল নোনোগাকির দ্বারা। কিন্তু মেজর টাকাহাশি তাঁর বিবৃতির দ্বারা নূতন এক সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। তিনি দাবী করেছেন লেঃ কর্নেল রহমান সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ছিলেন। নেতাজীর শরীরের আগুন নিভিয়েছিলেন মেজর টাকাহাশি স্বয়ং। নেতাজীর পোষাকের আগুন নেভাতে মেজর টাকাহাশির দাবী শুনে মনে পড়ে মেজর কোনোর দাবীর কথা। মেজর কোনো দাবী করেছেন যে তিনি বিমানে নেতাজীর সামনে বসেছিলেন এবং যাত্রা-পথে নেতাজীর সঙ্গে কথাও বলেছিলেন। মেজর কোনোর বক্তব্য বিমানে বসার আসন ব্যবস্থায় গোলযোগ এনে দিয়েছে ; আর মেজর টাকাহাশির বক্তব্য এক নূতন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। মেজর টাকাহাশি বলেছেন যে, নেতাজীর পরণের পোষাক কিছুটা ছিড়ে গিয়েছিল কিন্তু তা খুলে ফেলা হয়নি। কমিটির এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায় না যে প্রত্যক্ষদর্শীরা একমত হয়েছেন যে নেতাজীর পোষাকে আগুন ধরেছিল, সুতরাং কথাটা ঠিক। কিন্তু একথাও বিচার করে দেখতে হবে যে আগুন কতটা লেলিহান শিখা বার করে নেতাজীকে গ্রাস করেছিল। বস্তুতঃ এই প্রসঙ্গে কোন সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় না। কারণ সবাই প্রত্যক্ষদর্শী হলেও একে অন্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারেন নি। তদন্ত কমিটি আরও মন্তব্য করের্নেল যে নেতাজীকে সাহায্য করতে কর্নেল হবিব-উর রহমান এর পক্ষেই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব কারণ তিনি (নেতাজী) কর্নেল রহমান

এর নেতা। এই সম্ভাবনা অযৌক্তিক নয়, কিন্তু আরও একটা সম্ভাবনার কথা চিন্তা করা উচিত ছিল।

কূটনৈতিক সম্পর্কের দিক থেকে বিচার করতে গেলে জাপ সরকারের সামরিক ও বৈদেশিক দপ্তরের প্রতিটি ব্যক্তির কাছে নেতাজী একজন সম্মানিত অতিথি। আর ব্যক্তি হিসাবে বিচার করতে গেলে এশিয়ার মাটিতে বিশেষ করে জাপানে নেতাজী সুভাষ-চন্দ্র একজন অতি জনপ্রিয় নেতা। সুতরাং নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের মত নেতাকে বিপদে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসা সবার পক্ষেই সম্ভব। সুতরাং কর্নেল রহমানের দাবীই যে সমর্থন যোগ্য এবং অন্যদের নয়, তা বলা যায় না। কর্নেল রহমানের দাবী অর্থাৎ নেতাজীকে তিনিই সাহায্য করেছিলেন, তা মেজর কোনো ও লেঃ কর্নেল নোনোগাকির দ্বারা সমর্থিত হয়েছে সত্য, কিন্তু তাঁরা নেতাজীর শরীরের আগুন নেভাতে কর্নেল রহমান এর প্রচেষ্টার যে বিবরণ দিয়েছেন তার সঙ্গে কর্নেল রহমান এর বিবরণের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তদন্ত কমিটি ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামো-তোর বিবৃতির ওপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন; কারণ তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি তাইহোকু বিমানবন্দরে উপস্থিত থেকে সব ঘটনা দেখেছিলেন। তাঁর জবানীর ওপর যথেষ্ট নির্ভর করে কমিটি অন্য প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানীর বহু অংশ বাতিল করে দিয়েছেন। এই নির্ভরযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষদর্শী তদন্ত কমিটির কাছে দাবী করেছেন যে, তিনিই নেতাজীকে বিধ্বস্ত বিমান থেকে উদ্ধার করেছিলেন। তদন্ত কমিটির চোখে এই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীটির জবানীর এই অংশটুকু গ্রহণ যোগ্য হয় নি; এঁর বক্তব্য অন্য কেউ সমর্থন করেন নি সত্য কিন্তু তাইহোকুর ঘটনার বিবরণে বহু ক্ষেত্রে সমর্থিত অংশও বর্জন হয়েছে, তাও সত্য। ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতোর জবানীতে স্মৃতি শক্তি লোপ পেয়ে যাওয়ার প্রশ্ন জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সুদীর্ঘ সময় পার হয়ে যাওয়ার দরুণ ওঁর ভুল হয়েছে বলে এই

অংশটুকু বাতিল করার প্রয়াস সমর্থনযোগ্য নয়। তথাকথিত বিমানটিকে তাইহোকু বিমান বন্দরে পরীক্ষা করা, বিমানটির আকাশে ওঠা, বিমানটির নীচে নেমে আসা, বিধ্বস্ত হওয়া ও বিধ্বস্ত বিমান কোথায় পড়েছিল, ইত্যাদি প্রসঙ্গে সুদীর্ঘ এগার বছর পার হয়ে যাওয়ার দরুণ স্মৃতি লোপ পাওয়ার প্রশ্ন ওঠে নি। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে, যে ব্যক্তির অতীতের কথা সঠিক মনে নেই, তাঁর সাক্ষ্য প্রমাণের ওপর এত গুরুত্ব দেওয়ার কথাই ওঠে না, কিন্তু তদন্ত কমিটি নিজ প্রয়োজনে তাঁকে অবলম্বন করেছেন, আবার প্রয়োজন মতই তাঁকে বর্জন করেছেন। বহুবছর পার হয়ে যাওয়ার দরুণ ভুল করেছেন বলে নেতাজী তদন্ত কমিটি শ্রীরমনীও গোঁসাই এর জবানী উপেক্ষা করেছেন। একই কারণে ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতোর বক্তব্যের অংশবিশেষ উপেক্ষা করা হয়েছে। মেজর টাকাহাশির বক্তব্য সোজাসুজি বর্জন না করে সম্ভাবনার প্রশ্ন তুলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

যদি সত্যই বিমান দুর্ঘটনা ঘটে থাকে এবং যাঁরা তদন্ত কমিটির কাছে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাঁরা যদি ঐ বিমানেরই যাত্রী হয়ে থাকেন তবে ধরে নিতে হবে যে বিধ্বস্ত বিমানের ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার পেয়ে তাঁরা নূতন জীবন লাভ করেছিলেন। অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাঁরা পুনর্জীবন লাভ করেছেন তাঁরা তাঁদের জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় সেই বীভৎস মুহূর্তের কথা মনে রাখতে পারবেন না তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ও নূতন জীবন লাভ করে ফিরে আসার আনন্দে আত্মহারা হয়ে স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পেতে পারে কিন্তু ঐ ঘটনার জন্য যদি তাঁর মানসিক কোন বিপর্যয় না ঘটে তাহলে ঘটনার বিবরণ ভুলে যাওয়ার কোন কারণ নেই, এবং তা বিশ্বাস্যও নয়। অবশ্য কয়েক ঘণ্টা সময়ের তফাৎ বা কি দিয়ে জলযোগ হয়েছিল ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিছুটা ভুল হলেও হতে পারে, কিন্তু ঘটনার বিবরণের কোন কোন

অংশ সঠিক এবং কোন কোন অংশ ভুল, এমন হওয়া সম্ভব নয়। সব প্রত্যক্ষদর্শীদের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে তাঁদের বক্তব্যের অংশ বিশেষ তদন্ত কমিটির কাছে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছে এবং কিছু অংশ অযৌক্তিক বলে বর্জিত হয়েছে। যেখানেই পূর্ব-কল্পিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সেখানেই তদন্ত কমিটি যৌক্তিকতার দোহাই দিয়েছেন। কিন্তু একথা সত্য যে প্রত্যক্ষদর্শীরা প্রতিটি পর্যায়ে একে অন্যের বিরোধীতা করেছেন। তদন্ত কমিটি চেষ্টা করলে প্রত্যক্ষ-দর্শীদের একসঙ্গে ডেকে তাঁদের বিরোধী বক্তব্যগুলি যাচাই করে নিলেই সব সন্দেহের অবসান ঘট্‌ত, কিন্তু কমিটি তা করেন নি।

ষোড়শ অনুচ্ছেদে তদন্ত কমিটি লিখেছেন যে বিমানের অন্যান্য জাপানী যাত্রী ও বৈমানিকদের মধ্যে জেনারেল সিডি বিমানের বাইরে আসতে পারেন নি। তিনি বিমানের মধ্যে মারা যান। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে জাপ বৈদেশিক দপ্তরের মাধ্যমে জেনারেল সিডির চাকুরী জীবনের দলিল (ইংরাজীতে অনুবাদ করা) পাওয়া গিয়েছিল। তারই একটা প্রতিলিপি রিপোর্টে দেওয়া হয়েছে (আনেক্সার—১)। এই রেকর্ডে দেখা যাবে যে জেনারেল সিডি ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট তাইহোকু বিমান বন্দরে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর কারণ দেখানো হয়েছে যুদ্ধে মৃত্যু। তাঁর চিতাভস্ম এক সপ্তাহ পরে বার্মা সেনাবাহিনীর চীফ অফ্ জেনারেল স্টাফ, জেনারেল টানাকার মারফৎ টোকিওতে পাঠানো হয়। জেনারেল টানাকা সাতদিন পরে ব্রহ্মদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ডঃ বা মর সঙ্গে তাইহোকু হয়ে টোকিও যাচ্ছিলেন। কয়েকজন বৈমানিককে উদ্ধার করা হয়েছিল বলে মনে হয়। দু'জন পাইলট ও কয়েকজন বৈমানিক বিমানের মধ্যে আটক ছিলেন। তাঁদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতো দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে পাইলট টাকিজাওয়া ও কো-পাইলট আয়োগি জেনারেল সিডির সঙ্গেই নিশ্চিহ্ন হন। এবং তিনি নিজে তাঁদের

নাড়িভুঁড়ি মাটিতে পুঁতে ফেলতে ও তাঁদেরই চিতাভস্ম তিনটি বাক্সে ভর্তি করতে সাহায্য করেন। কিন্তু মেজর কোনো বলেছেন যে তিনি শুনেছিলেন যে কো-পাইলট আয়োগিকে বিমানের বাইরে টেনে বার করা হয়েছিল। ডাঃ সুরুতা ও ডাঃ ইয়োশিমি, তুজনেই দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে তাঁরা কো-পাইলট আয়োগির চিকিৎসা করেছিলেন এবং তিনি (কো-পাইলট আয়োগি) পরে হাসপাতালেই মারা যান। এই বক্তব্যগুলি থেকে বোঝা যায় যে জেনারেল সিডি ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরও তু' এক জন মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের পরিচয় জানা যায় না। সম্ভবত মেজর টাকিজাওয়াও তাঁদের মধ্যে ছিলেন। বাকি, প্রায় বারজন যাত্রী ও বৈনানিককে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মোটর গাড়ি, ট্রাক ও বিমানের প্রপেলার চালু করার জন্য ব্যবহৃত এক ধরনের অদ্ভুত গাড়ী 'শিডোশা'য় করে কয়েক কিলোমিটার দূরে, নানমন (সাউথ গেট) মিলিটারী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

নেতাজী তদন্ত কমিটির বক্তব্য যেমন সহজ সরল, তাইহোকুর বিমান বন্দরে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের ইঙ্গিতও তেমনই প্রাঞ্জল। বিমানের যাত্রী সংখ্যা যা ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, ততগুলি নাম খুজে পাওয়া যায় নি। যাঁদের নাম পাওয়া গেছে তাঁদের মধ্যে জেনারেল সিডি, পাইলট টাকিজাওয়া ও কো-পাইলট আয়োগিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এঁদের বাদ দিয়ে বাকি বৈমানিক বা যাত্রীদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল তা জানা যায় না, জানার প্রয়োজনও পড়ে না। প্রয়োজন শুধু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস এর শেষ পরিণতি নিয়েই, তাই তাঁকে ঘিরে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করাই মুখ্য কাজ। জেনারেল সিডির সহযাত্রী হয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র সাইগন ত্যাগ করেছিলেন। সুতরাং তাঁর পরিণতির কথা জানা প্রয়োজন। জেনারেল সিডি অবশ্যই বিমানের বাইরে আসতে পারেন নি বলে বিশ্বাস করে নেওয়া হয়েছে, কারণ প্রত্যক্ষদর্শীরাই তুর্ঘটনার পরে তাঁকে

কেহই দেখতে পেয়েছেন বলে বলেন নি। বরং ক্যাপ্টেন আরাই এর বিবৃতি থেকে জানা যায় যে লেঃ কর্নেল সাকাই তুর্ঘটনার পরে বিধ্বস্ত বিমানের চারপাশে সিডি! সিডি! বলে চিৎকার করতে করতে ঘুরছিলেন। জাপসরকার নেতাজী তদন্ত কমিটির কাছে জেনারেল সিডির চাকুরী জীবনের রেকর্ড দাখিল করেছেন। ঐ রেকর্ডে পরিষ্কার লেখা আছে যে জেনারেল সিডি ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট তাইহোকু বিমান বন্দরে মারা যান, শুধু মৃত্যুর কারণটা নিয়েই যা একটু গোলমাল। কমিটির চোখেও মৃত্যুর কারণ ধরা পড়েছে কিন্তু দিন ও জায়গা ঠিক থাকলেই যথেষ্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসের দিনপঞ্জী খুঁজলে দেখা যায় যে জাপ সরকার আত্মসমর্পণ করেছিলেন ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগস্ট। নেতাজী তদন্ত কমিটিও আত্মসমর্পণের তারিখটি জানেন, তার প্রমাণ তদন্ত রিপোর্টের প্রথম পর্বের চতুর্থ অনুচ্ছেদে শেষ করা হয়েছে ঐ তারিখটি জানিয়ে। আত্মসমর্পণ করার পর যুদ্ধের প্রশ্নই ওঠেনা। তাহলে, ১৫ই আগস্ট আত্মসমর্পণ করলে ১৮ই আগস্ট যুদ্ধ কোথা থেকে হ'ল? প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন যে জেনারেল সিডি ঐ বিমানে ছিলেন এবং ঐ বিমান যদি তুর্ঘটনায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে থাকে এবং জেনারেল যদি ঐ তুর্ঘটনায় মারা গিয়ে থাকেন তাহলে তাঁর মৃত্যুর কারণ অবশ্যই বিমান তুর্ঘটনা, যুদ্ধ নয়। কারণ যুদ্ধ তিন দিন আগে শেষ হয়েছিল। জাপ সরকার এর কাছে জেনারেল সিডির সার্ভিস রেকর্ড পাঠিয়ে 'যুদ্ধে মৃত' কথাটা বসানোর কারণ জানতে চাইলেই সব সন্দেহের অবসান হ'ত, কিন্তু তা করা হয়নি। ঐ রেকর্ড তাইহোকুর তদন্ত ক্ষেত্রে গ্রহণ যোগ্য নয় কারণ তাইহোকুর বিমান তুর্ঘটনা জাপানের সঙ্গে মিত্রশক্তির যুদ্ধের কারনে ঘটেনি। জেনারেল সিডির সার্ভিস রেকর্ডের অনুলিপি পাঠানো চিঠির কিছু অংশ মুছে দেওয়া হয়েছে। ঐ অংশে কি লেখা ছিল তা জানার ঔৎসুক্য সবারই থেকে যায়। প্রশ্ন আরও অনেক। কিন্তু উত্তর পাওয়ার আশা নেই। ঐ বিমান তুর্ঘটনায় জেনারেল

সিডি ছাড়া আরও দু'জন নামজাদা সামরিক অফিসার নিহত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। তাঁরা হলেন মেজর টাকিজাওয়া ও কো-পাইলট আয়োগি। জাপ বিমান বহরের আর যাঁরা মারা গিয়েছিলেন বলে প্রকাশ পায় তাঁদের ব্যাপারে কোন রেকর্ড নেই একথা ভাবতেই অবাক লাগে। নেতাজী তদন্ত কমিটি জাপ সরকারের কাছ থেকে জেনারেল সিডির সার্ভিস রেকর্ড পাওয়ার পর মেজর টাকিজাওয়া ও কো-পাইলট আয়োগির সার্ভিস রেকর্ডও কেন জাপ সরকারের কাছে চেয়ে পাঠালেন না, তা ব্যক্ত করেন নি। যাঁদের নাম জানা যায় নি তাঁদের কথা বাদ দিয়ে, যাঁদের নাম জানা গেছে তাঁদের সার্ভিস রেকর্ডগুলিও নিশ্চয় জাপ সরকারের দপ্তরে সযত্নে রাখা আছে। তাঁদের রেকর্ডগুলিতেও সম্ভবত একই কথা লেখা আছে মৃত্যুর কারণ —'যুদ্ধে মৃত'। তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নিহত তিনজন অফিসার এর মৃত্যুর কারণ যদি যুদ্ধ তাহলে সমস্যার বিষয়, কিন্তু যদি বাকি দু'জনের রেকর্ডে অন্য কোন কারণ দেওয়া থাকে তাহ'লে আরও জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা, তাই ওঁদের সার্ভিস রেকর্ড নেতাজী তদন্ত কমিটির রিপোর্টে স্থান পায় নি। ইতিহাস লেখার তাগিদে, তদন্ত কমিটি জাপ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ শিগিমিৎসুকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাতে পারতেন। কারণ, নেতাজীর সংগ্রামের সময়ও তিনি এই পদেই ছিলেন তাই নেতাজীর পরিকল্পনা ও তাইহোকুর—ঘটনা সম্বন্ধে তিনি নিশ্চয় কিছু আলোকপাত করতে পারতেন কিন্তু তা করা হয় নি। তদন্ত কমিটি জাপ সরকারের দেওয়া রিপোর্ট পেশ করেও, ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতোর বক্তব্য উদ্ধৃত করে প্রমাণ রেখেছেন যে জেনারেল সিডি বিধ্বস্ত বিমানের মধ্যেই নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু আর একটি জবানী এখানে উল্লেখ করা হয় নি। জবানী দিয়েছেন ক্যাপ্টেন আরাই। তিনি বলেছেন যে জেনারেল সিডিকে নিশ্চয়ই হাসপাতালে আনা হয়েছিল এবং সেখানেই তিনি মারা গিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতো আরও

বলেছেন যে জেনারেল সিডির সঙ্গে মেজর টাকিজাওয়া ও কো-পাইলট আয়োগির দেহের বিচ্ছিন্ন অংশগুলির শেষকৃত্য তিনিই করেছিলেন এবং তাঁদের ভস্মাবশেষ তিনটি বাক্সে তুলে রাখা হয়েছিল। এক্ষেত্রেও বিরোধী বক্তব্য পাওয়া গেছে। মেজর কোনো বলেছেন যে কো-পাইলট আয়োগিকে বিমানের বাইরে আনা হয়েছিল এবং নানমন সামরিক হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ সুরুতা ও ডাঃ ইয়োশিমি দু'জনেই দাবী করেছেন যে হাসপাতালে কো-পাইলট আয়োগির চিকিৎসা করেছিলেন। ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতোর জবানী মতে মৃত দেহের নাড়িভুঁড়িগুলো তিনি মাটিতে কবর দিয়েছিলেন আর এঁদের চিতাভস্ম তিনটি বাক্সে ভর্তি করে রেখে-ছিলেন। এমন বিচিত্র শেষকৃত্য, অর্থাৎ নাড়িভুড়িগুলো কবর দেওয়া আর হাড় মাংস জ্বালিয়ে দেওয়া কমই দেখা যায়। ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতো দাবী করেছিলেন যে তিনি নেতাজীকে জ্বলন্ত বিমান থেকে উদ্ধার করেছিলেন, সেই দাবী গ্রাহ্য হয় নি। কিন্তু তাঁর তিনজনের শেষকৃত্য করার দাবী অগ্রাহ্য হয় নি, কারণ জেনারেল সিডির মৃত্যুর যে কোনরকম প্রমাণ থাকা দরকার। কিন্তু কে যে ভুল করেছেন, আর কে ঠিক বলেছেন, তার প্রমাণ কোথায়? যাহোক বিধ্বস্ত বিমান থেকে প্রায় বারজনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল বলে কমিটি তদন্ত করে জেনেছেন। বিমানে মোট কতজন ছিলেন আর একবার তার হিসাব করা যাক। বিমানে গিয়েছিলেন—জেনারেল সিডি, লেঃ কর্নেল সাকাই, লেঃ কর্নেল নোনোগাকি, মেজর কোনো, মেজর টাকাহাশি, ক্যাপ্টেন আরাই, মেজর টাকিজাওয়া, কো-পাইলট আয়োগি, নেভিগেটর ওকিশতা, রেডিও অপারেটর টোমিনাগা এবং আরও দু'জন ইঞ্জিনীয়ার। তাহ'লে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও কর্নেল রহমানকে নিয়ে ঐ বিমানে মোট তের কিম্বা চোদ্দজন যাত্রী ছিলেন। এঁদের মধ্যে জেনারেল সিডি, মেজর টাকিজাওয়া, কো-পাইলট আয়োগি আরও দু'জন বিমানের বাইরে আসতে পারেন নি

বলে জানা যায়। যাঁদের নাম জানা যায় তাঁদের নিয়ে যদি চারজন যাত্রীও ঐ বিমানের মধ্যে মারা গিয়ে থাকেন এবং বাকি বারজনকে যদি চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে তাহলে যাত্রী সংখ্যা দাঁড়ায় ষোলজন। তাহ'লে দ্বিতীয় পর্বের পঞ্চম অনুচ্ছেদে যাত্রী সংখ্যার যে হিসাব পাওয়া যায় তার সঙ্গে এই হিসাবের মিল নেই। গড়মিল এতবেশী নজরে পড়ে যে সামান্যতম মিল অগ্রাহ্য হয়ে যায়। এই অনুচ্ছেদে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি খবর দেওয়া হয়েছে, তাহল ডঃ বা মর সঙ্গে জেনারেল টানাকার টোকিও যাত্রা। জাপ সরকার ব্রহ্মদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ডঃ বা ম ও ফিলিপাইন এর রাষ্ট্রপতি মিঃ লরেল এর কাছে জাপানে আসার প্রস্তাব পাঠিয়ে ছিলেন। রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে যথাযথ সম্মান দেওয়া ও সৌজন্য প্রকাশের জন্য পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়োগ করা কুটনৈতিক রীতি। তাই ডঃ বা মর টোকিও যাওয়ার পথে তাঁর সঙ্গে জেনারেল টানাকাকে দেখা যায়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস এর ক্ষেত্রে জেনারেল ইসোদা ও জেনারেল সিডির উপস্থিতি ও সাহচর্য্য হঠাৎ কোন যোগাযোগের ফল নয়, ওটা কুটনৈতিক বিধান। বিশেষ করে, জেনারেল সিডিকেই নিয়োগ করার কারণ তিনি হলেন রাশিয়ার ব্যাপারে একজন প্রখ্যাত জাপানী বিশেষজ্ঞ।

তদন্ত কমিটি অনেক কিছুই রিপোর্ট করেছেন কিন্তু অনেক কথা স্বেচ্ছাকৃত রিপোর্ট থেকে বর্জন করেছেন। তাইহোকুতে আহত হতভাগ্য যাত্রীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কি ধরণের গাড়ীতে করে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কমিটির রিপোর্ট থেকে তা জানা যায়, কিন্তু কে কখন, কিভাবে হাসপাতালে গেলেন তাঁর বিবরণ দেওয়া নেই। আহত যাত্রীরা সজ্ঞানে ছিলেন, তাই তাঁদের হাসপাতালে যাওয়ার বিবরণের অনেক গুরুত্ব দিতে হবে। শ্রীসুরেশচন্দ্র বসুর লেখা থেকে জানা যায় যে কর্নেল রহমান তাঁর জবানীতে বলেন যে পরিশ্রান্ত হয়ে তিনি নেতাজীর পাশে শুয়ে

পড়ার পনের কুড়ি মিনিট পরে একটি এ্যাম্বুলেন্স ও একটি ট্রাক কয়েকজন জাপানী নার্সকে নিয়ে ঘটনাস্থলে আসে। তাঁকে (কর্নেল রহমান) ও নেতাজীকে ট্রাকের মেঝেতে শুইয়ে এয়ার ফোর্স ইমারজেন্সি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মেজর টাকাহাশি বলেন যে নেতাজীকে একটি মিলিটারী ট্রাকে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি আরও বলেছেন যে তাঁকে সব শেষে একটি ট্রাকে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যদিও অসামরিক ও সামরিক ট্রাকের মধ্যে তফাৎ আছে, তবুও ধরে নেওয়া যাক যে কর্নেল রহমান এর বক্তব্য মেজর টাকাহাশির বক্তব্যের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কর্নেল নোনোগাকি বলেছেন যে প্রথমেই তাঁকে ও মেজর কোনোকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিনি আরও দাবী করেছেন যে বিমানের প্রপেলার চালু করার জন্য ব্যবহৃত 'শিডোশা'য় করে নেতাজীকে হাসপাতালে নিয়ে আসতে তিনি নিজে দেখেছিলেন। মেজর কোনো তাঁর জবানীতে বলেন যে চার পাঁচখানা ট্রাক, দু'একটা মোটর গাড়ী ও একটা শিডোশা ঘটনাস্থলে আনা হয়েছিল।

বিমান বন্দরের কর্মীরা তাঁকে (মেজর কোনো) কোলপাঁজা করে 'শিডোশা'য় তুলে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতো অবশ্য বলেছেন যে মিঃ বোস ও কর্নেল রহমানকে একটা সামরিক ট্রাকে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিনি আরও বলেছেন যে নেতাজীর শরীর এত বেশী পুড়ে গিয়েছিল যে তাঁকে ট্রাকের মেঝেতে শোয়ানো যায় নি। তাঁরই (ক্যাঃ নাকামুরা) তিনজন কর্মী নেতাজীকে তাঁদের কোলের ওপর শুইয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতো দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে 'শিডোশা'টি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় নি। নিশ্চয়তার সঙ্গে তিনি আরও বলেন যে নেতাজী কর্নেল রহমান, লেঃ কর্নেল নোনোগাকি, লেঃ কর্নেল সাকাই এবং সার্জেন্ট ওকিশ্‌টাকে একই ট্রাকে এক সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে

যাওয়া হয়েছিল। উপরোক্ত বক্তব্যগুলির মধ্যে মতৈক্যের চেয়ে মতানৈক্যই বেশী ধরা পড়ে। বিমান বন্দর থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত যাত্রার বিবরণ কেন যে রিপোর্টে তোলা হয় নি তা বলা দুষ্কর, তবে সম্ভবত আরও বেশী জটিল পরিস্থিতি এড়ানোর জন্যই একাজ করা হয়েছে। সাইগন থেকে যাত্রা শুরু করে তাইহোকু বিমানক্ষেত্রে খাড়াভাবে নীচে নেমে আসা পর্যন্ত ঘটনার কোন পর্যায়েই সাক্ষীরা অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শীরা একমত হতে পারেন নি। সবাই ঐ জীবন মরণ সংগ্রামের প্রতীক্ষদর্শীর ও ঘটনার সঙ্গে ওতপ্রোতোভাবে জড়িত, কিন্তু একের বক্তব্যের সঙ্গে অন্যের বক্তব্যের ব্যবধান অনেক। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর জবানী কোন না কোন মুহূর্তে অন্য একজন প্রত্যক্ষদর্শী দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করেছেন, অথচ তাঁরা একই বিমানের যাত্রী, একই ঘটনার সাক্ষী। প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীদের জবানীর মধ্যে অসংলগ্নতা তাইহোকুর ঘটনার আসল ইতিহাস প্রকাশ করে। তাইহোকুর ঘটনাস্থল থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত যাত্রার প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট বক্তব্য রাখে। কর্নেল রহমান নেতাজী তদন্ত কমিটির কাছে বলেন যে ট্রাকের মেঝেতে শুইয়ে তাঁকে ও নেতাজীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু শ্রী এস. এ আয়ার এর কাছে দেওয়া বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন যে নেতাজীর পাশে শুয়ে বীভৎস দৃশ্য দেখার পর তিনি জ্ঞান হারান এবং যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে তখন তিনি হাসপাতালের বিছানায়, অবশ্য নেতাজীর বিছানার পাশেই।* এক্ষেত্রে কর্নেল হবিব-উর রহমান এর কোন্ বিবৃতিকে সত্য বলে ধরে নিতে হবে তা তিনিই শুধু বলে দিতে পারেন। শুধু

---

* I too was exhausted and went and lay down next to him. I could hardly know what happened to the others. The whole place looked horrible with the wreckage of the plane and we passengers strewn about all over the place. The next thing I knew was that I was lying on a hospital bed next to Netaji. Unto Him A witness. P-133

মাত্র কর্নেল হবিব-উর রহমান এর বিবৃতিগুলির মধ্যেই এত বিরোধী বক্তব্য ও অসামঞ্জস্য রয়েছে যে তাঁকেই তাঁর বিবৃতিগুলি বিচার করতে দিলে তিনি বিব্রত বোধ করবেন। তবে এ কথাও সত্য যে কর্নেল রহমান তাইহোকুর সত্য ইতিহাস সম্বন্ধে ইঙ্গিত রাখতে দ্বিধা বোধ করেন নি এবং ঐ বক্তব্যগুলিই বহুজনের স্বরূপ প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে।

১০

দ্বিতীয় পর্বের সপ্তদশ অনুচ্ছেদে নেতাজী তদন্ত কমিটি লিখেছেন যে হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থার বিষয়ে যাওয়ার আগে বিমান দুর্ঘটনা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে যে বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল কিনা, তার কারণ, ঐ দুর্ঘটনা থেকে কেউ বেঁচে যেতে পারেন কিনা। কমিটির কাছে দেওয়া সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে বিশ্বাস করার মত যথেষ্ট তথ্য আছে যে, যে বিমানটি নেতাজীকে নিয়ে যাচ্ছিল সেই বিমান ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট অপরাহ্নে তাইহোকু বিমান বন্দরে বিধ্বস্ত হয়েছিল। জাপানী ও জাপানী নন এমন বহু সাক্ষীদের অবিশ্বাস করার মত কোন কারণ নেই। কমিটির কাছে এমন কোন তথ্য নেই যা থেকে প্রমাণ করা যেতে পারে যে আলোচ্য বিমানটি তাইহোকুতে বিধ্বস্ত হয় নি। দুর্ভাগ্য বশতঃ জাপ কর্তৃপক্ষ বিমান দুর্ঘটনার ঐ সময় কোন আনুষ্ঠানিক তদন্ত করেন নি। ১৯৪৫ সালে ফরমোসা সেনাবাহিনীর চীফ্ অফ ষ্টাফ্ ছিলেন জেনারেল ইসায়ামা। তাঁকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি প্রথম বলেন যে যেহেতু বিমানটি ফরমোসা সামরিক বাহিনীর বিমান নয়, সেজন্য এই বিষয়ে তদন্ত করার কোন দায়িত্ব ফরমোসা সেনা-বাহিনীর সদর দপ্তরের ছিল না। পরে তিনি বলেন যে, বিমানটি যে এলাকায় বিধ্বস্ত হয়েছিল, সেই এলাকার কম্যাণ্ডার এর দায়িত্ব ছিল ঐ সম্পর্কে তদন্ত করা এবং উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে ঘটনার বিবরণ পাঠানো। তিনি আরও বলেন যে এক্ষেত্রে লেঃ কর্নেল শিবুয়া, তাঁর (জেনারেল ইসায়ামা) মাধ্যমে ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে একটি রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। লেঃ কর্নেল শিবুয়াকেও জেরা করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন যে এ ধরণের কোন তদন্ত সম্পর্কে তাঁর কিছুই জানা নেই। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন যে এ ধরণের

ঘটনার তদন্ত করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিমান বিভাগেরই ওপর বর্তায়। এই ব্যাপারে তদন্ত কমিটি আরও যোগাযোগ করেন এবং জাপ কর্তৃপক্ষ বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কে যে কোন আনুষ্ঠানিক তদন্ত করেন নি তার সমর্থনে জাপ পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে একটি রিপোর্ট আদায় করেন। বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কে একটা আনুষ্ঠানিক তদন্ত আশা করা গিয়েছিল, কারণ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস ও লেঃ জেনারেল সিডির মত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ঐ দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন। ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাপানের আত্মসমর্পণের পরে অসম্ভব বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। দিল্লীতে ফিরে এসে নেতাজী তদন্ত কমিটি জাপানী সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রমাণ যথাযথ রেকর্ড করে আলোচ্য বিমান, তার অবস্থা ও দুর্ঘটনা সম্বন্ধে পাওয়া তথ্য প্রমাণ, ভারত সরকারের অসামরিক বিমান দপ্তরের ডাইরেক্টর জেনারেল এর কাছে মতামতের জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। অসামরিক বিমান দপ্তরের ডাইরেক্টর জেনারেল ঐ নথিপত্রগুলি একজন বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরীক্ষা করান। বিমান দুর্ঘটনা ও তার কারণ সম্বন্ধে দুর্ঘটনা তদন্ত বিভাগের এয়ারক্র্যাফ্ট ইন্সপেক্টর এ. এম্. এন্ শাস্ত্রীর অভিমত তদন্ত কমিটি রেকর্ড করেন। শ্রী শাস্ত্রী অভিমত দিয়েছিলেন—সাক্ষীদের জবানী, নক্সা ও ছবিগুলি থেকে দেখা যায় আকাশে ওঠার পরই বিমান বন্দরের সীমানার মধ্যে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছিল। সর্বোচ্চ সীমা ১৫০ ফিটের মধ্যে বিমানটি যে কোন উচ্চতা পর্যন্ত উঠে থাকতে পারে। সাক্ষীদের জবানীমতে বিমানটির মাটিতে পড়ে যাওয়ার প্রারম্ভিক কারণ—বিমানের প্রপেলার ও পরে বাঁ দিকের ইঞ্জিনটি ভেঙ্গে পড়ে যাওয়া। যে তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়, তা থেকে প্রপেলারটি কিভাবে ইঞ্জিন থেকে খুলে পড়ে গিয়েছিল তার সঠিক কারণ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। ইঞ্জিন তৈরীর বিবরণ, বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, এবং বিমানটির তত্ত্বাবধানের রেকর্ড না থাকার দরুণ এবং ভগ্নাবশেষ পরীক্ষা না করে ঠিক কি কারণে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছিল

তা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী মেজর কোনোর জবানী থেকে মনে হয় যে ইঞ্জিনে গোলযোগ ছিল এবং সাইগন থেকে আকাশে ওঠার সময় তা অত্যধিক গতিবেগ নিচ্ছিল। বিমান দুর্ঘটনার সঙ্গে এর যোগাযোগ আছে বলে মনে হয়।"

বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার পরিণাম ও মৃত্যুর হাতছানি থেকে বেঁচে যাওয়ার সম্বন্ধে শ্রী শাস্ত্রী বলেছেন, "মেজর কোনোর বক্তব্য মতে স্টার বোর্ডের সামনে থেকে আগুন শুরু হয়েছিল ধরে নিলে এবং পেট্রল ট্যাঙ্কের অবস্থান ও বিমানে জরুরী ব্যবস্থা যথাযথ ছিল না বলে বিচার করলে, বলা যেতে পারে যে—

(১) সব চেয়ে দুর্গতি হওয়ার সম্ভাবনা তাঁদেরই যাঁরা সামনে ছিলেন;

(২) যাঁরা মাঝখানে বাঁ দিকে বসেছিলেন তাঁদের গুরুতরভাবে আহত হওয়ার সম্ভাবনা; এবং

(৩) পিছনদিকে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের বেঁচে যাওয়া সম্ভবনা।"

তিনি আরও খোলাখুলিভাবে বলেছেন, "বিমান দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে, যাত্রী ও বৈমানিকদের বেঁচে যাওয়াটা সম্পূর্ণ ভাগ্যের ব্যাপার। এমন দুর্ঘটনার কথাও আমি (শ্রী শাস্ত্রী) জানি যেখানে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে কিন্তু আরোহীরা বেঁচে গেছেন, অথচ অনুরূপ কোন এক দুর্ঘটনায় আরোহীরা সবাই মারা গেছেন। বিমান দুর্ঘটনার ব্যাপারে আরোহীদের রক্ষা পাওয়া সম্বন্ধে সঠিকভাবে কোন ভবিষ্যত বাণী করা খুবই কঠিন ব্যাপার।"

নেতাজী তদন্ত কমিটি বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে স্থির নিশ্চিত হতে পেরেছেন যে তাইহোকু কেন্দ্রে ১৯৪৫ সালে ১৮ই আগস্ট যে বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল বলে প্রকাশ পেয়েছিল তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কমিটির কাছে স্বদেশী ও বিদেশী বহু ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছেন। সাক্ষীদের তালিকায় ৬৮ জনের নাম দেখা যায়। এতজন সাক্ষীকে

অবিশ্বাস করার মত নাকি কোন কারণই নেই। কথায় বলে, যা রটে তার কিছুটা সত্য বটে। নেতাজী তদন্ত কমিটি নিশ্চয়ই এই ধরণের প্রচলিত প্রবাদের ওপর আস্থা রেখে সমস্ত ঘটনার বিচার করেন নি। যান্ত্রিক গোলযোগ যে কোন মুহূর্তে দেখা দিতে পারে, এবং আকাশে উড়তে থাকা বিমান যে কোন সময় খুব নগণ্য কারণেও মাটিতে ভেঙ্গে পড়তে পারে। যাঁরা কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাঁরা যে দেশেই জন্মে থাকুন নেতাজী তদন্ত কমিটির কাছে তাঁদের পরিচয় হ'ল তাঁরা আলোচ্য ঘটনার সাক্ষী। সাক্ষীরা যে সত্য গোপন করবেন না, বা করতে পারেন না, তেমন সততার সার্টিফিকেট কখনই দেওয়া সমীচিন নয়। সাক্ষীরা ভারতীয়ই হোন আর জাপানীই হোন, তাঁদের অবিশ্বাস করার যেমন কোন কারণ নেই, তেমনি সব সাক্ষ্য বেদ বাক্যের মত বিশ্বাস করারও কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। কমিটির বক্তব্য পড়তে পড়তে সব পর্যায়েই একটা ধারণা জন্মায় যে বিমান দুর্ঘটনা যে ঘটেছিল তা কমিটি জানতেন এবং এখন শুধু মাত্র কোথায় দুর্ঘটনা ঘটেছিল তার প্রমাণ পাওয়ার চেষ্টা চলেছে। কমিটি লিখেছেন যে তাঁদের কাছে এমন কোন তথ্যপ্রমাণ নেই যা থেকে বোঝা যায় যে আলোচ্য বিমানটি তাইহোকুতে দুর্ঘটনার মুখে পড়ে নি। যদি লেখা হ'ত যে আলোচ্য বিমানটি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় নি এমন কোন তথ্য প্রমাণ নেই, অর্থাৎ শুধু 'তাইহোকু' কথাটা বাদ দিলে কমিটির বক্তব্যের অর্থ ভিন্ন হ'ত। কিন্তু, তাইহোকু বিমান বন্দরে যে ঘটনা ঘটেছিল বলে সাক্ষীরা বলেছেন তার কোন একটা পর্যায়ে নিশ্চিতভাবে কোন প্রমাণ সাক্ষীরা দাখিল করতে পারেন নি। সংক্ষেপে কোন ঘটনা শোনার পর যদি সেই ঘটনা সত্য বলে ধরে নেওয়া হ'ত, তাহলে বিচারালয়ে আইনজ্ঞদের জেরা ও সওয়ালের প্রয়োজন হ'ত না। সাক্ষীরা সবাই প্রত্যক্ষদর্শী বলে নিজেদের দাবী করেছেন, কিন্তু প্রত্যেক পর্যায়ে একে অন্যের বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে অসংলগ্নতা ও অসামঞ্জস্য প্রত্যেক পর্যায়ে প্রকট

হয়েছে। ঘটনার বিবরণের মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবীদারদের মতানৈক্য কখনই ঘটনার সুনির্দ্দিষ্টতা প্রমাণ করে না। আলোচ্য বিমানটি দুর্ঘটনায় বিধ্বস্ত হয়েছিল ফরমোসার তাইহোকুতে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও জেনারেল সিডির মত দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি যে ঐ বিমানের যাত্রী ছিলেন, তা সাইগন বিমান বন্দরে উপস্থিত ব্যক্তিরা বলেছেন। দুর্ঘটনা কদাচিৎ ঘটে এবং যে কোন দুর্ঘটনার কারণ ও পরিণতি সম্বন্ধে সব সময় সব দেশেই তদন্ত করা হয়ে থাকে। নেতাজী তদন্ত কমিটি জাপ সরকারের তরফ থেকে কোন রকম আনুষ্ঠানিক তদন্ত করা হয়নি বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। জাপ সরকারের লেখা চিঠির অনুলিপিও কমিটি আনেক্সার এ দিয়েছেন। ঐ চিঠিতে জাপ সরকারের এশিয়ান এ্যাফেয়ার্স বুরো'র-(গাইমুশো) লিখেছেন যে No official enquiry commission to determine the causes of the accident in question was held so for.* জাপ সরকার বলেছেন যে বিমান দুর্ঘটনা সম্বন্ধে সরকারী তদন্ত হয় নি। কিন্তু বেসরকারীভাবে কোনরকম তদন্ত হয় নি তা বলেন নি। দুর্ঘটনা সম্পর্কে সরকারী কমিটি গঠন করার প্রশ্ন তখনই আসতে পারে যখন ঘটনা সত্যিই ঘটে কিন্তু এক্ষেত্রে তার কোন প্রয়োজনই ঘটে নি, সুতরাং সরকারীভাবে তদন্ত করার প্রশ্নই ওঠে না। দুর্ঘটনার কবলিত হয়েছে একটা সামরিক বিমান এবং ঐ বিমানের যাত্রী ছিলেন জাপ সেনাবাহিনীর কয়েকজন পদস্থ অফিসার ও ভারতের জনগণের নেতার নেতা, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস। জাপ সরকার আত্মসমর্পণ করলেও অন্য দেশের সঙ্গে সৌহার্দ ও সৌজন্য রক্ষার চেষ্টা করাটা চিরকালের রীতি। তাঁর দেশের অফিসারদের জীবনের দাম তিনি যতটাই দিন না কেন, নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের ক্ষেত্রে তাঁর একটা কর্ত্তব্য ও বাধ্যবাধকতা আছে। অমন একজন বিশিষ্ট নেতা জনদরদী বিপ্লবীর মৃত্যুর খবর তাঁরা প্রচার করলেন বলে জানা গেল,

*Gaimusho's Report dt 4. 6. 56

কিন্তু দুর্ঘটনার বিষয়ের কোন রকম তদন্ত করলেন না, অথচ দুর্ঘটনার খবর প্রচার করলেন, এমন কথা বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয়। সরকারী প্রচারের পিছনে সরকারী সূত্রের সমর্থন থাকে। এক্ষেত্রে কোন তদন্ত না করে ঘটনার সত্যতা কিভাবে যাচাই করা হয়েছিল তা বোঝা যায় না। কমিটির কাছে জেনারেল ইসায়ামা যে জবানী রেখেছেন তার মধ্যে একটু গড়মিল পাওয়া যায়। প্রথমে তিনি দুর্ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করার দায়িত্ব অস্বীকার করেন এবং পর মুহূর্তে বলেন যে তাঁরই মাধ্যমে তাঁর অধীনস্থ অফিসার লেঃ কর্নেল শিবুয়া ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স-এ একটি রিপোর্ট পাঠান। জেনারেল ইসায়ামা ফরমোসা সেনাবাহিনীর চীফ অফ্ জেনারেল স্টাফ ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে পাঠানো রিপোর্টটা কোথায়? কিন্তু এর চেয়েও বিস্ময়কর অধ্যায় রয়েছে। তাঁরই (জেনারেল ইসায়ামা) অধীনস্থ অফিসার লেঃ কর্নেল শিবুয়া রিপোর্টের বিষয় পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। কার জবানী সত্য? যদি জেনারেল ইসায়ামার জবানী সত্য হয়ে থাকে তবে ঐ রিপোর্ট জাপ সরকার কেন পেশ করলেন না? তাহলে সরকারী তদন্ত কমিটি গঠন করা না হলেও সরকারী সূত্রে বেসরকারীভাবে রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছিল বলে ধরে নিতে হয়। জাপ সরকার কি তাহ'লে ঘটনা গোপন করলেন? আর, যদি লেঃ কর্নেল শিবুয়ার বক্তব্যকে সত্য বলে স্বীকার করে নিতে হয় তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে জেনারেল ইসায়ামা কেন মিথ্যার আশ্রয় নিলেন? প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানীর কথা বাদ দিলে, একটা প্রশ্ন থেকেই যায় যে জাপ সরকারের উঁচু মহলেও দুর্ঘটনার ব্যাপারে 'হ্যাঁ' ও 'না' এর দ্বন্দ্ব তুলে ধরা হয়েছে। আলোচ্য দুর্ঘটনা যদি সত্যিই ঘটে থাকত তবে এত অসামঞ্জস্য ও বিরোধী বক্তব্যের সমাবেশ হ'ত না।

তদন্ত কমিটি এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে আত্মসমর্পণের পর সম্ভবত জাপানে বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দিয়েছিল। জাপানে সত্যই

বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দিয়েছিল কিনা তা কমিটি নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন নি। অবশ্য এই সম্বন্ধে জাপ সরকারকে কোন প্রশ্নও তাঁরা করেন নি। কমিটির অনুমানের ওপর নির্ভর করে জাপানের পরিস্থিতি বিচার করা সম্ভবত ঠিক হবে না। একটা কথা সর্বত্র প্রচলিত আছে যে—It requires more discipline in surrendering than in fight, অর্থাৎ যুদ্ধের চেয়ে আত্মসমর্পণ করার সময় আরও বেশী শৃঙ্খলার প্রয়োজন। ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাপান সরকারীভাবে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তাঁদের আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত দূত মারফৎ মিত্ররাষ্ট্রের প্রধানদের কাছে পাঠানো হয়েছিল এবং ঐসব প্রধানদের টোকিওতে আশ্রয় দেওয়ার ব্যবস্থাও হয়েছিল। জাপ সরকারের প্রতিনিধি নিয়ম মাফিক যে রাষ্ট্রপ্রধানদের নিয়ে এসেছিলেন তার প্রমাণ ডঃ বা মকে টোকিওতে নিয়ে আসা। দুর্ঘটনা যেদিন ঘটেছিল বলে প্রকাশ, তার সাতদিন পরেও যে খুবই সুশৃঙ্খলভাবে সব ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহই থাকে না।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস ও জেনারেল সিডির বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর জাপানের বাইরে যেতে বেশ কয়েকদিন সময় লেগেছিল। এই সময় লাগার কারণ কি? নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস এর মত নেতার সত্যিই যদি মৃত্যু ঘটে থাকে তাহ'লে, যেদিন দুর্ঘটনা ঘটেছিল বলে জানা যায় সেদিনই বিশ্ববাসীকে জানানো হয় নি কেন? জাপ সরকার এই প্রশ্নের উত্তর কি দিয়েছেন জানি না, তবে দুর্ঘটনার খবর কোন সময় নষ্ট না করে প্রচার করাটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। অস্বাভাবিক কাজ করে স্বয়ং জাপ সরকার প্রমাণ রেখেছেন যে ঘটনার মধ্যে কিছু গোলযোগ অবশ্যই রয়েছে। ঐ গোলযোগের মীমাংসা জাপ সরকারই তাঁদের দলিল দস্তাবেজ দিয়ে প্রমাণ করেছেন। তাহ'ল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস নিহত হয়েছিলেন তাই-হোকুতে এক বিমান দুর্ঘটনায়, আর জেনারেল সিডি নিহত হয়েছেন, তাইহোকুর প্রান্তরে স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে। অথচ দু'জনে

একই বিমানের যাত্রী ছিলেন এবং ঐ বিমানটিই তাইহোকুতে খাড়াভাবে আকাশ থেকে নীচে নেমে এসে দু'জনেরই মৃত্যু ঘটিয়েছিল বলে প্রকাশ। জাপ সরকারের সরকারী বক্তব্য থেকে জানা যায় যে তাঁরা দুর্ঘটনার কারণ সম্বন্ধে কোনরকম আনুষ্ঠানিক তদন্ত করেন নি। কিন্তু দুর্ঘটনা যে সত্যই ঘটেছিল তার কি প্রমাণ তাঁরা পেয়েছিলেন? তাইহোকু থেকে টোকিওর দূরত্ব অনেক। যদি আলোচ্য বিমানটি যাত্রাপথে টোকিওতে যাত্রা বিরতি করবে বলে ঠিক করা ছিল বলে ধরে নেওয়া যায় তাহ'লে একথাও বিশ্বাস করতে হবে যে টোকিওর জাপ সরকারী মহলের যথাযথ কর্তৃপক্ষ, অন্ততঃপক্ষে জাপ পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ শিগিমিৎসুর কাছে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের টোকিওতে আসার খবর ছিল। আলোচ্য বিমানটি তাইহোকুতে বিধ্বস্ত হওয়াতে অবশ্যই টোকিও পর্যন্ত আর যেতে পারে নি। বিমানটির টোকিও পৌঁছানোর সময় পার হয়ে যাওয়ার পর তিনি কি করেছিলেন? তাইহোকু থেকে দুর্ঘটনার খবর কখন তাঁর কাছে পৌঁছেছিল? দুর্ঘটনার খবর টোকিওতে পৌঁছানো মাত্র জাপ সরকারের সদর দপ্তর থেকে কে ছুটে গিয়েছিলেন ঐ তাইহোকুতে? এই সকল সঙ্গত প্রশ্নের কোন উত্তর কেউ দেবে না, কারণ যা ঘটেছিল তা কেবল রটনা মাত্র।

তাইহোকু প্রসঙ্গে আজাদ হিন্দ্ সরকারের মন্ত্রী শ্রী এস্. এ. আয়ার এর লেখা থেকে জানা যায় যে, ১৯৪৫ সালের ২০শে আগস্ট সাইগন বিমান বন্দরে ডোমি নিউজ এজেন্সির দক্ষিণাঞ্চলের প্রধান মিঃ ফুকুওকার সঙ্গে শ্রী আয়ার এর দেখা হয়েছিল। মিঃ ফুকুওকা শ্রী আয়ারকে তখন বলেছিলেন, "মিঃ আয়ার, আমি নেতাজীর জন্য দুঃখিত। "শ্রী আয়ার উদ্বেগের সঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন কেন, কি ব্যাপার? তিনি কি কোন প্রতিকুল আবহাওয়া বা ইঞ্জিনের গোলযোগের জন্য কোথাও আটক হয়ে পড়েছেন? উত্তরে মিঃ ফুকুওকা বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আমার মনে হয় ঐরকমই কিছু ঘটেছে; কিন্তু দয়া

করে এখানে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।' পরমুহূর্তেই শ্রী আয়ার দেখেছিলেন যে নৌবাহিনীর পোষাকে রিয়ার এ্যাড্‌মিরাল চুডা তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছিলেন। শ্রী আয়ার বিমানে জাপানের দিকেই যাচ্ছেন কিনা জিজ্ঞাসা করে রিয়ার এ্যাড্‌মিরাল চুডা জানালেন যে নেতাজী মৃত। নেতাজী কথাটা তিনি এমনভাবে উচ্চারণ করেছিলেন যে শ্রীআয়ার এর কানে ঐ নামটি চ্যাটার্জী বলে মনে হয়েছিল। শ্রী আয়ার বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। সঠিকভাবে তাঁর মনে পড়ে না যে তিনি রিয়ার এ্যাড্‌মিরাল চুডাকে কি বলেছিলেন, তবে অনুমানের ওপর নির্ভর করে তিনি লিখেছেন যে তিনি সম্ভবত প্রশ্ন করেছিলেন, "চ্যাটার্জ্জী মারা গেছেন, বলছেন? কি করে তা সম্ভব? তিনি ১৬ তারিখ নাগাদ সাইগন ত্যাগ করে গেছেন। তিনি তো সিঙ্গাপুরের পথে যাচ্ছিলেন? বিমানে সিঙ্গাপুর যাওয়ার পথেই কি দুর্ঘটনা ঘটেছে? "রিয়ার এ্যাড্‌মিরাল চুডা উত্তরে তাঁকে কি বলেছিলেন সে সম্বন্ধে আজও তাঁর সংশয় রয়েছে। তিনি হেঁটে এগিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীআয়ার যখন বিমানে উঠতে যাচ্ছিলেন তখন তিনি আবার ফিরে এসে বলেছিলেন, 'মনোবল ফিরিয়ে আনুন।" শ্রীআয়ার প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?" রিয়াল এ্যাড্‌মিরাল যা বলেছিলেন তা "আযাজী" শব্দের মত মনে হয়েছিল। শ্রী আয়ার তাঁর কাছে আবার জানতে চেয়েছিলেন যে তিনি চ্যাটার্জ্জীর কথা বলেছিলেন কি না। উত্তরে রিয়ার এ্যাড্‌মিরাল বলেছিলেন যে তিনি নেতাজীর কথা বলছিলেন। নেতাজীর নাম শুনে শ্রী আয়ার আঁত্‌কে উঠেছিলেন। সাইগনের বিমান বন্দরে তখন বোমারু বিমানটির ইঞ্জিন চালু করা হয়েছিল। শ্রী আয়ার বিমানের দিকে এগিয়ে চলেছিলেন, আর রিয়ার এ্যাড্‌মিরাল চলেছিলেন তাঁর পাশে পাশে। হেঁটে যেতে যেতে তিনি শ্রীআয়ারকে বলেছিলেন "হ্যাঁ, নেতাজী। চন্দ্র বোস কাক্কা (হিজ্‌ এক্সেলেন্সি চন্দ্র বোস)।" রিয়ার এ্যাড্‌মিরাল চুডার কাছ

থেকে এই খবর পাওয়ার পর শ্রী আয়ার বিমানে উঠেছিলেন। দ্বিতীয় যে ব্যক্তির কাছ থেকে তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে বিশদ খবর পেয়েছিলেন, তাঁর নাম কর্নেল টি। তিনি জাপ সেনাবাহিনীর একজন সিনিয়র স্টাফ অফিসার ছিলেন। কর্নেল টির কাছ থেকে তাইহোকুর দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর শ্রী আয়ার বলেছিলেন, "দেখুন কর্নেল, আমি খোলাখুলিভাবেই আপনাকে বলতে চাই যে পূর্ব এশিয়া বা ভারতবর্ষের কোন ভারতীয়ই এই কাহিনী বিশ্বাস করবেন না, যদি আপনারা সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পেশ করতে না পারেন। আপনি বলেছেন, হাবিব বেঁচে আছেন। ভাল কথা; আপান এই মুহূর্তে আমায় তাইহোকু নিয়ে যাবেন? আমি স্বচক্ষে নেতাজীর মরদেহ দেখব। আমি হাবিব এর সঙ্গে দেখা করব। পরে আমাকে বলবেন না যে নেতাজীর মরদেহের শেষ কৃত্য করে ফেলা হয়েছে এবং হাবিবের সঙ্গে দেখা করার মত অবস্থায় তিনি নেই। যা কিছুই ঘটুক, আমাকে তাইহোকুতে নিয়ে যেতেই হবে।" কর্নেল উত্তরে বলেছিলেন, "আমার চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না। আমরা ইতিমধ্যেই তাইহোকুকে ছবি তুলে রাখতে এবং দুর্ঘটনা সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করতে নির্দেশ পাঠিয়েছি।" শ্রী আয়ারকে নিয়ে উড়ন্ত বোমারু বিমানটি একসময় আবার মাটিতে নেমে এসেছিল। তিনি ভেবেছিলেন যে বিমানটি তাইহোকুর মাটিতে নেমেছিল, তাই তিনি ক্যাপ্টেন আয়োগিকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আমার মনে হয় আমরা তাইহোকুতে পৌঁছে গেছি।" ক্যাপ্টেন আয়োগিকে জাপ সরকার এর হিকারি কিকান দপ্তর থেকে শ্রী আয়ার এর সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রতিনিধি হিসাবে পাঠানো হয়েছিল। ক্যাঃ আয়োগি উত্তরে বলেছিলেন, "আমরা তাইহোকুতে নয়, তাইচুতে এসেছি।" শ্রী আয়ার এর মনে হয়েছিল যে কর্নেল এর গলাটা টিপে ধরবেন। চিৎকার করে উঠেছিলেন তিনি, "কেন?" ক্যাঃ আয়োগি ও কর্নেল টির অকটু একান্তে কিছু বাক্যালাপ চলেছিল। তারপর ক্যাঃ

আয়োগি জানিয়েছিলেন, "দুঃখিত……জানিনা……দেখুন বিমানের গতিপথ আমাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না…আবহাওয়া অনুকূল নয়… আমাদের তাইচুতে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে…বলতে পারি না আমরা আদৌ তাইহোকু যেতে পারব কি না…সম্ভবত না।" শ্রী আয়ার ক্যাপ্টেন আয়োগির কথা শুনে খুবই মুস্‌ড়ে পড়েছিলেন। কর্নেল টির সঙ্গে তাঁর আবার আলাপ আলোচনা হয়েছিল। কর্নেল টি তাঁকে আবার আশ্বস্ত করেছিলেন যে তিনি বোমারু বিমানটিকে তাইহোকু নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন, তবে সফল হওয়ার আশা খুবই কম।" এর পরের ঘটনা আরও চমকপ্রদ। ১৯৪৫ সালের ২২শে আগস্ট বেলা ১-৩০ মি নাগাদ শ্রী আয়ারকে টোকিওর ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এ নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে সারি সারি বাড়ির বারান্দা ধরে মাইলের পর মাইল কর্নেল টির সঙ্গে হেঁটে একটি ছোট বিশ্রাম ঘরে এসে পৌঁছলেন।* তাঁর জন্য এক কাপ গরম পানীয় এল। ওদিকে কর্নেল টি কোথায় যেন গেলেন। ঘণ্টা কয়েক পরে বিকাল ৫টা নাগাদ কর্নেল টি ও ক্যাপ্টেন আয়োগি ফিরে এলেন। তিনজন মিলে আবার গেলেন পাশের এক বাড়িতে। আবার শুরু হ'ল প্রতীক্ষা। ইতিমধ্যে জাপ পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে দু'জন পদস্থ অফিসার এসে পৌঁছলেন। ভারতের বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত একজন সিনিয়র স্টাফ অফিসার কর্নেল সিও এলেন। কর্নেল টি., কর্নেল সি., ক্যাপ্টেন আয়োগি, শ্রী এস. এ. আয়ার ও দু'জন পররাষ্ট্র দপ্তরের পদস্থ অফিসার এক সঙ্গে আলাপ আলাচনা করতে

---

* An hour's drive down the narrow lanes on the outskirts of Tokyo brought us to the Dai Hon Yei (Imperial General Headquarters). There we walked miles and miles of corridors before I was ushered into some waiting room where I was perfectly content to slip into a chair and close my eyes. I was thirsty and tired. —S. A. Iyer.

Unto Hin A Witness, P. 98

বসলেন। ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। শ্রী আয়ার প্রথম প্রশ্ন করলেন, "নেতাজীর মরদেহ কি টোকিওতে আনা হয়েছে ?" উত্তরে কর্নেল সি ও পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিনিধিরা জানালেন "না।" শ্রী আয়ার আবার প্রশ্ন করলেন, "আপনারা কি তা টোকিওতে আনার চেষ্টা করছেন, না, সিঙ্গাপুর নিয়ে যাবেন ?" উত্তরে জাপ প্রতিনিধি জানালেন, "আসল ব্যাপার হ'ল, আমরা তাইহোকু থেকে কোন খবর পাই নি। গত দু'দিন ধরে তাইহোকুর সঙ্গে আমাদের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এবং ওখানে কি ঘটছে তা আমরা জানি না। যাহোক, নেতাজীর মরদেহ টোকিওতে নিয়ে আসার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা তা আমরা অচিরেই আপনাকে জানাতে পারব, কিন্তু অন্য কোথাও ঐ দেহ নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।" শ্রী আয়ার তখন জানতে চাইলেন, "হাবিবের খবর কি ? তাঁর কি কোন খবর আছে ? তিনি কি সুস্থ ?" উত্তর এল, "খুবই দুঃখিত, আমাদের কাছে তাঁরও কোন খবর নেই। আমরা আশা করি তিনি সুস্থ হয়ে উঠছেন।" শ্রী আয়ার তখন চরম নৈরাশ্যভরে প্রশ্ন করলেন, "তাইহোকু থেকে আর কোন খবর পাওয়ার আশা আপনারা রাখেন ?" জাপ প্রতিনিধি জানালেন, "নিশ্চয়ই। তাইহোকু থেকে খবর পাওয়ার আশা আমরা রাখি তবে খবর আসতে সময় লাগবে।" শ্রী আয়ার এর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেতাজী তদন্ত কমিটির জানার কারণ, তাঁরা শ্রী আয়ার এর লেখা বই পড়েছেন। তাইহোকু থেকে টোকিও পর্যন্ত খবর আসতে কত সময় লেগেছিল তাও কমিটির সদস্যদ্বয়ের জানা। শ্রী আয়ার দিনের পর দিন জাপানের ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এ গেছেন আর নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছেন,—তাইহোকু থেকে কোন খবর আসে নি। ১৯৪৫ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তাঁকে আশ্বস্ত করা হ'ল, তাইহোকুর খবর পাওয়ার জন্য পরদিন দেখা করতে। ৮ই সেপ্টেম্বর সকালে শ্রী আয়ার, শ্রী রামমূর্তির সঙ্গে জাপ ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এ

গেলেন। সেখানে কর্নেল সি তাঁদের জানালেন যে কর্নেল হাবিব সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং তাইহোকু থেকে নেতাজীর ভস্মাবশেষ নিয়ে টোকিও এসে পৌছেছেন।

শ্রীআয়ার এর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে ডোমি নিউজ এজেন্সি তাইহোকুর ঘটনা সম্বন্ধে খবর পেয়েছিলেন। কিন্তু একথা সত্য যে কর্নেল সি প্রকাশ্যে কোন খবর দিতে পারেন নি। তাঁর গোপনতা রক্ষার প্রয়াস প্রমাণ করে যে তিনি কানাঘুষায় খবরটি পেয়েছিলেন, কিন্তু সরকারী সমর্থন ছিল না বলে প্রকাশ করতে পারেন নি। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের খবরের ভিত্তিতে দুর্ঘটনার সরেজমিন তদন্ত অবশ্যই করতে পারেন নি। রিয়ার এ্যাড্‌মিরাল চূড়ার কাছেও খবরটি পৌছেছিল। কিন্তু 'চন্দ্র বোস কাক্কা মৃত' এই খবরটুকুই তিনি জানতেন। তৃতীয় ব্যক্তি কর্নেল টি, দুর্ঘটনার খবরটি বিশদভাবে বলেছিলেন। এই বিশদ বিবরণ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে। তবে কর্নেল টি, আয়ারকে তাইহোকু যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন বলেছিলেন। সে চেষ্টা কেন ফলপ্রসূ হয় নি তাও জানা যায়। তাঁদের কাছে নির্দেশই ছিল যে বিমানটি তাইহোকুতে নামবে না। শ্রীআয়ারকে তিনি যে আশ্বাস দিয়েছিলেন তা রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না তা তিনি জানতেন। বিমানের যাত্রাপথের নির্দেশ এসেছিল সদর দপ্তর থেকে এবং তাঁরা এও জানতেন যে শ্রীআয়ারকে তাইহোকু নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। তাই তাইচু বিমান বন্দরে বিমানে বসে ক্যাঃ টি, ও ক্যাপ্টেন আয়োগিকে একটু গোপন বাক্যালাপ্‌ করতে দেখা গিয়েছিল। কর্নেল টি, অবশ্য খুবই বাস্তবধর্মী. একটি খবর ফাঁস করে দিয়েছিলেন তাহ'ল তাইহোকুতে দুর্ঘটনা সম্বন্ধে ছবি ও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করে রাখতে বলা হয়েছে। এই নির্দেশ কে দিয়েছিলেন তা যদিও বলা হয় নি, তবে অনুমান করে নেওয়া যায় যে কর্নেল এর সদর দপ্তর থেকেই ঐ নির্দেশ পাঠানো সম্ভব। শ্রী আয়ারকে নিয়ে টোকিওতে ইম্পিরিয়াল জেনারেল

হেড কোয়ার্টার্স এর সংশ্লিষ্ট দপ্তরে কর্নেল টি, সরাসরি যান নি। শ্রীআয়ারকে কয়েক মাইল করিডোর ধরে হাঁটিয়ে একটি ছোট বিশ্রাম ঘরে বসিয়ে দিয়ে তিনি অদৃশ্য হয়েছিলেন। শ্রী আয়ার এর পদ-মর্যাদা সম্বন্ধে কর্নেল টি, নিশ্চয় ওয়াকিবহাল ছিলেন, কারণ ক্যাপ্টেন আয়োগিকে হিকারি কিকানের তরফ থেকে শ্রী আয়ার এর জন্যই যে পাঠানো হয়েছিল তা তিনি জানতেন। একজন মন্ত্রীকে একটি বিশ্রাম ঘরে কয়েক ঘণ্টার জন্য বসিয়ে রেখে অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটা গোপন সলাপরামর্শের ইঙ্গিতবহ। জাপ সরকার এর কাছে তাইহোকু থেকে কোন খবর ছিল না এবং কবে সে খবর পাওয়া যাবে তারও কোন নিশ্চয়তা ছিল না; এ খবর থেকে প্রমাণ হয় যে তাইহোকুর সঙ্গে জাপ সরকারের কোন যোগাযোগ ছিল না, এবং তাঁরা সে কথা স্বীকারও করেছেন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিনিধিদ্বয় ও কর্নেল সির মাধ্যমে। জাপ সরকার এর সঙ্গে তাইহোকুর যোগাযোগ ছিল না। এবং দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও কুড়িদিন তাঁরা কোন খবরই পান নি। সেনাবাহিনীর প্রধান যে বক্তব্য রেখেছেন তা থেকে সত্য খুঁজে পাওয়া কষ্টকর যে সত্যই কোন রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল কি না। তাহ'লে তাইহোকুতে যে সব বিধিব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায় সে ব্যাপারে নির্দেশ কোথা থেকে পৌঁছেছিল। যা ঘটেছিল বলে প্রকাশ তা কিন্তু সামরিক দপ্তরের ব্যক্তিরাই করেছিলেন। একথাই কি তবে বিশ্বাস করে নিতে হবে যে তাইহোকুতে কর্মরত ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতো, মেজর কে সাকাই প্রমুখ সামরিক বাহিনীর ব্যক্তিগণ ও বিমানের যাত্রীরা তাঁদের দায়ীত্বেই যা করণীয় তাই করেছিলেন, কারও নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করেন নি? এমন ঘটনা ঘটে যাওয়া কখনই সম্ভব নয়। জাপ সরকারের সামরিক বাহিনীর অফিসারগণ তাঁদের ওপরওয়ালার নির্দেশ ছাড়াই সব কাজ নিজেরা সেরে ফেলবেন একথা বিশ্বাস্য নয়। যখন দুর্ঘটনা ঘটেছিল বলে প্রকাশ তখনও যে যথেষ্ট গোপনতা রক্ষা করে সব কাজ করা হচ্ছিল

এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতই যে সব কাজ হচ্ছিল তার প্রমাণ কর্নেল টি. ও কর্নেল সি.র কথা থেকেই বোঝা যায়।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস ভারতের জনপ্রিয় নেতা। তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে কোনরকম তদন্ত না করে, টোকিও থেকে কোন প্রতিনিধি না পাঠিয়ে, তাইহোকুর সঙ্গে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রেখে দিয়ে, সেনাবাহিনীর প্রধানদের কেহই উপস্থিত না থেকে সবাই, বিশেষ করে টোকিওর জাপ সদর দপ্তর নিরুদ্বেগে রইলেন এমন একটা পরিস্থিতি কল্পনা করাও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। যদিও দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার তিন দিন আগেই জাপ সরকার আত্মসমর্পণ করেছিলেন, তবুও একথা বিশ্বাস যোগ্য নয় যে তাঁদের প্রিয় চন্দ্র বোস কাক্কা'র মৃত্যুর খবর পেয়ে তারা কোন তদন্ত করবেন না। নেতাজী তাঁদেরও প্রিয়, কিন্তু তিনি ভারতের নেতা। ভারতীয়দের কাছে নেতাজীর "তথাকথিত শেষ সময়ের" বিশদ-ইতিহাস সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়াটা রাষ্ট্রনৈতিক হিসাবে কর্তব্য আর বাধ্যতা-মূলক। জাপ সরকার কোনটাই রক্ষা করেন নি বলে প্রমাণ পায়। তাইহোকুর রঙ্গমঞ্চে যে ঘটনা ঘটেছিল বলে প্রকাশ পেয়েছে তাতে তাইহোকু ও টোকিওর মধ্যে এক অবিশ্বাস্য তৎপরতা ও প্রকাশ্য কর্মচাঞ্চল্য দেখা দেওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তার পরিবর্তে দেখা গেছে গোপন কর্মব্যস্ততা। টোকিওর কর্মচঞ্চল জীবনে ও জাপ সরকারী উচ্চ মহলে কোন শিহরণ জাগে নি, জেগেছিল অস্বস্তিকর নীরবতা। সবাই জানতেন বিমান দুর্ঘটনায় চন্দ্র বোস মারা গেছেন, কিন্তু আর কোন কথাই কারও জানা ছিল না বা অন্য কাউকে তা জানার চেষ্টা করতে দিতেও তাঁরা চান নি। দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার মাত্র সাত দিন পরে তাইহোকু বিমান বন্দরে যাত্রাবিরতি ঘটিয়ে জেনারেল টানাকা ও ডঃ বা ম টোকিওর পথে গিয়েছিলেন। জেনারেল টানাকার মারফৎই নাকি জেনারেল সিডির ভস্মাবশেষ পাঠানো হয়েছিল। তাইহোকুর সঙ্গে কোন যোগাযোগ না থাকলে

ডঃ বা ম ও জেনারেল টানাকাকে নিয়ে বিমান ওখানে কিভাবে নেমেছিল? ওঁদের নিয়ে বিমানটি যখন টোকিওতে এসে পৌঁছাল তখন টোকিওর জাপ সদর দপ্তর থেকে কি কোনরকম যোগাযোগ করা হয় নি জেনারেল টানাকার সঙ্গে? জেনারেল সিডির ভস্মাবশেষ তাহলে কোথায় নিয়ে রাখা হয়েছিল? এই ঘটনা থেকে পরিষ্কার প্রমাণ হয় যে জাপ সরকারের প্রতিনিধিরা টোকিও ও তাইহোকুর যোগাযোগ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা সত্য নয়।

কমিটি সাক্ষীদের জেরা করেছেন ঠিকই, কিন্তু যেখানেই ঘটনার অন্য রূপ ফুটে উঠেছে সেখানেই তাঁরা স্বকল্পিত ভিন্নমত ও পথ ধরেছেন। সাক্ষীরা কমিটির কাছে যা বলেছেন তাঁর সুর একই এবং ঐ সুরেই কথা বলেছেন কর্নেল টি। শ্রীআয়ার এর কাছে ঘটনার বিবরণ পেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—"১৭ই আগস্ট অপরাহ্নে নেতাজী বিমানে সাইগন ত্যাগ করেন, ঐ দিনই সন্ধ্যায় তাঁর বিমান টুরেন এ (ইন্দোচীন) পৌঁছায়; সব দলটি রাত্রের জন্য ওখানেই বিশ্রাম নেয় এবং পরদিন (১৮ই) সকালে যাত্রা ক'রে অপরাহ্নে তাইহোকু (ফরমোসা) পৌঁছায়। সামান্য কিছু সময়ের জন্য যাত্রাবিরতি ঘটিয়ে বিমানটি আবার যাত্রা করে, কিন্তু ঠিক পরমুহূর্তেই বিধ্বস্ত হয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিমানটি বিমান বন্দরের ঠিক সীমানার কাছে ভেঙ্গে পড়ে। নেতাজী ও হাবিব দু'জনেই আহত হন। নেতাজী গুরুতর ভাবে আহত হন। জেনারেল সিডি ঘটনাস্থলেই নিহত হন। নেতাজী ও কর্নেল হাবিবকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা নেতাজীর জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন, কিন্তু সব চেষ্টা সত্ত্বেও নেতাজী···(এই সময় কর্নেল টির কণ্ঠরোধ হয়ে আসে)। হাবিব বেঁচে আছেন। নেতাজীর মত তিনি ততটা গুরুতরভাবে আহত হন নি। তিনি হাসপাতালে চিকিৎসারত রয়েছেন এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠবেন।" এই বক্তব্য পড়তে গিয়ে একটি প্রশ্ন জাগে, তাহলে

ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে কর্নেল টির কণ্ঠরোধ হয়ে গিয়েছিল কেন ? এর কারণ হ'ল, কর্নেল টি দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নন বা দুর্ঘটনাস্থলে তিনি যান নি। তাঁর কাছে যে খবর এসে পৌঁছেছিল তারই ভিত্তিতে তিনি কথা বলেছিলেন। এমন হতে পারে, যে বিমান দুর্ঘটনার কথা তিনি বিশ্বাস করেছিলেন বলেই মর্মাহত হয়ে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে এসেছিল অথবা এও সত্য হতে পারে যে ঘটনার ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থেকে তিনি মর্মাহত হওয়ার ভাণ করেছিলেন। ঐ অভিনয় করার কারণ হ'ল শ্রীআয়ার এর মনে ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাস এনে দেওয়া। শুধু কর্নেল টিই বলতে পারেন যে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে যাওয়ার কারণ কি ছিল।

কথায় বলে ক্যামেরা মিথ্যা বলতে পারে না। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসকে ঘিরে যে ঘটনা ঘটেছিল বলে জানা যায় তাকে নির্ভুলভাবে ধরে রাখার জন্য জাপ সরকার ক্যামেরার সাহায্য কতটুকু নিয়েছিলেন তা বিচার্য বিষয়। নেতাজী তদন্ত কমিটি রিপোর্টের আনেক্সার-এ বিমান দুর্ঘটনার কয়েকটি ছবি দিয়েছেন। ছবিগুলির মধ্যে তিনখানি ছবিতে ভগ্নাবশেষ আছে বলে শিরোনামা লেখা হয়েছে। তিনখানি ছবিতে বিমান বন্দরের কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না।" সাক্ষীদের জবানীর মধ্যে তদন্ত কমিটি ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতোর জবানীর ওপরই যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে বিমানটি রানওয়ের ১০০ মিটার দূরে পড়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল। এই ছবিগুলিতে রানওয়ে বা বিমান বন্দরের কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায় না। কর্নেল হবিব-উর রহমান তাঁর জবানীতে বলেছিলেন যে বিমানটি ২।১ মাইল দূরে সমতল ভূমিতে বিধ্বস্ত হয়েছিল। ছবিগুলিতে কিন্তু পাহাড়ী পরিবেশ দেখা যায়, সমতলভূমি নয়। আর একটি ছবিতে চাদর দিয়ে ঢাকা কোন কিছু আছে বলে মনে হয়। ছবিটি দেখে ভিতরের জিনিষ বোঝার উপায় নেই। চাদরের তলায় কি ঢাকা রয়েছে তা নির্ধারণ করা সম্ভব দয়। আরও একটি

ছবিতে শিরোনামা লেখা হয়েছে 'নেতাজীর ভস্মাবশেষের পাশে কর্নেল রহমান বসে আছেন'। ছবিতে একটি গামলা দেখতে পাওয়া যায়। ঐ পাত্রে কি রয়েছে তা বোঝা যায় না। আপাদমস্তক ঢেকে যিনি বসে আছেন, তাঁর পরিচয় জানা সম্ভব নয়, বা কর্নেল হবিব-উর রহমান এর সঙ্গে তাঁর মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ছবিগুলি কোনভাবেই বিমান দুর্ঘটনার কোন প্রমাণ দেয় না। যিনি ছবি তুলেছিলেন, তিনি ক্যামেরা হাতে করে বেছে বেছে এমন কতকগুলি ছবি তুলেছেন যা থেকে আলোচ্য দুর্ঘটনার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরমুহূর্ত থেকে অনেক স্মরণীয় মুহূর্তইতো এসেছিল, যদি সত্যই দুর্ঘটনা ঘটে থেকে থাকে তাহলে সেই মুহূর্তগুলির ছবি কেন তোলা হ'ল না তার উত্তর পাওয়া যাবে না। নেতাজীর মৃত্যু যদি সত্যই ঘটে থাকে তাহলে তাঁর মরদেহের ছবি বা শবযাত্রা ইত্যাদির কোন ছবি, যাতে নেতাজীকে দেখতে পাওয়া যায় তেমন কোন ছবি তুলে রাখাটাই স্বাভাবিক ছিল কিন্তু এক্ষেত্রে সেই স্বাভাবিকতা রক্ষা করা হয় নি। শ্রী আয়ার এর লেখা থেকে জানা গিয়েছিল যে কর্নেল টি তাঁকে জানিয়েছিলেন যে তাইহোকুতে ছবি তুলে রাখতে ও দুর্ঘটনার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। দুর্ঘটনা যদি সত্যই ঘটে গিয়ে থাকে, তাহলে ধরে নিতে হয় যে তাইহোকুর কর্তৃপক্ষ তাঁদের উচ্চ কর্তৃপক্ষের ছবি তুলে রাখার সুনির্দিষ্ট নির্দেশ মেনে চলেন নি, তাইহোকুর ঘটনার প্রমাণ হিসাবে কোন ছবিই তোলা হয় নি। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ না মেনে চলার ফল, সামরিক আদালতে বিচার। কিন্তু তেমন কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। এইসব তথ্য থেকে সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রমাণ হয় যে আলোচ্য দুর্ঘটনা সম্পূর্ণ সাজানো। কাগজে কলমে বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল কিন্তু আকাশ থেকে খাড়াভাবে কোন বিমান মাটিতে পড়ে বিধ্বস্ত হয়নি।

ডঃ রাধাবিনোদ পাল নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ বিশ্বাস করেন নি। তিনি এক ব্যক্তিগত চিঠিতে মন্তব্য করেছিলেন যে, ফরমোসায় নেতাজীর মৃত্যু কাহিনীকে তিনি সত্য বলে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি অভিমত জ্ঞাপন করেছিলেন যে সমস্ত বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তি বিশেষের জবানী থেকে তিনি প্রচারিত কাহিনীর সত্যতা বিশ্বাস করেন না। তিনি আরও বলেছেন যে কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশের যথেষ্ট কারণ আছে। ডঃ পাল এর মত স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিচারকের দৃষ্টিতে দুর্ঘটনার কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য নয়। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করতে হলে সাক্ষীদের জবানী ও অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণের চুলচেরা বিচার করে দেখতে হয়। বিচারক মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আগে একবার "বেনিফিট অফ ডাউট" দেওয়ার কথা ভাবেন। সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত না হলে কোন ক্ষেত্রেই সাজা দেওয়া যায় না। আলোচ্য ক্ষেত্রে নেতাজী তদন্ত কমিটি যে ঘটনার কত গভীরে তদন্ত করেছেন তা রিপোর্ট পড়েই বোঝা যায়। কোন পর্যায়ে সন্দেহাতীত ভাবে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। আরও অনেক দিক বিচার করার ছিল কিন্তু তা করা হয়নি ; তবুও একথা সত্য যে যতটুকু তথ্যের ভিত্তিতে কমিটি রিপোর্ট লিখেছেন, তা থেকে আলোচ্য ঘটনা সত্য বলে প্রমাণিত হয় না।

দর্শনীয় কিছু লেখা, সম্পাদনা করে দর্শক ও পাঠকদের সামনে সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবে তুলে ধরা যায়, কিন্তু তথ্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে সম্পাদনার কোন স্থান নেই। নেতাজী তদন্ত কমিটি সাক্ষ্য প্রমাণের সম্পাদনা করে তাঁদের কাছে সেই অংশগুলিই তুলে ধরেছেন। রিপোর্টে সম্পাদনার কাজ যে উচ্চাঙ্গের হয়েছে তাতে কোন সন্দেহই নেই, কিন্তু আলোচ্য ঘটনার প্রত্যেক পর্যায়ে অসংলগ্নতা, বৈষম্য ও বিরোধী বক্তব্যের অপূর্ব সমাবেশ ও প্রামাণ্য তথ্যের অভাব থাকার দরুণ ঘটনা ঘটেছিল বলে প্রমাণ হয় নি।

নেতাজী তদন্ত কমিটি এয়ারক্র্যাফট্ ইন্সপেক্টর শ্রী এ. এম্. এন্. শাস্ত্রীর অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। শ্রী শাস্ত্রী যে অভিমত পেশ করেছেন তা দুর্বোধ্য। নেতাজী তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বিধ্বস্ত বিমানের যে কটি ছবি দেওয়া হয়েছে তা থেকে বোঝবার উপায় নেই যে ছবিগুলি কোথা থেকে তোলা। আর যে ক'টি নক্সা প্রত্যক্ষদর্শীরা পেশ করেছেন বলে জানা যায় সেগুলি রিপোর্টে তুলে ধরা হয় নি। শ্রীসুরেশচন্দ্র বসুর বিরোধী বক্তব্য থেকে জানা যায় কোন্ ব্যক্তি কি ধরণের নক্সা পেশ করেছেন। ঐ নক্সা থেকে সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রত্যক্ষদর্শীরা তাঁদের জবানীতে দুর্ঘটনার যে বিবরণ ব্যক্ত করেছেন তা এঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। সুতরাং শ্রীশাস্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে সাক্ষীদের জবানী, নক্সা ও ছবি থেকে বোঝা যায় যে বিমানটি যাত্রা করার পরই বিমান বন্দরের সীমানার মধ্যে বিধ্বস্ত হয়েছিল, তা যুক্তিযুক্ত নয়। ছবি ও নক্সা থেকে এই ঘটনার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ঐ অভিমত যদি শুধু প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানীর ভিত্তিতেই তিনি ব্যক্ত করে থাকেন তাহ'লে স্বতন্ত্র কথা। শ্রীশাস্ত্রী তাঁর অভিমত দিয়েছেন যে, বিমানের ইঞ্জিন তৈরী, কলা-কৌশল, বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও তত্বাবধানের রেকর্ড না দেখে ও ভগ্নাবশেষ পরীক্ষা না করে ত্রুটি বিচ্যুতির কারণ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। যে সব তথ্য না পেলে বিমান দুর্ঘটনার কারণ সম্বন্ধে মন্তব্য করা সম্ভব নয়, সেই তথ্যগুলি ছাড়াই শ্রীশাস্ত্রী কি ভাবে বিমানের সর্বোচ্চ উচ্চতা সম্বন্ধে মতামত দিয়েছেন তা বোঝা যায় না। বিমানটি ঠিক কোথায় বিধ্বস্ত হয়েছিল তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ না পেয়ে শ্রীশাস্ত্রী কি ভাবে বিমানের উচ্চতা নির্ধারণ করলেন তা দুর্বোধ্য। সাক্ষীদের জবানীতে দুর্ঘটনাস্থল সম্বন্ধে মতানৈক্য রয়েছে। বিমান বন্দর ও দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তবেই বিমানটি কত উচ্চতায় উঠেছিল ও কতক্ষণ আকাশে ছিল সে সম্বন্ধে মতামত দেওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে ঘটনাস্থল পরিদর্শন না করেই শ্রীশাস্ত্রীর মত একজন বিশেষজ্ঞ কি

ভেবে রায় দিলেন তা আমাদের মত বুদ্ধিজীবি মানুষের পক্ষে বোধগম্য নয়। মেজর কোনোর বক্তব্যকে সমর্থন করে শ্রীশাস্ত্রী বলেছেন যে সাইগন এ ইঞ্জিনের অত্যধিক গতিবেগ দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতো অবশ্য বলে-ছিলেন যে তাইহোকুতে বিমান ইঞ্জিনকে সর্বোচ্চ গতিবেগে চালানো হয় এবং তারপরই গতিবেগ কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ইঞ্জিনের যোগ্যতা পরীক্ষা করার জন্য ঐ ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া হ'ত। শ্রীশাস্ত্রী একজন বিমান বিশেষজ্ঞ। মেজর কোনোর জবানী তিনি ভালভাবে নিশ্চয়ই পড়েছিলেন। ঐ জবানীতে বলা হয়েছে যে বিমানটি মাটিতে পড়ে যাওয়ার সময় বিমানের ভিতরের পেট্রল ট্যাঙ্কটি পড়ে গিয়ে গড়িয়ে তাঁর ও নেতাজীর মাঝখানে চলে আসে। পেট্রল ট্যাঙ্কটির দরুণ তিনি নেতাজীকে দেখতে পান নি। খাড়াভাবে কোন বিমান মাটিতে নামতে থাকলে পেট্রল ট্যাঙ্ক পড়ে গিয়ে বিমানের সামনের দিকে চলে আসবে, না বিপরীত মুখে পিছনের দিকে যেতে যেতে মাঝ পথে থেমে যাবে, এর সঙ্গত ব্যাখ্যা শ্রীশাস্ত্রী দেন নি। যাত্রীদের সঙ্গে সীট বেল্ট না থাকার দরুণ বিমানটি খাড়াভাবে নীচে নামতে থাকলে বিমানের আরোহীরা ও পিছনে রাখা মালপত্র সবই গড়িয়ে বিমানের সামনের দিকে চলে আসবে এবং বিশেষজ্ঞ শ্রীশাস্ত্রীর মতামত অনুসারে যাঁরা সামনের দিকে থাকবেন তাঁদের দুরবস্থার সীমা থাকবে না। আলোচ্য বিমানের ক্ষেত্রে তেমন কিছুই ঘটেনি। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে উপেক্ষা করে বিমানের আরোহীরা নিজেদের বসার জায়গায় বিমানটি বিধ্বস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বসেছিলেন। শ্রীশাস্ত্রী এই সম্বন্ধে তাঁর বিশেষজ্ঞের মতামত জানান নি। যে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছিল বলে বলা হয়েছে, ঐ স্যালি ৯৭'২ ধরণের দু'ইঞ্জিনের বোমারু বিমানের সামান্য ইতিহাস পাওয়া গেছে :

কমিটি বলেছেন যে তাঁরা উল্লিখিত বিমানের মডেলটি কি তা সংগ্রহ করতে পারেন নি এ কথা অবিশ্বাস্য।

THE MITSUBISHI KI 213 "SALLY,"

Japanese Army Designation: Type 97 Heavy Bomber, Model 3.

Type: Twin-engined Army Bomber.

Wings: Mid-wing cantilever monoplane. In three section, comprising a narrow centre-section and two tapering outer sections. Dihedral on outer sections. All-metal structure with stressed-skin covering. Flaps run from centre-section to ailerons.

Fuselage: Oval metal semi-monocoque structure.

Tail Unit. Cantilever monoplane type of high aspect ratio with straight taper on leading-edge of tailplane and trailing-edges of elevators. Tail single-fin and rudder. Trim-tabs on elevators and rudder.

Landing Gear: Retractable type. Each unit comprises two elec-shock-absorber legs and a backwardly-inclined forked strut. Wheels are raised upwards and forwards round the hinge-points of the forked struts into the engine nacelles. Hydraulic retracrion, Tail wheel non-retractable.

Power Plant: Two 1,450 h.p. Mitsubishi Type 100 (Ha 101) fourteen-cylinder two-row radial air-cooled engines. Three-bladed Hydraulic or electric controllable-pitch airscrews. Fuel tanks in wings inboard and outboard of nacelles and in fuselage over centre-section. All tanks except outboard wing tanks have rubber protection. Protected oil tank in leading edge of wings. Fuel capacity 810 Imp. gallons.

Accomodation : Normal crew of five to seven

Armament and Epuipment : Two 7.7 m/m. moveable machine-guns in nose, dorsal and lateral positions, two 7.7 m/m. ventral machine-guns, and remote-controlled fixed machine-gun in extreme tail of fuselage. Meximum internal bomb load 4,400 lbs. (2,000 Kg.)

Dimensions : Span 74 ft. 8 in. (22.8 m.), Length 52 ft. (15.86in.) Height 11 ft. 11 in. (36.6.m) wing area 675 sq. ft. (62.7 sq. m.).

Weights : Weight empty 10,450 lbs. (4,750 Kg.), weight loaded 22,000 lbs. (10,000 Kg.).

Performance : Maximum speed 248 m.p.h. (397 km. h.) at 8,000 ft. (2,440 m.), speed at sea level 225 m. P. h. (360 km. h.), operational range 600-700 miles (960-1,120 km.), service ceiling 22,000 ft, (6,710 m,),

Remarks : Known officially as the Army 97 Mk. I and Mk, II twin engined Bomber (Mitsubishi), The Mk, I and II differ mainly in the dorsal gun-position, The Mk, II has a small turret in place of the older long raised cockpit, and the addition of the ventral guns.

JANE'S ALL THE WORLD'S AIRCRCRAFT 1943-44
Japan—(129-c pages)

উল্লিখিত বিবরণের পাওয়ার প্ল্যাণ্ট অনুচ্ছেদে লেখা আছে যে বিমানগুলিতে তিনটি পেট্রল ট্যাঙ্ক থাকে। আউট বোর্ড পাখার পেট্রল ট্যাঙ্কটি ছাড়া অন্য দু'টি পেট্রল ট্যাঙ্ক এ রাবারের আস্তরণ দেওয়া থাকে। তাহ'লে বিমানের মাঝামাঝি জায়গায় যে পেট্রল ট্যাঙ্কটি ছিল বলে জানা যায় তা রাবার দিয়ে মোড়া ছিল এবং যথাযথভাবে বিমানের কাঠামোর সঙ্গে আটকানো ছিল। ঐ ট্যাঙ্ক কিভাবে

গড়িয়ে পড়ে ? বোমারু বিমান বোমা ফেলার সময় প্রায় খাড়াভাবেই নীচে নেমে আসে ; সুতরাং পেট্রল ট্যাঙ্ক যে খুবই সযত্নে বসানো থাকে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আলোচ্য দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে অসম্ভব ঘটনা ঘটে গেল। সময় বুঝে যাত্রীদের পদ মর্যাদা দেখে পেট্রল ট্যাঙ্কটি গড়িয়ে পড়ল। উল্লিখিত বিবরণে বিমানের ক্ষমতার ইঙ্গিতও রয়েছে। বিমানটির গতিবেগ ও আকাশে ওঠার উচ্চতার ইতিহাস থেকে বিশেষজ্ঞের অভিমত বোধহয় দেওয়া যেত। শ্রীশাস্ত্রী যা বলেছেন তাতে তাঁর মতামত কতটা প্রকাশ পেয়েছে তা বলা কষ্টকর তবে ভাগ্যের অদৃশ্য ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে তিনি আলোচ্য প্রসঙ্গে যবনিকা টেনেছেন। অদৃশ্য শক্তির বিচিত্র বিধানে কি ঘটে তা বলা অসাধ্য। এক্ষেত্রেও এক অদৃশ্য-নির্দেশ সব ঘটিয়েছে। যা ঘটেছে বলে প্রকাশ, তা সবই কূটবিদ্‌দের মস্তিষ্কে ঘটেছে। ফরমোসার সেই রূপসী বিমান বন্দর তাইহোকুতে আদৌ কিছু ঘটেনি ; শুধু মাত্র নাটকের মহলা দেওয়া ছাড়া। তাইহোকুর রহস্যময় পরিবেশে অভিনেতারা এক অত্যন্ত গতিশীল নাটকের মহলা দিয়ে, বিশ্বের মঞ্চে এসে অভিনয়ের ইতিহাসে এক বিচিত্র নাটক পরিবেশন করলেন।

এই অধ্যায়ের অষ্টাদশ অনুচ্ছেদে নেতাজী তদন্ত কমিটি লিখেছেন যে, সাক্ষীদের জবানী ও বিশেষজ্ঞের অভিমত থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে ইঞ্জিনে কোনরকম গোলযোগ থাকার দরুণ ১৯৪৬ সালের ১৮ই আগস্ট তাইহোকুতে এক বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল, তবে প্রয়োজনীয় স্বীকৃত বিষয় (data) না থাকার জন্য দুর্ঘটনার সঠিক কারণ নির্ধারণ করা যায় না। হতভাগ্য বিমানের তের চৌদ্দজন আরোহীর মধ্যে সাতজনের বেঁচে যাওয়াটা কিছুই আশ্চর্য নয়। ঘটনা বলার জন্য শুধু যে কর্নেল হবিব-উর রহমানই বেঁচে গিয়েছিলেন তা সত্য নয়। যতদূর জানা যার নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা বেঁচে গিয়েছিলেন :

(১) লেঃ কর্নেল টি. সাকই

(২) লেঃ কর্নেল এম. নোনোগাকি

(৩) মেজর টি. কোনো

(৪) মেজর আই. টাকাহাশি

(৫) ক্যাপ্টেন কে. আরাই

(৬) সার্জেণ্ট ওকিশতা এবং

(৭) কর্নেল হবিব-উর রহমান

এঁদের মধ্যে লেঃ কর্নেল টি. সাকাইকে (১) কমিটি জেরা করতে পারেন নি কারণ তিনি জাপানের বাইরে ছিলেন। জাপ পররাষ্ট্র দপ্তরের মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে একটি লিখিত জবানী সংগৃহীত হয়েছে আগেই জানানো হয়েছে। সার্জেণ্ট ওকিশতাকে (৬) খুঁজে বার করার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে পাওয়া যায় নি।

নেতাজী তদন্ত কমিটি প্রচারিত দুর্ঘটনার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পেয়েছেন বলে অভিমত দিয়েছেন, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানী, ছবি ও জাপ সরকারের পেশ করা তথ্য থেকে আলোচ্য ঘটনার প্রমাণ যে আদৌ পাওয়া যায় না তা প্রত্যেক পর্যায়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রতক্ষ্যদর্শীদের জবানীর মধ্যে অসংলগ্নতা ও পরস্পর বিরোধী বক্তব্য, ঘটনার এক কৌতুকপ্রদ ছবি তুলে ধরে সাক্ষীদের পেশ করা ছবি ও নক্সাগুলি সাক্ষীদের বক্তব্যের সমর্থন করে না কিন্তু জাপসরকারের ঔদাসীন্য ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত রাখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেব প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পক্ষে বেঁচে থাকাটা সত্যিই এক অসম্ভব ব্যাপার ছিল। অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য তাঁর কাছে একটি রাস্তাই খোলা ছিল, তাহ'ল 'তাঁর মৃত্যু সংবাদ' প্রচার করা। নেতা তাঁর সুনির্দিষ্ট চিন্তাধারা দিয়ে সময়োপযোগী এক অভিনব পরিকল্পনা রূপায়ন করেছিলেন, এবং ঐ প্রকল্পের স্বার্থক রূপায়নের জন্য তাঁরই অনুরক্ত সৈনিকগণ সজ্ঞানে বৈষম্যমূলক বিবৃতি দিয়ে পরিকল্পিত পথে পৃথিবীর মানুষকে আসল ঘটনা জানাতে তৎপর হয়েছেন। এই পরিকল্পনার স্বার্থক রূপায়নের জন্য জাপ-সরকারের সহযোগীতার তুলনা নেই।

১১

যদিও দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা প্রসঙ্গে পরিষ্কার বোঝা যায় যে তাইহোকু বিমান বন্দরে আলোচ্য বিমানটি যে দুর্ঘটনার মুখে পড়েছিল তার সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ নেই, বরং সাক্ষীদের জবানী ও অন্যান্য তথ্য প্রমাণ থেকে, এই সিদ্ধান্তই প্রাধান্যলাভ করে যে সমস্ত ঘটনাটি সুন্দরভাবে সাজিয়ে বলা হয়েছে এবং সাক্ষীরা স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে তাঁদের বিবৃতিতে ঘটনার যে বিবরণ দাখিল করেছেন, তাতে প্রত্যেক পর্যায়ে একে অন্যের বক্তব্যের বিরোধিতা করে বক্তব্য রেখেছেন, অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে খণ্ডন করেছেন, তবুও তদন্ত কমিটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে আলোচ্য দুর্ঘটনার কথা সত্য। তাই তৃতীয় পর্বে নেতাজী তদন্ত কমিটি নেতাজীর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার কাহিনী লিখতে সচেষ্ট হয়েছেন।

'নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস-এর মৃত্যু' শীর্ষক তৃতীয় পর্বের প্রথম অনুচ্ছেদে তদন্ত কমিটি লিখেছেন যে অন্যান্য আহত ব্যক্তিদের সঙ্গে নেতাজীকে তাইহোকুর নানমন মিলিটারী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হাসপাতালটি ছোট এবং তাতে চারিটি জেনারেল ওয়ার্ডে সর্বসাকুল্যে আশীজন রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল আর ছোঁয়াচে রোগের জন্য একটি আলাদা ওয়ার্ডে আরও পনেরটি বিছানা ছিল। বিমান আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা হিসাবে মূল হাসপাতালটি ও তার অনেকগুলি বিভাগ তাইহোকুর উপকণ্ঠে অপসারণ করা হয়েছিল। নানমন শাখাটিই শুধু তাইহোকু শহরে রাখা হয়েছিল এবং অন্য হাসপাতালে রোগীদের পাঠানোর আগে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা এখানেই করা হ'ত। নানমন শাখার মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন ক্যাপ্টেন টি. ইয়োশিমি। ১৯৩৮ সালে তিনি পাশ

করেছিলেন এবং কমিশন লাভ করেছিলেন ১৯৪০ সালে। ঐ হাসপাতালে ডাঃ সুরুতা নামে আরও একজন ডাক্তার ছিলেন। ইনি পাশ করেছিলেন ১৯৪৪ সালে। তৃতীয় একজন ডাক্তারও ঐ হাসপাতালে ছিলেন। ঐ হাসপাতালে কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন ছ'জন জাপানী ও ফরমোসান নার্স ও জন তিরিশেক মেডিক্যাল আর্দালি। কমিটি ডাঃ ইয়োশিমি ও ডাঃ সুরুতা দু'জনকেই জেরা করেছেন। জাপানী নার্সদের মধ্যে কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায় নি। শান পি শাহ নাম্নী জনৈকা ফরমোসান নার্স যিনি ১৯৪৬ সালে ইণ্ডিয়া ফ্রী প্রেস জার্নালএর শ্রীহারিন শাহ'র কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাঁকে জেরা করা যায় নি, কারণ কমিটির পক্ষে ফরমোসা পরিদর্শন করা সম্ভব হয় নি। ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট বেলা দুটোর সময় ডাঃ ইয়োশিমি তাইহোকু বিমান বন্দর থেকে টেলিফোনে খবর পেয়েছিলেন যে এক বিমান দুর্ঘটনায় আহত কিছু ব্যক্তিকে গ্রহণ করতে তিনি যেন প্রস্তুত থাকেন। কিছুক্ষণ পরে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস সমেত জন বার আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে ভর্তি করে নেওয়া হয়েছিল। কে কোন্ ধরণের গাড়ীতে চড়ে হাসপাতালে এসেছিলেন এবং কে প্রথম এসে পৌঁছেছিলেন সে বিষয়ে সাক্ষীদের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু এগুলি নগণ্য ব্যাপার এবং তাই এড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে। বেশীর ভাগ সাক্ষীই বলেছেন যে নেতাজীকে যখন হাসপাতালে আনা হয়েছিল তখন তাঁর পরনে কিছুই ছিল না, কিন্তু কয়েকজন বলেছেন যে তিনি আংশিক ঢাকা অবস্থায় এসেছিলেন। একজন মিলিটারী অফিসার সুঠাম দেহ বিদেশীকে ভারতীয় নেতা, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস বলে সনাক্ত করেছিলেন। তাঁর সহকারী কর্নেল হবিব-উর রহমানকে একই সময়ে ভর্তি করা হয়েছিল।

নেতাজী তদন্ত কমিটি নানমন মিলিটারী হাসপাতালের এক অনবদ্য বিবরণ দিয়েছেন। বিবরণটি পড়তে পড়তে মনে হয় কমিটি

বোধহয় হাসপাতালটি পরিদর্শন করেই ঐ বিবরণ দাখিল করেছেন, কিন্তু তাঁরা তাইহোকুতে যান নি। কর্নেল হবিব-উর রহমান তাঁর জবানীতে বলেছিলেন যে তাঁকে ও নেতাজীকে লরিতে করে নিয়ে প্রথমে নিকটতম এয়ারফোর্স ইমারজেন্সি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।* এই এয়ারফোর্স ইমারজেন্সি হাসপাতাল ও নানমন মিলিটারী হাসপাতাল একই হাসপাতাল কি না, নেতাজী তদন্ত কমিটি তা জানান নি। তদন্ত কমিটি নানমন হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার ইনচার্জ ডাঃ ইয়োশিমিকে জেরা করেছেন বলে জানিয়েছেন। হাসপাতালের দায়ীত্ব যাঁর ওপর দেওয়া ছিল তিনি তাঁর অধীনস্থ ডাক্তারের নাম বলতে পারেন না, একথা বিশ্বাস করতে সঙ্কোচ হয়, কারণ মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স এই ব্যাপারে কোন ডাক্তারকে রেহাই দিতে পারে না। ফরমোসান নার্স শান পি শাহ'র বিবৃতি নিয়ে তদন্ত কমিটি পরে আলোচনা করেছেন, তাই বর্তমান অনুচ্ছেদে তাঁর বিবৃতি নিয়ে আলোচনা স্থগিত রইল। তাইহোকু বিমানবন্দর থেকে কাকে কি ভাবে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটি বিশদভাবে কোন মন্তব্য করেন নি, তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানীতে ঐ বিষয়ে যে বৈষম্য ছিল তা তাঁরা স্বীকার করেছেন। আলোচ্য বিমানের যাত্রীদের হাসপাতালে নিয়ে আসার ব্যাপারে আরোহীদের বক্তব্যে বিশেষ মতানৈক্য দেখা গিয়েছিল, তা আগেই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু কমিটির কাছে সামান্য অসংলগ্নতাই ধরা পড়েছে। তদন্ত কমিটি নগণ্য সূত্র বলে প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গেছেন, কিন্তু সত্যই কি এই প্রসঙ্গটি খুবই নগণ্য? প্রত্যক্ষদর্শীরা আলোচ্য ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে প্রথম থেকেই পরস্পর পরস্পরের বিরোধিতা করেছেন। গতানুগতিকভাবে হাসপাতালে যাওয়ার ব্যাপারেও তাঁরা

---

*Both of them were then placed on the floor of the lorry and were the first to be rushed to the nearest Airforce Emergency Hospital--Dissentient Report. P-121

একে অন্যের জবানবন্দী স্বীকার করেন নি। বিমান দুর্ঘটনা যদি সত্যই ঘটত তাহ'লে আহত আরোহীদের চিকিৎসার জন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হ'ত। কিন্তু যা ঘটেনি তা ঘটেছে বলে প্রমাণ করতে গেলে সাক্ষীদের জবানীতে অসংলগ্নতা অবশ্যই দেখা দেবে এবং এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

নেতাজী তদন্ত কমিটি তাঁদের রিপোর্টের দ্বিতীয় পর্বের দশম অনুচ্ছেদে লিখেছেন যে তাইহোকু বিমানবন্দর থেকে যাত্রা করার সঠিক সময় সম্বন্ধে সাক্ষীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, তবে বেশীর ভাগ সাক্ষীই সময় বলেছেন অপরাহ্ন দু'টো থেকে আড়াইটার মধ্যে। কর্নেল হবিব-উর রহমান তাইহোকু থেকে যাত্রা শুরু করার সময় ২-৩৫ মিঃ বলেছিলেন। যিনি তাইহোকুতে নেতাজীকে চিকিৎসা করেছিলেন বলে দাবী করেছেন, তাঁর কাছে এক বিমান দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে রাখার খবর এসেছিল অপরাহ্ন দু'টোর সময়; অবশ্য তারিখটা ঠিকই আছে। তাইহোকু বিমান বন্দর থেকে বিমান দুর্ঘটনার খবর দিয়ে যে টেলিফোন করা হয়েছিল সেটা যে আলোচ্য বিমানের ব্যাপারেই তার প্রমাণ হ'ল টেলিফোনের পরেই না কি নেতাজী, কর্নেল রহমান ও অন্যান্যদের হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। দু'টোর সময় টেলিফোন করা হয়ে থাকলে, দু'টো বাজবার অন্তত বেশ কয়েকমিনিট আগেই বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল বলে ধরে নিতে হয়। বিমানটি তাইহোকু বিমান বন্দরে এসে নামামাত্র হাসপাতালে টেলিফোন করে কর্তৃপক্ষকে অগ্রিম খবর দিয়ে রাখা হয়েছিল কি? আর, দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে যদি হাসপাতালে খবর দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে টেলিফোন আসা উচিত ছিল দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার অন্তত: পাঁচ মিনিট পরে, অর্থাৎ ২-৩৫ মিঃ থেকে ২-৪৫ মিঃ-এর মধ্যে। তাহলে এক্ষেত্রেও ঘটনার মধ্যে অসঙ্গতি দেখা যায় এবং আর এক গোলক ধাঁধার সৃষ্টি হয়, যা তদন্ত কমিটি উপেক্ষা করে গেছেন। হাসপাতালে বার জন আহত ব্যক্তিকে ভর্তি

করলে আলোচ্য বিমানের মোট আরোহীদের সংখ্যা কমপক্ষে ষোলজন দাঁড়ায়, অথচ কমিটি তদন্ত করে জেনেছেন যে বিমানে আরোহী ছিলেন তের চোদ্দজনের মত। এই প্রসঙ্গে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। নেতাজী তদন্ত কমিটি লিখেছেন যে প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও একটি বিষয়ে একমত হতে পারেন নি, তাহ'ল নেতাজীর পরনে কোন পোষাক ছিল কি না। সাক্ষীরা নেতাজীকে কিভাবে আনা হয়েছিল এবং তাঁর পরনে কি ছিল সে বিষয়ে একমত হতে পারেন নি, কিন্তু কোন্ বিষয়ে তাঁরা একমত হতে পেরেছেন তা বোঝা যায়, শুধু একটি বিষয় ছাড়া, তাহ'ল বিমানটি খাড়াভাবে নীচে নেমে এসেছিল। নেতাজীকে যে সত্যই হাসপাতালে আনা হয়েছিল, তার প্রমাণ এই অনুচ্ছেদে পাওয়া যায় না। একজন মিলিটারী অফিসার নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসকে সনাক্ত করেছিলেন বলে জানা যায়, কিন্তু একথাও সত্য যে সাইগনে শ্রীরমনীও গোঁসাইও নেতাজীকে সনাক্ত করতে পেরেছিলেন। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট লেখার অসুবিধাটুকু অনুভব করা যায়। মিলিটারী অফিসারের সনাক্তকরণ, হাসপাতালের কাহিনীর সমর্থনে বক্তব্য রাখে, অথচ রমনীও গোঁসাই এর বক্তব্য সমস্ত ঘটনাটাকে সাজানো ঘটনা বলে প্রমাণ করে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কমিটি লিখেছেন যে নেতাজীকে যখন হাসপাতালে আনা হয়েছিল তখন তাঁর অবস্থা সবচেয়ে গুরুতর ছিল। কিন্তু তাঁর মহানুভবতা এমন ছিল যে তিনি ডাক্তারদের বলেছিলেন যে অন্যান্য ব্যক্তিদের আগে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করে তার পর যেন তাঁকে দেখা হয়। তাঁর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্য তাঁকেই ডাক্তাররা প্রথম চিকিৎসা করেন। মেডিক্যাল ও নন্-মেডিক্যাল প্রত্যক্ষদর্শীরা সকলেই বলেছেন যে নেতাজীর সমস্ত শরীর পুড়ে গিয়েছিল এবং তাঁর গায়ের চামড়ার রং কালো হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু ওঁরা কেউই নেতাজীর শরীরে কোন কাটাক্ষতের উল্লেখ করেন নি। কর্নেল

হবিব-উর রহমান বলেছিলেন যে নেতাজীর মাথায় চারইঞ্চি লম্বা একটা কাটাক্ষত হয়েছিল এবং তা থেকে রক্ত ঝরছিল। এও একটা অসংলগ্নতা। নেতাজীকে পরীক্ষা করেছিলেন ডাঃ ইয়োশিমি। তিনি বলেছেন, "আমি দেখেছিলাম যে তাঁর সমস্ত শরীর গুরুতরভাবে পুড়ে গিয়েছিল এবং দেহটা ছাই-এর মত ধুসর বর্ণে পরিবর্তিত হয়েছিল। তাঁর মুখ ফুলে গিয়েছিল। আমার মতে, তাঁর পোড়াক্ষত ছিল খুবই খারাপ ধরণের অর্থাৎ থার্ড ডিগ্রী পর্যায়ের। তাঁর সমস্ত শরীরে এমন কোন জখম ছিল না যেখান থেকে রক্ত পড়ছিল। তাঁর চোখ দুটিও ফুলে গিয়েছিল। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর চোখ খুলতে কষ্ট হচ্ছিল। যখন তাঁকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল তখন তাঁর জ্ঞান ছিল। তাঁর খুব জ্বর উঠেছিল; উত্তাপ ছিল ৩৯° সেন্টিগ্রেড। তাঁর নাড়ির স্পন্দন ছিল মিনিটে ১২০ বার। তাঁর হার্টের অবস্থাও দুর্বল ছিল।" ডাঃ ইয়োশিমি বলেছেন যে তাঁর (নেতাজী) অবস্থা এতই সঙ্গীন ছিল যে পরদিন সকাল পর্যন্ত তাঁর বেঁচে থাকার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তিনি বলেছেন যে পেট্রল ছিটকে আসার দরুণই নেতাজীর দেহ পুড়ে গিয়েছিল। নেতাজীকে পরীক্ষা করে ও তাঁর যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করে ডাঃ ইয়োশিমি অন্যান্য আহত ব্যক্তিদের পরীক্ষা করে তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। শুধুমাত্র নেতাজীই আগুনে গুরুতরভাবে পুড়ে যান নি। কো-পাইলট আয়েগির কাঁধেও একই ধরণের পোড়াক্ষত হয়েছিল। কনুই থেকে নীচের দিকে তাঁর (আয়োগি) হাত দুটি এবং হাঁটুর নীচের দিকটা পুড়ে গিয়েছিল। শুধুমাত্র লেঃ কর্নেল নোনোগাকির দেহে কোন জখম বা পোড়াক্ষত ছিল না। ডাঃ ইয়োশিমি বলেছেন যে কর্নেল রহমান এর মুখের একপাশে ও উল্টোদিকে হাতে পোড়াক্ষত ছিল। তাঁর কপালের ডান দিকটা কেটে গিয়েছিল।

নেতাজী তদন্ত কমিটি সাক্ষ্য থেকে প্রমাণ পেয়েছেন যে আরোহীদের মধ্যে নেতাজীর অবস্থাই সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল। ঐ

আশঙ্কাজনক অবস্থার মধ্যেও নেতাজী সজ্ঞানে ছিলেন এবং অন্যান্য আহত ব্যক্তিদের প্রথমে চিকিৎসা করার কথা বলেছিলেন। হাসপাতাল চিকিৎসা পর্বে প্রথম গড়মিল অবশ্য শুরু হয়েছে নেতাজীর মাথায় চার ইঞ্চি বড় একটা গভীর ক্ষতকে নিয়ে। যাঁরা চিকিৎসা করেছিলেন বলে দাবী করেছেন তাঁরা কোন কাটা দাগ দেখেন নি, অথচ কর্নেল রহমান তাঁর রুমাল দিয়ে নেতাজীর মাথার গভীর ক্ষত থেকে রক্ত পরা বন্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন। তদন্ত কমিটি অবশ্য স্বীকার করেছেন যে ঐ ব্যাপারে অসঙ্গতি রয়েছে। কিন্তু অসঙ্গতি রয়েছে আরও অনেক পর্যায়ে। কর্নেল রহমান শ্রী আয়ার এর কাছে বলেছিলেন হাসপাতালে পৌছানোর ঠিক পরেই নেতাজী জ্ঞান হারিয়ে-ছিলেন।* কর্নেল রহমান এর বক্তব্য যদি সত্য হয় তাহলে অন্যান্য আহত ব্যক্তিদের শুশ্রূষা করার কথা নেতাজী কখন বলেছিলেন? মজার কথা এই যে তদন্ত কমিটি এক্ষেত্রে কর্নেল রহমান এর চেয়ে ডাঃ ইয়োশিমির বক্তব্যের গুরুত্ব বেশী দিয়েছেন। কিন্তু ডাঃ ইয়োশিমি যে আরও বিচিত্র কাহিনী বলেছেন। কো-পাইলট আয়োগির চিকিৎসা নাকি তিনিই করেছিলেন এবং তাঁর শরীরে কোথায় কি ধরণের ক্ষত হয়েছিল তারও বিবরণ তিনি দিয়েছেন। কিন্তু তদন্ত কমিটির রিপোর্টের দ্বিতীয় পর্বের ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদে লেখা আছে যে মেজর কোনো তাঁর জবানীতে বলেছেন যে কো-পাইলট আয়োগির বুকে চোট লেগেছিল এবং সেখান থেকে রক্ত পড়ছিল। এবং ঐ পর্বের ষোড়শ অনুচ্ছেদে লেখা হয়েছে যে ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতো দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে কো-পাইলট আয়োগি জেনারেল সিডি'র সঙ্গেই শেষ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কো-পাইলট আয়োগির জখম সম্বন্ধে ডাঃ ইয়োশিমি যা বিবরণ দিয়েছেন মেজর কোনোর জবানীর সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাওয় যায় না। ডাঃ

* Netaji lost consciousness, almost immediately after reaching the hospital.—Unto Him A Witness, P. 113

ইয়োশিমি কর্নেল হবিব-উর রহমান এরও চিকিৎসা করেছিলেন। কর্নেল রহমান এর ক্ষত সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে তাঁর (কর্নেল রহমান) মুখের একদিক পুড়ে গিয়েছিল। তদন্ত কমিটি পরীক্ষা করে কর্নেল রহমান এর মুখের ডানদিকে পোড়া ক্ষত দেখেছিলেন। ধরে নেওয়া যায় যে কর্নেল রহমান এই পোড়া অঙ্গের কথাই ডাঃ ইয়োশিমিকে বলেছিলেন। কমিটি কর্নেল রহমান এর দু'টি হাতেই ভয়ানক পোড়া দাগ দেখেছিলেন। কিন্তু ডাক্তারের বক্তব্য মতে, কর্নেল রহমান এর বাঁ হাতটা শুধু পুড়ে গিয়েছিল। কমিটি কর্নেল রহমান এর কপালে কাটা দাগ দেখেছিলেন। ডাঃ ইয়োশিমি কর্নেল রহমান এর কপালের ডানদিকে কাটা ক্ষতের চিকিৎসা করেছিলেন। কিন্তু তদন্ত কমিটি কর্নেল রহমান এর পায়ের যে জখম চিহ্ন খুঁজে পেয়েছিলেন, ডাঃ ইয়োশিমি সে সম্বন্ধে কোন বক্তব্যই রাখেন নি। তদন্ত কমিটির সদস্যগণ মেজর কোনোর মুখে ভীষণভাবে পুড়ে যাওয়ার চিহ্ন দেখেছিলেন। তাঁর সব দাঁতগুলি পড়ে গিয়েছিল এবং তিনি নকল দাঁত পড়েছিলেন। তাঁর ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল বাদে চারটি আঙ্গুল ও বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুল এমনভাবে পুড়ে গিয়েছে যে তিনি হাতমুঠো করতে পারেন না। মেজর কোনো নাকি সুদীর্ঘ এগার মাস চিকিৎসাধীনেও ছিলেন। হাসপাতালে যিনি মেজর কোনোর চিকিৎসা করেছিলেন, তিনি কিন্তু বলেছেন যে মেজর কোনোর হাত দু'টি ভীষণভাবে পুড়ে গিয়েছিল। মেজর কোনোর জবানীমতে শরীরের আগুন বা তদন্ত কমিটির সদস্যদের দেখা মুখের পোড়া দাগের কথা চিকিৎসক ডাঃ ইয়োশিমি উল্লেখ করেন নি। তাহ'লে প্রত্যক্ষদর্শী তাঁদের ক্ষয়ক্ষতির যে খাতিয়ান দিয়েছেন তার সঙ্গে তাইহোকুর হাসপাতালের চিকিৎসকের বিবরণের মিল কমই পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানীর মধ্যে বৈষম্য আরও অনেক রয়েছে।

এই পর্বের তৃতীয় অনুচ্ছেদে নেতাজী তদন্ত কমিটি লিখেছেন যে নেতাজীর চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে ডাঃ ইয়োশিমি এক বিবরণ দাখিল

করেছেন। নেতাজীর শরীরের পোড়া ক্ষতের প্রাথমিক শুশ্রূষা করেছিলেন ডাঃ সুরুতা। তিনি প্রথমে নেতাজীর শরীরে সাদা মলম লাগিয়ে দেন এবং তারপর তাঁর সমস্ত শরীরে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেন। নেতাজীর হার্টের দুর্বলতা রোধ করার জন্য ডাঃ ইয়োশিমি তাঁর শরীরে একের পর এক চারটি ভিটা-ক্যাম্ফর ইঞ্জেক্‌শন ও দু'টি ডিজিটামাইন ইঞ্জেকশন দেন। তিনি নেতাজীর শরীরে পাঁচশ সি.সি.র তিনটি ইণ্টারভেনাস রিগার সল্যুসন ইঞ্জেকশনও দিয়েছিলেন। নেতাজীর চিকিৎসা প্রথম ড্রেসিংরুমেই শুরু করা হয় এবং পরে তাঁকে ড্রেসিং রুমের লাগোয়া ২নং ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এবং বাকি চিকিৎসা ব্যবস্থা ওখানেই নেওয়া হয়েছিল। যে ঘরে নেতাজীকে প্রথম চিকিৎসা করা হয়েছিল সেই ঘর সম্বন্ধে বিভিন্ন সাক্ষীরা ভিন্ন ভিন্ন জবানী দিয়েছেন। ডাঃ ইয়োশিমি হাসপাতালের একটি নক্সা পেশ করেছেন। ঐ নক্‌সায় দেখানো হয়েছে নেতাজী কোন্ ওয়ার্ডে ছিলেন নেতাজীর সঙ্গে ঐ ওয়ার্ডে আর কে কে ছিলেন সেই বিষয়ে সাক্ষীদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

হাসপাতালের দু'জন ডাক্তারের জবানীমতে শুধু কর্নেল হবিব-উর রহমান ও নেতাজী ঐ ওয়ার্ডে ছিলেন কিন্তু কর্নেল রহমান বলেছেন যে তৃতীয় এক ব্যক্তি, সম্ভবত একজন পাইলটও ওখানে ছিলেন। কর্নেল রহমান এবং ডাঃ সুরুতা দু'জনেই হাসপাতাল ও নেতাজীকে যেখানে রাখা হয়েছিল সেই ওয়ার্ডের নক্‌সা পেশ করেছেন। মেজর টাকাহাশি ও মেজর কোনো বলেছেন যে নেতাজীকে আলাদা ঘরে রাখা হয়েছিল। কিন্তু লেঃ কর্নেল নোনোগাকি বলেছেন যে নেতাজী সমেত সব আহত ব্যক্তিদের একই ঘরে রাখা হয়েছিল, শুধু তিনিই আলাদা ঘরে ছিলেন। দোভাষী মিঃ জে. নাকামুরা বলেছেন যে নেতাজী ও কর্নেল হবিব-উর রহমান ছাড়া ঐ ওয়ার্ডে আর তিনজন জাপানী অফিসার ছিলেন। এত বছর পার হয়ে যাওয়ার পর অমন নগণ্য অসংলগ্নতার ওপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া সম্ভবত বোকামি করা

হবে, বিশেষ করে যখন সাক্ষীদের মধ্যে অনেকেই গুরুতর ভাবে আহত হয়েছিলেন। ছু'জন ডাক্তারের জবানীকে গ্রহণ করাই খুব যুক্তিযুক্ত হবে যে কর্নেল হবিব-উর রহমান ও নেতাজীকে একই ঘরে রাখা হয়েছিল। ডাঃ ইয়োশিমি বলেছেন যে ভীষণভাবে পুড়ে গিয়ে থার্ড ডিগ্রী ধরণের পোড়া ক্ষত হলে, শরীরের রক্ত গাঢ় হয়ে যায় এবং হার্টের ওপর অত্যধিক চাপের সৃষ্টি হয়। এই চাপ দূর করে দেওয়ার জন্য সাধারণতঃ শরীর থেকে রক্ত বার করে নেওয়া হয় এবং তার পরিবর্তে শরীরে নূতন রক্ত দিয়ে দেওয়া হয়। নেতাজীর শরীর থেকে প্রায় ২০০ সি. সি. রক্ত বার করে নেওয়া হয়েছিল এবং তার পরিবর্তে ৪০০ সি. সি. নতুন রক্ত তাঁর শরীরে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ডাঃ ইয়োশিমি বলেছেন যে নানমন মিলিটারী হাসপাতালেই একজন জাপানী সৈনিকের দেহ থেকে রক্ত নেওয়া হয়েছিল এবং ঐ দিনই বিকাল চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে ঐ রক্ত নেতাজীর শরীরে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শ্রীহারিন শাহ নামে জনৈক ভারতীয় সাংবাদিক ১৯৪৬ সালে ফরমোসায় এই বিষয়ে স্থানীয় তদন্ত করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর বিবরণের সঙ্গে এই বিবরণের কিছু বৈষম্য রয়েছে। শ্রীহারিন শাহ'র জবানীমতে নেতাজীর জন্য রক্তদান করেছিলেন জনৈক জাপানী ছাত্র। ডাঃ সুরুতার জবানীতে আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ বৈপরীত্য দেখা যায়। তিনি নেতাজীর শুশ্রূষা করেছিলেন। তিনিই বলেছেন যে নেতাজীর শরীরে কোন রক্ত দেওয়া হয় নি। কর্নেল রহমান নেতাজীর সঙ্গে একই ওয়ার্ডে ছিলেন; কিন্তু তিনি মনে করতে পারেন নি যে নেতাজীর দেহে রক্ত দেওয়া হয়েছিল কি না। এই বিরোধী বিবৃতিগুলির মধ্যে সংহতি এনে দেওয়ার কোন পথ নেই তাই বিবৃতিগুলি যেমন আছে তেমনি থাকবে। সংক্রামক রোধ করার জন্য পরে নেতাজীর দেহে সালফানোমাইড ইঞ্জেক্‌শনও দেওয়া হয়েছিল। নেতাজীর জন্য এই ধরণের চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রথমে সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া গিয়েছিল

কর্নেল হবিব-উর রহমান এর ক্ষতস্থানও মলম ও সংক্রামক রোধক ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছিল এবং পরে ব্যাণ্ডেজ করে দেওয়া হয়েছিল। পরে ডাঃ ইয়োশিমি ডাঃ সুরুতাকে নেতাজীর দিকে লক্ষ্য রাখা এবং তিরিশ মিনিট অন্তর ভিটা-ক্যাম্ফর ইঞ্জেক্‌শন্ চালিয়ে যাওয়া নির্দেশ দিয়ে আহত জাপানী অফিসারদের চিকিৎসা করতে চলে যান। শুধুমাত্র রক্ত দেওয়ার বিষয় ছাড়া, ডাঃ সুরুতার জবানী ডাঃ ইয়োশিমির বক্তব্যের সমর্থন করে। আগেই বলা হয়েছে যে কোন নার্সকেই জেরা করা যায় নি। মিঃ কাজো মিৎসুই নামে জনৈক মেডিক্যাল আর্দালি, যিনি ঐ সময় নানমন মিলিটারী হাসপাতালেই ছিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় এসে কমিটির কাছে সাক্ষ্য দেন। তিনি বলেন যে ওষুধ ইত্যাদি এনে দিয়ে তিনি নেতাজীকে চিকিৎসারত ডাক্তারকে সাহায্য করেছিলেন।

নেতাজী তদন্ত কমিটি কোন্ ক্ষেত্রে যে অসঙ্গতি খুঁজে পান নি, তা রিপোর্ট পড়ে বোঝা কষ্টকর। তদন্তের প্রত্যেক পর্যায়ে রয়েছে অগণিত-অসঙ্গতির অপূর্ব সমাবেশ, তবে কোথাও তার গুরুত্ব কম আর কোথাও বেশী। যে হাসপাতালে নেতাজীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে তদন্ত কমিটি জানতে পেরেছেন সেখানে ক'টা নাগাদ আহত ব্যক্তিরা পৌঁছেছিলেন তা রিপোর্ট পড়ে বুঝতে পারা যায় না। প্রত্যক্ষদর্শীরা হাসপাতালে পৌঁছানোর সময়টা জানান নি বলে বিশ্বাস হয় না। তদন্ত কমিটি এই বিষয়ে বিশদভাবে কিছু না লেখার দরুণ স্বভাবতই মনের কোণে একটা 'কিন্তু' জেগে ওঠে। শ্রীসুরেশ চন্দ্র বসুর রিপোর্ট পড়ে জানা যায় যে মেডিক্যাল আর্দালি মিঃ এম্. কাজুও বলেছেন যে বেলা দু'টো নাগাদ সমস্ত আহত ব্যক্তিরা হাসপাতালে এসে পৌঁছে-ছিলেন। ডাঃ সুরুতা বলেছেন যে বেলা তিনটা নাগাদ নেতাজী ও কর্নেল রহমান সমেত জন বার আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। ডাঃ ইয়োশিমি বলেছেন যে বেলা আড়াইটা নাগাদ একটি শিডোশায় করে শুধু মিঃ বোসকে হাসপাতালে আনা হয়।

তারপর একটি লরিতে করে বার তেরজন আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। শ্রীআয়ার এর কাছে কর্নেল রহমান বলেছেন যে মিনিট পনেরর মধ্যেই একটি মিলিটারী এ্যাম্বুলেন্সে তাঁকে ও নেতাজীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। উপরোক্ত প্রত্যক্ষ-দর্শীদের বিবরণ থেকে হাসপাতালে পৌছানোর সময় সম্বন্ধে মতানৈক্য দেখা যায়। হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসার পর নেতাজীকে কোথায় রাখা হয়েছিল সে বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে বলে তদন্ত কমিটি মন্তব্য করেছেন। তদন্ত কমিটি আরও জানিয়েছেন যে নেতাজীকে যেখানে রাখা হয়েছিল সেখানে তাঁর সঙ্গে আর কে ছিলেন সেই সম্বন্ধেও মতানৈক্য রয়েছে। হাসপাতালের চিকিৎসকরা নক্সা এঁকে দেখিয়েছেন নেতাজী ও কর্নেল রহমান হাসপাতালের ঠিক কোন্ জায়গায় ছিলেন। মেজর টাকাহাশি ও মেজর কোনো বলেছেন যে নেতাজীকে আলাদা রাখা হয়েছিল আর লেঃ কর্নেল নোনোগাকি জানিয়েছেন যে নেতাজী, কর্নেল রহমান ও অন্যান্য আহত ব্যক্তিদের একই ঘরে রাখা হয়েছিল। কর্নেল রহমান মধ্যপন্থী হয়ে মত দিলেন যে তাঁর ও নেতাজীর ঘরে তৃতীয় আর এক ব্যক্তি ছিলেন। এমন সুপরিকল্পিত অসঙ্গতির সৃষ্টি করে প্রত্যক্ষদর্শীরা সমস্ত ঘটনার আসল রূপ তুলে ধরার প্রয়াসী হয়েছেন। তদন্ত কমিটি এই সূত্রগুলিকে নিতান্ত নগন্য সূত্র বলে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু সত্যই এগুলি নগন্য? বিমান দুর্ঘটনা ঘটে থাকলে, তার পূর্ণ বিবরণ বার করার জন্য দুর্ঘটনার কারণ থেকে শুরু করে পরিণতি পর্য্যন্ত সব স্তরের সূত্রগুলিই প্রয়োজনীয়। খুবই নগন্য কোন সূত্র ঘটনার সত্যতা প্রকাশ করতে সাহায্য করতে পারে। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। হাসপাতাল পর্বের ইতিহাস যদি সত্য হত তাহ'লে কোন পর্যায়েই কোন মত পার্থক্য থাকত না। তদন্ত কমিটি সব সূত্রই সমান গুরুত্ব দিয়ে বিচার করবেন বলে আশা করা গিয়েছিল, কিন্তু সে আশা পূরণ হয়নি। তদন্ত কমিটি

নগণ্য সূত্রের ক্ষেত্রে হাসপাতালের দু'জন ডাক্তারের জবানীকে যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করেছেন। নেতাজীকে চিকিৎসা করতে গিয়ে রক্ত বার করে নূতন রক্ত দেওয়া হয়েছিল বলে ডাঃ ইয়োশিমি বলেছেন। ডাঃ ইয়োশিমি একথাও জানিয়েছেন যে, কার কাছ থেকে রক্ত নেওয়া হয়েছিল। অবশ্য, সাংবাদিক শ্রীহারিন শাহর বক্তব্য মতে ঐ রক্তদাতা অন্য এক ব্যক্তি; চরম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে তখনই যখন ডাঃ সুরুতা তাঁর প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে নেতাজীর দেহে রক্ত দেওয়া হয় নি। কর্নেল রহমান কিন্তু এই প্রসঙ্গে সুন্দর ভাবে বলেছেন যে ঐ রক্ত দেওয়ার বিষয়টি তাঁর মনে নেই। এই ঘটনা প্রসঙ্গে তাঁর কোন মন্তব্য করা প্রয়োজনই তিনি মনে করেন নি কারণ চিকিৎসকদ্বয় স্বয়ং পরস্পর বিরোধী বক্তব্য বলেছেন। যদি তাঁদের বক্তব্যে স্ব-বিরোধিতার ভাব ফুটে না উঠত তাহ'লে এই প্রসঙ্গে ভিন্ন বক্তব্য কর্নেল রহমান এর কাছ থেকে আশা করা যেত। নেতাজীকে কোন্ ঘরে কার সঙ্গে রাখা হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটি দুই ডাক্তারের জবানীকে গ্রহণ করে যৌক্তিকতার পরিচয় রেখেছেন। কিন্তু ঐ দু'জন ডাক্তারই যখন পরস্পর বিরোধী বক্তব্য রাখলেন তখন তাঁরা দুই বিরোধী বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব নয় বলে প্রসঙ্গটি মাঝপথে বর্জন করলেন।

ডাঃ ইয়োশিমি নেতাজীর জন্য যে ধরণের চিকিৎসা ব্যবস্থা করেছিলেন সেই ব্যবস্থা একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিকিৎসকের দ্বারা সমর্থিত হয় নি। তিনি বলেছেন যে ভীষণভাবে পুড়ে যাওয়া ব্যক্তির শরীরের উত্তাপ এক দেড়ঘণ্টা পরে যথেষ্ট বেড়ে যেতে পারে। এই ধরণের রোগীদের হৃদযন্ত্র যদি দুর্বল মনে হয় এবং হৃদযন্ত্রের ওপর যদি রক্তের চাপ অনুভূত হয়, তাহলে ঐ চাপ দূর করে দেওয়ার জন্য প্লাস্‌মা দেওয়া উচিত ছিল। থার্ড ডিগ্রী পোড়া কেসের রোগীদের শরীর থেকে রক্ত বার করে নেওয়ার অর্থ রোগীকে আরও দুর্বল করে

দেওয়া। রক্ত দেওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে এই ধরণের রোগীদের সাধারণতঃ দুই বোতল রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে অবস্থা বুঝে এক বোতলও দেওয়া যেতে পারে।

নেতাজী তদন্ত কমিটি একজন মেডিক্যাল আর্দালির স্বেচ্ছায় এসে সাক্ষ্য দেওয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন। মিঃ কাজো মিৎসুই বলেছেন যে তিনি নেতাজীকে চিকিৎসা করার সময় ডাক্তারদের সাহায্য করেছিলেন। এই সাক্ষীটির কথা রিপোর্টে উল্লেখ করার কারণ নেতাজী যে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তারই সমর্থনে আরও একটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ রাখা। শ্রীসুরেশ চন্দ্র বসুর রিপোর্টে শ্রী এম. কাজুও নামে একজন মেডিক্যাল আর্দালির নাম দেখা যায়। এই ব্যক্তিই সম্ভবত তদন্ত রিপোর্টে উল্লিখিত মিঃ কাজো মিৎসুই। সাক্ষীদের নামের তালিকায় অবশ্য শ্রীএম. কাজো বলে কোন নাম নেই। ইনি কমিটির কাছে বলেছিলেন যে, প্রথম মেজর কোনোকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। মেজর কোনোকে তিনি পিঠে করে হাসপাতালের ভিতরে নিয়ে গিয়েছিলেন কারণ তিনি খুব বেশী আহত ছিলেন না। নেতাজীকে তিনি ষ্ট্রেচার এ শোয়া অবস্থায় দেখেছিলেন। নেতাজীর পরনে তখন বিমানবাহিনীর অফিসারের পোষাক ছিল। তাঁর টিউনিকের বোতাম খোলা ছিল, আর পায়ের পোড়া জায়গায় চিকিৎসা করার জন্য তাঁর ট্রাউজারের সামনের দিক কাঁচি দিয়ে কেটে ফাঁক করে নেওয়া হয়েছিল। মিঃ কাজোর জবানী অলোচ্য কাহিনীর মধ্যে এক নূতন দিগন্ত উদ্‌ঘাটন করে, যা অন্য কোন প্রত্যক্ষদর্শীদের দ্বারা সমর্থিত হয় নি। নেতাজী তদন্ত কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেওার জন্য স্বেচ্ছায় বহু সাক্ষীই এসেছিলেন। তাঁরা যে বিবরণ দাখিল করেছেন তা থেকে আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে এই ধারণা জন্মায় যে সব ঘটনাটিই সুন্দরভাবে সাজানো।

নেতাজী তদন্ত কমিটির কাছে মিঃ কে. সাটো নামে অপর এক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি একজন বোমারু বিমানের মেকানিক।

আলোচ্য ঘটনার সময় তিনি তাইহোকু বিমানবন্দরেই কার্য্যরত ছিলেন। তিনি বলেছেন যে ১৯৪৫ সালের ১০ই আগস্ট সকাল ৭টা নাগাদ একটা ছোটখাট বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল। ঐ বিমানে যাত্রী ছিলেন মাত্র দু'জন। একজন যাত্রী বিমানের দরজা খুলে লাফিয়ে বাইরে আসেন এবং অন্য যাত্রীটিকে বিমান থেকে বার করে আনা হয়। প্রথম ব্যক্তি অ-জাপানী ছিলেন এবং নেতাজীর মতই তাঁকে দেখতে ছিল ; আর দ্বিতীয় ব্যক্তিটি ছিলেন জাপানী। শ্রী এস্. এন্. সেন নামে একব্যক্তি তদন্ত কমিটির কাছে তাঁর সাক্ষ্য নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। শ্রী সেন এর সাক্ষ্য নেতাজী তদন্ত কমিটি নিয়েছিলেন। সাক্ষ্যদান কালে শ্রীসেন বলেন যে কুড়ি বছরেরও বেশী সময় ধরে তিনি জাপানে বসবাস করছেন। ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন এবং নেতাজীর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। তিনি বলেন যে ঐ বিমানে নেতাজী ছিলেন না। শ্রীসুরেশ চন্দ্র বসু লিখেছেন যে নেতাজী তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি (চেয়ারম্যান) মিঃ এম. মিয়োশি নামে আর এক ব্যক্তিকে জেরা করতে চান। মিঃ মিয়োশি তাইহোকুর ঐ হাসপাতালে আলোচ্য ঘটনার সময় মেডিক্যাল আর্দালী হয়ে কাজ করতেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মিঃ মিয়োশি তাঁর জবানীতে বলেছেন যে হাসপাতালের একটি ঘর থেকে একটা কফিন তুলে নিয়ে বাইরে অপেক্ষারত একটা ট্রাকে তুলে দিতে তাঁকে বলা হয়েছিল। তিনি আরও তিনজনের সাহায্য নিয়ে ঐ কাজ করেছিলেন। ঐ কফিনে কার দেহ রাখা ছিল তা তিনি জানেন না। এমন সাক্ষীদের জবানী স্বভাবতই নেতাজী তদন্ত কমিটিকে বিব্রত করেছিল। শ্রীসুরেশ চন্দ্র বসু এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে বহু ব্যক্তিই সাক্ষী দেওয়ার জন্য তদন্ত কমিটির কাছে দরখাস্ত পেশ করেছিলেন, কিন্তু মাত্র তিনজন ব্যক্তির সাক্ষ্য নেওয়ার পর দুর্ভাগ্যবশতঃ যখন দেখা গেল যে তাঁদের জবানী চেয়ারম্যান সাহেবের অনুকূলে নয় তখন তিনি কাহাকেও

জেরা করতে সাহস পান নি এবং শ্রীবসুকেও ঐ সব দরখাস্তকারীদের সম্বন্ধে অন্ধকারে রেখে দেন।*

এই অধ্যায়ের চতুর্থ অনুচ্ছেদে নেতাজী তদন্ত কমিটি লিখেছেন যে, প্রথম দিকে নেতাজী সজ্ঞানেই ছিলেন এবং সময়ে সময়ে জল চেয়েছিলেন। প্রত্যেকবারেই সামান্য একটু করে জল তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। একজন দোভাষীকে ভিতরে ডাকা হয়েছিল, যাতে নেতাজী ইচ্ছা করলে জাপানীদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। দু'জন ডাক্তার ছাড়া কয়েকজন নার্সও নেতাজীর শুশ্রূষা করছিলেন। কর্নেল হবিব-উর রহমান বলেছেন যে নেতাজীকে 'অপারেশন থিয়েটার'-এ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তাঁর শরীরে সাদা রঙের কিছু ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যা তিনি (কর্নেল রহমান) ক্যাম্ফর বলে মনে করেছিলেন। জাপানী ডাক্তাররা কিন্তু অপারেশন থিয়েটারের নামও করেন নি। যাহোক, যেহেতু অস্ত্রপচার করা হয় নি, সেইহেতু তাঁকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয় নি। কর্নেল হবিব-উর রহমান সম্ভবত ওয়ার্ডের লাগোয়া ড্রেসিংরুমের কথা ভাবছিলেন। কর্নেল রহমান বলেছেন যে নেতাজী দু'একবার মাত্র জল চেয়েছিলেন এবং একবার জানতে চেয়েছিলেন যে হাসান সেখানে ছিল কি না। দোভাষী মিঃ নাকামুরার জবানী মতে নেতাজী ঠিক তিনবার কথা বলেছিলেন। প্রথমবার তিনি বলেছিলেন যে তাঁর কিছু লোক তাঁকে অনুসরণ করছেন এবং যখন তাঁরা ফরমোসায় এসে পৌঁছবেন তখন যেন তাঁদের প্রতি যত্ন নেওয়া হয়। দ্বিতীয়বার তিনি বলেছিলেন যে তিনি অনুভব করতে

---

* I believe, a fair mumber of applications was received, but in view of his biassed attitude and of the result of the examination of only three of them, which unfortunately proved unfavourable to him, he did not dare examine any more of them and also kept me in the dark regarding any of those application.—Shri Suresh Chandra Bose.

Dissentient Report—P, 12

পারছেন যে তাঁর মাথায় রক্ত উঠে যাচ্ছে। এই বক্তব্য লেঃ কর্নেল নোনোগাকি দ্বারা আংশিকভাবে সমর্থিত হয়েছে। লেঃ কর্নেল নোনোগাকি দাবী করেছেন যে তিনি নেতাজীর বিছানার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথাও বলেছেন। এই সুদীর্ঘ সময় ধরে নেতাজী অবশ্যই খুব যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন কিন্তু কোন অভিযোগ বা কষ্টের গোঙানী তাঁর মুখে প্রকাশ পায় নি। তাঁর উদাসীন নীরবতা জাপানী সাক্ষীদের খুবই অভিভূত করেছিল। মিঃ জে. নাকামুরা বলেছেন, "এই সময়ের মধ্যে যন্ত্রণা বা কষ্টভোগের কোন অনুযোগ তাঁর মুখ থেকে প্রকাশ পায় নি। ঘরের অপর প্রান্তে শুয়ে থাকা জাপানী অফিসাররা তখন যন্ত্রনায় কাত্‌রাচ্ছিলেন এবং চিৎকার করে বলছিলেন যে অমন কষ্টভোগ করার চেয়ে তাঁদের যেন হত্যা করে ফেলা হয়, তখন নেতাজীর প্রশান্ত ভাব আমাদের সকলকে অবাক করেছিল।"

এই পর্যায়েও সাক্ষীদের জবানীর মধ্যে সঙ্গতি পাওয়া যায় না। যে দু'জন ডাক্তার নেতাজীর চিকিৎসা করেছিলেন তাঁরা অপারেশন থিয়েটার-এর নামও মুখে আনেন নি, কিন্তু কর্নেল হবিব-উর রহমান অপারেশন থিয়েটার-এর উল্লেখ করেছেন। তদন্ত কমিটি এই মত পার্থক্যের মধ্যে সমন্বয় এনে দিয়েছেন এই বলে যে, অস্ত্রপচারের প্রয়োজন হয় নি বলেই অপারেশন থিয়েটার-এ নিয়ে যাওয়ার দরকার হয় নি। কিন্তু কর্নেল রহমান এর জবানীর সত্যের অপলাপ করা হয়েছে বলে তদন্ত কমিটি বর্জন করেন নি। ড্রেসিংরুমকে কর্নেল রহমান অপারেশন থিয়েটার বলে ভুল করে ফেলেছিলেন। কিন্তু কর্নেল রহমান কখন জ্ঞান ফিরে পেয়েছিলেন তা রিপোর্টে লেখা হয় নি। শ্রীআয়ার এর কাছে, কর্নেল রহমান বলেছিলেন যে হাসপাতালে যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে তখন তিনি দেখেছিলেন যে নেতাজীর বিছানার পাশে আর এক বিছানায় তিনি শুয়ে আছেন।*

---

* The next thing I knew was that I was lying on a

নেতাজীকে ওয়ার্ডের বিছানায় নিশ্চয় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করার পরই পাঠানো হয়েছিল। তাহলে অপারেশন থিয়েটারে তাঁকে কখন নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? কর্নেল রহমান যে অজ্ঞান হয়ে হাসপাতালের বিছানায় ছিলেন তাইতো তদন্ত রিপোর্টে লেখা নেই। নেতাজী তদন্ত কমিটি এই প্রসঙ্গে কোন প্রশ্ন তোলেন নি। কিন্তু কর্নেল রহমান এর বিরোধী বক্তব্য শুনে বোঝা যায় যে ডাক্তারদের অপারেশন থিয়েটার সম্বন্ধে মন্তব্য অন্য কারও দ্বারা খণ্ডন হয় নি বলেই কর্নেল রহমান স্বয়ং ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। নেতাজী প্রথম দিকে সজ্ঞানেই ছিলেন মন্তব্যটির অর্থ দাঁড়ায়, পরে নেতাজী জ্ঞান হারিয়েছিলেন এবং তা বেশ কিছু সময়ের জন্য। কিন্তু কর্নেল রহমান শ্রীআয়ার এর কাছে বলেছিলেন যে সামান্য কিছু সময়ের জন্য ছাড়া সারাক্ষণ নেতাজী সজ্ঞানেই ছিলেন।* কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছানো মাত্রই যে নেতাজী জ্ঞান হারিয়েছিলেন তা কর্নেল রহমানই বলেছিলেন। তা'হলে নেতাজীর জ্ঞান হারানোর প্রশ্নে সম্পূর্ণ বিপরীত মতামত রয়েছে।

তদন্ত কমিটি লিখেছেন যে নেতাজী সময়ে সময়ে জল চেয়েছিলেন, কিন্তু কর্নেল রহমান বলেছেন যে দু'একবারই মাত্র নেতাজী জল চেয়েছিলেন। আরও জানা যায় যে, হাসপাতালে নেতাজীর জন্য একজন দোভাষী আনা হয়েছিল। কিন্তু একথা ঠিক যে নেতাজী জাপানী ভাষা জানতেন। সুতরাং হাসপাতালে কথা বলার জন্য একজন দোভাষীর প্রয়োজন এক্ষেত্রে দেখা যায় না। এক্ষেত্রে দোভাষী মিঃ নাকামুরার প্রয়োজন দোভাষী হিসাবে নয়; আলোচ্য দুর্ঘটনার অভিনয়ে সাক্ষীর ভূমিকায় একজন অভিনেতা হিসাবে। মিঃ নাকামুরা

Hospital bed next to Netaji—Col. Rehman, Unto Him A Witness, P. 113.

* Except for brief spells, Netaji was practically conscious throughout. Ibid P. 114.

তাঁর জবানীতে বলেছেন যে নেতাজী মোট তিনবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু কর্নেল রহমান এর জবানী এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর বক্তব্য মতে, হাসপাতালে পৌঁছানোমাত্র নেতাজী জ্ঞান হারিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি জ্ঞান ফিরে পান, কিন্তু আবার তিনি নিঃসাড় হয়ে পড়েন। বিকারের ঘোরে নেতাজী একবার হাসান এর নাম করেছিলেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে নেতাজী আর একবার বলেছিলেন, "হাবিব, আমার শেষ সময় ঘনাইয়া আসিতেছে। আমি আমার মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য সমস্ত জীবন সংগ্রাম করিয়াছি। আমার মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যই আমি মৃত্যুবরণ করিতেছি। দেশে ফিরিয়া গিয়া আমার স্বদেশবাসীকে বলিও তাহারা যেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া যায়। ভারত স্বাধীন হইবেই এবং অচিরেই।" এই জবানীর সঙ্গে দোভাষী শ্রীনাকামুরার জবানীর মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কর্নেল নোনোগাকিও নেতাজীর সঙ্গে কথা বলেছেন বলে জানিয়েছিলেন, কিন্তু মিঃ নাকামুরার জবানীতে তার কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। তৃতীয়বার নেতাজী কি বলেছিলেন তদন্ত কমিটির রিপোর্টে তা লেখা হয় নি। তবে শ্রীসুরেশচন্দ্র বসুর রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে শেষবার নেতাজী বলেছিলেন, "আমি ঘুমাইতে চাই।" কর্নেল হবিব-উর রহমান এই বিবৃতির সমর্থনে কোন কিছুই বলেন নি।

তদন্ত কমিটির রিপোর্টের দ্বিতীয় পর্বের চতুর্থ অনুচ্ছেদে কর্নেল হবিব-উর রহমান এর ও নেতাজীর এক কথোপকথন উদ্ধৃত করেছেন। তাইহোকুর মাটিতে শুয়ে নেতাজী কর্নেল রহমানকে বলেছিলেন যে "সে (কর্নেল রহমান) যখন স্বদেশে ফিরে যাবে, তখন জনগণকে সে যেন জানায় যে নেতাজী জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করে গেছেন। দেশবাসী যেন তাদের মুক্তি-সংগ্রাম চালিয়ে যান। হিন্দুস্থান নিশ্চয় স্বাধীন হবে ; এ দেশকে কেউ দাসত্বে রাখতে পারবে না।" কমিশন কর্নেল রহমান এর কাছে বলা নেতাজীর

এই কথাগুলিকে নেতাজীর "বাণী" বলেছেন। যদি তাইহোকু বিমান বন্দরের কথোপকথনকে নেতাজীর শেষ বাণী বলে ধরে নেওয়া হয় তাহ'লে হাসপাতালে নেতাজী কর্নেল রহমানকে যে কথা বলেছিলেন বলে জানা যায়, তাকে শেষের পরের বাণী বলতে হবে কী? নেতাজী তদন্ত কমিটি শ্রীআয়ার এর বইটি পড়েছেন এবং কর্নেল রহমানকে জেরাও করেছেন, কিন্তু তাঁকে (কর্নেল রহমান) তাঁর বক্তব্যের মধ্যে যে যথেষ্ট গড়মিল রয়েছে তা তুলে ধরে প্রশ্ন করেন নি। লেঃ কর্নেল নোনোগাকি দাবী করেছেন যে তিনি নেতাজীর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে নেতাজীর সঙ্গে কথা বলেছেন। লেঃ কর্নেল নোনোগাকি মিঃ নাকামুরার জবানী আংশিকভাবে সমর্থন করেছেন; কিন্তু মিঃ নাকামুরা লেঃ কর্নেল নোনোগাকির দাবী সমর্থন করেছেন কিনা তা বোঝা যায় না। কর্নেল রহমান নেতাজীর বিছানার পাশের বিছানায় শুয়েছিলেন এবং নেতাজীর সঙ্গে কথাও বলেছিলেন। নেতাজীর শারীরিক অবস্থা যা ছিল বলে ডাক্তাররা অভিমত দিয়েছেন, তা যদি সত্য হ'ত তাহ'লে ডাক্তাররাই নজর রাখতেন যাতে অন্য কেউ কোনভাবেই তাঁকে বিরক্ত না করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তা করা হয় নি। এমন বিচিত্র বিবরণ ও ব্যবস্থার প্রাচুর্য দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে "তাইহোকুর প্রাঙ্গনের" নাটকটি সুন্দরভাবে প্রযোজিত এবং সু-অভিনীত।

পঞ্চম অনুচ্ছেদে তদন্ত কমিটি লিখেছেন যে ডাঃ ইয়োশিমি বলেছেন যে সাতটা, সাড়ে সাতটা নাগাদ ডাঃ সুরুতা তাঁকে জানিয়েছিলেন যে নেতাজীর অবস্থার অবনতি ঘটেছে এবং তাঁর নাড়ি খুবই দুর্বল বোধ হচ্ছে। খবরটি পাওয়া মাত্র তিনি ছুটে গিয়ে নেতাজীর শরীরে ভিটা ক্যাম্ফর ও ডিজিটামাইন ইঞ্জেকশন্ দেন। উত্তেজক ওষুধ দেওয়া সত্বেও তাঁর হৃদ্-যন্ত্র ও নাড়ির স্পন্দনে কোন উন্নতি দেখা যায় নি। ধীরে ধীরে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। রাত আটটার কিছু পরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি (ডাঃ ইয়োশিমি)

মৃতের জন্য মৃত্যুর একটি মেডিক্যাল সার্টিফিকেট তৈরী করে দেন। ঐ সার্টিফিকেটে মৃতের নাম জাপানী ভাষায় লেখা হয় "কাতাকানা" অর্থাৎ চন্দ্র বোস এবং মৃত্যুর কারণ দেওয়া হয় "থার্ড ডিগ্রী পোড়া ক্ষত"। নেতাজীর মৃত্যুর সময় তাঁর বিছানার পাশে নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন: ডাঃ ইয়োশিমি, ডাঃ সুরুতা, দু'জন নার্স, কর্নেল হবিব-উর রহমান, মিঃ নাকামুরা (দোভাষী) ও একজন মিলিটারী পুলিশ। মেডিক্যাল আর্দালি কাজো মিৎসুই এর জবানী মতে সময় (নেতাজীর মৃত্যুর) রাত সাতটা বা আটটা। কর্নেল রহমান সময় বলেছেন রাত ন'টা, দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার ছ'ঘণ্টা পরে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে ১৯৪৬ সালে হংকং এর ষ্ট্যান্‌বি জেলে থাকাকালীন ডাঃ ইয়োশিমি একটি ছোট বিবৃতি দেন। ঐ বিবৃতিতে তিনি সময় বলেন রাত এগারটা এবং ও. সি. হিকারী কিকান এর উদ্দেশ্যে, চীফ অফ স্টাফ সাউদার্ণ আর্মির ২০শে আগস্ট, ১৯৪৫ সালের এক টেলিগ্রাম, যা বৃটিশ মিলিটারী ইণ্টেলিজেন্স উদ্ধার করেছিলেন তাতে লেখা হয়েছে যে মৃত্যু ঘটেছিল মাঝরাতে। ১৯৪৫ সালের ২৩শে আগস্ট তারিখে জাপানী ডোমি নিউজ এজেন্সির প্রথম প্রকাশিত খবরে এর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল। আহত অন্যান্য সহযাত্রীদের সাক্ষ্য সঠিক সময় নির্ধারিত করতে সাহায্য করে না। লেঃ কর্নেল নোনোগাকি এবং মেজর কোনো বলেন যে ঐ রাত্রেই তাঁদের দ্বিতীয় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। মেজর টাকাহাসি শুধু বলতে পেরেছিলেন যে নেতাজী ঐ রাত্রেই মারা গিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন আরাই বলেন যে রাত দশটা নাগাদ তিনি একজন নার্সের কাছ থেকে শুনেছিলেন নেতাজী পরলোক গমন করেছেন। সুতরাং মৃত্যুর সময় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না; ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট রাত আটটা থেকে যে কোন এক সময়ে মৃত্যু ঘটেছিল।

এই অধ্যায় পড়ার পর মনের কোণ থেকে অস্বস্তির ছায়া সরে গেল। শেষ পর্যন্ত নেতাজী সুভাষ চন্দ্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

রিপোর্ট পড়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানী থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তাইহোকুর অমন নাটকীয় ঘটনা ঘটিয়ে দিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, আর নেতাজী শেষ নিঃশ্বাস নয়—স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। হাসপাতালের চিকিৎসকরা যে নেতাজীকে বাঁচানোর জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন তা কর্নেল রহমান স্বীকার করেছেন। ইঞ্জেক্‌শনের পর ইঞ্জেকশন্ দিয়ে নেতাজীর অবস্থার কিছু উন্নতিও ঘটানো সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায় নি; হঠাৎ তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটেছিল। এই হঠাৎ পরিবর্তনের কারণ অবশ্য জানা যায় নি। তবে অবস্থার অবনতি দেখে তাঁর শরীরে আবার কয়েকটা ইঞ্জেক্‌শন দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নি। জনৈক লব্ধ প্রতিষ্ঠ চিকিৎসকের সঙ্গে তাইহোকুর সামরিক হাসপাতালের অক্লান্ত প্রচেষ্টার বিষয় নিয়ে একবার আলাপ করা হয়েছিল। নেতাজী শেষ পর্যন্ত শেষ নিঃশ্বাস (?) ত্যাগ করলেন, পর্যন্ত বলা মাত্র তিনি অবাক হয়ে বললেন, "এটা কেমন হ'ল"? কয়েক মিনিটের জন্য তিনি কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, "যে সব ওষুধের নাম বলা হয়েছে, আর রোগীর অবস্থা যা জানা যাচ্ছে তাতে ওষুধগুলি ঠিকই দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ওষুধ দেওয়ার মাত্রা তো ঠিক হয় নি। উত্তেজক ওষুধ এত বেশী মাত্রায় রোগীকে দেওয়া ঠিক হয় নি।" প্রবীণ চিকিৎসক বেশ চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলেন, ব্যাপারটা কি দাঁড়াল? ব্যাপার কিছুই নয়, তাইহোকুর ঘটনায় যা কিছুই ঘটেছে, তা খুবই তৎপরতার সঙ্গে করা হয়েছে। ঘটনার পরিণতি দ্রুততালে ঘটলে ঘটনার সঙ্গে জড়িত সবাই স্বস্তি পাবেন, তাই খুবই গতিশীল এক অভিনব নাটক অভিনীত হয়েছে।

যাঁকে ঘিরে তাইহোকু'র প্রান্তে অমন বিচিত্র এক ঝড় বয়ে গেল, তিনি কখন শেষ নিঃশ্বাস (?) ত্যাগ করেছিলেন? এই সম্পর্কে নেতাজী তদন্ত কমিটি মন্তব্য করেছেন যে মৃত্যুর সময় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি, তবে ঐদিন রাত আটটা থেকে মাঝরাতের

মধ্যে যে কোন এক সময় তিনি মারা গিয়েছিলেন। নেতাজী যে মারা গিয়েছেন (?) তা যখন সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে তখন একথা মানতেই হবে যে তাঁর মৃত্যুর সময় (?) ঘড়ির কাঁটাগুলি কোন এক জায়গায় এসে নিশ্চয় থেমেছিল। এখন ঘড়ির কোন্ কাঁটা কোথায় ছিল তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে কোন ব্যক্তি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে, তা অবশ্যই কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে ত্যাগ করবেন, বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকবার নিশ্চয়ই তাঁর মৃত্যু হবে না। নেতাজীর শেষ নিঃশ্বাস কিন্তু বহুবার পড়েছিল। হাসপাতালের ডাক্তারদের জবানীর ওপর তদন্ত কমিটি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন, এবং তা যুক্তিযুক্তই হয়েছে কারণ ওঁরা নিজেরা নেতাজীর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। একজন ডাক্তারের মতে, নেতাজী রাত আটটার একটু পরেই মারা গিয়েছিলেন এবং অন্যজনের মতে নেতাজী মারা গিয়েছিলেন রাত সাতটা থেকে রাত আটটার মধ্যে। অর্থাৎ, একজনের মতে নেতাজীর মৃত্যু ঘটেছিল রাত আটটার আগে এবং অপর জনের মতে রাত আটটার পরে। এঁরা তো ডেথ রিপোর্টও লিখেছেন, এবং তাতে মৃত্যুর সময় নিশ্চয় লেখা হয়েছিল। এখন প্রশ্ন, এঁরা সার্টিফিকেট-এ কি সময় লিখেছিলেন? তবে ডাক্তারদের জবানীর পরিপ্রেক্ষিতে ধরে নেওয়া যায় যে, মেডিক্যাল রিপোর্টে মৃত্যুর সময় রাত আটটার কিছু আগে বা কিছু পরে লেখা হয়েছিল। তাহ'লে তদন্ত কমিটি মৃত্যুর সময় মাঝরাত পর্য্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গেলেন কেন? তদন্ত করতে গিয়ে তাঁদের হাতে বৃটিশ মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের উদ্ধার করা একটা টেলিগ্রাম এসে পড়ে। ঐ টেলিগ্রামে মৃত্যুর সময় মাঝরাত বলে লেখা ছিল, তাই তদন্ত কমিটিও সময়টা এগিয়ে দিলেন। মাঝরাত বলতে ঘড়ির কাঁটাগুলি তখন কোথায় ছিল তার প্রমাণ হয় না। কিন্তু, ঐ টেলিগ্রামটাও যে সত্য ঘোষণা করেছে তার প্রমাণ কি? ডাক্তারের রিপোর্ট ছাড়া মৃত্যুর সময় সম্পর্কে ঘোষণা নির্ধারণ করার সাধ্যি অন্য

কাহারও নেই। সাউদার্ন আর্মির তরফ থেকে মৃত্যুর সময় ঘোষণার পিছনে ডাক্তারের দেওয়া রিপোর্টের সমর্থন থাকা উচিত। কিন্তু ডাক্তারদের জবানী মতে মৃত্যু সময় রাত সাতটা থেকে আটটার কিছু পরে বলে ধরে নিতে হয়। তাহ'লে সাউদার্ন আর্মির দেওয়া সময়, ডাক্তারের দেওয়া সময়ের ভিত্তিতে নিশ্চয়ই দেওয়া হয় নি। সুতরাং ঐ সময়ের কোন দাম নেই বলেই ধরে নিতে হবে। কিন্তু তদন্ত কমিটি ঐ টেলিগ্রামটির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। টেলিগ্রামটি যে সত্যিই খুব গুরুত্বপূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ ঐ টেলিগ্রামে দেওয়া মৃত্যুর সময় প্রমাণ করে যে ওটা মনগড়া বক্তব্য। ঘটনাটি যে সম্পূর্ণ পরিকল্পিত, তারই এক প্রকট প্রমাণ রাখে ঐ টেলিগ্রাম। জাপ কর্তৃপক্ষ ঐ টেলিগ্রামটি উদ্ধার করতে দেওয়ার জন্যই রেখেছিলেন। কিন্তু এর চেয়ে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ বৈষম্য দেখা যায়। ডাঃ ইয়োশিমি স্বয়ং মৃত্যুর সময় রাত এগারটা বলে জানিয়েছিলেন। একই ব্যক্তি মৃত্যুর সময় সম্বন্ধে দু'রকম বক্তব্য রেখেছেন এবং দুই বক্তব্যের মধ্যে সময়ের তফাৎ তিন ঘণ্টার। অন্যান্য সাক্ষীদের জবানীর মধ্যে সময়ের তফাৎ অনেকটা, কিন্তু একই ব্যক্তির সময় সম্বন্ধে দু'জায়গায় দু'রকম বক্তব্য ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করে না।

কিন্তু অসংগতি আরও রয়েছে, যা বুঝতে পেরেও নেতাজী তদন্ত কমিটি না বোঝার ভাণ করেছেন। হাসপাতালের ডাক্তার মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর একটা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট তৈরী করে দিয়েছিলেন বলে তদন্ত কমিটিকে জানান। মেডিক্যাল সার্টিফিকেট না দিয়ে ওটা তৈরী করা হয়েছিল বলে তিনি বলেছিলেন, এটাই বা কোন দেশী ব্যাপার হল? তাঁর বক্তব্য থেকে আরও জানা যায় যে মৃত ব্যক্তির নাম জাপানী ভাষায় ভাষান্তরিত করে 'কাতাকানা' বলে লেখা হয়েছিল। এমন বিচিত্র ব্যাখ্যা শুনে নূতন করে ভাষাজ্ঞান আহরণ করার ইচ্ছা পাঠকদের মনে নিশ্চয়ই জাগবে। সুভাষচন্দ্রের নাম যদি

ইংরেজীভাষী কোন ব্যক্তি "সোনোরাস সীট ডাউন" বলে লেখেন বা বলেন তাহলে ঠিক বলা হ'ল কি? জাপসাক্ষীর জবানী পড়ে মনে হয় যে ব্যক্তি বিশেষের নামের ঐ ধরণের পরিভাষা হয় না, কিন্তু ঘটনা ঐ রূপ করা হয়েছে। "কাতাকানা" নামক জনৈক মৃত ব্যক্তির ডেথ রিপোর্ট লেখা হয়েছিল এবং পরে ঐ রিপোর্টটি এমানভাবে তৈরী করে নেওয়া হ'ল যে তা দেখিয়ে বলা যেতে পারে যে ওটা চন্দ্র বোস এর রিপোর্ট। সুতরাং রিপোর্ট তৈরী করার কথাটা খুবই তাৎপর্যপুর্ণ, অর্থাৎ অর্ডার মাফিক কাজ। এছাড়া আরও একটা বিচিত্র বৈষম্য লক্ষ্য করা গেছে, তাহল নেতাজীর মৃত্যুর সময় (?) কর্নেল রহমান ছাড়া আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায় তাঁরা কেউই আলোচ্য বিমানের আরোহী ছিলেন না। লেঃ কর্নেল নাকামুরা সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায়ই বিধ্বস্ত বিমান থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন বলে জানা গেছে। হাসপাতালে নেতাজীর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে অমন ভীষণভাবে আহত মৃত প্রায় ব্যক্তির সঙ্গে তিনি কথা বলেছিলেন বলে জানা গেছে, কিন্তু যখন নেতাজী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন তখন তিনি সেখানে ছিলেন না। এমন বিচিত্র ব্যবহার কোন মানুষের কাছে আশা করা যায় না। কিন্তু এক্ষেত্রে তাও ঘটেছিল বলে জানা যায়। মুখে মুখে বা কাগজে কলমে এমন বিচিত্র ঘটনা ঘটানো অসম্ভব নয়। তাইহোকুকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা ঘটেছিল বলে আমাদের জানান হয় তা কাগজে কলমে এবং মুখে মুখে ঘটেছিল, আসলে তেমন কোন ঘটনা ঘটলে এমন বিচিত্র অসঙ্গতির সমাবেশ দেখা যেত না। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট থেকে সবই বোঝা গেছে; কমিটি লিখেছেনও অনেক কিছু; কিন্তু একটা কথা লেখা হয়নি তাহ'ল নেতাজীর ডেথ রিপোর্ট ডাঃ ইয়োশিমি লেখেন নি—ওটা লিখেছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস নিজেই।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে তদন্ত কমিটি জানিয়েছেন যে বহুলোক নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। এর অন্যতম কারণ হ'ল সংবাদটি

প্রচার করার ধরণ। জাপানী কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে অত্যধিক গোপনীয়তা রক্ষা করেছিলেন। এই গোপনীয়তা রক্ষা করার কারণ পরিষ্কার বোঝা যায় না। নিরাপত্তার জন্যই সম্ভবত এই কাজ করা হয়েছিল। কম্যাণ্ডারদের মধ্যে সরকারী চিঠিপত্রের বিনিময়ের সময়েও তাঁরা নেতাজীকে মিঃ "টি" বলে পরিচয় দিতেন। ১৯৪৬ সালের ২০শে আগস্ট, ও. সি. হিকারী কিকানকে চীফ অফ্ সাউদার্ন আর্মি এক টেলিগ্রামে সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ দেন যে, গোপনতা রক্ষা করতে হবে। দোভাষী মিঃ নাকামুরা বলেন যে নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখা হয়েছিল এবং ঐ সংবাদ শুধুমাত্র উচ্চপদস্থ মিলিটারী অফিসারদেরই জানা ছিল। ফরমোসা সেনাবাহিনীর চীফ অফ্ স্টাফ্ জেনারেল ইসায়ামা এই কানাঘুসার বিষয়টি এই বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তাঁরা জনগণকে জানাতে চান নি যে নেতাজীর মত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, যিনি ভারতকে স্বাধীন করার জন্য বৃটিশের বিরুদ্ধে এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন, তিনি টোকিওতে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। জেনারেল ভোঁসলে বলেন যে নেতাজীর খবর খুব তৎপরতার সঙ্গে ধারাবাহিক টেলিগ্রামের মাধ্যমে ব্যাঙ্ককে তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকারের উপদেষ্টা ও ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের থাইল্যাণ্ড আঞ্চলিক সমিতির চেয়ারম্যান সর্দার ইশার সিং বলেন যে নেতাজী ব্যাঙ্কক ত্যাগ করে যাওয়ার তিন চার দিন পরে, অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের ২০শে বা ২১শে আগস্ট জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর খবর জানিয়েছিলেন। নেতাজীর দলের লোক যাঁরা সাইগনে থেকে গিয়েছিলেন তাঁরা যতদিন সেখানে ছিলেন ততদিনের মধ্যে, অর্থাৎ ২০শে আগস্ট পর্যন্ত নেতাজীর কোন খবর পান নি। কিন্তু এই সাইগনেই সাউদার্ন আর্মির কেন্দ্রীয় দপ্তর ছিল এবং কয়েকদিন জেনারেল ইসোদা সেখানেই ছিলেন আর তাঁরই কাছে সব গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলি ছিল। ২০শে আগস্ট একই বিমানে টোকিও যাওয়ার পথে

ক্যান্টনে লেঃ কর্নেল টাডা, শ্রী এস. এ. আয়ারকে খবরটি দিয়েছিলেন। শ্রীদেবনাথ দাস, ও অন্যেরা হ্যানয়-এ চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই টোকিও থেকে রেডিও মারফৎ প্রচারিত এই মর্মান্তিক সংবাদ পান। তারপরই এক বিচিত্র ঘটনা ঘটে। যার বিবরণ শ্রীদেবনাথ দাস দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে দিন দুই পরে একজন জাপানী স্টাফ অফিসার তাঁর কাছে এসে বলেন যে বিমান দুর্ঘটনার বিষয় একটি সাজানো কাহিনী এবং তাঁরা যেন এসব বিশ্বাস না করে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করে যান। শ্রীদেবনাথ দাস কর্নেল প্রীতম্ সিংকেও এই কাহিনী বলেছিলেন। পরের মাসেই শ্রী দেবনাথ দাস আত্মগোপন করেছিলেন। ব্যাঙ্ককে আরও কিছু লোক ছিলেন যাঁদের নেতাজী স্বয়ং ব্যাঙ্কক ত্যাগ করে যাওয়ার সময় নির্দ্দশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁরা যেন আত্মগোপন করেন এবং বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। শ্রী এ. সি, রায় ও শ্রী সুনীল রায়কে কিছু ছোটঘাট অস্ত্র গোলাবারুদ এবং বেতার যন্ত্রও দেওয়া হয়েছিল। ব্যাঙ্ককে শ্রীদাসকে জেরা করা হয়। জেরার উত্তরে তিনি বলেন যে যখন তিনি দুর্ঘটনার খবর পেয়েছিলেন, তখন অন্যান্যদের মত তিনিও ঘটনাটি বিশ্বাস করেন নি। যদিও শ্রী সুনীল রায় এর কাছে নেতাজীর সঙ্গে যোগাযোগ করার ওয়েভলেংথ, ফ্রিকোয়েন্সি, সঙ্কেত ডাক ইত্যাদি ছিল, কিন্তু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। দিন দশেক পরে তিনি যোগাযোগ করার চেষ্টা পরিত্যাগ করেন এবং বিশ্বাস করে নেন যে বিমানটি নিশ্চয়ই নেতাজীকে নিয়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল। শ্রী দেবনাথ দাস ১৯৪৫ সালের মে মাসে ব্যাঙ্ককে আত্মপ্রকাশ করেন, কিন্তু নেতাজীর অবস্থিতি সম্পর্কে কোন খবরই তিনি শ্রী এ. সি. দাসকে দিতে পারেন নি। সুতরাং, অধিকাংশ ব্যক্তি যাঁরা প্রথমে বিমান দুর্ঘটনার কাহিনী সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, তাঁরাই ধীরে ধীরে ঘটনাটি বিশ্বাস করতে থাকেন।

তাইহোকু'র ঘটনা সম্পর্কে জনগণ যে সন্দেহ প্রকাশ করেন তা তদন্ত কমিটির অজ্ঞাত নয়। এই সন্দেহের কারণও কমিটি উপলব্ধি করতে পেরেছেন; তাহ'ল বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর (?) খবরটি প্রকাশ করার ধরণ। জাপ সরকার যে সমস্ত ব্যাপারে খুবই গোপনীয়তা রক্ষা করেছিলেন, তাও তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে। তদন্ত কমিটি আরও একটু বিশদভাবে বলেছেন যে এই গোপনীয়তা রক্ষার আংশিক কারণ হ'ল নিরাপত্তা। অর্থাৎ, কি কি কারণে জাপ সরকার গোপনতা রক্ষা করেছিলেন তা পুরোপুরিভাবে জানা যায় নি। সরকারী চিঠিপত্রে নেতাজীকে "মিঃ টি." বলে পরিচয় দেওয়া হ'ত জানতে পেরে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে জাপ সরকার যে সব গোপন ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তা সবই নেতাজীর নিরাপত্তার জন্য। নেতাজীর পরিকল্পনা ও তাঁর গতিবিধি সম্বন্ধে গোপনতা রক্ষা করা নিয়ম মাফিক কাজ। কারণ, তাঁর নিরাপত্তার ওপরই নির্ভর করছিল আজাদ হিন্দ্ ফৌজের আন্দোলন, এবং জাপ সরকারও রাজশক্তি বিরোধী ঐ আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তাছাড়া যুদ্ধের সময় গোপনতা রক্ষা করাটা যুদ্ধের এক বিশেষ অঙ্গ এবং বিশেষ করে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের গতিবিধি কোন অবস্থাতেই যথাযথ কর্তৃপক্ষ ছাড়া অন্য কারও কাছে প্রকাশ করা হয় না। অতএব জাপ সরকারের ঐ টেলিগ্রাম আলোচ্য ঘটনা সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোকপাত করে বলে মনে হয় না। কিন্তু, জাপ সরকারের ২০শে আগস্টের টেলিগ্রাম তথ্যবহুল। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্ব্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস অকস্মাৎ পরলোক-গমন করেছেন এবং সেই মৃত্যু খুবই মর্মান্তিকভাবে ঘটেছে (?) এমন এক খবর গোপন করে রাখার নির্দেশ দিয়ে জাপ সরকার 'গোপনতা' শব্দের অর্থ ঠিক করেছেন বলে মনে হয় না। টেলিগ্রামের ভাষা মাফিক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও আন্দোলনের প্রয়োজনে গোপনতা রক্ষার প্রয়াস যথাযথ হয়েছে। কিন্তু যেখানে

ব্যক্তির দেহ নিষ্প্রাণ, অর্থাৎ, যাঁর গতিবিধি ও পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য গোপনতা রক্ষার ব্যবস্থা, তিনিই যখন মৃত, তখন তাঁর মৃত্যুর খবর (?) গোপন করে রাখার প্রয়াস কি কারণে প্রয়োজন হয়েছিল তা যথাযথভাবে পর্য্যালোচনা করে দেখা দরকার। তাইহোকুর ঘটনা সত্য হলে নেতাজী সুভাষচন্দ্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট। অথচ, ঐ খবর গোপন রাখার নির্দেশ পাঠানো হয়েছিল ২০শে আগস্ট, অর্থাৎ ছ'দিন পর। নেতাজী সুভাষচন্দ্র আর নেই; এই খবর গোপন রাখার নির্দেশ পাঠানোর পিছনে নিশ্চয় কোন কারণ ছিল। জাপ সরকার-এর সেনাবাহিনীর চীফ অফ্ স্টাফ জেনারেল ইসায়ামা গোপনতা রক্ষার ব্যাপারে যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র টোকিওতে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, এই কথা সত্য নয়। আজাদ হিন্দ্-এর আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি নিরাপদ জায়গায় যাচ্ছিলেন এবং এই যাওয়াকে পালিয়ে যাওয়া বলে না; বরং আত্মগোপন করার প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। সুতরাং জাপ সরকারী মুখপাত্রের বক্তব্য গোপনতা রক্ষার প্রয়াসের সমর্থনে নূতন এক ইঙ্গিত বহন করে। জাপানী সাক্ষী দোভাষী শ্রীনাকামুরার বক্তব্য থেকে জানা যায় যে নেতাজীর মৃত্যু (?) সংবাদ শুধু উচ্চপদস্থ মিলিটারী অফিসারদের মধ্যেই জানা ছিল। এই বক্তব্য প্রমাণ করে যে তাইহোকুর অভ্যন্তরে যে ঘটনা ঘটেছিল তা জাপ সরকার এর সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসাররা জানতেন; এবং ঐ খবর যাতে প্রকাশ করা না হয় সে জন্য ওপরের মহল থেকে নির্দেশও এসেছিল। তাইহোকুর সঙ্গে টোকিওর, এমন কি বিশ্বের অন্য সব দেশের যোগাযোগও যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল তাও সত্য। তাই'লে সুনির্দিষ্টভাবে এটাই প্রমাণিত হয় যে তাইহোকুর প্রান্তেও গোপনতা রক্ষার নির্দেশ পৌঁছেছিল। তাইহোকুকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল; জাপ সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারদেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, অথচ টোকিওর

সরকারী কর্তৃপক্ষ কোন কিছুই জানতেন না একথা বিশ্বাস্য নয়। এবং একথাও জানা যায় যে দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গোপনতা রক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয় নি, অথচ যখন নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়, অর্থাৎ ২০ আগস্টের আগে দুর্ঘটনার খবর প্রকাশ পেয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই তথ্য প্রমাণ করে যে তাইহোকুর বিমান বন্দরে যে ঘটনা ঘটেছিল তা কয়েকজন পদস্থ ও বিশ্বস্ত সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা, যদি ঘটনা সত্যই ঘটে থেকে থাকে, বা পরিকল্পনা মাফিক যা করণীয় তা করে ফেলার পর নিশ্চয়ই টোকিওর সরকারী কর্তৃপক্ষকে তাঁদের রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন। ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট রিপোর্ট পাঠানোর পর ২০শে আগস্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নির্দেশ এসেছিল। এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, জাপ সরকারী কর্তৃপক্ষ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন যে তাইহোকুর ঘটনা সম্পর্কে যেন গোপনতা রক্ষা করা হয়। যদিও অনেকেই কানাঘুষায় খবরটি জানতে পেরেছিলেন বলে বোঝা যায়—যেমন ডোমি নিউজ এজেন্সির মিঃ ফুকুওকা, কিন্তু তাঁরাও খবরটি প্রচার করতে পারেন নি কারণ ঘটনার তথ্য কারও জানা ছিল না।

জাপসরকার-এর এই প্রচেষ্টা সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রমাণ করে যে তাইহোকুর প্রান্তে যে ঘটনা ঘটেছিল বলে ডোমি নিউজ এজেন্সি প্রচার করেছিলেন তা এক গোপন প্রচেষ্টার অংশবিশেষ। এই প্রচেষ্টা সফল হওয়ার দরুণ জাপানের প্রশাসন ব্যবস্থারও একটা ছবি পাওয়া যায়। বিমান দুর্ঘটনা ঘটে থাকলে অবশ্যই বেশ কিছু লোক বিমানের গতিপথ, উদ্ধার কার্য্য, ইত্যাদি বহু ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বিমানের আরোহীরা ছাড়া, ঐ সময় তাইহোকু বিমানবন্দরে অন্ততঃ কয়েক'শ লোক কর্মরত ছিলেন। নানমন মিলিটারী হাসপাতালে যদি আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা করা হয়ে থেকে তাহ'লে বেশ কিছু

কর্মচারী স্বভাবতই ঐ কাজে সাহায্য করেছিলেন। বিধ্বস্ত বিমান থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করার জন্য ও তাঁদের শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তোলার জন্য নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক তৎপরতা দেখা দিয়েছিল, বিশেষ করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস এর মত ব্যক্তি যখন ঐ দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। খবরটিকে গোপন রাখার জন্য অবশ্যই দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া মাত্র তাইহোকু বিমান বন্দর ও নানমন হাসপাতাল নিষিদ্ধ এলাকা বলে ঘোষিত হয়েছিল এবং বিমান বন্দর ও হাসপাতালের কর্মচারীদের ওপর প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেন খবরটি প্রকাশ না পায়। এই ধরণের কোন নির্দেশ কেউ দিয়েছিলেন বলে জানা যায় নি। ঘটনাটি ঘটে যাওয়া মাত্র বেতারে ঘটনার বিবরণ অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছিল এবং কোন নির্দেশ না আসা পর্যন্ত গোপনতা রক্ষা করার নিশ্চয় কোন কথাই ওঠে না। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যায় যে আলোচ্য বিমান দুর্ঘটনার খবর, ঘটনা ঘটে যাওয়া মাত্রই প্রকাশ পায় নি। এই বিলম্ব প্রমাণ করে যে জাপ সরকারের-এর প্রশাসন বিভাগ, বিশেষ করে সামরিক কর্তৃপক্ষ খুবই সংগঠিত ছিল এবং আত্মসমর্পণের পরও সরকারী কর্তৃপক্ষ নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলেছিলেন। জাপ সরকার এর প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার দরুণ যা করণীয় ছিল তা করা হয় নি বলে তদন্ত কমিটি যে মন্তব্য করেছেন তা ঠিক নয়

জাপ সরকার নেতাজীর ব্যাপারে যে ধরণের গোপনতা রক্ষা করা নির্দেশ দিয়েছিলেন, ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা তা যথাযথভাবে যে পালন করেছিলেন তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু একথাও সত্য যে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস ভারতীয়দের নেতা। জাপ সরকারের এক্তিয়ারের মধ্যে যে কোন জায়গায় যদি তাঁর কোন ক্ষতি হয় তাহ'লে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার দায়িত্ব জাপ সরকারের ওপর বর্তায়। তাইহোকুর বিমানবন্দর জাপ সরকারের এক্তিয়ারের মধ্যেই তখন ছিল। আলোচ্য ঘটনা যদি সত্যই ঘটে

থাকে তবে জাপ সরকারের তরফ থেকে ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করার মত তথ্য সংগ্রহ করে রাখা উচিত ছিল। ঘটনার বিষয় যাতে জনগোচরে না আসে সেজন্য জাপ সরকার যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করার মত তথ্য তাঁরা রাখেন নি। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার।

নেতাজী তদন্ত কমিটি শ্রীদেবনাথ দাস বর্ণিত ঘটনাকে কৌতুকোদ্দীপক বলে অভিমত দিয়েছেন। আলোচ্য ঘটনার সমর্থনে যদি সুনিশ্চিত তথ্য প্রমাণ থাকত তাহ'লে ঐ কাহিনীকে কৌতুকপ্রদ বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত, কিন্তু যেখানে পরিষ্কার প্রমাণ রয়েছে যে জাপ সরকার আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে গোপনতা রক্ষা করার জন্য যে সুনির্দিষ্ট নিয়ম্ পাঠিয়েছিলেন সেখানে একজন স্টাফ অফিসার এর বক্তব্যকে হাল্‌কাভাবে দেখা যায় না। জাপানী স্টাফ অফিসার শ্রীদেবনাথ দাস এর কাছে এসে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করে যাওয়ার কথা বলে গিয়েছিলেন। নেতাজীর কি পরিকল্পনা করা ছিল তা একজন স্টাফ অফিসারের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ঐ স্টাফ অফিসার যদি শ্রীদাস এর কাছে পরিকল্পনা সম্বন্ধে কোন অভিমত রাখতেন তাহ'লে ভাববার অবকাশ থাকত, কিন্তু তা তিনি করেন নি। একথাও সত্য যে ব্যাঙ্কক ত্যাগ করে যাওয়ার আগে নেতাজী বিশেষ কোন পরিকল্পনা করে রেখে গিয়েছিলেন। তবে একথাও সত্য যে নেতাজীর মত রহস্যময় পুরুষের পরিকল্পনা স্বয়ং তিনি ছাড়া আর কেউ জানতেন না। যাঁদের মাধ্যমে তিনি তাঁর পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ন করবেন, তাঁরা শুধু তাঁদের করণীয় কাজটুকু সম্বন্ধেই ওয়াকি-বহাল থাকতেন। শ্রীদেবনাথ দাস ও অন্য কয়েকজনকে নেতাজী আত্মগোপন করে থাকার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার ওয়েভলেংথ, ফ্রিকোয়েন্সি, সঙ্কেত ডাক ইত্যাদি জানা ছিল শুধু একজনের—তাঁর নাম শ্রীসুনীল রায়। নেতাজী যাঁদের আত্মগোপন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁদেরকেই পরিকল্পনা মাফিক

কাজ করে যাওয়ার নির্দেশ যে ঐ স্টাফ অফিসার-এর মাধ্যম পাঠানো হয়নি তা কে বলতে পারে? ভুললে চলবে না যে যিনি খসরাটি দিতে এসেছিলেন তিনি একজন সামরিক অফিসার। যেখানে জাপ সরকারী উচ্চ মহল থেকে গোপনতা রক্ষা করার নির্দেশ আসছিল, সেখানে তিনি স্বেচ্ছায় গিয়ে আজাদ হিন্দ্ সরকার-এর একজন মন্ত্রীর কাছে বলে এলেন যে সব মিথ্যে কথা, পরিকল্পনা মাফিক কাজ করুন, এমন হতে পারে না। সামরিক বাহিনীর নিয়ম শৃঙ্খলা সম্বন্ধে যাঁদের সামান্যতম জ্ঞান আছে—যাঁরা কোর্ট মার্শাল করার কথা জানেন, তাঁরা অন্ততঃ একথা বিশ্বাস করবেন না। এখানে প্রশ্ন থেকে যায় যে যাঁরা আত্মগোপন করেছিলেন তাঁরা তো শেষ পর্যন্ত আবার আত্মপ্রকাশ করলেন, নেতাজীর নির্দেশ এল না কেন? বিশ্বপরিস্থিতি তখন প্রতি পলে পলে পরিবর্তিত হচ্ছিল। নেতাজী যাঁদের দিয়ে প্রয়োজন শুধু তাঁদেরই সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, অন্যদের সাথে করেন নি; কিংবা এমনও হতে পারে যে শ্রীসুনীল রায় এর কানে হঠাৎ কোন এক সময় ভেসে এসেছিল, "আমার এই পর্যায়ের কাজ শেষ। আমার জীবিত থাকার কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিও না, পরে সময় মত দেখা হইবে, জয় হিন্দ্।" আবার এমনও হতে পারে যে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়ে গিয়ে নেতাজী দিন দশেকের মধ্যে যোগাযোগ করে উঠতে পারেন নি। কিন্তু পরে যখন তিনি যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন তখন হয়ত অন্য প্রান্ত থেকে নীরব হয়ে গিয়েছিল। নেতাজীর রহস্যজনক অন্তর্ধানের সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন বলে জানা যায়, তাঁদের অধিকাংশই সামরিক বাহিনীর পদস্থ ব্যক্তি। যাঁরা মনে প্রাণে সৈনিক, তাঁরা কম্যাণ্ডার এর নির্দেশ মাফিক কাজ করতেই অভ্যস্ত। নির্দেশ বহির্ভূত কোন কাজ তাঁরা কখনই করতে পারেন না। আলোচ্য ঘটনার সাক্ষী হিসাবে যাঁরা নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁরা ঘটনার গূঢ় রহস্য সম্যক রূপেই জানেন এবং একে অন্যের বিরোধী বক্তব্য রেখে বিচারকের চোখকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করেন নি।

আর জাপ সরকার তাঁদের নেওয়া ব্যবস্থার বিবরণ দাখিল করে ও ঘটনার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না রেখে, মানুষের চোখে ছোট হয়ে যান নি। একটি প্রশ্ন অনেকেরই মনে জাগে যে, জাপ সরকার মিথ্যা প্রচার করলেন কেন? এই বিষয়ে শ্রী এস. এ. আয়ার এর বিবৃতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখেছেন যে—তিনি জাপ কর্তৃপক্ষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁদের মতে বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল ১৮ই আগস্ট এবং ঐ রাত্রেই নেতাজী মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু সুদীর্ঘ চারদিন পার হয়ে যাওয়া সত্বেও, অর্থাৎ ২২শে আগস্ট পর্যন্ত, জাপ সরকার বা অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্‌ সরকার-এর তরফ থেকে বিপর্যয়ের কোন খবর প্রচার করা হয় নি। শ্রীআয়ার জাপ সরকারকে বলেছিলেন যে নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ প্রচার করতে যত বিলম্ব হবে ততই জনগণ এই প্রচারের উপর বিশ্বাস হারাবে। সুতরাং প্রচারের কাজ যত তাড়াতাড়ি করা হয় ততই ভাল। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে জাপ কর্তৃপক্ষ শ্রীআয়ারকে প্রচারের একটি খসড়া করে দিতে অনুরোধ করেন। শ্রীআয়ার তখন খসড়া করে দেন। পরের দিন জাপ ডোমি নিউজ্‌ এজেন্সি শ্রীআয়ারের খসড়া অনুযায়ী আলোচ্য দুর্ঘটনার সংবাদ প্রচার করে। এই ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় যে জাপ সরকার যে সংবাদ প্রচার করেছিলেন বলে জানা যায়, তা আসলে শ্রীআয়ার এর খসড়ার ভিত্তিতে। অর্থাৎ জাপ সরকার আলোচ্য দুর্ঘটনার সংবাদ প্রচারে সরকারীভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেন নি। সরকারী পর্যায়ে শোনা কথার ওপর নির্ভর করে ও অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্‌ সরকার-এর একজন মন্ত্রীর খসড়ার ভিত্তিতেই আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে ঘোষণা হয়েছিল।

১২

তৃতীয় পর্বের সপ্তম অনুচ্ছেদে নেতাজী তদন্ত কমিটি লিখেছেন জাপানীরা প্রথমে শুধুমাত্র গোপনতা রক্ষা ও সংবাদ প্রকাশে বিলম্বই করেছেন তা নয়, উপরন্তু, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের সামনে নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ তুলে ধরতে পারে নি। নেতাজীর মৃত্যুর দু'দিন পরে কয়েকটি ছবি তোলা হয়েছিল, তারই একটিতে দেখা যায়, কর্নেল হবিব-উর রহমান প্রহরারত রয়েছেন এবং অন্যটিতে, কোন বস্তুকে ঢেকে রাখা অবস্থায় একটি চাদর দেখা যায়। এই ছবিগুলি থেকে মৃত ব্যক্তিকে সনাক্ত করা যায় না। ডাঃ ইয়োশিমি বলেছেন যে মৃতদেহের ছবি তোলা জাপানী প্রথার বিরোধী। কর্নেল হবিব-উর রহমান বলেছেন যে নেতাজীর মুখের ছবি তোলার অনুমতি তিনি দেন নি কারণ ঐ মুখ যথেষ্ট ফুলে গিয়েছিল এবং বিকৃতিও হয়ে গিয়েছিল। ঐ সময় ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল বলে নেতাজীর ব্যক্তিগত ব্যবহারের কোন জিনিষ দেখানো হয় নি। কর্নেল হবিব-উর রহমান যে ঘড়িটি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন এবং যা পরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নেতাজীর অগ্রজ স্বর্গত শরৎ চন্দ্র বসুকে দিয়েছিলেন, ঐ ঘড়িটি সম্বন্ধে কিছু মতভেদ রয়েছে। ঐ ঘড়িটি ছিল চতুর্ভুজ আকারের। কর্নেল হবিব-উর রহমান বলেছেন যে ডাঃ ইয়োশিমি ঐ ঘড়িটি তাঁর হাতে দিয়েছিলেন। কিন্তু ডাঃ ইয়োশিমি বলেছেন যে ঐরকম কোন ঘটনা তাঁর মনে নেই। বেশীর ভাগ ছবিতেই নেতাজীর হাতে একটি গোল ঘড়ি দেখা যায়। তাঁর (নেতাজীর) ব্যক্তিগত অনুচর কুন্দন সিংও জানিয়েছেন যে নেতাজী অভ্যাসবশতঃ একটি গোল ঘড়িই সব সময় পরতেন। অপর পক্ষে, একথাও সত্য যে নেতাজী তাঁর সঙ্গে যে সব মালপত্র নিয়ে যাচ্ছিলেন তার মধ্যে চতুর্ভুজ আকারের ঘড়ি

সমেত বিভিন্ন ধরণের বহু ঘড়ি ছিল, যেগুলি তাঁকে বিভিন্ন সময়ে উপহার দেওয়া হয়েছিল। নয়াদিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনের জাতীয় সংগ্রহশালায় তাইহোকু বিমান বন্দর থেকে উদ্ধার প্রাপ্ত কিছু জিনিষপত্র সযত্নে রাখা আছে। তারই মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় কয়েকটি চতুর্ভুজ আকারের ঘড়ি রয়েছে, যা কমিটি পরিদর্শন করে দেখেছেন। ঘড়ির বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় নি। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে উদ্ধারপ্রাপ্ত জিনিষপত্রগুলি নেতাজীর অনুচর কুন্দন সিংকে দেখানো হয়েছিল। নেতাজী সিঙ্গাপুরে আসার পর থেকে ১৯৪৫ সালের ১৭ই আগস্ট ব্যাঙ্কক ত্যাগ করে যাওয়ার সময় পর্যন্ত কুন্দন সিং তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। কুন্দন সিং বেশ কিছু জিনিষ নেতাজীর জিনিষ বলে সনাক্ত করেছেন, যেমন হের হিটলারেব উপহার দেওয়া বহুমূল্য রত্নখচিত একখানি সোনার সিগারেট কেস, একটি সোনার সিগারেট লাইটার, আর একটি পেপার নাইফ এবং সুপারী রাখার জন্য একটি ডিম্বাকৃতি সোনার বাক্স। যে সব জিনিষপত্র নেতাজী নিজের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন সেগুলি সম্বন্ধে পরে বিচার করে দেখা হবে। এখানে যে প্রসঙ্গে বিচার করে দেখা হচ্ছে তাহ'ল যথেষ্ট গোপনতা রক্ষা করার জন্য আলোচ্য ঘটনা প্রকাশের বিলম্ব করার দরুণ এবং জাপানী কর্তৃপক্ষের দ্বারা নেতাজীর মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট প্রমাণ দাখিল না করার দরুণ নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে বহুলোক সত্যিই সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এমন বিলম্ব ও ক্রটি বিচ্যুতি দেখা দিত না এবং ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগস্ট, জাপ সরকারের আত্মসমর্পণের পর যে অব্যবস্থা দেখা দিয়েছিল তাও হ'ত না।

নেতাজী তদন্ত কমিটি তাইহোকুর রহস্য সম্বন্ধে সব কিছুই টের পেয়েছেন। আলোচ্য ঘটনার মূল রহস্য খুঁজে পাওয়ার জন্য তদন্ত কমিটির সদস্যগণ অনেক গভীরে তদন্ত চালিয়ে ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট প্রমাণও পেয়েছেন। তবুও নেহেরু সরকারের পরিকল্পনানুযায়ী

মৃত্যুদণ্ড রায় বহাল রাখতে তাঁরা কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তদন্ত কমিটির সদস্যদের তুলনায় দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের সংখ্যা অনেক বেশী। জাপ সরকার ঐসব ভারতীয়দের সামনে এমন কোন প্রমাণ পেশ করতে পারেন নি, যা থেকে সুনির্দিষ্টভাবে সিদ্ধান্ত হয় যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাইহোকুতে নিহত হয়েছেন। তদন্ত কমিটি এগার বছর পরে সাইগন, টোকিও প্রভৃতি দেশ ঘুরে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন সেই সব তথ্যগুলি নিশ্চয়ই এগার বছর আগেও সযত্নে রাখা ছিল, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার ঐ তথ্যগুলি আলোচ্য ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেই জাপ সরকার পেশ করেন নি। তাইহোকুতে নেতাজী নিহত হয়েছেন এবং কিভাবে নিহত হয়েছেন শুধু এই খবরটুকু দিয়েই জাপ সরকার নীরব ছিলেন। তদন্ত কমিটির কাছে যে সামান্য তথ্য প্রমাণ তাঁরা পেশ করেছেন তাও ঐ সময় কেন পেশ করা হ'ল না, তা রীতিমত সন্দেহের বিষয়। ধরে নেওয়া গেল যে জাপ সরকার আলোচ্য ঘটনা সম্বন্ধে গোপনতা রক্ষা করেছিলেন বলেই তখন কোন তথ্য প্রমাণ পেশ করেন নি। কিন্তু যেদিন ডোমি নিউজ এজেন্সি সংবাদটি প্রকাশ করে, তারপর থেকে গোপনতা রক্ষা করার কোন প্রয়োজন অবশ্যই হয় নি। কিন্তু তখনও জাপ সরকার তাইহোকুর ঘটনা সম্বন্ধে কোন প্রমান পেশ করেন নি। এর থেকে একটি মাত্র সিদ্ধান্ত হয় যে, জাপ সরকার তদন্ত কমিটির কাছে যে তথ্য পেশ করেছিলেন, তা আলোচ্য ঘটনা ঘটে যাওয়ার ঠিক পরে তাঁদের কাছে ছিল না। যদি কোন তথ্য তাঁদের দখলে থাকত তাহলে তাঁরা ঐ তথ্যগুলি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের সামনে তখনি পেশ করতেন। তদন্ত কমিটির কাছে যে ছবিগুলি পেশ করা হয়েছিল তা থেকে আলোচ্য ঘটনার মৃত ব্যক্তিকে যে সনাক্ত করা যায় না, তদন্ত কমিটি তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু ঐ ছবিগুলি দেখে জনমনে একটি প্রশ্ন স্বভাবতই জাগবে যে, যিনি মারা গেছেন বলে বিশ্ববাসীকে জানানো হ'ল, তাঁর একটা ফটো কেন রাখা হ'ল

না? তদন্ত কমিটি জনগণের প্রশ্নের উত্তর কর্নেল হবিব-উর রহমান ও ডাঃ ইয়োশিমির জবানীর মাধ্যমে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ঐ দু'জনের জবানী থেকে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মত কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কর্নেল রহমান এর বক্তব্য পড়ে পরিষ্কার বোঝা যায় যে নেতাজীর মরদেহের (?) মুখের ফটো তোলার জন্য জাপ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করেছিলেন কিন্তু কর্নেল রহমান স্বয়ং ঐ প্রচেষ্টায় বাদ সাধেন। নেতাজীর বিকৃত মুখের (?) ফটো তুলতে দিতে তিনি বাধা দেন। অথচ, ডাঃ ইয়োশিমির বক্তব্য থেকে জানা যায় যে ফটো তোলার কোন চেষ্টা আদৌ করা হয় নি কারণ মৃতদেহের ছবি তোলা জাপানী প্রথার বিরোধী। দু'জনেই প্রত্যক্ষদর্শী, অথচ এঁদের বক্তব্যের মধ্যে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না; একে অন্যের বক্তব্যের সরাসরি বিরোধিতা করেছেন যা প্রত্যেক পর্যায়েই পরিলক্ষিত হয়েছে। মরদেহের ফটো ছাড়া অন্য সব অবস্থার ফটো অনায়াসে তুলে রেখে আলোচ্য ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ধরে রাখা যেত। ডাঃ ইয়োসিমির বক্তব্য প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বহন করে যে সেখানে উপস্থিত জাপানীদের পক্ষে ফটো তুলে রাখার কোন অসুবিধা ছিল না, শুধু মৃত দেহের ছবি তোলা ওঁদের রীতি বিরুদ্ধ কাজ ছিল। আর, কর্নেল রহমান এর বক্তব্য প্রমাণ করে যে ফটো তোলার যথাযথ ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তিনিই বাদ সাধেন। তাহলে আলোচ্য ঘটনার অন্য সব পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ ক্যামেরায় কেন তুলে রাখা হয় নি? অপরপক্ষে, যে ছবিগুলি আলোচ্য দুর্ঘটনার প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হয়, সেগুলি থেকে কোন কিছুই বোঝা যায় না। এর থেকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে, যে ধরণের ফটো তুলে রাখলে আলোচ্য দুর্ঘটনা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া যেত, সেই ধরণের কোন ফটো তুলে রাখা হয়নি; ক্যামেরার সাহায্যে এমন কিছু ফটো তোলা হয়েছিল যার বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে বিশদভাবে বলতে পারেন একমাত্র তিনিই যিনি ঐ ছবিগুলি তুলেছিলেন। জাপানীদের সংস্কার

মতে মৃত দেহের ফটো তোলা নিষেধ। কিন্তু কি একটা ঢাকা দেওয়া ফটো, যার বিষয়বস্তু বোঝা দুষ্কর, তা যদি মরদেহের হয়ে থাকে, তাহ'লে সেটা নেতাজীর দেহ বলে মনে নিতে হবে কি? ঢাকা দেওয়া মরদেহের ফটো তোলাটা কি জাপানী সংস্কার? জাপ কর্তৃপক্ষের এই ধরণের বিচিত্র প্রয়াস থেকে সুনিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, আলোচ্য ঘটনা আধুনিক সিনেমার ন্যায় একটি নিছক সাজানো গোছানো মনোরম গল্প।

তাইহোকুর প্রান্তদেশে আলোচ্য ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর যেমন কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেশ করা যায় নি, ঠিক তেমনি ঘটনাস্থল থেকে যে নেতাজীর ব্যবহৃত কোন জিনিষ উদ্ধার করা হয়েছিল তাও জানা যায় না। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর কিছু মামুলী ধরণের তথ্য সযত্নে সংগৃহীত হয়েছিল এবং কিছু ক্ষতিগ্রস্ত জিনিষপত্রও খুঁজে (?) পাওয়া গিয়েছিল। দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনের জাতীয় সংগ্রহশালায় তাইহোকু বিমান বন্দর থেকে উদ্ধার প্রাপ্ত ছাপ দিয়ে যে সব জিনিষ রাখা আছে, তার কয়েকটি জিনিষ নেতাজীর অনুচর শ্রীকুন্দন সিং সনাক্ত করতে পেরেছেন বলে জানা যায়। ঐ জিনিষগুলি সবই নেতাজীর ব্যবহারের জিনিষ বলে শ্রীসিং সনাক্ত করেন নি। ঐ জিনিষগুলির মধ্যে ঘড়িগুলি নিয়ে যথেষ্ট সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে বোঝা যায়। একটি চতুর্ভূজ আকারের ঘড়িই সব সমস্যার সৃষ্টি করেছে। কর্নেল রহমান চতুর্ভূজ আকারের যে ঘড়িটি নেতাজীর ব্যবহৃত ঘড়ি বলে ভারতের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন ঐ ধরণের ঘড়ি নেতাজী কখনও ব্যবহার করেছেন বলে জানা যায় না। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের হাতে সব সময়ই একটি গোল ঘড়ি দেখা গেছে। ঐ ঘড়িটি তাঁর কাছে অমূল্য ছিল। শোনা যায়, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মা প্রভাবতী দেবী ঐ ঘড়িটি তাঁর সুভাষকে উপহার হিসাবে দিয়েছিলেন। চতুর্ভূজ আকারের ঘড়িটিই নেতাজীর হাতে ছিল, এবং তাইহোকুর প্রান্তরে আলোচ্য দুর্ঘটনার ফলে তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল,

এই অভিমত তখনই স্বীকৃত হতে পারে যখন প্রমাণিত হবে যে ঐ ক্ষতিগ্রস্ত ঘড়িটি তাইহোকু বিমান বন্দরের বিধ্বস্ত বিমানের ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে কর্নেল রহমান জানিয়েছেন যে ঘড়িটি ডাঃ ইয়োশিমি তাঁকে দিয়েছিলেন। ডাঃ ইয়োশিমি তা অস্বীকার করেছেন। সুতরাং ঘড়িটি আলোচ্য দুর্ঘটনার প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। ঘড়িটি যে কোথা থেকে সংগৃহীত হয়েছিল তা নির্ধারণ করা যায় না। কিন্তু আরও চমকপ্রদ কাহিনী রয়েছে যা তদন্ত কমিটির রিপোর্টে স্থান পায় নি। যে ঘড়িটি নেতাজীর ব্যবহৃত ঘড়ি বলে স্বর্গত শরৎচন্দ্র বসুর হাতে দেওয়া হয়েছিল, ঐ ঘড়িটি ১টা বেজে ১০ মিনিট নাগাদ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আলোচ্য দুর্ঘটনা যদি বেলা ২-৩৫ মিঃ এর পরে ঘটে থাকে তাহ'লে নেতাজীর হাতে থাকা ঘড়ি বেলা ১-১০ মিঃ নাগাদ বন্ধ হয়ে যেতে পারে না। এই প্রসঙ্গে আরও একটু তথ্য জানা যায় যা তদন্ত কমিটির রিপোর্টে স্থান পায় নি। তাহ'ল, এই ঘড়িটি স্বর্গতঃ ভুলা-ভাই দেশাই এর হাতে পড়লে তিনি ঘড়ি বিশেষজ্ঞের দ্বারা ঘড়িটি পরীক্ষা করিয়ে নেন। পরীক্ষা করে জানা যায় যে ঘড়িটির অয়েলিং ঠিক ছিল এবং ভিতরের কলকব্জারও কোন ক্ষতি হয় নি। বিমান দুর্ঘটনায় এমন হওয়া সম্ভব নয়। কারণ ঐ সময়ে ঘড়ি আজকের মত উন্নত ধরণের হয় নি।

আরও একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে বলা চলে, তাহ'ল নেতাজীর অনিশ্চিতের পথে যাত্রা করার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। যদিও কারও সঠিকভাবে জানা ছিল না যে তিনি কোথায় যাচ্ছিলেন, কিন্তু একথা ধ্রুব সত্য যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র খুব চিন্তা করেই তাঁর পরিকল্পনা করেছিলেন। শ্রীসুভাষচন্দ্র বোস যখন ভারত ত্যাগ করে গিয়েছিলেন তখন প্রচুর ধনরত্ন যে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেন নি তা সবারই জানা। অনিশ্চিতের পথে পা বাড়িয়ে অর্থের ভাবনা তিনি কমই ভাবতেন। শুভ কাজে অর্থের

অকুলান হয় না একথা কর্মযোগীরা বিশ্বাস করেন। তাই সাইগন থেকে যাওয়ার সময় নেতাজী আর যাই নিয়ে গিয়ে থাকুন পথে অর্থ সঙ্কটের আশঙ্কায় উপহারের জিনিষপত্রগুলি নিশ্চয় নিয়ে যান নি। আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক তাঁর সঙ্গে অবশ্যই আজাদ হিন্দ্ সরকার-এর দলিলপত্রগুলি নিয়ে গিয়েছিলেন। বিমান দুর্ঘটনার স্থল থেকে কোন কাগজ পত্রের টুক্‌রোও পাওয়া গেল না, কিন্তু পাওয়া গেল তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারের কতকগুলি জিনিষ, এমন ঘটনা, আলোচ্য বিমান দুর্ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করে না, বরঞ্চ সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে। যদি আজাদ হিন্দ সরকারের গোপন দলিলপত্রের অংশবিশেষ, তা যে কোন অবস্থায়ই হোক ঐ ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করে জনসমক্ষে পেশ করা হ'ত তাহলে ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের নিরসন হ'ত, কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিষপত্র পেশ করে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ রাখা হয়েছে যে আলোচ্য ঘটনা সত্য নয়। আলোচ্য ঘটনা সম্বন্ধে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করার জন্য ঐ কাজ করা হয়েছে।

নেতাজী তদন্ত কমিটি যখনই সুযোগ এসেছে তখনই জাপ সরকার এর প্রশাসনে আত্মসমর্পণ করার দরুণ অব্যবস্থার দোহাই দিয়েছেন। কিন্তু জাপানী সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারদের মুখ থেকে কখনও অব্যবস্থা বা বিশৃঙ্খলার কোন কথা শোনা যায় নি। বরং জাপ সেনাবাহিনীর পদস্থ অফিসারদের বক্তব্য থেকে এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগস্টের পরও জাপ সরকার এর প্রশাসন দপ্তর যথেষ্ট নিপুণতার সঙ্গে সব কাজ করে চলেছিলেন। শ্রীআয়ার এর কাছে কর্নেল টি. এর বক্তব্য প্রমাণ রেখেছে যে বিমানের গতিপথ নির্ধারণ করার দায়িত্ব যথাযথ কর্তৃপক্ষের হাতে এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশ না থাকার দরুন শ্রীআয়ারকে তাইহোকু নিয়ে যাওয়া যায় নি। ৩০শে আগস্টের পর থেকে ৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শ্রীআয়ারকে জানানো হয়েছিল যে তাইহোকুর সঙ্গে কোন যোগাযোগ করা যায় নি, সেখানকার কোন খবর নেই। কিন্তু ২৪।২৫শে সেপ্টেম্বর নাগাদ সেই

তাইহোকু বিমান বন্দরেই ডাঃ বা মকে নিয়ে জেনারেল টানাকা যাত্রাবিরতি করেছিলেন। তাছাড়া জাপ সরকারী উচ্চ মহলের গোপনতা রক্ষার নির্দেশও জাপ প্রশাসন ব্যবস্থার ইঙ্গিত বহন করে। জাপ সরকারের মধ্যে বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা, বা অব্যবস্থার কথা জাপান বলেন নি, এবং কেউ না বলা সত্বেও তদন্ত কমিটি ঐ দিকটির ওপরই অযথা স্বকল্পিত গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এই অধ্যায়ের অষ্টম অনুচ্ছেদে নেতাজী তদন্ত কমিটি লিখেছেন যে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঠিক পরেই ভারত সরকার কর্নেল ফিনে ও মিঃ ডেভিস্ এর নেতৃত্বে গোয়েন্দা (পুলিশ) অফিসারদের দু'টি দল, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস এর অবস্থান সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে ও সম্ভব হলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসতে দূর প্রাচ্যে পাঠিয়েছিলেন। দু'জন ভারতীয় পুলিশ অফিসার, শ্রী এইচ. কে. রায় ও শ্রী পি. কে. দে ঐ দু'টি দলে ছিলেন। তারা তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হয়ে সাক্ষ্য দেন। শ্রী এইচ. কে রায় মিঃ ডেভিস্ এর দলে কাজ করেছিলেন। তিনি ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথমে সাইগন ও পরে তাইহোকু পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি বলেন যে তাঁরা সাইগন বিমান বন্দরের ভারপ্রাপ্ত জ্যপানী মিলিটারী অফিসারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে আলোচ্য বিমানের যাত্রী তালিকা নিয়েছিলেন। ১৯৪৫ সালের ১৭ই আগস্ট সাইগন থেকে ঐ একটি বিমানই যাত্রা করেছিল। ঐ যাত্রী তালিকায় শেষ দুটি নাম ছিল চন্দ্র বোস ও এইচ. রহমান। তাইহোকুতে তাঁরা বিমান বন্দরের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন অফিসারকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন যে ১৮ই আগস্ট বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং তাতে আগুন ধরে গিয়েছিল। তারই ফলে নেতাজীর শরীর ভীষণভাবে পুড়ে গিয়েছিল। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সেখানে ঐ রাত্রেই তিনি মারা গিয়েছিলেন। তাঁরা আরও বলেছিলেন যে কর্নেল হবিব-উর রহমানও আহত হয়েছিলেন এবং ঐ দুর্ঘটনায় বহু

জাপানী অফিসার হতাহত হয়েছিলেন। মিঃ ডেভিস্‌ও হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। ঐ ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার নেতাজীর মৃত্যু সমর্থন করেছিলেন। পুলিশ অফিসার অভিমত দিয়েছিলেন যে নেতাজী বিমান দুর্ঘটনাতেই মারা গেছেন এবং এই মর্মে তাঁরা ভারত সরকারকেও রিপোর্ট দিয়েছিলেন। শ্রীএইচ্‌. কে. রায়, যিনি কর্নেল ফিনে কে রিপোর্ট লিখতে সাহায্য করেছিলেন, বলেছেন যে রিপোর্টে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে নেতাজী মৃত এবং তারপরই ভারত সরকার নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস এর বিরুদ্ধে জারি করা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তুলে নিয়েছিলেন। তদন্ত কারী ব্যাঙ্কক পার্টি একটি টেলিগ্রামের সংবাদ বাজেয়াপ্ত করেছিলেন যাতে খবর পাঠানো হয়েছিল যে নেতাজীকে নিয়ে যে বিমানটি যাচ্ছিল, ঐ বিমানটি ১৮ই আগস্ট তাইহোকুতে বিধ্বস্ত হয়েছে এবং নেতাজী ঐ দিনই মারা গেছেন। সাউদার্ন আর্মির চীফ অফ্‌ স্টাফ এর কাছ থেকে এ.সি. হিকারী কিকান এর কাছে পাঠানো ২০শে আগস্টের সিগ্‌ন্যাল ৬৬ নম্বরের আলোচ্য টেলিগ্রামটি নীচে উদ্ধৃত করা হল :

ও. সি. হিকারী কিকানকে

চীফ অফ্‌ স্টাফ, সাউদার্ন আর্মি, স্টাফ-এর কাছ থেকে

সিগ্‌ন্যাল ৬৬, ২০শে আগস্ট

রাজধানীতে যাওয়ার পথে "টি", ১৮ই আগস্ট বেলা ২ টা'র সময় তাইহোকুতে তাঁরই বিমান দুর্ঘটনার ফলে গুরুতর আহত হয়েছিলেন এবং ঐ দিনই মাঝরাতে মারা গিয়েছেন। ফরমোসা সেনাবাহিনী তাঁর মরদেহ বিমানে টোকিও পাঠিয়েছেন। (আগেই বলা হয়েছে যে মিঃ "টি", নেতাজীরই ছদ্ম নাম) মরদেহের ব্যাপারে অসংলগ্নতা দেখে, তার সঙ্গত কারণ জানতে চেয়ে প্রশ্ন করা হলে জানানো হয় যে নেতাজীর মরদেহ নয়, নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে বক্তব্য বিমানে টোকিও পাঠানো হয়েছিল। এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য কর্নেল

টাডাকে বিশেষ করে টোকিও থেকে সাইগন এ নিয়ে আসা হয়েছিল। প্রায় একই সময়ে, কাণ্ডির এ্যাড্‌মিরাল লর্ড মাউন্টব্যাটেন এর সদর দপ্তরের জন্য ভারতের মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স এর ডাইরেক্টর এর নির্দেশক্রমে টোকিওস্থ জেনারেল ম্যাক্‌ আর্থার এর সদর-দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত অফিসার কর্নেল এফ. ফিজেস্‌ এর মাধ্যমে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস সম্পর্কে আরও একটি তদন্ত চালানো হয়েছিল। এই তদন্ত চালিয়েছিলেন সুপ্রীম কম্যাণ্ডারে এলায়েড পাওয়ার্স এর জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এর অধীনে কর্মরত একজন মারকিন গোয়েন্দা অফিসার। এই তদন্ত রিপোর্টগুলি থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গিয়েছিল যে বিমান দুর্ঘটনার ফলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে নেতাজী তাইপেতে মারা গিয়েছেন।

নেতাজী তদন্ত কমিটির সদস্যগণ নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কিত গোপন গোয়েন্দা রিপোর্টগুলি পরীক্ষা করে তাঁদের মতামতের সমর্থনে আরও অনেক তথ্য পেয়েছেন বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। ১৯৪৫ সালে ভারত সরকার নেতাজী সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য যে গোয়েন্দা দলগুলি পাঠিয়েছিলেন, ঐদলের গোয়েন্দা অফিসারকে খুঁজে বার করে তাঁকে জেরা করা সত্যিই কষ্টসাধ্য কাজ। মিঃ ডেভিস্‌ এর নেতৃত্বে পাঠানো তদন্তকারী দলের সদস্য শ্রী এইচ. কে. রায় এর জবানী থেকে জানা যায় যে তাঁরা সাইগন বিমান বন্দরের ভারপ্রপ্ত জাপানী অফিসার এর কাছ থেকে একটি যাত্রী তালিকা সংগ্রহ করেছিলেন। শ্রী রায় এর জবানী থেকে আরও জানা যায় যে ভারত সরকারকে একটি রিপোর্টও পেশ করা হয়েছিল। মিঃ ডেভিস্‌ এর দেওয়া রিপোর্ট পরীক্ষা করা হয়ে থাকলে শ্রীরায়কে জেরা করার সঙ্গত কারণ বোঝা যায় না। ঐ রিপোর্টে যা লেখা হয়েছিল, শ্রীরায় নিশ্চয়ই তার সমর্থনেই কথা বলবেন। যদি ঐ রিপোর্টগুলি তদন্ত কমিটি পরীক্ষা করে না থাকেন তবে, শ্রীরায় এর বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ কোথায়? শ্রীরায় এর জবানীমতে, যে যাত্রী তালিকা সাইগন বিমান

বন্দর থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, তা অবশ্য গোপন রিপোর্টের এক্সিবিট্ (exhibit) হিসাবে পেশ করা হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু নেতাজী তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পড়েই জানা যায় যে আলোচ্য বিনানের যাত্রী তালিকা পাওয়া যায় নি। যে যাত্রী তালিকা গোয়েন্দা দল বাজেয়াপ্ত করেছিলেন বলে জানা যায় তা যদি গ্রহণ যোগ্য তালিকা হ'ত তাহ'লে, ঐ তালিকার মাধ্যমেই প্রমাণ হয়ে যেত যে ঐ বিমানে আরোহী কে কে ছিলেন। আগেই জানা গেছে যে জাপ সরকার ঐ সময় নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যুর এমন কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পেশ করতে পারেন নি যা থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় অবস্থানকারী ভারতীয়দের বিশ্বাস উৎপাদন হতে পারত। অথচ দেখা যায় তদন্তকারী দল এমন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে ফেলেছিলেন যা থেকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছিল যে নেতাজী মৃত। ঐ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে নেতাজীর বিরুদ্ধে জারি করা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা পর্যন্ত প্রত্যাহার হয়েছিল বলে জানা যায়। এমন হওয়া কি সম্ভব ছিল না যে নেতাজীকে মৃত বলে স্বীকার করে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করে তৎকালীন প্রশাসকগণ নেতাজীকে আটক করার জন্য এক নূতন ফাঁদ পেতেছিলেন? এই ধারণা, অযৌক্তিক নয়, কারণ রাজশক্তির গোয়েন্দাবাহিনী এই ঘটনার পরেই, বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া এক সংবাদের ওপর নির্ভর করে মহাত্মা গান্ধীর 'আরোগ্য নিকেতন' ঘিরে ফেলেছিলেন। সম্ভব অনেক কিছুই, কিন্তু আসলে কি ঘটেছিল এবং কোন্‌পথে কিভাবে কাজ করা হয়েছিল, তা কর্মকর্তারাই বলতে পারেন। ভারতের জনমনে একটি প্রশ্ন অবশ্যই জাগবে, তাহ'ল জাপ সরকার চেষ্টা করেও প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ পেশ করে ঐ সময়ে কারও বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারেন নি, অথচ গোয়েন্দা দল আলোচ্য ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পেরেছিলেন। যে টেলিগ্রাম বার্তাটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল বলে জানা যায়, ঐ টেলিগ্রাম যে ঘটনার সত্যতা প্রমাণ

করে না তা সত্য। টেলিগ্রামের জবানীমতে মিঃ টি. ওরফে নেতাজী সুভাষচন্দ্র রাজধানীতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সাক্ষীদের জবানী থেকে বোঝা যায় যে নেতাজী মাঞ্চুরিয়ায় যাচ্ছিলেন, তবে তাঁর টোকিও হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। নেতাজী স্বয়ং অনিশ্চিতের পথে যাত্রার কথা বলেছিলেন এবং জাপানে যাওয়ার ইচ্ছা তিনি কখনও ব্যক্ত করেছিলেন বলে নির্ভরযোগ্য কোন সূত্রে পাওয়া যায় না। যাহোক, টেলিগ্রামের সংবাদের ভিত্তিতে নেতাজীর রাজধানীতে, অর্থাৎ টোকিওতে যাওয়া, আর সাক্ষীদের জবানীমতে, টোকিও হয়ে মাঞ্চুরিয়া যাওয়া বক্তব্য দু'টির মধ্যে তফাৎ অনেক। তদন্তকারী দল সংবাদের এই দিকটা বোধহয় পর্যালোচনা করেন নি। দ্বিতীয়তঃ, ঐ টেলিগ্রামে বিমান দুর্ঘটনার সময় বেলা দু'টো বলে লেখা রয়েছে। সাক্ষীদের জবানীর ওপর নির্ভর করলে ঐ সময় নির্ধারণ ঠিক হয় নি, আর চতুর্ভুজ আকারের ঘড়িটির ওপর আস্থা রাখলে টেলিগ্রামের বক্তব্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়। তৃতীয়তঃ, টেলিগ্রামের সংবাদে বলা হয়েছে যে নেতাজী মাঝরাতে পরলোক গমন করেছিলেন। কিন্তু সাক্ষীদের জবানী এই সময়ের সমর্থনে কোন বক্তব্য রাখে নি। চতুর্থ ও শেষ বক্তব্য এই যে, টেলিগ্রামের লেখা নেতাজীর মরদেহ টোকিওতে পাঠানোর কথা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। নেতাজীর দেহ নয়, নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে রিপোর্ট টোকিওতে পাঠানো হয়েছিল বলে ভুল সংশোধন কে করেছিলেন তা বুঝতে অসুবিধা হয়। যখন টেলিগ্রামটি পাঠানো হয়েছিল, তার পরে ভ্রম সংশোধন করে আরও একটি বার্তা পাঠানো হয়েছিল বলে জানা যায় না। সুতরাং ঐ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়, এবং ঐ টেলিগ্রাম ঘটনার সমর্থনে বক্তব্য রাখে না। আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে কোন রিপোর্ট টোকিওতে পৌঁছেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। রিপোর্ট পাঠানোর ব্যাপারে যে মত পার্থক্য রয়েছে তা আগেই আলোচিত হয়েছে। সুতরাং টেলিগ্রামের সংবাদ নির্ভরযোগ্য নয়।

আমরা অবধারিত রূপে ধরে নিচ্ছি যে ভারত সরকারের গোয়েন্দা দলগুলির রিপোর্ট নেতাজী তদন্ত কমিটি নিশ্চয়ই পড়েছেন। ঐ রিপোর্টে কি মন্তব্য করা হয়েছে তাও নিশ্চয়ই সদস্যদের দৃষ্টি এড়ায় নি। শ্রী এইচ. কে. রায় ছিলেন মিঃ ডেভিস্ এর দলে। কিন্তু তিনিই কর্নেল ফিনেকে তদন্ত রিপোর্ট লিখতে সাহায্য করেছিলেন বলে জানা যায়। গোয়েন্দা বাহিনীর নেতা কর্নেল ফিনের অভিমত সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে। সরকারের কাছে তিনি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন যে মিঃ বোস সত্যই এবং স্থায়ীভাবে মৃত কিনা সেই সম্পর্কে আরও তদন্ত করা উচিত। এই অভিমত অবশ্যই প্রমাণ করে না যে কর্নেল ফিনে নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পেরেছিলেন কিন্তু গোপন রিপোর্টে আরও অনেক রয়েছে যা অবশ্যই তদন্ত কমিটির হাতে এসেছিল, কিন্তু আলোচ্য রিপোর্টে তার কোন উল্লেখ নেই। সরকারী গোপন দলিল দস্তাবেজের মধ্যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস এর বিষয়ে বেশ কিছু ফাইল রয়েছে। ঐ ফাইলগুলির একটিতে বিষয়বস্তু লেখা আছে সুভাষচন্দ্র বোস ও ফাইলের কভারের ওপর ফাইল নম্বর দেওয়া আছে ১০ মিসেলেনিয়াস ২৭৩ আই. এন্. এ.।

ফাইলের পাতা ওল্টালেই বোঝা যায়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস ও তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে কত পরীক্ষা নিরীক্ষাই না চলছে। সাইগনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জাপানী জেনারেল, জেনারেল ইসোদার উপস্থিতি সুনজরে দেখা হয়নি। গোপন তদন্ত করে ঝানু গোয়েন্দারা সন্দিগ্ধ হয়েছিলেন যে জাপ সরকার এর তরফ থেকে নেতাজী সুভাষ চন্দ্রকে নিরাপদস্থানে পৌঁছে দিতে সাহায্য করার জন্য একটি সাজানো গল্প প্রচার করার পরিকল্পনা সম্ভবত ছিল। গোয়েন্দা দপ্তর দুর্ঘটনার খবর মিথ্যা বলে ধরে নেওয়ার মত আরও একটি কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন, তাহ'ল সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের খবরে ঘোষণা করা হয়েছিল যে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র জাপানের এক হাসপাতালে

পরলোক গমন করেছেন। জাপান আর তাইহোকু (ফরমোসা) একই জায়গা নয়। যে টেলিগ্রামটি আলোচ্য রিপোর্টে উদ্ধৃত করা হয়েছে, ঐ টেলিগ্রামের কথা গোপন রিপোর্টের পাতায়ও রয়েছে। ঝানু গোয়েন্দারা ঐ টেলিগ্রাম পড়ে নিঃসন্দেহ হওয়া তো দূরের কথা আরও বেশী সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন বলেই গোপন রিপোর্টের বক্তব্য। স্যাইগন, তাইহোকু, টোকিও ইত্যাদি বহুদেশ ঘুরে বিভিন্ন গোয়েন্দা বাহিনীর প্রবীণ ও সন্ধানী গোয়েন্দারা কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন বলে সরকারী ফাইলে কোথাও লেখা নেই। নেতাজীর একান্ত অনুগত সহকর্মী ও সুযোগ্য অনুচর কর্নেল হবিব-উর রহমান যথেষ্ট দরদ দিয়ে তাইহোকুর মর্মান্তিক কাহিনীর বিবরণ বিভিন্ন গোয়েন্দা বাহিনীর সামনে পেশ করেছিলেন, কিন্তু কোন গোয়েন্দা দলই যে তাঁর বক্তব্যকে সত্য বলে স্বীকার করে নিতে পারেন নি তাঁর প্রমাণ সরকারী ফাইলে রয়েছে। কর্নেল রহমান এর জবানীর মধ্যে অসংলগ্নতা গোয়েন্দাদলের সন্দেহ দূর করতে পারে নি, প্রকান্তরে সন্দেহ বৃদ্ধি করেছে। তবে একথাও ঠিক যে বিভিন্ন তদন্তকারী দলের সামনে কোন ব্যক্তিই কোনভাবে ব্যক্ত করেন নি যে সমস্ত ঘটনাটিই সাজানো ব্যাপারে, কিন্তু প্রচারিত ঘটনা সত্য বলে দাবী করে বিভিন্ন ব্যক্তি ও দপ্তর থেকে যে সব বিবরণ ও তথ্য প্রমাণ পেশ করা হয়েছে তা থেকে ঘটনা সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসন করার মত কোন উপাদান খুঁজে পাওয়া যায় নি। নেতাজী তদন্ত কমিটি এই ধরণের তদন্ত রিপোর্ট বিচার বিবেচনা করে কিভাবে আলোচ্য ঘটনার সমর্থন পেলেন তা অবোধ্য। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে ১৯৫৬ সালের নেতাজী তদন্ত কমিটি নেতাজীর জীবনের শেষ দিনগুলির ইতিহাস লেখার জন্য তদন্ত চালিয়েছেন, আর ১৯৪৫ সালের তদন্তকারী দলগুলি নেতাজীকে খুঁজে বার করবার জন্য তদন্ত করেছিলেন। ১৯৫৬'র তদন্ত কমিটি বুঝতে পেরেছিলেন যে নেতাজী সুভাষ আর নেই, কিন্তু ১৯৪৫ এর গোয়েন্দা দলগুলির সন্ধানী দৃষ্টি

ও সন্দিগ্ধ মন, দূর-প্রাচ্য তন্নতন্ন করে খুঁজে ও নথিপত্র ঘেঁটে বিভ্রান্তিতে পড়েছিলেন কোন তথ্যপ্রমাণ থেকেই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন নি যে জাপ সরকারের প্রচারিত কাহিনী নির্ভেজাল সত্য।

নবম অনুচ্ছেদে লেখা হয়েছে যে, ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে, অর্থাৎ আলোচ্য দুর্ঘটনার একবছর পর, চিয়াং কাইসেক সরকার এর আমন্ত্রণে একজন ভারতীয় সাংবাদিক শ্রীহারিন শাহ্ ফরমোসায় গিয়েছিলেন। স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে তিনি সেখানে নেতাজী সম্পর্কে তদন্ত চালান। তাইহোকুতে নেতাজীর কি ঘটেছিল সেই সম্বন্ধে জানেন এমন বহু ফরমোসাবাসীর সঙ্গে শ্রীশাহর দেখা হয়েছিল। কয়েকজন মেডিক্যাল ছাত্রের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। যাঁরা তাঁকে বলেছিলেন যে তাঁরা শুনেছিলেন—বিমান দুর্ঘটনার ফলে নেতাজী গুরুতররূপে অগ্নিদগ্ধ হয়েছিলেন এবং একজন জাপানী মেডিক্যাল ছাত্র তাঁর দেহে রক্ত দেওয়ার জন্য রক্ত দান করেছিলেন। পরে তিনি সিস্টার শান পি. শা নাম্নী একজন ফরমোসার নার্সকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। সিস্টার শান পি. শা বলেছিলেন যে নানমন মিলিটারী হাসপাতালে তিনি নেতাজীর শুশ্রূষা করেছিলেন। নেতাজী ও কর্নেল হবিব-উর রহমান এর সঠিক বর্ণনা তিনি দিয়েছিলেন এবং পরিশেষে তিনি বলেছিলেন যে রাত ১১টার সময় নেতাজী হাসপাতালেই মারা যান। শ্রীহারিন শাহ্‌র সাক্ষ্য সেদিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আলোচ্য ঘটনার পরই ঘটনাস্থল থেকে সাক্ষ্য প্রমাণগুলি সংগ্রহ করা হয়েছিল। তাঁর অনুসন্ধানের ভিত্তিতে তিনি নিজে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে বিমান দুর্ঘটনার ফলে তাইহোকুতেই নেতাজী নিহত হয়েছিলেন।

শ্রীহারিন শা'র সন্তুষ্টি নেতাজী তদন্ত কমিটিকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে। সরকারী তদন্ত কমিটি ঐকান্তিক ইচ্ছা সত্বেও ফরমোসার সেই রহস্যময়ী নগরী তাইহোকুর রহস্যময় পরিবেশ স্বচক্ষে দেখতে পারেন নি, কিন্তু শ্রী শাহ্‌র পক্ষে তা দেখা সম্ভব হয়েছিল। নেতাজী

তদন্ত কমিটি ফরমোসায় যেতে পারেন নি, কারণ ঐ দেশের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই; এই আক্ষেপ রিপোর্টে অনেকবারই লেখা হয়েছে। তদন্ত কমিটির ফরমোসায় যাওয়ার ইচ্ছা কতটা ছিল সেই সম্বন্ধে অনুমান করা কষ্টকর কারণ ওটা মনস্তত্বের নিগূঢ় ব্যাপার, কিন্তু একথা ঠিক যে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু ৩রা ডিসেম্বর ১৯৫৬ সালে, লোকসভায় এক প্রশ্নোত্তরে বলেছিলেন যে তদন্ত কমিটির সদস্যদের ফরমোসায় যাওয়ার কথা বলা হবে না। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে ফরমোসায় যেতে অনেক অসুবিধা। প্রথমতঃ, ফরমোসা সরকার এর সহযোগীতা দরকার; দ্বিতীয়তঃ, সাক্ষীসাবুদ সবই জাপানে। তদন্ত কমিটির রিপোর্টে কূটনৈতিক সম্পর্কের যে জটিলতা তুলে ধরা হয়েছে তা সত্যিই কোন প্রতিবন্ধক কিনা তার প্রমাণ পাওয়া যেত, যদি ঐ সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানানো হ'ত। ফরমেসা সরকারের কাছে কোন প্রস্তাবই পাঠানো হয় নি এবং ফরমোসা যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য যে প্রস্তাব এসেছিল, তাও গ্রহণ করা হয় নি।

ভারতীয় সাংবাদিক শ্রীহারিন শাহ্ তদন্ত করে যে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন বলে জানা যায়, তা থেকে আলোচ্য ঘটনাসম্পর্কে রহস্যের জটিলতা কতটুকু কাটে তা বিচার্য বিষয়। বিমান দুর্ঘটনা সত্যিই ঘটেছিল কিনা এবং যদি ঘটে থেকে থাকে তাহলে কি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সেই বিষয়ে শ্রী শাহ্ কি সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন তা রিপোর্টে স্থান পায় নি। তবে হাসপাত্যলে নেতাজীর চিকিৎসা ও মৃত্যুর খবর পাওয়ার দরুণ, আগের পর্যায়গুলির কথা ছেড়েই দেওয়া গেল। হাসপাতালে যিনি নেতাজীকে চিকিৎসা করেছিলেন বলে দাবী করেছেন, তিনি বলেছেন যে একজন জাপানী সৈন্যর দেহ থেকে রক্ত নেওয়া হয়েছিল। জাপানী সৈন্য আর জাপানী মেডিক্যাল ছাত্র, দু'জনেই জাপানী হলেও একই ব্যক্তি কখনই নন। আর মেডিক্যাল ছাত্ররা শ্রী শাহ্কে যা বলেছিলেন তা সবই

শোনা কথা, নিজেরা কিছুই দেখেন নি। তবে, শ্রী শাহ্ দুর্ঘটনা সম্বন্ধে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি খবর সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা হ'ল তাইওয়ান এর (ফরমোসা) একটি সংবাদপত্রের সংবাদ। ঐ সংবাদে লেখা হয়েছিল যে নেতাজী ১৯শে আগস্ট মাঝ রাত্রে মারা গেছেন। অন্যান্য আরোহী সম্বন্ধে ঐ কাগেজে লেখা হয়েছিল যে লেঃ জেনারেল সুইচেঙ্গচি ঘটনা স্থলেই মারা যান এবং অন্য চারজন কর্নেল ও জেনারেল আহত হন। খবরের কাগজটি যেখানে বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল বলে জানা যায়, সেই রহস্যময়ী নগরী তাইহোকু থেকেই প্রকাশিত, কিন্তু এর সংবাদের সঙ্গে অন্য সংবাদের কোন মিল নেই। নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যুর সময় এখানে ২৪ ঘণ্টা পিছিয়ে গেছে এবং জেনারেল সিডির বদলে অন্য এক জেনারেল এর নাম এই সংবাদ থেকে পাওয়া যায়।

সিস্টার শান পি শা, শ্রী হারিন শাহ্‌র কাছে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে তা উদ্ধৃত করা হয় নি। সিস্টার শা ভারতীয় সাংবাদিক শ্রী শাহ্‌কে জানিয়েছিলেন, যে ১৮ই আগস্ট বেলা ১২টা নাগাদ নেতাজীকে তাইহোকুর মিলিটারী হাসপাতালে আনা হয়েছিল। ঐদিনই রাত ১১টায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নেতাজীর সঙ্গে তাঁরই একজন সহকারী ও আরও তিন জন জাপানী অফিসারকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। শেষোক্ত অফিসার তিনজন তিন দিন পরে মারা গিয়েছিলেন। নেতাজীর মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ কফিনে ভর্তি করে হাসপাতালের ওয়ার্ড থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ঐ মরদেহ হাসপাতালের সীমানায় মৃতদেহ রাখার জন্য একটি বাড়ী আছে, তাতেই তিন দিনের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছিল। নেতাজীর সমস্ত দেহে আগুন লেগেছিল। তাঁর দেহের পোড়া জায়গাতে অলিভ তেল লাগানো হয়েছিল। তাঁর জ্ঞান ছিল না। নেতাজীকে যে ঘরে রাখা হয়েছিল সেই ঘরে আরও দু'টি বেড ছিল। একটিতে ছিলেন নেতাজীর

সহকারী এবং অপরটি নার্স এর জন্য নির্দিষ্ট। নেতাজীর শরীরে কোন ইঞ্জেকশন্ দেওয়া হয় নি। সিস্টার শান পি শা আরও বলেছিলেন যে তিনি নেতাজীর বেডের পাশেই ছিলেন এবং তাঁরই মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাঁর শুশ্রূষা করেছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে নেতাজী একবার যন্ত্রণায় কাত্‌রে উঠেছিলেন এবং সম্ভবত বলেছিলেন 'শান্তিতে মরতে চাই।' সিস্টার শান পি শা এর এই ধরণের জবানবন্দী নেতাজী তদন্ত সম্পর্কে আরও জটিলতার সৃষ্টি করে, অথবা আলোচ্য ঘটনার সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ দেয় তা পাঠকবর্গই বিচার করে দেখবেন। শ্রী হারিন শা'র তদন্ত রিপোর্ট যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই রিপোর্টে নেতাজীর মৃত্যুর ঘটনার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা থেকে আলোচ্য ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে আরও সন্দেহজনক জটিলতা সৃষ্টি করে।

এই অধ্যায়ের দশম অনুচ্ছেদে নেতাজী তদন্ত কমিটি লিখেছেন যে, দেখা যায় যে কমিটির কাছে সাক্ষীরা নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য প্রমাণ দাখিল করেছেন তা, দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে বৃটিশ ও মারকিন গোয়েন্দা সংস্থা যে রিপোর্ট দিয়েছেন এবং এক বছর পরে বেসরকারীভাবে তদন্ত করে একজন ভারতীয় সাংবাদিক যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তার দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। যে সব সাক্ষী কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁদের পূর্ববর্তিতা থেকে অথবা তাঁদের বিবৃতি দেওয়ার ধরণ দেখে তাঁদের বলা কাহিনী অবিশ্বাস করার মত কোন কারণ নেই। সাক্ষীরা সবাই ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক। কয়েকজন হলেন জাপানী, কর্নেল হবিব-উর রহমান হলেন একজন ভারতীয় (বর্তমানে পাকিস্তানি), এবং কর্নেল ফিজেস হলেন একজন ইংরাজ। তাঁদের একের সঙ্গে অন্যের কোন যোগাযোগ ছিল না এবং সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তর থেকেই তাঁরা এসেছেন। এমন কোন কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না যে তাঁরা জেনে শুনে কোন মিথ্যা কাহিনী বলতে এগিয়ে আসবেন। জাপানের সবপ্রান্ত থেকেই জাপানী সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিতে

এসেছিলেন। কয়েকজন যথেষ্ট ব্যক্তিগত ক্ষতি ও অসুবিধা সত্বেও এসেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জাপানের ক্যাশি দ্বীপে ডাঃ ইয়োশিমির একটি ডাক্তারখানা আছে। বেশ কয়েকদিনের জন্য ঐ ডাক্তারখানা বন্ধ করে রেখে, প্রায় ১২০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে তিনি টোকিওতে এসেছিলেন। জাপ সরকার এর পররাষ্ট্র দপ্তর কিছুদিন আগে এই বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করেছিলেন এবং কয়েকজন সাক্ষীর নাম তদন্ত কমিটির কাছে প্রস্তাব করেছিলেন যাঁরা আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে খবর দিতে পারেন। কিন্তু জাপান স্বৈরতন্ত্র রাষ্ট্র নয় এবং এই অনুমানও ঠিক নয় যে জাপানের পররাষ্ট্র দপ্তর যে কয়েকটি নাম প্রস্তাব করেছিলেন তাঁদের সকলকে কোন বিশেষ কাহিনী বলতে বাধ্য করা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আরও বলা যেতে পারে যে কমিটি জাপানের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রস্তাবিত নামের চেয়ে অনেক বেশী ব্যক্তিকে সাক্ষী রূপে জেরা করেছেন। এই সাক্ষীদের হয় কমিটি ডেকে পাঠিয়েছেন নয়ত' সংবাদপত্রে দেওয়া কমিটির বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দিয়ে তাঁরা এসেছেন। অধিকাংশ জাপানী সাক্ষীরাই বর্তমানে আর কোনভাবেই জাপ সরকার এর সঙ্গে যুক্ত নন এবং কোন তৈরী করা নথিপত্রের ভিত্তিতে সাক্ষ্য দিতে তাঁরা কোন কারণেই বাধ্য নন। আসলে কিন্তু দেখা যায় যে বিভিন্ন সাক্ষীরা ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী বলেছেন এবং সেইজন্যই অন্তরাল থেকে কোন ইঙ্গিত দেওয়ার সম্ভাবনা অগ্রাহ্য হয়। সুতরাং অসংলগ্নতা ও বৈষম্য ব্যতিরেকে যা এত বছর পরে থাকা খুবই স্বাভাবিক, সাক্ষীদের জবানী অবশ্যই নির্ভরযোগ্য বলে ধরে নিতে হবে। এই বক্তব্যগুলি আলোচ্য দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেই সামরিক ও বেসরকারী পর্যায়ে যে সব তদন্ত হয়েছে, তার রায় থেকে সমর্থিত হয়। তাঁরা সবাই একই বক্তব্য রাখেন যে ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট রাত্রে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস তাইহোকু মিলিটারী হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। তদন্ত কমিটি এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। অবশ্য এক দিক থেকে,

এই অকস্মাৎ এবং নাটকীয় মৃত্যু জাতীয় নেতা ও দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্র বোস এর দুর্বারগতি চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায়। জেনারেল সিডির সার্ভিস রেকর্ডে, তাঁর মৃত্যুর কারণ "যুদ্ধে মৃত" বলে দেখানো আছে। একথা নেতাজীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, শুধু তাঁর যুদ্ধটা ছিল একটু ভিন্ন ধরণের, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ। তাঁর যুদ্ধ চলছিল। তিনি শুধু এক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছিলেন, দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়া থেকে মাঞ্চুরিয়ায়।

নেতাজী তদন্ত কমিটির রায় পড়তে পড়তে মনে হয়, আলোচ্য ঘটনা সত্য হলে ভালই হ'ত। তাহ'লে এত কষ্ট করে, এত চিন্তা করে, এত ভাষার মাধুর্য দিয়ে রিপোর্ট লেখার প্রয়োজন হ'ত না। এর চেয়েও ভাল হ'ত জাপ সরকার যদি নেতাজীর প্রাণহীন দেহটাকে (?) ভারতেয় মাটিতে ফেরৎ পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু জাপ সরকার এর চেয়ে আরও বেশী সাহায্য করতে পারেন ঐ ভয়ঙ্কর সহনশীলা তাইহোকু। আলোচ্য ঘটনার পরই সে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, এবং আজও সে এমন এক ভাবগম্ভীর ভাব বজায় রেখে শ্মশানের নীরবতা রক্ষা করে চলেছে যে তাঁর ছোঁয়া থেকে সবাই দূরে থাকতে পারলেই স্বস্তি পায়। তাইহোকুতে ১৯৪৫ সালের ২৩শে আগস্টের পর যে নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল আজও তার অবসান হয় নি, কোন্ অদূর ভবিষ্যতে যে হবে, তা কে বলতে পারে? তাইহোকুর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে মিত্রশক্তির বহু গোয়েন্দাদল বিভিন্ন সময়ে নূতন উদ্যম নিয়ে ছুটে গেছেন দূর প্রাচ্যে; কিন্তু কোন সূত্র থেকেই নির্ভরযোগ্য কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণই সংগ্রহ করা যায় নি, যা থেকে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে তাইহোকুর প্রান্তদেশে যা ঘটেছিল বলে বলা হয়েছে ও হচ্ছে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বৃটিশ ও মারকিন সরকার আজও নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যুর কাহিনী বিশ্বাস করেন না। ভারত সরকারের গোপন দলিল দস্তাবেজের কোথাও তাইহোকুতে নেতাজীর মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট প্রমাণের কথা লেখা নেই। স্বতন্ত্রভাবে

সবার বক্তব্যই তাইহোকুর দুর্ঘটনার কথা সত্যি বলে দাবী করেন, কিন্তু ভিন্ন সিদ্ধান্ত ও সাক্ষ্য প্রমাণ পাশাপাশি রেখে বিচার করতে গেলে কোন সিদ্ধান্তেই পৌঁছানো সম্ভব হয় না। কিন্তু তদন্ত কমিটি বিচার করে দেখেছেন যে বিভিন্ন তদন্তের রায়, তদন্ত কমিটির কাছে দেওয়া সাক্ষীদের বক্তব্যকে সমর্থন করে। এই সিদ্ধান্ত কতটা যুক্তি-যুক্ত হয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্বর্গত জওহরলাল নেহরুর কর্ণে বহুবার ধ্বনিত হয়েছিল যে নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যুর কাহিনী নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু কোন সময়ই তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি কোন গোপন তদন্তের রায় দাখিল করতে পারেন নি। ভাবলেও অবাক লাগে যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী যা পারেন নি নেতাজী তদন্ত কমিটি সেই কাজে সফল হয়েছেন।

নেতাজী তদন্ত কমিটি বিভিন্ন সাক্ষীদের পারস্পর্য ও তাঁদের সাক্ষ্য দেওয়ার ধরণ থেকে তাঁদের বলা কাহিনী অবিশ্বাস করার কোন কারণ খুঁজে পান নি। তাহ'লে ধরে নিতে হয়, যে সাক্ষীদের পূর্ববর্তিতা সম্বন্ধে যথাযথ তদন্ত নিশ্চয় করা হয়েছিল। কিন্তু সত্যই এই ধরনের কোন গোপন বা প্রকাশ্য অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল বলে জানা যায় নি। কোন সত্যবাদী যুধিষ্ঠির কোন মিথ্যা মামলার সাক্ষীরূপে মহামান্য ধর্মাবতারের সামনে দাঁড়ালেই মামলার সত্যতা প্রমাণ হয়ে যায় না, অপরপক্ষে, কোন মিথ্যাবাদী কোন সত্য মামলার সাক্ষী হলেই ঐ মামলা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যায় না; সবই নির্ভর করে ঘটনার পারিপার্শ্বিক ও প্রমাণের ওপর। মদ্যপ, লম্পটের ঔরসজাত পুত্র, পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করবেই একথা হলফ করে কখনই বলা যায় না। সুতরাং ব্যক্তির পূর্ববর্তিতা বিচার করে তাঁর বিবৃত ঘটনার সত্যতা যাচাই করা যায় না; প্রয়োজন পারিপার্শ্বিক প্রমাণ। বিবৃতি দেওয়ার ধরণ থেকেই যদি ঘটনার সত্যতা প্রমাণ হ'ত, তবে বিচারালয়ে বহু মামলার রায় মুহূর্তের মধ্যেই দেওয়া যেত। সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়ার জন্য মহামান্য বিচারক দিনের পর দিন ধৈর্য

থরে অপেক্ষা করতেন না। সুতরাং পূর্ববর্তিতা ও সাক্ষ্য দেওয়ার ধরণ থেকে কিছু যে বুঝে ফেলা যায় না, তা সত্য। আলোচ্য ঘটনার সাক্ষীরা ভিন্ন দেশীয় ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক বলেই তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ নেই এই মতবাদের ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। আলোচ্য ঘটনার সঙ্গে সাক্ষীরা সবাই যুক্ত, এবং তাই তাঁরা একে অন্যের আপনজন। নেতাজীকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে পরিকল্পিত পথে কাজ করে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ঘটনাটি যখন সাজানো হয়েছে তখন, ঘটনার সাক্ষী হিসেবে যাঁরা এগিয়ে এসেছেন তাঁরাও তো সবই সাজানো। মিথ্যা ঘটনা জেনেও তাঁরা সবাই এগিয়ে এসেছেন একটি মাত্র তাগিদে, তাহ'ল, তাঁদের প্রিয় নেতাজী সুভাষ চন্দ্রকে তাঁর পরিকল্পিত পথে কাজ কয়ার সুযোগ করে দিতে। তদন্ত কমিটি জাপানে যেসব সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কিছু সাক্ষীর নাম প্রস্তাব করেছিলেন জাপ সরকার এর পররাষ্ট্র দপ্তর। এই নামগুলি প্রস্তাব করার আগে পররাষ্ট্র দপ্তর এই বিষয়ে তদন্ত চালিয়েছিলেন বলে জানা যায়। এই খবরটি লেখার পরই তদন্ত কমিটি বহু যুক্তি তর্কের অবতারণা করেছেন। অধিকাংশ সাক্ষীই জাপ সরকার এর সঙ্গে আর যুক্ত নয়, তাঁদের যা শেখানো হবে তাই তাঁরা বলতে কোনভাবেই বাধ্য নন। জাপ পররাষ্ট্র দপ্তর সাক্ষীদের যে তালিকা দিয়েছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যক সাক্ষী ডাকা হয়েছিল। বিভিন্ন সাক্ষী ভিন্ন ভিন্ন জবানী দিয়েছেন ইত্যাদি বলে তদন্ত কমিটি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে সাক্ষীরা যা বলেছেন তা পর্দার অন্তরাল থেকে তাঁদের বলে দেওয়া হয় নি। তদন্ত কমিটি যে সব যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন, তার যৌক্তিকতা তাঁরা বিচার করে দেখেছেন বলে মনে হয় না। আলোচ্য ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে। নেতাজী তদন্ত কমিটি তদন্ত করতে গিয়েছিলেন দশ বছর নয় মাস পরে। ইতিমধ্যে বহুবার আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে বহু তদন্ত হয়ে গেছে বলে সবারই জানা

আছে। জাপ সরকার এর পররাষ্ট্র দপ্তরেরই মাথা ব্যথা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস এর ব্যাপার নিয়ে—কারণ তিনি জাপানের এক মিত্র রাষ্ট্রের অস্থায়ী সরকারের প্রধান ও জাপ জাতির অন্তরের সিংহাসনে অতিথি-দেবতা। বিভিন্ন গোয়েন্দা দলের বহু জিজ্ঞাসাবাদের উত্তর ও প্রয়োজনীয় তথ্য যতটুকু ঐ দপ্তরের জানা, তা জোগাতে হয়েছে। স্বভাবতই অনেক ঝড় বয়ে গেছে এই দপ্তরটির ওপর দিয়ে এবং যিনি খুবই সহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন তিনি হলেন জাপ পররাষ্ট্র মন্ত্রী। একটি অদ্ভুত যোগাযোগও লক্ষ্য করা গেছে। ঐ পদে যিনি আজাদ হিন্দ-এর সংগ্রামের সময় বহাল ছিলেন, নেতাজীর তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার সময় পর্যন্তও ছিলেন, নেতাজী তদন্ত কমিটি যখন জাপানে যান তখনও তাঁকে ঐ পদেই দেখা যায়। এই ব্যক্তিটি হলেন মিঃ শিগিমিৎসু। আলোচ্য দুর্ঘটনার বিষয়ে সুদীর্ঘ প্রায় এগার বছরের মধ্যে জাপ সরকার এর তরফ থেকে কোনও তদন্ত করা হয়েছিল বলে জানা যায় না, কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে সরকারী তদন্ত কমিটি টোকিও পৌঁছানোর আগে হঠাৎ জাপ সরকারী মহল থেকে আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করাটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। আরও বেশী অবাক হতে হয় যখন, জাপানের পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে সাক্ষীদের নামের তালিকা তৈরী করে সরকারী তদন্ত কমিটির সামনে পেশ করেন। আলোচ্য ঘটনা যদি ঘটেই থাকে, তাহলে জাপ সরকার ঘটনার কারণ সম্পর্কে কোন রকম তদন্ত না করে থাকলেও, যাঁরা ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাঁদের খবর নিশ্চয়ই জানতেন। সরকারী নেতাজী তদন্ত কমিটির সামনে তাঁদের পুরাতন তালিকা পেশ করেই তো বলে দিতে পারতেন যে, ঘটনার সাথে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের নাম ঐ রেকর্ডে লেখা রয়েছে, কিন্তু তা না করে তাঁরা সাক্ষীদের একটি নূতন তালিকা পেশ করলেন এবং ঐ তালিকা তৈরী হল সরকারী তথ্যানুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে। জাপ সরকারএর এই ধরণের সাক্ষী নির্বাচন করার তদন্ত, আলোচ্য ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে রহস্যজনক সন্দেহের

সৃষ্টি করে। জাপ সরকার যে সাক্ষী তালিকা নেতাজী তদন্ত কমিটির সামনে পেশ করেছিলেন, সেই তালিকাটি রিপোর্টে স্থান পায় নি। ঐ তালিকা রিপোর্টে তুলে ধরা হলে দেখা যেত, যে যেসব সাক্ষীরা নিজেদের প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবী করে তদন্ত কমিটির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের নামই ঐ রিপোর্টে স্থান পেয়েছে। ঘটনার যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী তাঁদের অধিকাংশই এক সময় জাপ সরকার এর পদস্থ অফিসার ছিলেন। জাপান যে ধরণের রাষ্ট্র হোক, রাষ্ট্রের নাগরিক যদি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়, তাঁদের রাষ্ট্রের সম্মানের কথা তাঁকে সব সময়ই ভাবতে হয়। তাছাড়া সরকারী চাকুরে যতদিন বেঁচে থাকেন ততদিনই যে সরকার এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বজায় থাকে এবং সরকারী নির্দেশ তাঁকে একটু মানতেই হয়, তদন্ত কমিটির সদস্যদের অন্তত তা অজানা নয়। তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য কারণ হ'ল নেতাজীর প্রতি তাঁদের অনুরাগ। সব মিলিয়ে জাপ সরকার এর প্রস্তাবিত সাক্ষীদের পক্ষে কোন সাজানো ঘটনা কারও নির্দেশ মতো পেশ করা সম্ভব নয়, একথা বলা যায় না। বরং জাপানের হঠাৎ অনুসন্ধানে প্রয়োজন ও সাক্ষী তালিকা তৈরী করা, আলোচ্য ঘটনার প্রতিকূলে বক্তব্য রাখা।

নেতাজী তদন্ত কমিটি নির্বাচিত জাপানী সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন এবং পরিষ্কার বুঝেছেন ও দেখেছেন যে তাঁরা আলোচ্য ঘটনা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য দিয়েছেন। সাক্ষীরা যদি ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য রাখেন, তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে যদি মিল খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে আলোচ্য ঘটনার সত্যতা কিভাবে প্রমাণ হয়? এই অনুচ্ছেদে তদন্ত কমিটি স্বীকার করেছেন যে সাক্ষীদের জবানীর মধ্যে মিল নেই অথচ ঘটনার বিভিন্ন পর্যায়ের বিবরণ দাখিল করতে গিয়ে তাঁরা সাক্ষীদের বক্তব্যের মধ্যে মিল খুঁজে পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। এই থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে জাপ সরকার-এর তদন্ত ও সাক্ষী নির্বাচনের ঘটনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তদন্ত কমিটি প্রকাশ

করে ফেলেছেন যে সাক্ষীরা ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য রেখেছেন। এই মন্তব্য স্বভাবতই আলোচ্য ঘটনার সত্যতা প্রকাশ করে না, কারণ সাক্ষীরা ঘটনার বিবরণ সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে একমত হতে পারেন নি। এই যুক্তি খণ্ডন করতে, তদন্ত কমিটি সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের অজুহাত তুলেছেন। সাক্ষীদের জবানীর মধ্যে অসংলগ্নতা, বৈষম্য, মত-বিরোধ, ইত্যাদি গোলযোগের কারণ নাকি সুদীর্ঘ এগার বছর সময়ের ব্যবধান। সময়ের ব্যবধানে ঘটনার সময়ের সামান্য ব্যবধান হতে পারে, কিন্তু ঘটনার বিবরণে কোন ভুল হওয়া কখনই সম্ভব নয়।

নেতাজী তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান সাহেব যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন ভুলতে পারবেন না লালকেল্লার বিচারের দিনগুলির কথা। আলোচ্য ঘটনার সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, যাঁদের পুন-র্জন্ম হয়েছিল, আলোচ্য দুর্ঘটনার সাক্ষ্য দিতে তাঁদের পক্ষে ঐ ঘটনার পূর্ণ বিবরণ ভুলে যাওয়া কখনই সম্ভব নয়। ঘড়ির কাঁটার বিবরণে কিছু হের ফের হতে পারে, কিন্তু ঘটনার বিবরণে কোন গড়মিল থাকার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ সবাই একই ঘটনা, একই সময়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন। সুতরাং ঘটনার বিবরণে সময়ের ব্যবধান কোন প্রতিবন্ধকই নয়। নেতাজী তদন্ত কমিটি সাক্ষীদের অবিশ্বাস করার মত কোন কারণ খুঁজে পান নি, তাছাড়া মন্তব্য করেছেন সাক্ষীদের মিথ্যা বলার কোন কারণ নেই। এই অভিমত অবশ্যই গ্রহণ যোগ্য কারণ সাক্ষীরা অবিশ্বাস করার মত কোন কাজই করেন নি এবং ভুলেও মিথ্যার ধার ঘেঁসেন নি। সাক্ষীরা তাঁদের জবানীর মধ্যে অসংলগ্নতা ও মত পার্থক্য সৃষ্টি করে কোন স্তরেই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সুনির্দ্দিষ্ট প্রমাণ রাখেন নি। তাঁরা প্রত্যেক পর্যায়ে একে অন্যের বিরোধিতা করেছেন, অথচ বলেছেন যে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র আর নেই। একথার তাৎপর্য আর কিছুই নয়, প্রকারন্তরে সবাই জানিয়েছেন যে নেতাজীর অস্থায়ী মৃত্যু ঘটেছে। তদন্ত কমিটি যে সাক্ষীদের মূল কথা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন তা সাক্ষীদের সম্বন্ধে

তাঁদের মন্তব্য পড়েই বোঝা যায়। আলোচ্য ঘটনার প্রমাণ যদি সাক্ষীদের জবানীর মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে পাওয়া যেত এবং নথিপত্র ও ফটোর সাহায্যে যদি সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ পেশ করা হ'ত তাহলে সাক্ষীদের পূর্ববর্তিতা, জবানী দেওয়ার কারণ জাতিগত বৈষম্য, সরকারের প্রতি অনুরাগ ইত্যাদি প্রশ্নের অবতারণা করতেন না। এইরূপ সাফাই গাওয়া অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর তা কমিটির সভ্যদ্বয়ের নির্জ্ঞান মনে উদয় হয়েছে। তাই বার বার ঐ প্রসঙ্গ তুলেছেন।

নেতাজী তদন্ত কমিটি বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুকে বীরোচিত মৃত্যু বলে বাহবা দিয়েছেন। বিমান দুর্ঘটনায় এমন আকস্মিক মৃত্যু নাকি তাঁরই মত বীরের পক্ষে শোভা পায়। এই অভিমতটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে কিনা তা বিচার্য বিষয় নয়, তবে নেতাজী সুভাষ যে স্বয়ং আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে মরলে কেমন হয় সেই ইচ্ছা অন্ততঃপক্ষে দু'বার বলেছেন, তা সত্য। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সংগ্রাম শুরু করার আগে তাঁর আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে মরার ইচ্ছা প্রমাণ করে যে প্রয়োজনের ঐ ধরণের মৃত্যু কাহিনী রটিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা তাঁর বহুদিন আগেই করা ছিল। তাইহোকুর নাট্যমঞ্চে যে নাটক অভিনীত হয়েছিল, তারই শেষ পর্বে ঘোষণা করা হয়েছিল যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। তদন্ত কমিটির কাছে শুধু ঐ বক্তব্যটুকু খুবই যথাযথ হয়েছে কিন্তু গোলমাল দেখা দিয়েছে জেনারেল সিডির সার্ভিস্ রেকর্ড নিয়ে। তদন্ত কমিটি খুবই কষ্টকল্পনায় ভাবাবেগের সঙ্গে জেনারেল সিডি ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুর কারণের মধ্যে সমন্বয় এনে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু যা সত্য নয়, যেখানে ঘটনার মধ্যে অন্তর্নিহিত অসংলগ্নতা সেখানে সঙ্গতি-এনে দেওয়ার চেষ্টা কতটা সফল হয়েছে তা বিচার্য বিষয়। একথা সত্য যে নেতাজী, ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সমাপ্তি ঘোষণা না করে শুধু সংগ্রামের ধারা একটু বদল করে নিয়েছিলেন। যেহেতু আজাদ

হিন্দ্ সরকার এর ঘোষিত যুদ্ধ কোন ঘোষণার দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া হয় নি এবং ঐ সরকারএর প্রধান, নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্বয়ং যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য সাইগন ত্যাগ করে অন্য কোন উপযুক্ত নিরাপদ স্থানে চলে যাচ্ছিলেন, সেইহেতু যদি কেউ মন্তব্য করেন যে নেতাজীর যাত্রা পথের পর্যায়টুকুও ভারতের মুক্তি সংগ্রামের অংশ বিশেষ, তা'হলে ঐ অভিমত অবশ্যই অযৌক্তিক বলা যাবে না। সুতরাং যদি ডোমি নিউজ এজেন্সি প্রকাশিত তাইহোকুর ঘটনা সত্য (?) বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহ'লে নেতাজীর ঐ মৃত্যুর কারণ সংগ্রাম বা যুদ্ধ বলা যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটেছে বলে প্রকাশ করা হয়েছে তাই মৃত্যুর কারণ "বিমান দুর্ঘটনা" বলতে হবে। জেনারেল সিডির মৃত্যুও তাইহোকুর ঐ রহস্যময় বিমান দুর্ঘটনার কারণেই ঘটেছে। কোন যুদ্ধক্ষেত্রে বা যুদ্ধরত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু না হওয়ার দরুণ, ঐ মৃত্যুর কারণও "বিমান দুর্ঘটনা"ই হবে। কিন্তু জাপ সরকারী রেকর্ড গোলযোগের সূত্রপাত করে দিয়েছেন। তাঁদের রেকর্ড প্রমাণ করে 'যে জেনারেল সিডি যুদ্ধে মারা গেছেন, তবে মৃত্যুর তারিখ ১৮ই আগস্ট, অর্থাৎ জাপান আত্ম-সমর্পণ ও যুদ্ধ বিরতি করার তিনদিন পরে যখন যুদ্ধের কোন প্রশ্নই আর ওঠে না। তদন্ত কমিটি জাপ সরকারী দলিলের লিখন ও তাইহোকু ঘোষিত কাহিনীর মধ্যে সমন্বয় এনে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছে। জাপ সরকার জেনারেল সিডির সার্ভিস রেকর্ড পেশ করে প্রমাণ করেছেন যে তাঁদের জেনারেল বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন নি। এবং ঐ জেনারেল নেতাজীর সঙ্গে একই বিমানে বসে প্রমাণ করেছেন যে আলোচ্য ঘটনার কাহিনী সত্য নয়, ঐ ঘটনার মধ্যে রহস্য রয়েছে। নেতাজী তদন্ত কমিটি সবই উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু তবু লিখে গেছেন এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ের শেষ কয়েক পৃষ্ঠা —যা তাঁদের লিখতে পূর্বেই বলা হয়েছিল। তাই নানা স্থান থেকে এলোমেলো সূত্র জুড়ে দিয়ে নক্সিকাঁথা বুনেছেন।

এই অধ্যায়ের একাদশ অনুচ্ছেদে তদন্ত কমিটি লিখেছেন যে, বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী নিহত হয়েছেন এই বক্তব্যের সমর্থনে এত অগণিত প্রমাণ থাকা সত্বেও একদল লোক আছেন যাঁরা বিশ্বাস করেন যে তিনি আজকে বেঁচে আছেন। এই দল আবার দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম দলে, মুখ্যতঃ বসু পরিবারের কয়েকজন আছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে নেতাজী যদিও জীবিত কিন্তু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগে নেই কারুর। তিনি কোথাও আত্মগোপন করে আছেন এবং এই আত্মগোপন করে থাকার কারণ তিনিই বলতে পারেন। উপযুক্ত সময়ে তিনি ভারতে আত্মপ্রকাশ করবেন। এই মতবাদের মুখপাত্র হলেন শ্রীঅরবিন্দ বসু। তাঁর মতে, নেতাজী একজন পরিকল্পনা বিশারদ এবং তিনি তাঁকে শেষবারের মত মুক্ত করে নিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার পরিকল্পনা এমন সুষ্ঠুভাবে করেছিলেন যে কেউই তার কোন সূত্র খুঁজে বার করতে পারেন নি। জাপ সরকার তাঁকে চলে যেতে সাহায্য করেছিলেন এবং সেইজন্যই তাঁরা এক সাজানো কাহিনী প্রচার করেছেন, যা জাপানী সাক্ষীদের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। কর্নেল হবিব-উর রহমান সম্বন্ধে বলা যায় যে তিনি "মন্ত্রগুপ্তির" শপথে আবদ্ধ এবং তাঁর ক্ষতগুলি সবই নকল। এগুলি সবই উদার মনের ধারণার প্রতীক। আগেই বলা হয়েছে যে প্রচুর সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে যে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং নেতাজী পরলোক গমন করেন। জাপানী ও অন্য জাতির অগণিত সাক্ষীদের অবিশ্বাস করার মত কোন কারণ নেই। ডাক্তারী সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে কর্নেল রহমান এর ক্ষতগুলি আসল। যদি তিনি (কর্নেল রহমান) 'মন্ত্রগুপ্তি'র শপথে আবদ্ধ হয়ে থেকে থাকেন, তাহলে অন্যান্য সাক্ষীরা, বিশেষ করে জাপানী সাক্ষীরা অবশ্যই কোন শপথে আবদ্ধ ছিলেন না। তবুও তাঁরা একে অন্যের জবানীর সমর্থন করেছেন। সুতরাং এই মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের যুক্তিকে সমর্থন করা যায় না।

শেষ পর্যন্ত নেতাজী তদন্ত কমিটির কাছে নেতাজীর বেঁচে থাকার প্রশ্নটি স্থান পেয়েছে। তবে, তদন্ত কমিটি নেতাজীর বেঁচে থাকার প্রশ্নে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের দু'টি দলে ভাগ করে কেমন যেন একটা ভাব প্রকাশ করে ফেলেছেন। যাঁরা তদন্ত কমিটির সামনে বলেছেন যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র মৃত (?), তাঁরা কিন্তু প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য রেখেছেন। তাঁদের বিভিন্ন জবানীর ভিত্তিতে আলাদা দলে ভাগ না করে, যাঁরা নেতাজী জীবিত আছেন বলে দাবী করেছেন তাঁদের কেন আলাদা করা হ'ল, তা ভাবলে অনেক কু-অনুমানই মাথায় আসে। যাহোক, বসু পরিবারের কয়েকজন বিশ্বাস করেন যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র জীবিত। শ্রীঅরবিন্দ বসুকে তদন্ত কমিটি সাক্ষী হিসাবে জেরা করেছেন। শ্রীবসু কমিটির কাছে যে সব বক্তব্য প্রকাশ করেছেন তার বিশদ বিবরণ রিপোর্টে তুলে ধরা হয় নি। জাপ সরকার নেতাজীকে সাহায্য করার জন্য একটি সাজানো কাহিনী প্রচার করেছিলেন বলে মন্তব্য করার সময় শ্রীবসু তাঁর মন্তব্যের সমর্থনে কিছু বলেছিলেন। তদন্ত কমিটি সেই বক্তব্য রিপোর্টে উদ্ধৃত করেননি কিন্তু ঐ বক্তব্য যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। শ্রীবসু বলেছিলেন যে ১৯৪১ সালের ১৬ই জানুয়ারী নেতাজীকে কলকাতা ত্যাগ করে যেতে তিনি সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু ২৬শে জানুয়ারী পর্যন্ত ঐ খবর গোপন রাখা হয়েছিল। যখন খবর পৌঁছায় যে নেতাজী ভারতের সীমানা পার হয়ে আফগানিস্তানে গিয়ে পৌঁছেছেন তখন খবরটি প্রকাশ করা হয়। শ্রীঅরবিন্দ বসুর এই বক্তব্য শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর দ্বারা সমর্থিত হয়। এই দু'জনের বক্তব্যের মধ্যে কোন অসংলগ্নতা বা বৈষম্য যে পাওয়া যায় নি তা অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না কারণ ওঁরা দু'জনেই সত্য ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তদন্ত কমিটি এঁদের ধারণাকে উদার মনের অলীক ধারণার প্রতীক বলে বাতিল করে দিয়েছেন। কিন্তু এঁদের বক্তব্যের মধ্যে যে যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওঁরা বলেছেন যে

নেতাজীর নির্দেশ মতই সব কাজ করা হয়েছিল। একাধিক ব্যক্তি একই ধারণা পোষণ করলে ও একই বিবরণ দাখিল করলে তার গুরুত্ব স্বভাবতই বেড়ে যায়। তাই কমিটির রিপোর্টে শ্রীঅরবিন্দ বসুর কথা বলে শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর নাম সাক্ষী তালিকায় তুলে ধরা হয়েছে। জাপ সরকার নেতাজীকে যে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং ঐ সাহায্যের উদ্দেশ্য নেতাজীকে অন্য কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়া, তা জোর করে অস্বীকার করা যায় না। তদন্ত কমিটি যে সব সাক্ষ্য প্রমাণ পেয়েছেন তা থেকে আলোচ্য ঘটনার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ কতটুকু পাওয়া যায় তা রিপোর্ট পড়েই অনুমান করা যায়। এমন কোন একটি পর্যায়ও খুঁজে পাওয়া যায় না যেখানে সাক্ষীদের জবানীর মধ্যে অসঙ্গতি, মত বিরোধ ও স্ববিরোধিতা নেই। তদন্ত কমিটি সব অসঙ্গতির মাঝে জোড়া-তালি দিয়ে সঙ্গতি এনে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তথাপি একথা সত্য যে সাক্ষ্য প্রমাণ আলোচ্য ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করে না।

কর্নেল হবিব-উর রহমান যে নেতাজীর খুবই আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিলেন তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সাইগন থেকে নেতাজীর সঙ্গে সহযাত্রী হয়ে যাওয়ার জন্য কর্নেল রহমান-এর নাম নেতাজী স্বয়ং প্রস্তাব করেন। পদস্থ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গকে দায়িত্বপূর্ণ কাজ করার জন্য 'মন্ত্রগুপ্তি'র শপথ নিতে হয়। নেতাজীর একান্ত আস্থাভাজন ব্যক্তি 'মন্ত্রগুপ্তি'র শপথ নিয়ে নেতাজীর নির্দেশ মতই সব কাজ করেছেন, এই মতবাদ পোষণ করলে উদার মনোভাবের পরিচয় দেওয়া হয় না—যুক্তিপূর্ণ চিন্তাধারারই স্বাক্ষর রাখা হয়। তদন্ত কমিটি ডাক্তারী রিপোর্টের ভিত্তিতে পরীক্ষা করে কর্নেল রহমান এর দেহে আসল ক্ষতচিহ্ন দেখেছেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু হাসপাতালের চিকিৎসা পর্যায়ে দেখা গেছে যে ডাঃ ইয়োশিমির ডাক্তারী রিপোর্টের সঙ্গে কর্নেল রহমান এর দেহের ক্ষতচিহ্নের গড়মিল রয়েছে। কর্নেল রহমান আদর্শ সৈনিকের মত তাঁর 'কম্যাণ্ডার'

এর নির্দেশ মাফিক কাজ করেছেন বললে কখনই ভুল বলা হয় না। আর জাপ সরকার যখন নেতাজীকে সাহায্য করতে আগ্রহী ছিলেন তখন নেতাজীর নির্দেশমত ঐ কাল্পনিক কাহিনী প্রচার করে দিতে তাঁদের আপত্তি থাকার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কর্নেল রহমান পালন করেছেন তাঁর নেতার নির্দেশ আর জাপানী সাক্ষীরা মেনেছেন তাঁদের সরকার এর নির্দেশ। একথা ধ্রুব সত্য যে সৈনিক মাত্রেই সৈনিক জীবনের শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। দেশের স্বার্থে, স্বদেশের সরকার এর সম্মানার্থে এবং এশিয়ার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক স্বার্থের প্রয়োজনে, জাপ সাক্ষীরা যে সবাই মুখস্থ করা জবানী দেবেন না তা কে অস্বীকার করতে পারে? এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হ'ত না, যদি জাপ সরকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেশ করতেন এবং সরকারী তদন্ত কমিটি জাপান পরিদর্শন করার আগেই আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে গোপন তথ্যানুসন্ধান চালাতেন। তদন্ত কমিটি নেতাজী জীবিত বলে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের মতবাদ উদার চিন্তাধারার ফলশ্রুতি ও পূর্বধারণার বশবর্তী (preconcieved) বলে বাতিল করে দিয়েছেন, কিন্তু তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পড়ে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ভিত্তিহীন অনুমানের ওপর নির্ভর করে তাঁরা বহু ক্ষেত্রে স্ব-বিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

দ্বাদশ অনুচ্ছেদে নেতাজী তদন্ত কমিটি লিখেছেন যে অন্য একদল দাবী করেন যে নেতাজী শুধু জীবিতই নন। তাঁকে অনেকেই প্রত্যক্ষ দেখেছেন এবং তিনি বহু জায়গায়, বিশেষ করে চীনএ এবং ভারত-চীন সীমান্তে দেখা দিয়েছেন। মাদ্রাজ বিধান সভার সদস্য শ্রীমথুরালিঙ্গম্ থেবর বিভিন্ন সময়ে প্রেস বিবৃতি দিয়ে বলেছেন যে তিনি নেতাজীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। তদন্ত কমিটি প্রথম তাঁকেই সাক্ষী হিসাবে ডাকেন যদিও কমিটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি তাঁর গোপন তথ্য প্রকাশ করতে রাজী হন নি। তিনি অজুহাত দেখান যে তাঁকে প্রথম জানাতে হবে

যে নেতাজীর নাম যুদ্ধাপরাধীদের তালিকায় নেই। যখন ভারত সরকার এর কাছ থেকে অনুসন্ধান করে জানানো হয় যে সরকার এর কাছে তেমন কোন তালিকা নেই তখনও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। একাধিকবার শ্রী থেবর বলেন যে তিনি এক রাজনৈতিক দলভুক্ত (ফরোয়ার্ড ব্লক), তাই সব কিছু তিনি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করবেন। তাঁর প্রেস বিবৃতিগুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি তাৎপর্যপূর্ণ এক উক্তি করেন। "এটা হ'ল সরকারী কমিটি, ওটা সর্বসাধারণের বিষয়।" যে ব্যক্তি তাঁর দেওয়া প্রেস ও জনসমাবেশে দেওয়া বিবৃতির সমর্থনে সরকারী কমিটির কাছে কিছু বলতে রাজী নন, তাঁর বক্তব্যকে গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে আশা করতে পারেন না। শ্রী এস. এম্. গোস্বামী "নেতাজী মিস্ট্রি রিভিল্ড" নামের এক চাঞ্চল্যকর পুস্তিকা পেশ করেছেন। তিনি কলকাতায় কমিটির কাছে সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং দাবী করেছেন যে নেতাজী জীবিত। তাঁর এই মতবাদের শুরু ১৯৪৯ সালে, যখন তিনি জার্মানীতে গিয়েছিলেন। সেখানে হের হাইন্‌স ভন হ্যাভ নামে জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। হের হাইন্‌স ভন হ্যাভ শ্রী গোস্বামীকে বলেছিলেন যে নেতাজী জীবিতই আছেন। ঐ ভদ্রলোক দাবী করেছিলেন নেতাজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। শ্রীগোস্বামীকে হের হ্যাভ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেন যে, বিমান দুর্ঘটনার সময় হের হ্যাভ টোকিওতে ছিলেন। তিনি (শ্রী গোস্বামী) নিশ্চিত করে বলতে পারেন নি যে হের হ্যাভ জার্মান বন্ধুদের কাছ থেকেই দুর্ঘটনার কথা শুনেছিলেন, না নিজেই দুর্ঘটনার সম্বন্ধে তদন্ত করতে ফরমোসা গিয়েছিলেন। ভন হ্যাভ এর জার্মান বন্ধুরা ভন হ্যাভকে বলেছিলেন যে কোন বিমান দুর্ঘটনা ঘটে নি। ভন হ্যাভ এর ঐ জার্মান বন্ধুদের সম্বন্ধে কোন খবরই দেওয়া হয়নি। শ্রীগোস্বামী নিজে কিন্তু ফরমোসায় যান নি।*

* নেতাজী তদন্ত কমিটিও ফরমোসায় যান নি।

এই ধরণের খবরকে শুধু জনশ্রুতি বলেই ব্যক্ত করা যায়। নেতাজী কোথায় কোথায় ছিলেন এবং আছেন সেই সম্বন্ধে শ্রীগোস্বামী অনেক প্রকার মতই প্রকাশ করেছেন, যেমন,—সোভিয়েট রাশিয়া, চীন ও মঙ্গোলিয়া। শ্রীগোস্বামী তাঁর মতবাদের সমর্থনে বলেন নেতাজী পর্যায়ক্রমে, প্রথমে ছিলেন রুশ বন্দী, পরে একজন চীনা কমিউনিষ্ট জেনারেল, এবং তারপর একজন মঙ্গোলীয় বাণিজ্য প্রতিনিধি। একটি ফটোর ওপরই তাঁর পূর্ণ আস্থা দেখা যায়। "নেতাজী মিষ্টী রিভিল্ড" পুস্তিকার অষ্টম পৃষ্ঠার উল্টোদিকে চীনা মিলিটারী অফিসারদের একটি ফটো রয়েছে। ঐ ফটোর বাঁ দিক থেকে ষষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস এর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে বলে তিনি মনে করেন। এই ধরণের ফটো থেকে সনাক্তকরণ করা খুবই কষ্টকর বিশেষ করে যখন ব্যক্তিরা বিদেশী পোষাকে থাকেন। যে ছবিটির ওপর শ্রীগোস্বামীর অটুট বিশ্বাস, সেই ছবিটি হল ১৯৫২ সালে পিকিং পরিভ্রমণরত মঙ্গোলীয় বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের। পিকিং ওয়ার্কার্স প্রেস প্রকাশিত একটি বইয়ে ছবিটি ছাপা হয়েছিল এবং ১৯৫৫ সালে ঐ বইটি শ্রীগোস্বামীর হাতে আসে। ঐ বইয়ের চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ছবিটি তিনি বর্ধিত আকারে ছাপিয়ে নেন এবং কমিটির কাছে তা পেশ করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে ছবিতে বাঁ দিক থেকে তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস এর যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। হঠাৎ তুলে ফেলা কোন ফটো থেকে কোন ব্যক্তিকে সনাক্ত করতে যে অসুবিধা আছে তা আগেই বলা হয়েছে। বাচালতার প্রতি কোন ইঙ্গিত না করে, এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি মাঝেমাঝেই প্রযোজিত হয়ে থাকে। যাঁরা ঐ চরিত্রগুলিতে অভিনয় করতে চান, প্রযোজকরা তাঁদের ইণ্টারভিউ করার জন্য ডেকে পাঠান এবং যাঁরা আসেন তাঁদের অনেকের মধ্যেই যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু যে অভিনেতা রূপালী পর্দায় বিবেকানন্দরূপে দেখা দেন তিনি সত্য

সত্যই সম্পূর্ণ এক অন্য ব্যক্তি, আসল ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর কোন মিল নেই। এই হাস্যকর হঠাৎ চমক লাগা উপমাটা দেওয়া কি সুপ্রোজয্য হল কমিটির পক্ষে ?

যাহোক, মঙ্গোলীয় প্রতিনিধি দলের ঐ ছবি পিকিংএর ভারতীয় দূতাবাসে সনাক্তকরণের জন্য পাঠানো হয়েছিল। প্রজাতন্ত্র চীনের বৈদেশিক দপ্তর অনুসন্ধান করে জানান যে ছবিটি পিকিং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মেডিক্যাল কলেজের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, মিঃ লী. কি. হং. নামক জনৈক চীনা ভদ্রলোকের। এই সংবাদ দিয়ে পাঠানো টেলিগ্রামের একটি অনুলিপি আনেক্সার-১ এ দেওয়া আছে। খুবই উৎসাহিত হয়ে শ্রীগোস্বামী দ্বিতীয়বারের জন্য কমিটির সামনে হাজিরা দেন। তাঁকে মঙ্গোলীয় প্রতিনিধি দলের বিষয়ে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। প্রশ্নোত্তরগুলি নীচে উদ্ধৃত করা হ'ল :—

'প্রশ্ন : কিভাবে আপনি এই মঙ্গোলীয় প্রতিনিধির কার্যকলাপ জানতে পারেন ?

উত্তর : প্রেস মারফৎ দেওয়া লেঃ এন্. বি. দাসএর বিবৃতি থেকে।

প্রশ্ন : কিভাবে লেঃ দাস মঙ্গোলীয় প্রতিনিধি দলের অবস্থিতির কথা জানতে পারেন ?

উত্তর : এর উত্তর তিনিই দিতে পারেন।"

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে জনৈক ব্যক্তি নিজেকে লেঃ এন্. বি. দাস বলে দাবী করে কমিটির সামনে হাজির হন এবং তাঁর বক্তব্য রাখেন। শ্রী দেবনাথ দাস, যিনি অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকার-এর একজন উপদেষ্টা ছিলেন, তিনিই এই ব্যক্তিটির প্রসঙ্গে কমিটির চেয়ারম্যানএর কাছে একটি চিঠি লেখেন। ঐ চিঠিতে তিনি জানান, "সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে যে লেঃ এন্. বি. দাস নামে এক ব্যক্তি কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিয়েছেন। যখন মিত্রশক্তি ব্রহ্মদেশ দখল করে নেয় তখন ব্রহ্মদেশের জাওয়াবুডিতে দাস একজন হাবিলদার হিসাবে কর্নেল পি. এন্. দত্তর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি সিকিউরিটি

অফিসার ছিলেন না। যদিও সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু তিনি ব্যাঙ্কে কর্মরত ছিলেন না।"

এমন উৎস থেকে পাওয়া খবরের গুরুত্ব বেশী হতে পারে না এবং এই ধরণের জনশ্রুতির ওপর ভিত্তি করে গঠন করা শ্রীগোস্বামীর মতামতের ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা যেতে পারে না।

তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পড়ে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে শ্রীথেবরকে নিয়ে একটু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। কমিটি সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আলোচ্য ঘটনার সত্যতা নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু শ্রী থেবর প্রশ্ন করে বসেছেন সরকারী তদন্ত কমিটিকে, তাঁর প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত তিনি কিছু বলতে রাজি নন। তদন্ত কমিটি যে শ্রীথেবর এর কাছ থেকে কিছু শোনার জন্য বহু চেষ্টা করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং যে খবরগুলি শ্রীথেবর এর কাছে ছিল তা যে গোপন খবর সে বিষয়েও কোন দ্বিমত নেই কারণ তদন্ত কমিটিই লিখেছেন যে শ্রীথেবর তাঁর গোপন খবর প্রকাশ করতে চান নি। নেতাজী তদন্ত কমিটি ভারত সরকার এর সঙ্গে যোগাযোগ করে শ্রীথেবরকে তাঁর সংশয়ের যে উত্তর দেন তাতে শ্রীথেবর সন্তুষ্ট হন নি অর্থাৎ সন্তুষ্ট হওয়ার মত উত্তর তদন্ত কমিটির কাছ থেকে আসে নি। সাক্ষীদের তালিকা থেকে জানা যায় যে ১৯৫৬ সালের ৪ঠা এপ্রিল নেতাজী তদন্ত কমিটি শ্রীথেবরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। ঐদিনই শ্রীথেবরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে তদন্ত কমিটি ভারত সরকার এর কোন্ সূত্র থেকে যুদ্ধাপরাধীদের তালিকা সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করলেন তা রিপোর্ট পড়ে জানা যায় না। নেতাজী সুভাষচন্দ্র যে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, তা বৃটিশরাজের ও আমেরিকার বিরুদ্ধে, নেহেরুর ভারতসরকারের বিরুদ্ধে নয়। সুতরাং যুদ্ধাপরাধীদের তালিকা কোথায় থাকা সম্ভব তা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়। ভারতসরকারএর কাছে যুদ্ধাপরাধীদের কোন তালিকা নেই এই উক্তি করে সরকারী মুখপাত্র কেবলমাত্র সত্যের-অপলাপই করেন নি,

শ্রীথেবর এর প্রশ্নের যথাযথ উত্তরও যে দেওয়া হয় নি তা সত্য, কারণ মিত্র-শক্তির যুদ্ধাপরাধীদের তালিকায় নেতাজীর নাম আছে কিনা তা সরকারী মুখপাত্র জানান নি। নেতাজী তদন্ত কমিটি বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু শ্রীথেবর এর প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য বৃটিশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করার কোন চেষ্টাই যে তাঁরা করেন নি, তাতে কোন সন্দেহের লেশ নেই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে, তাহ'লো তদন্ত কমিটি কি মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন যে শ্রীথেবর কিছু বলুন? আমরা জানি যে, থেবর প্রেস বিবৃতি ও জনসমাবেশের মাধ্যমে দাবী করেছিলেন যে নেতাজীর সঙ্গে বেশ কয়েকবারই তাঁর দেখা হয়েছে এবং নেতাজীর অগ্রজ স্বর্গত শরৎচন্দ্র বসুর নির্দেশক্রমে তিনি ভারত সীমান্তে গিয়ে নেতাজীর সঙ্গে দেখাও করেছেন। তিনি তাঁর বক্তব্য মিথ্যা প্রমাণ করার চ্যালেঞ্জও ভারত সরকারকে জানিয়েছিলেন। শ্রীথেবরএর চ্যালেঞ্জের ভিত্তি জানার জন্য তাঁকে যদি তাঁর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া হত, তাহলে ভারতবাসী অবশ্যই নিরুদ্বেগ হতে পারতেন। শ্রীথেবর এর চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী পর্যায়ে নীরবতা স্বভাবতই জনমনে গভীর সন্দেহ সৃষ্টি করেছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতেরই নেতা। ভারত সরকার এর তরফ থেকে অবশ্যই জেনে রাখা প্রয়োজন যে তাঁর নাম যুদ্ধাপরাধীদের তালিকায় আছে কি নেই। এই প্রশ্নের জবাব যথাযথভাবে পাওয়া গেলে শ্রীথেবর এর বিবৃতির সমর্থনেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যেত। নেতাজী তদন্ত কমিটি এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আদায় না করে নেতাজীর প্রতি সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর এক তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত রেখেছেন। সরকারী তদন্ত কমিটির কাছ থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্পষ্ট ঘোষণা না পেয়ে শ্রীথেবর তাঁর মূল বক্তব্য প্রকাশ করেন নি, কিন্তু জনতার কাছে তিনি তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন। কারণ মাটির মানুষের কাছে রাজনীতির ছলা কলা নেই, ভাষার মার-

প্যাচ নেই, আছে শুধু নেতাজীকে ফিরে পাওয়ার ঐকান্তিক বাসনা। নেতাজী তদন্ত কমিটি শ্রীথেবরকে কোন গুরুত্ব দেন নি, কিন্তু নেতাজী সম্বন্ধে তদন্ত করতে গিয়ে তাঁরা নেতাজীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ সম্বন্ধে যথাযথ তথ্যানুসন্ধান করেন নি। এই ক্রটি থাকা উচিৎ ছিল না।

শ্রীথেবরএর পর তদন্ত কমিটি উল্লেখ করেছেন শ্রীএস. এম. গোস্বামীর নাম। রিপোর্ট পড়ে জানা যায় যে হের হ্যাভ নামে একজন জার্মান ভদ্রলোক বিমান দুর্ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করতে ফরমোসায় গিয়েছিলেন কিনা, সেই সম্বন্ধে শ্রীগোস্বামী নাকি নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারেন নি। কিন্তু শ্রীগোস্বামীর "নেতাজী মিস্ট্রী রিভিল্ড" বইয়ের বার পাতায় লেখা আছে ফরমোসায় বিমান দুর্ঘটনা ও নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যুর খবর যখন হের হ্যাভএর কাছে পৌঁছায় তখন তিনি টোকিওতে। সংবাদটি পেয়ে তিনি মর্মাহত হন। কিন্তু প্রচারিত মৃত্যু সংবাদ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন বক্তব্য না পেয়ে তিনি ঘটনা সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হন। ঘটনার সত্যতা জানার জন্য তিনি খুবই তৎপর হয়ে ওঠেন। তিনি ফরমোসাতেও অনুসন্ধান করেন। কিন্তু বিমান দুর্ঘটনার সময় বিমান বন্দরে উপস্থিত থেকে নেতাজীর মরদেহ দেখেছিলেন বলে কেউ তাঁকে বলতে পারেন নি। এমন কি একথাও কেউ তাঁকে বলতে পারেন নি যে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী আহত হয়েছিলেন বলে দেখেছিলেন। ফরমোসা থেকে কোন খবর সংগ্রহ করতে না পেরে হের হ্যাভ্ টোকিওতে খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন কিন্তু সেখানেও কোনভাবেই তাঁর সন্দেহের নিরসণ হয় না। তিনি নেতাজীর চিতাভস্ম বলে কোন ভস্মাবশেষই দেখেন নি। টোকিওতে নেতাজীর মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে কোন অনুষ্ঠানও হয় নি। ঐ ধরণের কোন রকম অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। ইতিমধ্যে জাপ সরকারএর পররাষ্ট্র দপ্তর তাঁর ঐ অনুসন্ধিৎসার খবর জানতে পারেন। ঐ দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র তাঁকে বলেন যে, তিনি

যদি নেতাজীর সত্যিকারের বন্ধু হন তাহলে যেন ঐ ধরণের প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকেন। হের হ্যাভ মন্তব্য করেন যে, নেতাজীর তথা-কথিত মৃত্যু হ'ল রাজনৈতিক রহস্য, এবং দূর প্রাচ্যের দেশগুলি থেকে তিনি যে সব সংবাদ সংগ্রহ করেছেন তা থেকে তিনি বিশ্বাস করেন যে নেতাজী জীবিত। নেতাজী তদন্ত কমিটি শ্রীগোস্বামীর লেখা বইটি নিশ্চয় পড়েছেন। হের হ্যাভ তো নিজেই অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন বলে লেখা রয়েছে, তাহ'লে কমিটির মন্তব্য ভিন্ন ধরণের হল কেন? শ্রীগোস্বামী স্বয়ং ফরমোসায় যান নি সত্য, কিন্তু তাঁর লেখা বইয়ে যে সব তথ্য রয়েছে তা থেকে কোনভাবেই প্রমাণ হয় না যে নেতাজীর মৃত্যু কাহিনী সত্য। তদন্ত কমিটি আলোচ্য বইটির তথ্যগুলি নিয়ে কোন বিচার বিশ্লেষণ করেন নি। তবে শ্রীগোস্বামীর পেশ করা দু'টি ছবি নিয়ে তদন্ত কমিটি বেশ কিছু বক্র মন্তব্য করেছেন। মঙ্গোলীয় বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের মধ্যে যে ব্যক্তিটির সঙ্গে নেতাজীর মুখের সাদৃশ্য ছিল সেই ব্যক্তিটির পরিচয় ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে পাওয়া গেছে। কিন্তু ব্যক্তিটির পরিচয় পেয়ে ঘটনা সম্পর্কে সন্দেহের নিরসণ হয় না। পিকিংএ প্রকাশিত বইয়ে মঙ্গোলীয় বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের ছবি ছাপা হয়েছিল, ঐ দলে জনৈক চীনা ভদ্রলোকের উপস্থিতি কিভাবে ঘটল তা পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল না। নেতাজী তদন্ত কমিটি তদন্তের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের মত বেশ কিছু ক্ষেত্রেই নিয়েছেন। কিন্তু এই ছবিগুলির ক্ষেত্রে ফটো বিশেষজ্ঞদের মতামত কেন নেওয়া হল না তা জানা যায় না। এই মঙ্গোলীয় বাণিজ্য দূতের ছবির ব্যাপারে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে লোকসভায় প্রশ্ন করা হয়েছিল। তখন পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন যে খবরের কাগজে প্রকাশিত ছবিটি তিনি দেখেছেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি আবছা সাদৃশ্যের ওপর খুব গুরুত্ব দিতে চান না। লক্ষণীয়, নেহরুজী ব্যক্তিগত মতামতের কথায় বলে ক্ষান্ত হয়েছেন। প্রশ্ন, বিশেষজ্ঞের

মতামত কেন নেওয়া হল না? কিন্তু তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পড়েও বোঝা যায় যে তাঁরা ছবিটির মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখেছিলেন তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে চান নি। মাঙ্গোলীয় বাণিজ্য প্রতিনিধি দল ও চীনা জেনারেলদের ছবিগুলির মধ্যে যদি নেতাজী সুভাষ-চন্দ্রের ছবি থেকে থাকে তাহ'লে তা প্রজাতন্ত্র চীন সরকারএর অজ্ঞাত নয় এবং তাদের কাছ থেকে কোন পরিচিতি আদায় করে ফটো বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে মন্তব্য করাটাই যুক্তিযুক্ত কাজ হ'ত। নেতাজী তদন্ত কমিটি লেঃ এন্. বি. দাস নামে জনৈক ব্যক্তির সাক্ষ্য বাতিল করে দিয়েছেন, কারণ ঐ ব্যক্তি নাকি তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে সত্য কথা বলেন নি। কিন্তু আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন বলে জানা যায় তাঁরা সকলেই যে তাঁদের পদমর্যদা সম্পর্কে ঠিক কথা বলেন নি তাও সত্য। কিন্তু লেঃ দাস কি বক্তব্য রেখেছিলেন, তা রিপোর্টে স্থান পায় নি। তবে নেতাজী জীবিত আছেন এই মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের জবানী দিয়ে আলোচিত অনুচ্ছেদেই যখন লেঃ দাসএর জবানী নিয়ে আলোচনা হয়েছে তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না, যে তিনি নেতাজীর জীবিত থাকার স্বপক্ষেই কিছু বক্তব্য অবশ্যই রেখেছিলেন। তদন্ত রিপোর্ট পড়তে পড়তে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তদন্ত কমিটি শুধু নেতাজীর মৃত্যুর স্বপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করতে আগ্রহী। বিরুদ্ধে কোন যুক্তিযুক্ত বক্তব্য পেলেও বহু অনুমান এবং যুক্তিতর্কের অবতারণা তাঁরা করেছেন। যেখানে মৃত্যুর স্বপক্ষে, কোন পর্যায়ে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না সেখানে রিপোর্টে তথাকথিত মৃত্যুগাঁথাকে সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী বলে কমিটির সামনে এসে সাক্ষ্য দিয়েছেন তারাই যে প্রত্যক্ষদর্শী তারই বা প্রমাণ কোথায়? কারণ আলোচ্য বিমানের কোন যাত্রী তালিকা পাওয়া যায় নি। যাত্রী তালিকা ছাড়া কিভাবে প্রমাণ হয় যে যাঁদের বিমানের আরোহী বলে বলা হয়, তাঁরা সত্যিই আলোচ্য বিমানের আরোহী ছিলেন, তা

বোঝা যায় না। কিন্তু নেতাজী তদন্ত কমিটি সবই বুঝেছেন, তবুও না বোঝার ভাণ করে যে ইতিহাস লেখার অলিখিত নির্দেশ তাঁরা পেয়েছেন তাই লিখেছেন।

এই অধ্যায়ের ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদে নেতাজী তদন্ত কমিটি লিখেছেন যে একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি অভিমত জ্ঞাপন করেছেন যে নেতাজী সম্ভবত বেঁচে আছেন। এই দায়িত্বশীল ব্যক্তিটি হলেন হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক, শ্রীএ. কে. গুপ্ত। ১৯৫১ সালে তিনি আসামের পার্বত্য অঞ্চল পরিদর্শন করেছিলেন। সেখানে নাগা নেতা শ্রীফিজোর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। শ্রীফিজো তাঁকে (শ্রীগুপ্ত) বলেছিলেন যে নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনার আগেই তিনি (শ্রীফিজো) জানতে পেরেছিলেন যে ঐ ধরণের একটি মিথ্যা কাহিনী প্রচার করা হবে। এই বিবরণটি আনন্দবাজার পত্রিকার (বাংলা) ১লা মে, ১৯৫১ সালের সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল। মিশ্‌মি পাহাড় এলাকা পরিভ্রমণ করার সময় কয়েকজন মিশ্‌মি সর্দার শ্রীগুপ্তকে বলেছিলেন যে চীন সীমান্তে অবস্থানরত কয়েকজন চীনা অফিসার তাঁদের মধ্যে জনৈক ভারতীয়কে দেখার জন্য কয়েক-জনকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে দেখানো হয়েছিল, যিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসএর মতই দেখতে। শ্রীগুপ্ত আরও বলেন যে মিশ্‌মিরা নেতাজীকে আগে কখনও দেখেন নি, সুতরাং তাঁদের বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি কিছুই বলতে পারেন না। নেতাজী চীনা সেনাবাহিনীর সঙ্গে আছেন অথবা, সংগ্রামী নাগাদের সঙ্গে আছেন অথবা একদিন তিনি এক সেনা-বাহিনীর সর্বাধিনায়করূপে ভারতে ফিরে আসবেন, এই ধরণের অবাস্তব ধারণা সময়ে সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৩ সালের ৪ঠা জুলাই সিঙ্গাপুরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা ও নেতৃত্বভার নেওয়ার সময় নেতাজী যে ঐতিহাসিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে—"এমন কি

আমার শত্রুরও এই কথা বলিবার ধৃষ্টতা নাই যে আমি ভারতবর্ষের স্বার্থের প্রতিকুল কোন কার্য করিতে পারি।"

তদন্ত কমিটি শ্রীগুপ্তকে দায়িত্বশীল ব্যক্তি বলে শ্রীগোস্বামী ও শ্রীথেবরকে অবমাননা করেছেন। শ্রীগোস্বামী একজন ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়ের প্রয়োজনে পৃথিবীর বহুদেশ তিনি ভ্রমণ করেছেন। এক সময় তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারএর এ্যান্টি-করাপশ্ন অফিসার ছিলেন। আর শ্রীথেবর ছিলেন রাজনৈতিক নেতা ও বিধান সভার সদস্য। সুতরাং শ্রীগোস্বামী ও শ্রীথেবর যে দায়িত্বশীল ব্যক্তি নন তা বলা যায় না। যাহোক শ্রীঅশ্বিনী কুমার গুপ্ত স্বনামেই ভারতেই শুধ্ নয় বিদেশেও পরিচিত। তিনি একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং একটি বহুল প্রচারিত কাগজের যুগ্ম-সম্পাদক। কোন সংবাদ শুনে তার সত্যতা যাচাই না করে, কাগজের পাতায় তা স্থান পায় না। শ্রীগুপ্ত শুধ্ মিশ্মিদের কথা শুনে সংবাদের সত্যতা যাচাই না করেই তা কাগজে প্রকাশ করেছেন এই রকম ধারণা পোষণ করলে খবরের কাগজের সম্পাদকের দায়িত্বকে হীন প্রতিপন্ন করা হয়। শ্রীগুপ্ত তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনী শুধ্ কাগজের পাতায় লিখেই ক্ষান্ত হননি, বহু জায়গায় তিনি তাঁর পরিভ্রমণের বিবরণ বলেছেন। তদন্ত কমিটি মিশ্মি সর্দারের বক্তব্য শ্রীগুপ্তর জবানীর ভিত্তিতে নাকচ করে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যকে তদন্ত কমিটি কোন যুক্তি না দেখিয়ে এড়িয়ে গেলেন কেন? মিশ্মি-দের নেতাজী দর্শনের কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে শ্রীগুপ্ত কিছু বলতে পারেন নি, কিন্তু নাগা নেতা শ্রীফিজোর বক্তব্যকে তিনি তো (শ্রীগুপ্ত) অস্বীকার করেন নি? নাগা নেতা শ্রীফিজোর দাবী সম্বন্ধে তদন্ত কমিটি নীরব রয়ে গেছেন কেন? এই নীরবতার অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয় না। শ্রীফিজোর মন্তব্য তাইহোকু রহস্যে এক নূতন অধ্যায় যোগ করে। অন্য সাক্ষীরা তাঁদের জবানীর মধ্যে অসংলগ্নতা ও মত পার্থক্য এনে যে কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন শ্রীফিজো সরাসরি সেই

কথা বলে ফেলেছেন। নেতাজী তদন্ত কমিটি নেতাজী জীবিত আছেন, এই মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের দাবী নেতাজীর এক ঐতিহাসিক বাণী উদ্ধৃত করে নাকচ করে দিয়েছেন। কিন্তু নেতাজীর আশ্বাসবাণী সম্ভবত তাঁদের স্মরণে নেই—তাহ'ল "রাত্রির পর দিনের আগমন যেমন সুনিশ্চিত, তেমনই, ভারতকে উদ্ধার করিবার যে শেষযুদ্ধ তাতে যোগ দিবার জন্যই আমি বাঁচিয়া থাকিব—দূর বিদেশ হইতে নয়, একেবারে ভারতের মধ্যে আমার সহযোদ্ধাগণের পাশে দাঁড়াইয়া সেই যুদ্ধ করিব ; ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।"

১৩

তাইহোকু বিমানবন্দরের রহস্য-ঘেরা অঙ্গন থেকে আলোচ্য ঘটনার চরিত্রাভিনেতারা জীবনমৃত্যুর খেলাঘর ঐ রহস্যময় হাসপাতালে। সেখানে পার্থিব দেহটিকে ফেলে রেখে এক অবিনশ্বর আত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়ে গেল। অবিশ্বাস্য তৎপরতার সঙ্গেই সব ঘটনা ঘটে গেল। নিষ্প্রাণ দেহটাকে নিয়ে চলল আসুরিক তৎপরতা। প্রবাদ আছে যে মৃতের শত্রু নেই, কিন্তু আলোচ্য ঘটনায় এক প্রাণ-হীন দেহ নিয়ে চাঞ্চল্য দেখা দিল। বেঁচে থাকাকালীন যিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে চিরন্তন সংগ্রামী, মৃত্যুর (?) পরে না জানি তিনি কি এক ভীষণ সমস্যার সৃষ্টি করলেন।

নেতাজী তদন্ত কমিটি নেতাজীর পার্থিব দেহের শেষকৃত্যের ব্যাপার সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করে "নেতাজীর মর দেহের শেষকৃত্য" শিরোনামায় রিপোর্টের চতুর্থ পর্ব লিখলেন। এই পর্বের প্রথম অনুচ্ছেদ লেখা হ'ল যে নেতাজীর পরলোকগমন করার পর মুহূর্তেই, সেখানে উপস্থিত জাপানী ব্যক্তিবর্গ উঠে দাঁড়ালেন এবং সামরিক কায়দায় তাঁর মরদেহের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করলেন। কর্নেল হবিব-উর রহমান ছিলেন নেতাজীর অতি বিশ্বস্ত অফিসারদের অন্যতম এবং নেতাজীর শেষযাত্রায় সহযাত্রী হয়ে যাওয়ার জন্য তিনিই শুধু নেতাজীর দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন। নেতাজীর মৃত্যুতে ভীষণভাবে মর্মাহত হলেন কর্নেল হবিব-উর রহমান। দোভাষী মিঃ নাকামুরা নেতাজীর মৃত্যু শয্যার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ছকের সাহায্যে বর্ণনা দিয়েছেন যে কর্নেল রহমান মৃতের জন্য কিভাবে প্রার্থনা করেছিলেন। প্রথম তিনি (কর্নেল রহমান) এগিয়ে এসে নেতাজীর শয্যার পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়েন এবং মিনিট পাঁচ-ছ'এর জন্য প্রার্থনা করেন। তারপর তিনি জানালাটি খুলে দেন এবং

আকাশের দিকে তাকিয়ে আরও বেশী সময় ধরে প্রার্থনা করেন এবং ধীরে ধীরে তাঁর বিছানায় ফিরে এসে শুয়ে পড়েন। ঐ ঘরে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সবাই ভেঙ্গে পড়েছিলেন। ডাঃ ইয়োশিমি বলেছেন যে কর্নেল রহমান এর দু'চোখ বেয়ে জল পড়ছিলেন। নার্সরা সবাই চিৎকার করে কাঁদছিলেন। ঐ ঘরে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সবাই কেঁদেছিলেন। সত্যি বলতে কি, কমিটির সামনে ঐ মর্মস্পর্শী দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে ডাঃ ইয়োশিমি স্বয়ং ভেঙ্গে পড়েন এবং তাঁর কান্না শোনা যায়। ঐ মর্মান্তিক ঘটনার কথা ডাঃ ইয়োশিমি মিলিটারী সদর দপ্তরে জানান। সদর দপ্তর থেকে মেজর নাগাটোমোকে পাঠানো হয়। তিনি হাসপাতালে এসে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় নেতাজীর দেহ বিছানায় শায়িত দেখেন। মরদেহটিকে ঘরের এক কোণে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং দেহের চারপাশ ঘিরে পর্দা টাঙানো হয়। জাপানী প্রথামতে মরদেহের পাশে ফুল রাখা হয় এবং মোম-বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ডাঃ ইয়োশিমি ও কর্নেল হবিব-উর রহমান হাসপাতালের যে নক্সাগুলি পেশ করেছেন তাতে পরিবর্তিত অবস্থা দেখানো হয়েছে। মেজর নাগাটোমো মরদেহ পাহারা দেওয়ার জন্য সৈন্য মোতায়েন করেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত বহু প্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। তথাকথিত প্রত্যক্ষ-দর্শীদের বিবরণ থেকে নেতাজী তদন্ত কমিটি জেরা করে জানলেন যে নেতাজীর পার্থিব দেহ থেকে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়া মাত্র উপস্থিত ব্যক্তিরা মরদেহের প্রতি যথাযথ সম্মান জানালেন। আলোচ্য ঘটনা ঘটে থাকলে সামরিক কায়দায় হোক আর মাথা নীচু করেই হোক মৃতের প্রতি সম্মান দেখানো কর্তব্য এবং হাসপাতালে নেতাজীর শেষ শয্যার (?) পাশে দাঁড়িয়ে কর্তব্যকর্মে অবিচলভাব দেখিয়েছেন। কর্নেল রহমানএর পক্ষে কান্নায় ভেঙ্গে পড়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সত্যিই তেমন কোন অঘটন ঘটেছিল কি? দোভাষী মিঃ নাকামুরা নেতাজীর শেষ শয্যা (?) পাশে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে সব

লক্ষ্য করেছিলেন বলে জানা যায়। একদিন তাঁকে যে আলোচ্য ঘটনার বিশদ বিবরণ দিতে হবে তা নিশ্চয় তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন। কিন্তু লেঃ কর্নেল নোনোগাকি যিনি সারাক্ষণ নেতাজীর বিছানার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং ঐ ধরণের গুরুতর অবস্থায় রোগীর সঙ্গে কথাও বলেছিলেন, তিনি কিন্তু শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আশার সময় কি করলেন তা জানা গেল না। প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানীর গুরুত্ব অনেক। তাঁরা যে আলোচ্য বিমানের আরোহী হিসাবে গিয়েছিলেন তার সমর্থনে কোন প্রমাণ অর্থাৎ আলোচ্য বিমানের যাত্রী তালিকা না থাকা সত্ত্বেও তাঁদেরকে ঐ বিমানের আরোহী বলে ধরে নেওয়া হয়েছে কারণ তাঁরা প্রতক্ষ্যদর্শী হিসাবে দাবীদার। ঘটনার কোন পর্যায়েই তাঁদের একের জবানীর সঙ্গে অন্যের জবানীর মিল না থাকা সত্ত্বেও ধরে নিতে হবে যে আলোচ্য ঘটনা সত্য, কারণ তাঁরা সব দেখেছেন। ঘটনা ঘটে থাকলে একবারই ঘটেছিল দু'বার নয়; এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা একবারই যা দেখার দেখেছেন, কিন্তু একের দেখার সঙ্গে অন্যের দেখার তারতম্য আকাশ পাতাল। দোভাষী মিঃ নাকামুরা ছক কেটে সমস্ত ঘটনার পুর্ণ বিবরণ দাখিল করেছেন। সব মাপা ব্যাপার, একটুও গরমিল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। নেতাজী সুভাষচন্দ্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পর কর্নেল রহমান এসে তাঁর বিছানার পাশে হাঁটুমুড়ে বসে ছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু শ্রীআয়ারএর কাছে কর্নেল রহমান যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন, "আমি তাঁর (নেতাজীর) কাছেই বসেছিলাম।"* নেতাজীর বিছানার পাশে বসে থাকা অবস্থায় কর্নেল রহমান নেতাজী পরলোকগমন করার পর আবার কিভাবে তাঁর বিছানা থেকে উঠে এসে নেতাজীর বিছানার পাশে হাঁটুমুড়ে বসেছিলেন, তা বোঝা দুষ্কর। তাছাড়া, কর্নেল

*I was sitting near him—Col. Rehman
Unto Him A witness. P—114

রহমানএর উক্তি থেকেই জানা গেছে যে নেতাজী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে তাঁর কাছে ভারতবাসীর জন্য শেষ বাণী দিয়ে গিয়েছিলেন।* নেতাজী ইহজগত ত্যাগ করে যাওয়ার পর তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন। কোন ব্যাপারেই তিনি আর আসক্ত ছিলেন না। ঘটনাস্থলে উপস্থিত জাপানীরা তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন, সামান্য কিছু খাওয়াতেও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোন লাভ হয় নি। কর্নেল রহমানএর এই ধরণের ব্যবহারের কথা অন্য কোন প্রত্যক্ষদর্শী উল্লেখ করেন নি। কর্নেল রহমানএর যে ধরণের ব্যবহারের কথা দোভাষী শ্রীনাকামুরার জবানী থেকে জানা যায় তা খুব স্বাভাবিক ব্যবহার হয় নি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে যিনি মারা গেছেন বলে কর্নেল রহমান বলেছেন, তিনি কর্নেল রহমানএর নেতাই নন, তাঁর একান্ত প্রিয়জনও বটে। অপরপক্ষে কর্নেল রহমান পরলোকগত সেই ব্যক্তির একান্ত বিশ্বস্ত অনুচর ও স্নেহভাজন। ডাঃ ইয়োশিমি তদন্ত কমিটির কাছে নাটকের শেষ অঙ্কের বিবরণ দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। কর্নেল রহমানও বিভিন্ন তদন্তকারী দলের কাছে ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন বলে জানা যায়। অশ্রুভরা চোখে কোন ঘটনার বিবরণ দিলেই যে সেই ঘটনা সত্য হবে আর, অশ্রুশূন্য চোখে কোন বিবৃতি দিলে তা মিথ্যা ভাষণ হবে, এমন যুক্তি নিশ্চয় গ্রহণ যোগ্য নয়। ঘটনা যদি শুধু নাটকই হয় তাহ'লে ঐ নাটকের অভিনেতারা যে উঁচুদরের অভিনেতা হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সাজানো ঘটনাকে সত্যি বলে চালাতে গেলে, একটু আবেগ দিয়ে ঘটনার বিবরণ অবশ্যই দাখিল

---

*I was prostrate, I did not know what to do,
I did not care what happened to me.

I was not interested in anything. The Japanese tried to coax me and did their best to make me eat a little by way of nourishment but they found it was useless, for the time being. Col. Rehman—Ibid, P-114

করতে হয়, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতির মধ্যে সঙ্গতি, স্বাভাবিকতা ও তথ্যগত প্রমাণ না থাকলে ঘটনার সত্যতা নির্ধারিত হয় না। দোভাষী মিঃ নাকামুরার ছকে আঁকা কর্নেল রহমানএর ব্যবহার ডাঃ ইয়োশিমির জবানীর দ্বারা সমর্থিত হয় না। কিন্তু ডাঃ ইয়োশিমি ও দোভাষী শ্রীনাকামুরা দু'জনেই নাকি ঐ মর্মান্তিক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী।

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে লেখা হয়েছে যে, পরদিন অর্থাৎ ১৯শে আগস্ট, ফরমোসা সামরিক বাহিনীর সদর-দপ্তর, ইম্পিরিয়াল হেড কোয়ার্টার্স থেকে এই মর্মে একটি টেলিগ্রাম পান যে, নেতাজীর মরদেহ যেন বিমানে টোকিও পাঠানো হয়। সেইমতে মরদেহটিকে সংরক্ষিত করে রাখার জন্য মেজর নাগাটোমো ডাঃ ইয়োশিমিকে মরদেহে ফরম্যালিন (formalene) ইঞ্জেকশন দিয়ে দিতে নির্দেশ দেন। ঐ দিনই মরদেহটি একটি কফিনে রেখে দেওয়া হয়। কর্নেল রহমান তাঁর জবানীতে বলেছেন যে কফিনটি ক্যাম্ফর কাঠের তৈরী হয়েছিল। মেজর নাগাটোমো বলেছেন যে তিনি কফিনের ডালাটি তুলে নেতাজীর মুখ দেখেছিলেন। তাঁর ভাষায়, "আমি মিঃ বোস-এর মুখ দেখেছিলাম। মুখটি ছিল বেশ বড় গোলমুখ।" মরদেহটি কফিনে রেখে দিতে কর্নেল হবিব-উর রহমানও দেখেছিলেন। ইতিমধ্যে মরদেহটি সিঙ্গাপুরে অথবা বিকল্পে টোকিওতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য কর্নেল হবিব-উর রহমান স্থানীয় জাপানী সামরিক বাহিনীর কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ দিচ্ছিলেন। ঐদিনই, অর্থাৎ ১৯শে আগস্ট, কয়েকজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার হাস-পাতালে এসেছিলেন, এবং ঐ দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা ও নেতাজীর মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মরদেহটি সিঙ্গাপুর বা টোকিও কোথাও পাঠানো হ'ল না। মেজর নাগাটোমো তাঁর জবানীতে বলেছেন যে ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স থেকে প্রথম টেলিগ্রাম আসার পর দ্বিতীয় আর একটি টেলিগ্রাম এসেছিল।

ঐ টেলিগ্রামে নির্দেশ এসেছিল যে মরদেহটি টোকিওতে না পাঠিয়ে তাইহোকুতেই যেন দাহ করে ফেলা হয়। আদেশ পরিবর্তন করার জন্য কোন রূপ কারণই দর্শানো হয় নি। ২০শে আগস্ট তারিখে কর্নেল হবিব-উর রহমানকে জানানো হয়েছিল যে মরদেহটি বিমানে পাঠানো সম্ভব নয়, কারণ জাপানীদের কাছে যে ধরণের ছোট বিমান ছিল তার তুলনায় কফিনটি অনেক বড়। আগস্ট মাসে ফরমোসায় গ্রীষ্মের যথেষ্ট উত্তাপ থাকে। ওদিকে মরদেহ তিনদিন রেখে দেওয়া হয়েছিল। বিকল্প কোন পথ খুঁজে না পেয়ে কর্নেল হবিব-উর রহমানকে তাইহোকুতেই মরদেহ দাহ করতে রাজী হতে হয়েছিল। মরদেহ দাহ করার তারিখ নিয়ে কিছু গোলমাল রয়েছে। কর্নেল হবিব-উর রহমান তদন্ত কমিটির কাছে দেওয়া জবানীতে মরদেহ দাহের তারিখ বলেছেন ২০শে আগস্ট। কিন্তু ১৯৪৫ সালের ২৪শে আগস্ট তিনি যে বিবৃতিটি সহি করে শ্রীমূর্তির হাতে দিয়েছিলেন তাতে মরদেহ দাহের তারিখ দেওয়া হয়েছে ২২শে আগস্ট। মিঃ জে. নাকামুরা সুনির্দিষ্টভাবে মরদেহ দাহের তারিখ ২০শে আগস্ট বলেন। ডাঃ ইয়োশিমি বলেছেন যে, যতদূর তাঁর মনে পড়ে, ২০ তারিখেই মরদেহ দাহ করা হয়েছিল, তবে তিনি ঐ তারিখ সম্বন্ধে খুব নিশ্চিত নন। মেজর নাগাটোমো অবশ্য কোন তারিখ উল্লেখ করেন নি, তবে বলেছেন যে মরদেহ দাহ করা হয়েছিল "যেদিন ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স থেকে দ্বিতীয় টেলিগ্রামটি এসে পৌঁছে-ছিল সেই দিনই"—ঐ দিনটা ছিল ১৯শে আগস্ট বলে মনে হয়। এত তর্কবিতর্ক ও নির্দেশ বদলের দরুণ মরদেহটি ১৯শে তারিখেই অর্থাৎ মৃত্যুর পরের দিনই দাহ করা হয়েছিল বলে মনে হয় না। মরদেহ দাহের কাজ পরে কোন একসময় করা হয়েছিল বলেই মনে হয়।

তাইহোকুর হাসপাতালে ফেলে রাখা নেতাজীর মরদেহ (?) নিয়ে বেশ টানাপোড়েন চলেছিল বলে বোঝা যায়। নেতাজী ব্যাপারে যতই গোপনতা রক্ষা করা হয়ে থাকুক্ না কেন, এক মিত্ররাষ্ট্রের

সর্বপ্রধানের মরদেহ রক্ষার দায়িত্ব সামরিক বাহিনীর ওপরই বর্তায়। হাসপাতালের অধিকর্তার টেলিফোন বা বার্তাদূত সামরিক বাহিনীর সদর দপ্তরে পৌছানো মাত্র সেখান থেকে ছুটে এসেছিলেন মেজর নাগাটোমো। তিনি এসে নেতাজীর পার্থিব দেহ ব্যাণ্ডেজ জড়ানো দেখেছিলেন বলে জানা গেছে। আরও জানা গেছে যে তিনি একজন সৈনিক মোতায়েন করেছিলেন। একথা সত্য যে, যে কোন দেহ নিষ্প্রাণ হয়ে গেলে ঐ দেহে ব্যাণ্ডেজ বা প্লাষ্টার যাই-ই করা থাকুক না কেন অবিলম্বে তা খুলে ফেলা হয়। এক্ষেত্রে কিন্তু মেজর নাগাটোমো হাসপাতালে পৌছোনো পর্যন্ত তা রেখে দেওয়া হয়েছিল বলে দেখা যায়। এর সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাছাড়া মেজর নাগাটোমো যে সৈনিক সঙ্গে করেই হাসপাতালে এসেছিলেন তাও কেউ বলেন নি। খুব নগণ্য ব্যাপার বলে এগুলি এড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সামরিক হাসপাতালের অধিকর্তাকে মরদেহে ফরম্যালিন ইঞ্জেকশন দেওয়ার নির্দেশ দেওয়াটা সত্যিই খুব খাপছাড়া লাগে। মেজর নাগাটোমো একজন সামরিক অফিসার। তিনি তাঁর কাজ ভাল বোঝেন, কিন্তু মরদেহে ফরম্যালিন দেওয়ার সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়ার এক্তিয়ার তাঁর নেই। সেনাবাহিনীর অফিসার হয়ে তিনি ডাঃ ইয়োশিমির এক্তিয়ারে অনুপ্রবেশ করে ঘটনা সম্পর্কে এক বিচিত্র ইঙ্গিত দিয়েছেন। মরদেহ সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেওয়াই তাঁর ক্ষমতার মধ্যে, কিন্তু সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন চিকিৎসক স্বয়ং। ঘটনার বিবরণের এই অংশটুকু ত্রুটিপূর্ণ। মেজর নাগাটোমো প্রথম দিন হাসপাতালে এসে নেতাজীর দেহ দেখছিলেন, কিন্তু পরের দিন কফিনের ঢাকনা তুলে তিনি নেতাজীর মুখ দেখলেন, এই দুই বক্তব্যের মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশ্য, যদি প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবী করেন যে নেতাজীর মুখও পুরোপুরি ব্যাণ্ডেজ করা হয়েছিল তাহলে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু কফিনে রাখা গোল বড় মুখের দেহটিই যে নেতাজীর মুখ তা তিনি

কিভাবে জানতে পেরেছিলেন তা বোঝা যায় না। তদন্ত রিপোর্টের তৃতীয় পর্বের সপ্তম অনুচ্ছেদে পরিষ্কার লেখা হয়েছে যে নেতাজীর মুখ ফুলে গিয়েছিল এবং তা বিকৃত হয়ে যাওয়ার দরুণ কর্নেল রহমান ঐ মুখের কোন ছবি তুলতে অনুমতি দেন নি। মেজর নাগাটোমা ও কর্নেল রহমান যদি একই মুখ দেখে থাকেন তাহলে উভয়ের বিবরণের মধ্যে তারতম্য থাকার কোন কারণ নেই। মেজর নাগাটোমো যে বিকৃত কোন মুখ দেখেছিলেন তা বলেন নি। তাছাড়া তাঁর বিবৃতি থেকে মনে হয় না যে নেতাজীকে তিনি আগে কখনও দেখেছিলেন। দুই প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা থেকে এটাও ধরে নেওয়া খুব বেশী অযৌক্তিক হবে না যে মেজর নাগাটোমো অপর কোন ব্যক্তির মুখও দেখে থাকতে পারেন। স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার টিকিট দু'জনের কারও বক্তব্যের সঙ্গে এঁটে দেওয়া যাবে না কারণ, মরদেহ যে কফিনে রাখা হয়েছিল তা দু'জনেই দেখেছিলেন। দু'জনের বক্তব্য পাশা-পাশি রাখলে ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সমর্থনই পাওয়া যায় না।

টোকিওর সঙ্গে তাইহোকুর টেলিগ্রাম মারফৎ যোগাযোগ করার বিষয়টি জাপ সরকারএর পদস্থ অফিসারদের বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখে না। নেতাজীর ব্যাপারে যথেষ্ট গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছিল জাপানী কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। গোপনতাই যদি রক্ষা করা হয়ে থাকে তাহ'লে টেলিগ্রাম পাঠানো হ'ল কেন? বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে সরাসরি বাক্যালাপ না করে টেলিগ্রাম পাঠানোর কারণ বোঝা যায় না। টেলিগ্রামে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স, কিন্তু ২২শে আগস্ট জাপানের ঐ সদর দপ্তর থেকেই সামরিক বাহিনী ও পররাষ্ট্র দপ্তরের কয়েকজন অফিসার শ্রী এস্, এ, আয়ারকে যে কথা বলেছিলেন তার সঙ্গে টেলিগ্রামের ইতিহাসের কোন যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। নেতাজীর মরদেহ সিঙ্গাপুর না অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হবে, এই প্রশ্নের উত্তরে জাপানী কর্তৃপক্ষ বলেছিলেন যে দু'দিন যাবৎ, অর্থাৎ ২০শে তারিখ থেকে তাইহোকুর

সঙ্গে টোকিওর কোন যোগাযোগ নেই। তাইহোকু বিমানবন্দরে কি ঘট্ছিল তাই তাঁদের জানা ছিল না। টোকিওতে নেতাজীর মরদেহ আনার সম্ভাবনা আছে কি না তা তাঁরা পরে জানাতে পারবেন বলেছিলেন। তবে ঐ দেহ অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন তাঁরা সরাসরি বাতিল করে দিয়েছিলেন। তাইহোকুতে মরদেহের ব্যাপারে ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এর নির্দেশগুলির সঙ্গে টোকিওর ঐ দপ্তরের কর্তা ব্যক্তিদের বক্তব্যের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। টোকিও ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স থেকে পরপর দু'টি টেলিগ্রাম তাইহোকুর সামরিক দপ্তরে এসে পৌঁছাল, অথচ আশ্চর্যের বিষয় টোকিওর ঐ দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঐ ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। এর পরও আলোচ্য ঘটনা নির্ভেজাল সত্য বলে বিশ্বাস করে নিতে হবে, যেহেতু ওঁরা সবাই বলেন যে ঐ ঘটনা সত্যই ঘটেছিল।

নেতাজী তদন্ত কমিটি তদন্ত করে বার করতে পারেন নি যে মরদেহ টোকিও নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নির্দেশ কেন বদ্‌লানো হ'ল। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ফাঁক ঘটনার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় যার কোন সমাধান হয় না। টোকিওর কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মাফিক মরদেহ টোকিওতে না পাঠিয়ে তাইহোকুতেই দাহ করে দেওয়া হ'ল বলে মেজর নাগাটোমো তাঁর জবানীতে বলেছেন। কিন্তু কর্নেল হবিব-উর রহমান এর জবানী থেকে জানা যায় অতবড় কফিন নিয়ে যাওয়ার মত বিমানের ব্যবস্থা করতে না পারার দরুণ বাধ্য হয়ে তাইহোকুতেই কাজ শেষ করে ফেলা হয়। কর্নেল রহমানকে যিনিই বিমানের অসুবিধার কথা জানিয়ে থাকুন তিনি যে একজন পদস্থ সামরিক অফিসার তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ মরদেহের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ সামরিক দপ্তরের এক্তিয়ার। এবং কেন্দ্রের নির্দেশ ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্রের প্রধানএর মরদেহের কোন গতি করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। বিমান না পাওয়ার জন্য মরদেহ তাইহোকুতেই দাহ করে

দেওয়া, আর, প্রথমে মরদেহ টোকিওতে পাঠানো ও পরে তাইহোকুতেই দাহ করে দেওয়ার মধ্যে ঘটনার কোন সঙ্গতি নেই। যাক, সব বোঝা গেল। কিন্তু শেষ কাজটা কবে হ'ল? কর্নেল হবিব-উর রহমানের কাছ থেকে মরদেহ দাহ করার দু'টি তারিখ পাওয়া গেছে, ২০শে আগস্ট, ও ২২শে আগস্ট। আলোচ্য ঘটনার দু'দিন পরের বিবৃতিতে শেষ-কৃত্যের দিন ২২শে আগস্ট, আর এগার বছর পরে দেওয়া বিবৃতিতে ২০শে আগস্ট। সুদীর্ঘ এগার বছর পরেও ডাঃ ইয়োশিমির আলোচ্য ঘটনার হাসপাতাল পর্বের কাহিনী হুবহু মনে ছিল, ঘড়ির কাঁটার সময় পর্যন্ত এবং তিনিই ঐ হাসপাতালের অধিকর্তা—কিন্তু কবে যে তাঁর আপ্রাণ চেষ্টার বলি ঐ আগুনে পোড়া দেহটাকে দাহ করা হয়েছিল তা তিনি নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন নি। সত্যই, যাঁরা আলোচ্য ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাঁরা সবাই বিচিত্র মানুষ। সামরিক দপ্তর থেকে যাঁকে মরদেহের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হ'ল, সেই মেজর নাগাটোমো, টেলিগ্রাম পাওয়ার তারিখ মিলিয়ে বললেন দাহ করা হয়েছিল ১৯শে আগস্ট। এগার বছর পরেও যিনি সৈন্য মোতায়েন, ফরম্যালিন ইঞ্জেক্‌শন, কফিনের ঢাক্‌না তুলে দেখা, ইত্যাদি ঘটনার কথা হুবহু মনে করে রেখেছেন, তিনি মরদেহ দাহ করার তারিখটা মনে রাখেন নি। একেই বলে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। তদন্ত কমিটি দাহ করার তারিখ ১৮ই আগস্ট থেকে ২২শে আগস্ট এর মধ্যে কোন একদিন বলে লিখলে, পাঠকদের বোঝার সুবিধা হ'ত এবং রাত আটটা থেকে মাঝরাতের মধ্যে কোন সময় মৃত্যু ঘটেছিল মন্তব্যটির সঙ্গে ছন্দে মিল থাকত। কিন্তু তা না করে পরে কোন এক দিন দাহ করা হয়েছিল বলেই কমিটি ঐ অনুচ্ছেদের সমাপ্তি টেনেছেন। নেতাজীর মরদেহ (?) দাহ করার প্রয়োজন হলে দিন ক্ষণ তারিখ সবই প্রত্যক্ষদর্শীদের মনে থাকত।

হাসপাতাল পর্বে নেতাজীর পার্থিব দেহ থেকে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে মরদেহ দাহ করতে নিয়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত

অনেক ঘটনার কথাই অজানা থেকে যায়। মরদেহের ব্যাণ্ডেজ কখন খুলে ফেলা হ'ল, কফিন আনার নির্দেশ কে দিলেন, কে কফিন নিয়ে এলেন, কে কে হাসপাতালের বিছানা থেকে মরদেহ কফিনে রাখলেন, ঐ কফিন তারপর কোথায় রাখা হ'ল, ফরম্যালিন ইঞ্জেক্শন কখন দেওয়া হল, ইত্যাদি পর্যায়ের কোন খবর রিপোর্টে নেই। অবশ্য বিশদভাবে সব পর্যায়ের আলোচনা না করে ভালই হয়েছে, কারণ, আরও অনেক অসঙ্গতি ও পরস্পর বিরোধী বক্তব্য প্রকাশ পেত। কিন্তু তাতেও খুব অসুবিধা হ'ত বলে মনে হয় না। কারণ, সব অসঙ্গতির মাঝে সঙ্গতি এনে দেওয়ার জন্য তদন্ত কমিটি খুবই তৎপর ছিলেন।

এই পর্বের তৃতীয় অনুচ্ছেদে তদন্ত কমিটি লিখেছেন যে খুবই সাধারণ ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মরদেহ দাহ করা হয়েছিল। কর্নেল হবিব-উর রহমান যদিও বলেছেন যে হাসপাতালের কর্মীরা এবং অন্যান্য বহু ব্যক্তি শবদেহবাহী গাড়ীর সঙ্গে গিয়েছিলেন, কিন্তু এই বক্তব্য ঐ সামরিক হাসপাতালের অধিকর্তা ডাঃ ইয়োশিমির দ্বারা সমর্থিত হয় নি। ডাঃ ইয়োশিমি শুধু বলেছেন, "১৮ই তারিখেই রক্ষী মোতায়েন করা হয়েছিল। তাঁর ক্যাপ্টেন হাসপাতাল থেকে দেহটি নিয়ে গিয়েছিলেন। কফিনটি ট্রাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।" সামরিক বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে মেজর নাগাটোমোকে নেতাজীর মরদেহ শেষ কৃত্য ও দাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা করতে নিয়োগ করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন যে কফিনটি একটি ট্রাকে তোলা হয়েছিল এবং ঐ ট্রাকে বারজন সৈনিকও ছিলেন। ট্রাকের আগে আগে একটি গাড়ীতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্নেল হবিব-উর রহমান ও দোভাষীর (মিঃ নাকামুরা) সঙ্গে তিনিও গিয়েছিলেন। শবদাহক্ষেত্রে কি ঘটেছিল সেই সম্বন্ধে মিঃ নাকামুরা এক বিশদ বিবরণ দাখিল করেছেন। শ্রীহারিণ শাহ্ও এই শবদাহ ক্ষেত্র পরিদর্শন করেছিলেন। এই শবদাহ ক্ষেত্রটির নাম হ'ল 'তাইহোকু গভর্ণমেণ্ট ক্রিমেটোরিয়াম' এবং শহরের রাজপথ 'সান্-

ইয়েত-সেন এভিনিউ' পার হয়েই ওখানে পৌঁছানো যায়। শ্রীহারিণ শাহ্ শবদাহক্ষেত্রের ভিতর এবং বাইরে থেকে কয়েকটি ছবিও তুলেছিলেন। জাপানী সৈনিকরা ছাড়া আর যাঁরা শবদাহের সময় নিশ্চয়ই উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন :

কর্নেল হবিব-উর রহমান

মেজর নাগাটোমো

মিঃ জে. নাকামুরা

জনৈক বৌদ্ধ পুরোহিত এবং শবদাহ ক্ষেত্রের কর্মী মিঃ চু সাং।

তদন্ত কমিটি প্রথমোক্ত তিনজনকে জেরা করেছেন। বৌদ্ধ পুরোহিত এবং ফরমোসান কর্মীকে জেরা করা যায় নি, কারণ সদস্যগণ ফরমোসায় যেতে পারেন নি। তাইহোকুর শবদাহক্ষেত্র ও সেখানে কি ঘটেছিল' তার এক বিশদ বিবরণ মিঃ নাকামুরা দাখিল করেছেন। তিনি বলেছেন, "শবদাহক্ষেত্রে পৌঁছানোর পর সৈনিকরা কফিনটি তুলে নেয় এবং দাহচুল্লী পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যায়। বড় একটি হলঘর নিয়ে শবদাহক্ষেত্র, এবং ঘরের মাঝখানে শবদাহ চুল্লী। যতদূর মনে পড়ে হলঘরটির মাপ প্রায় ১৬ ফিট্ X ১৬ ফিট্। শবদাহক্ষেত্রের প্রবেশ পথ থেকে সৈন্যরা কফিনটি কাঁধে করে বয়ে হলঘর পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং চুল্লীর চলমান ট্রের ওপর রেখে দেয়। তারপর চুল্লীর দরজা বন্ধ করে দিয়ে তাঁরা বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং আমাদের জানান যে কফিনটি তাঁরা চুল্লীতে যথাযথভাবেই রেখে দিয়ে এসেছেন। সৈন্যরা সবাই হলঘরের বাইরে চলে যান এবং আমরা, যাঁরা এতক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করছিলাম, সবাই হলঘরের ভিতরে যাই। কর্নেল রহমান ছিলেন সামনের দিকে। তাঁরই পিছনে ছিলাম আমি। সেখানে উপস্থিত অন্যান্য ভদ্রলোকেরা, সর্বসাকুল্যে পাঁচজন আমাদের অনুসরণ করেন। ভিতরে গিয়ে আমরা দাহচুল্লীর সামনে দাঁড়ালাম। আমরা সবাই সেখানে অপেক্ষা করলাম এবং সামরিক কায়দায় শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলাম। তারপর আমরা

দাহচুল্লীর পিছনদিকে গেলাম। সেখানে দেখলাম যে জলন্ত ধূপকাঠি হাতে নিয়ে পুরোহিত দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি কর্নেল রহমানকে একটি ধূপকাঠি দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু যেহেতু তিনি (কর্নেল রহমান) তা ধরতে .পারছিলেন না, তাই আমি ধূপ কাঠিটা হাতে ধরে কর্নেল রহমানএর হাতে দিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি আঙ্গুল দিয়ে ধূপ কাঠিটা ধরতে পারছিলেন না বলেই, দু'হাতের তালু দিয়ে ওটা চেপে ধরেছিলেন এবং চুল্লীর পিছনদিকে একটি গর্তে ধূপকাঠিটা রেখে দিয়েছিলেন। পরের ধূপকাঠিটি আমি নিনেছিলাম 'এবং ঐ গর্তেই রেখে দিয়েছিলাম এবং একে একে অন্যেরা আমাদের অনুকরণ করেছিলেন। শবদাহক্ষেত্রের প্রবেশ পথের বাইরে যখন আমরা এলাম, তখন ওখানকার তত্ত্বাবধায়ক আমাদের পরদিন দুপুর নাগাদ আসতে বললেন। দাহচুল্লীর দরজা বন্ধ করে দিয়ে সকলেই চলে এসেছিলেন। কর্নেল হবিব-উর রহমান এবং মেজর নাগাটোমো দু'জনেই দাহচুল্লীর চাবিটি রেখেছিলেন বলে দাবী করেছেন।

তাইহোকুর হাসপাতালে কফিনের মধ্যে ফরম্যালিন ইঞ্জেকশন দিয়ে সযত্নে রাখা (?) মরদেহটি শেষ পর্যন্ত শবদেহ দাহক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন। কিন্তু কি ধরণের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হাসপাতালের সীমানা থেকে মরদেহটি দাহক্ষেত্র পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হ'ল, তা পরিষ্কার হ'ল না। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পড়ে মনে হয় যে কমিটির সদস্যগণ অনুসন্ধান করে বার করতে পেরেছেন যে খুব সাধারণ ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানই সেদিন হয়েছিল, কিন্তু যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী, তাঁদের বক্তব্য পড়ে অনুষ্ঠানের সঠিক রূপ বোঝা যায় না। কর্নেল হবিব-উর রহমান স্বচক্ষে দেখেছিলেন যে শবদেহবাহী গাড়ীতে (cortege) করে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু ডাঃ ইয়োশিমি দেখেছিলেন যে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ট্রাকে (Truck) করে। ট্রাক আর শবদেহবাহী গাড়ী একই ধরণের গাড়ী নয়, একথা ডাঃ ইয়োশিমি ও কর্নেল রহমানই শুধু নন,

সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন। কিন্তু তবুও দু'জনেই দুই ধরণের গাড়ীর কথা বলেছেন এবং দু'জনেই প্রত্যক্ষদর্শী। ডাঃ ইয়োশিমি দেখেছিলেন যে সামরিক রক্ষীর ক্যাপ্টেন মরদেহ ট্রাকে তুলে নিয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করে গিয়েছিলেন। ট্রাকের সঙ্গে অন্য কোন ব্যক্তি গিয়েছিলেন বলে তিনি জানান নি। অথচ, মেজর নাগাটোমো কিন্তু দেখেছিলেন যে কফিনের সঙ্গে ট্রাকে বারজন সৈনিক ছিলেন। ডাঃ ইয়োশিমি ও মেজর নাগাটোমো দুজনে একই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কিন্তু একের সঙ্গে অন্যের বক্তব্যের কোন মিল নেই। এঁদের দু'জনের বক্তব্যের সঙ্গে আর একজন প্রত্যক্ষদর্শীর জবানী যোগ করলে ঘটনার রূপ আরও বিচিত্র দাঁড়ায়। কর্নেল হবিব-উর রহমান কিন্তু দেখে-ছিলেন যে হাসপাতালের কর্মীরা ও অন্যান্য বহু ব্যক্তি শবদেহবাহী গাড়ী অনুসরণ করে গিয়েছিলেন। হাসপাতালের অধিকর্তা ডাঃ ইয়োশিমি কিন্তু দেখেন নি যে তাঁর হাসপাতালের কর্মীরা মরদেহের সঙ্গে গিয়েছিলেন। আরও বিচিত্র ব্যাপার হ'ল, কর্নেল রহমান মেজর নাগাটোমোর সঙ্গে একই গাড়ীতে গিয়েছিলেন কিন্তু মেজর নাগাটোমো হাসপাতালের কোন কর্মী এবং অন্য ব্যক্তিদের শবদেহবাহী গাড়ী অনুসরণ করে যেতে দেখেন নি, অথচ কর্নেল রহমান দেখেছিলেন। শবদেহ যাত্রা যে সত্যই করা হয়েছিল তেমন কোন প্রমাণ কি ডাঃ ইয়োশিমি, মেজর নাগাটোমো ও কর্নেল রহমানএর জবানী থেকে পাওয়া যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রত্যক্ষদর্শীরা বলবেন পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁদের পরস্পর খণ্ডনকারী বক্তব্য প্রমাণ করে ঘটনা সত্য নয়।

নেতাজী তদন্ত কমিটি এই অনুচ্ছেদে শ্রীহারিণ শাহর বক্তব্যের উল্লেখ করে আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে সমর্থিত আরও কিছু তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাইহোকুর গভর্ণমেণ্ট ক্রিমোটোরিয়াম-এর ছবি থেকে আলোচ্য ঘটনার সমর্থনে কোন প্রমাণ থাকে না। শ্রী হারিণ শাহর তদন্ত রিপোর্টকে মূলধন করলে বিশ্বাস করতে হয় যে

শবদেহ কফিনে ভর্তি করে হাসপাতালের সীমানার মধ্যেই শবদেহ রাখার একটি আলাদা বাড়ীতে তিনদিন রেখে দেওয়া হয়েছিল। শ্রী শাহ্‌র কাছে সিস্টার শান পি শা, এই কথাই বলেছিলেন। এই বক্তব্য কিন্তু অন্য কারও দ্বারা সমর্থিত হয় নি। শবদেহ দাহ করার প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শীরা যে বক্তব্য রেখেছেন তা বিচার করে দেখতে গেলে সাধারণ শিষ্টাচার ভুলে যেতে হয়; শবদেহ দাহক্ষেত্রে পৌছানোর পর কয়েকজন সৈনিক শবাধারাটি কাঁধে তুলে নিয়ে সোজা শবদাহ চুল্লীর কাছে চলে গেলেন। তারপর চুল্লীর মধ্যে শবধারাটি বসিয়ে রেখে চুল্লীর দরজা বন্ধ করে দিয়ে তাঁরা বাইরে চলে এলেন। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা কিন্তু শবাধার অনুসরণ করে ভিতরেও গেলেন না, তাঁরা বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। এমন বিচিত্র ঘটনা কখনও ঘটতে পারে বলে কেউ কল্পনাও করতে পারেন না। একজন রাষ্ট্রপ্রধানের মরদেহ গাড়ী থেকে নামিয়ে, তাঁকে শেষ বারের মত কেউই দেখলেন না, এমনকি কর্নেল রহমানও দেখলেন না এবং ঐ মরদেহ অনুসরণ করে দাহচুল্লী পর্যন্তও কেউই গেলেন না। একথা ভাবা যায় না কারণ, তা সম্ভব নয়। সৈন্যরা শবাধার চুল্লীতে রেখে দরজা বন্ধ করে বাইরে চলে যাওয়ার পর সেখানে উপস্থিত সবাই হলঘরের মধ্যে এসে চুল্লীর সামনে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন। এমন অভিনব শ্রদ্ধাঞ্জলি অভিনব কাহিনীর সঙ্গেই খাপ খায়। শবদাহ ক্ষেত্রটি নিশ্চয় আগে থেকেই সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল, নইলে যন্ত্রের মত সব কাজ হয়ে গেল, কোথাও কোনরকম দেরী বা অসুবিধা দেখা দিল না, এমন হওয়া সম্ভব নয়। মিঃ নাকামুরার জবানী মতে ঐ অনুষ্ঠানে পাঁচ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ঘটনা প্রবাহ থেকে ধরে নিতে হয় যে সেখানে নির্বাচিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ থাকতে পারেন না। তদন্ত কমিটি তিনজনের উপস্থিতির কথা টের পেয়েছেন কিন্তু বাকি দু'জন কারা ছিলেন তা জানতে পারেন নি। মরদেহ চুল্লীতে দেওয়ামাত্রই নিশ্চয় তা জ্বলতে আরম্ভ করেছিল, কারণ কেউ

চুল্লী জ্বালিয়েছিলেন বলে জানা যায় না, অর্থাৎ ঐ চুল্লীটা ছিল অনন্ত-চিতা, সারাক্ষণ জ্বলতেই থাকে।

কর্নেল হবিব-উর রহমান এর ধূপকাঠি ধরার বিবরণ খুবই উপভোগ্য। হাতের আঙ্গুল দিয়ে তিনি একটা ধূপকাঠি ধরতে পারেন নি বলেই দু'হাতের তালু দিয়ে ধরেছিলেন। এমন গুরুতর ভাবে যিনি পুড়ে গিয়েছিলেন তিনিই ২৪শে আগস্ট ঐ তাইহোকুতে থেকে কিভাবে লিখিত জবানী দিয়েছিলেন. তা বুঝতে অসুবিধা হয়। কোন পর্যায়েই যে কিছু বোঝা যায় না তা সত্য, কিন্তু তবুও বুঝতে হবে। বোঝার জন্য তাই মনের মধ্যে অনেক প্রশ্নই আনাগোনা করে। তদন্ত কমিটি শবযাত্রার প্রসঙ্গে তিনজনের উক্তির বিচার করেছেন, কিন্তু মিঃ নাকামুরার কোন বক্তব্য ঐ প্রসঙ্গে তোলা হয় নি। মিঃ নাকামুরা শবযাত্রা প্রসঙ্গে অবশ্যই কিছু বক্তব্য রেখেছিলেন কারণ তিনিও শবযাত্রায় গিয়েছিলেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য তুলে ধরলে শবযাত্রা প্রসঙ্গে নিশ্চয় আরও বিচিত্র কোন কাহিনী জানা যেত। আলোচ্য ঘটনার বিভিন্ন পর্যায়ে কবে ও কখন কি ঘটেছিল, তা যখন সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি, তখনই অপরিমেয় উদারতার সঙ্গে তদন্ত কমিটি কয়েক দিন বা কয়েক ঘণ্টার অবকাশ বরাদ্দ করে দিয়েছেন। কিন্তু কখন শবযাত্রা শুরু হয়েছিল কখন তা অনন্ত-চিতার কাছে এসে শেষ হয়েছিল, কখন শবদেহ চুল্লীতে দেওয়া হয়েছিল এবং কটার সময় উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীরা শেষ প্রণাম করে ফিরে এসেছিলেন তা জানা যায় না। শেষ পর্যন্ত গোলমাল দেখা দিয়েছে দাহচুল্লীর চাবিটি নিয়ে। চাবিটি চুল্লীতে কে লাগিয়েছিলেন তা অবশ্য বলা হয়নি কিন্তু চাবিটা কার কাছে ছিল তাই নিয়ে সমস্যা। তদন্ত কমিটি এই সমস্যার সমাধান খুঁজে পান নি। মেজর নাগাটোমা ও কর্নেল হবিব-উর রহমান, দুজনের কাছেই শবদেহ চুল্লীর চাবিটা ছিল বলে জানা যায় আসলে চাবি কিন্তু একটাই। এমন জট খোলার চেষ্টা তদন্ত কমিটি করেন নি। হাসপাতাল পর্বে কত উৎসাহী

প্রত্যক্ষদর্শীদের দেখা গিয়েছিল, এবং নেতাজীর জন্য উদ্বেগে সবাই তখন স্থান কাল পাত্র ভুলে গিয়েছিলেন, কিন্তু শবযাত্রার পর কর্নেল হবিব-উর রহমান ছাড়া আলোচ্য ঘটনার সঙ্গে জড়িত আর কাউকেই দেখা যায় না। মিঃ নাকামুরাকে স্বতন্ত্রভাবে দেখতে হবে কারণ, তিনি বিমানের আরোহী ছিলেন বলে দাবী করেন নি। তদন্ত কমিটি ঘটনার এই দিকটাও অবশ্যই বিচার করে দেখেছিলেন কিন্তু কোন মন্তব্য তাঁরা করেন নি। আলোচ্য ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিবৃতি দেওয়ার বহর দেখে বুঝতে অবশ্যই কোন অসুবিধা হয় না যে ঘটনার আসল চাবিকাঠি সযত্নে ধরে রেখেছেন 'জাপ সরকার'। যখন যেখানে যাঁকে প্রয়োজন তখনই অদৃশ্য চাবির স্পর্শে সাক্ষীদের মুখ খুলেছে, আর অপ্রয়োজনে, তা কুলুপ এঁটে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

মরদেহ যখন চুল্লীতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন সর্বগ্রাসী আগুনের স্পর্শে ঐ দেহের রূপান্তর অবশ্যই ঘটবে। এবং মরদেহের শেষ চিহ্ন হিসাবে ঐ রূপান্তরিত পদার্থের কিছুটা নিশ্চয়ই সযত্নে রেখে দেওয়া হবে। মরদেহের ঐ শেষ চিহ্ন নিয়ে লেখা হয়েছে এই পর্বের চতুর্থ অনুচ্ছেদ। তদন্ত কমিটি লিখেছেন যে পরদিন তাঁরা সবাই চিতাভস্ম সংগ্রহ করতে আবার শবদাহক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে মেজর নাগাটোমো বলেছেন,—"ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহকারীকে (কর্নেল রহমান) আমার সঙ্গে শবদাহক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি পরদিন সকাল ৮টা নাগাদ হাসপাতালে গিয়েছিলাম। আমি একটি গাড়িতে করেই হাসপাতালে গিয়েছিলাম এবং যতদূর আমার মনে পড়ে দোভাষী ভদ্রলোকও পরদিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন। শবদাহক্ষেত্রে পৌঁছে আমার কাছে যে চাবিটা ছিল তা দিয়ে দাহচুল্লীর তালাটা খুলে ফেলেছিলাম এবং চুল্লীর স্লাইডিং প্লেট (sliding plate) টেনে বার করে এনেছিলাম। সদর দপ্তর থেকে আসার সময় আমি আট ইঞ্চি (8″ cube) মাপের একটি বাক্স নিয়ে

এসেছিলাম। যে প্লেটটির ওপর শবাধারটি বসানো ছিল তা টেনে বার করে আনার পর আমরা দেখেছিলাম যে সমস্ত কঙ্কালটি ঠিক আকারেই ছিল, তবে তা সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধ প্রথামতে দু'টি ছোট কাঠের লাঠি (chop-sticks) দিয়ে আমিই প্রথম তাঁর গলার কাছ থেকে এক টুকরো হাড় (bone) তুলে নিয়ে বাক্সে রেখেছিলাম। তারপর তাঁর দেহের প্রত্যেক অংশ থেকে এক এক টুক্‌রো হাড় তুলে নিয়ে আমি বাক্সে রেখেছিলাম। ভারতীয় সেনা-বাহিনীর সহকারীও (কর্নেল রহমান) আমার অনুসরণ করেছিলেন। দোভাষী ভদ্রলোক হাড় তুলেছিলেন কিনা তা আমার মনে নেই। এইভাবে সমস্ত বাক্সটি ভর্তি করে ফেলা হয়েছিল। হাড় ভর্তি বাক্সটির ঢাক্‌না পেরেক দিয়ে আটকানো হয়েছিল, তবে আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারব না যে ওখানেই, না মন্দিরেই নিয়ে যাওয়ার পর পেরেক লাগানো হয়েছিল। বাক্সটি বন্ধ করে দেওয়ার পর এক টুক্‌রো সাদা কাপড় দিয়ে তা মুড়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর ঐ বাক্সটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহকারীর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং আমরা একটি গাড়ীতে করে নিশি (পশ্চিম) হংগনজী মন্দিরে চলে গিয়েছিলাম। ঐ দিনই মন্দিরে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয়েছিল।"

কর্নেল হবিব-উর রহমান মেজর নাগাটোমোর এই বক্তব্য সমর্থন করেছেন, তবে তিনি এত বিশদভাবে কোন বিবরণ দেন নি। ১৯৪৬ সালে শ্রীহারিণ শাহ্‌ শুধু যে শবদাহক্ষেত্র পরিদর্শন করারই সুযোগ পেয়েছিলেন তা নয়, তিনি ঐ দাহক্ষেত্রের তত্ত্বাবধায়ক মিঃ চু শাংকে জিজ্ঞাসাবাদও করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে নেতাজীর শবাধারটি খুবই বড় ছিল। অপরাহ্ন তিনটা নাগাদ ঐ শবাধার শবদাহ ক্ষেত্রে আনা হয়েছিল এবং দাহ করতে সময় লেগেছিল আট ঘণ্টা। জাপানী অফিসাররা দাহ করার নিয়মিত ফী বাবদ আঠার ইয়েন জমা দিয়েছিলেন। শবাধারটি এত বড় ছিল যে তা দাহচুল্লীর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় নি, তাই মরদেহটি অপেক্ষকৃত ছোট আর একটি

শবাধারে ভর্তি করতে হয়েছিল। মিঃ চু শাং এর জবানী মতে তিনিই পরদিন সকালে চিতাভস্ম সংগ্রহ করেছিলেন এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শবভস্ম রাখার কাঠের পাত্রে তা রেখেছিলেন। শ্রীহারিণ শাহ্‌কে তিনি আরও বলেছিলেন যে হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় জনৈক ভারতীয় কয়েকজন জাপানী ভদ্রলোকের সঙ্গে একটি গাড়ী করে শবদাহক্ষেত্রে এসেছিলেন এবং ভস্মাধারটি নিয়েই চলে গিয়েছিলেন। ভারতীয় ভদ্রলোকের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে ভদ্রলোক বেশ লম্বা, পরনে সাদা পোষাক এবং হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল।

এই অনুচ্ছেদে মেজর নাগাটোমোর বিবরণ পড়ে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ভস্মাবশেষ সংগ্রহ করতে তাঁকে যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। অবশ্য এই কষ্ট তাঁকে সহ্য করতেই হ'ত কারণ সামরিক বাহিনীর তিনি একজন পদস্থ অফিসার এবং তাঁর উর্ধতন কর্তৃপক্ষ শবদেহ শেষকৃত্য করার জন্য তাঁকে যথাযথ ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে, দায়িত্ব যদি বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি সত্যিই নিতেন তাহলে তাঁর নিয়োগকর্তা তাঁকে কতটা সুনজরে দেখতেন তা ভাববার বিষয়। মরদেহের সব দায়িত্ব নিয়ে তিনি সঠিকভাবে বলতে পারেন নি যে কত তারিখে ঐ দেহ দাহ করা হয়েছিল এবং ভস্মাবশেষ সংগ্রহ করতে যাওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে দোভাষী ভদ্রলোকও গিয়েছিলেন কি না। সেনাবাহিনীর একজন পদস্থ দায়িত্বশীল অফিসারের এই ধরণের ক্রুটি বিচ্যুতি কতটা সহনীয়, তা তাঁর উধতন কর্তৃপক্ষই বিচার করে বলতে পারেন, তবে সাধারণের দৃষ্টিতে এই ধরণের ক্রুটি কটু মনে হয়। নেতাজী তদন্ত কমিটি মেজর নাগাটোমার বক্তব্য ধৈর্য ধরে শুনেছেন। দাহচুল্লী থেকে চিতাভস্ম সংগ্রহ করার প্রসঙ্গে মেজর নাগাটোমো প্রথম বলেছেন যে তিনি চাবি দিয়ে চুল্লীর তালা খুলে স্লাইডিং প্লেটটি টেনে বার করে এনেছিলেন, কিন্তু পরে তিনি আবার বলেছিলেন যে তাঁরা সবাই প্লেটটি টেনে বার করে এনেছিলেন। এই প্রসঙ্গে মেজর

নাগাটোমোর জবানীর মধ্যেই অসঙ্গতি দেখা যায়। দাহচুল্লী থেকে স্লাইডিং প্লেটকে টেনে বার করে নিয়ে আসার ব্যাপারে একবার দাবীদার তিনি স্বয়ং আর একবার সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সবাই। আরও একটু অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে তাহ'ল, শবদাহক্ষেত্রের দাহচুল্লীতে মরদেহ ঢুকিয়ে দেওয়া এবং দাহ হয়ে যাওয়ার পরে ভস্মাবশেষ বার করে নেওয়ার জন্য শবদাহ ক্ষেত্রের কোন কর্মীই কাজ করেন নি। জাপ সামরিক বাহিনীর সৈনিক ও অফিসার যে দাহচুল্লী চালনা করতে পটু তাও বিশ্বাস করে নিতে হয় কিন্তু, এই দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব কিনা তা তর্কের বিষয়। কিন্তু সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়া মরদেহ থেকে কতকগুলো হাড়ের টুক্রো কি করে সংগ্রহ করা হয় তা বোঝা সত্যই দুষ্কর। মেজর নাগাটোমো ও কর্নেল রহমান দাহ করা দেহের প্রত্যেক অঙ্গ থেকে হাড় সংগ্রহ করেছিলেন বলে জানা যায়। মরদেহের ভস্মাবশেষ ও হাড় একই পদার্থ নয় (যাঁরা ভাষাতত্ত্ববিদ বা ব্যাকরণ-বিশারদ তাঁরাও) তা নিশ্চয় সবাই মেনে নেবেন। সুতরাং এক্ষেত্রে যে অসঙ্গতি রয়ে গেছে তার ব্যাখ্যা করা হয় নি। মেজর নাগাটোমো সামরিক দপ্তর থেকে নির্দেশ পেয়ে মরদেহের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বলতে পারেন নি যে দোভাষী মিঃ নাকামুরা মরদেহ থেকে হাড় (ভস্ম নয়) সংগ্রহ করেছিলেন কিনা ; অবশ্য তিনি পরদিন মেজর নাগাটোমোর সঙ্গী হয়েছিলেন কিনা তাও তিনি মনে করে বলতে পারেন নি। আর একটি বিষয়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহ'লো কর্নেল হবিব-উর রহমান এর হাড় সংগ্রহ। আগের দিন যিনি আঙ্গুল দিয়ে একটি ধূপকাঠি ধরতে পারেন নি পরের দিন তিনি কিভাবে ছোট দুটি কাঠের লাঠি দিয়ে মরদেহের প্রত্যেক অঙ্গ থেকে হাড় সংগ্রহ করেছিলেন তা তিনিই বলতে পারেন। কয়েক ঘণ্টার তফাতে তিনি কিভাবে এত দ্রুত আরোগ্যলাভ করেছিলেন সেই সম্বন্ধে হাসপাতেলর চিকিৎসক কিন্তু কোন উচ্চবাচ্য করেন নি।

মেজর নাগাটোমোর বক্তব্যের ওপর তদন্ত কমিটি যথেষ্ট নির্ভর

করেছেন এবং তা যথাযথই হয়েছে কারণ, জাপ সামরিক দপ্তর থেকে তাঁরই ওপর সব দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনিও অনেক কথাই মনে করে উঠতে পারেন নাই তাও তিনিই স্বীকার করেছেন। হাড় ভর্তি বাক্সটি কোথায় পেরেক দিয়ে আঁটা হয়েছিল তা তিনি বলতে পারেন নি। কিন্তু ঐ বাক্সটি যে কর্নেল হবিব-উর রহমান এর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার প্রমাণ কি ? কর্নেল রহমান নেতাজীর ভস্মাবশেষের কাছে বসে আছেন প্রমাণ রেখে যে ছবি রিপোর্টে পাওয়া যায়, তা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় যে হাড়ের বাক্সটি কি করে তিনি গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে ছিলেন। ঐ ছবি দেখে ভাবনায় পড়তে হয় যে কোন ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার বলে তিনি হাত দিয়ে হাড় তোলার কাঠি হু'টি ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভারতীয় সাংবাদিক শ্রীহারিণ শাহ্ ১৯৪৬ সালে যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, তা কোনভাবেই আলোচ্য ঘটনার সমর্থনে যায় না। শবদাহ ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধায়ক মিঃ চু শাং শবাধার বদল করার কথা বলেছিলেন, কিন্তু কোন প্রত্যক্ষদর্শীই ঐ প্রসঙ্গে কিছু বলেন নি। তবে মিঃ চু শাং এর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে তিনি ভস্মাবশেষ সংগ্রহ করে রেখেছিলেন ; অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীদের মত দাহ করা মরদেহ থেকে হাড় সংগ্রহ করেন নি। শ্রীশাহ্‌র তদন্তের কথা রিপোর্টের অনেক অংশেই উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু তাঁর তদন্ত সম্পর্কে বিশেষভাবে কোন আলোচনা করা হয় নি। ফরমোসা পরিদর্শন করার সময় শ্রীশাহ্ ডেথ সার্টিফিকেট ও মরদেহ দাহ করার অনুমতি পত্র দেখার জন্য তাইহোকুর 'ব্যুরো অফ হেলথ্ এ্যাণ্ড হাইজিন' এ গিয়েছিলেন। সেখানে ঐ দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ কান ও হু'জন করণিকের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। তাঁরা সবাই আলোচ্য ঘটনার সময় কর্মরত ছিলেন। শ্রীশাহ্‌কে তাঁরা বলেছিলেন যে মরদেহটি জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তির দেহ হওয়ার দরুণ তাঁদের কাউকেই ঐ দেহ দেখতে দেওয়া হয় নি। তবে ঐ দেহটি শবাধারের বাইরে বার

করে এনে কাঠের পাটাতনের ওপর রাখা হয়েছিল। দেহটি ছিল কাপড়ে মোড়া। তারপর ঐ দেহ চিতার ওপর তোলা হয়েছিল। তাইহোকুর সামরিক হাসপাতাল থেকে চিকিৎসক যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাতে লেখা ছিল : *

সামরিক হাসপাতাল থেকে
দি ব্যুরো অফ্ হেলথ্ এ্যাণ্ড হাইজিন-কে
রিপোর্টের তারিখ—২১শে আগস্ট, ১৯৪৫

মৃত্যুর সার্টিফিকেট

ব্যক্তির নাম :	ওকারা ওচিরো
পুরুষ না স্ত্রীলোক :	পুরুষ
জন্ম :	৯ই এপ্রিল, ১৯২২ জন্মস্থান—হিতি
পেশা :	তাইওয়ান-এর সামরিক সরকার-এর সেনাবাহিনীর অনুগত অফিসার
মৃত্যুর কারণ :	অসুস্থতা
অসুস্থতার ধরণ :	হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া
অসুস্থতার সময় :	১৭ই আগস্ট, ১৯৪৫
মৃত্যুর সময় :	১৯শে আগস্ট, বিকাল ৪টা
মৃত্যুর স্থান :	সামরিক হাসপাতাল
তারিখ :	২১শে আগস্ট, ১৯৪৫
ডাক্তারের নাম ও শীলমোহর :	চুলুতা তোইজী চেন্‌জা, সিস্‌কোয়ান (জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়)

Dissentient Report,—by Shri Suresh Chandra Bose, P. 167-70

এই রিপোর্ট দেখার পর শ্রীশাহ্ ব্যুরোর জনৈক করণিককে প্রশ্ন করেছিলেন যে, মারা গেলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, অথচ সব বিবরণই ভিন্ন কেন? উত্তরে করণিক ভদ্রলোক বলেছিলেন যে মরদেহের সঙ্গে যে সব জাপানী অফিসাররা এসেছিলেন তাঁদের নির্দেশেই মিথ্যা বিবরণ লিখে নেওয়া হয়েছিল। এই যুক্তি কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কোন ব্যক্তি মারা গেলে তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায় না এবং গোপনতা রক্ষা করার যে প্রয়োজনই থাকুক না কেন, দলিল পত্রে কোন কারচুপির প্রশ্নই ওঠে না।

জীবিত নেতাজীর নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সব রকম গোপনীয়তা অবলম্বন প্রয়োজন অবশ্যই দেখা দেয়; কিন্তু মৃত নেতাজীর জন্য এই ধরনের ভৌতিক বা আদিভৌতিক নিরাপত্তার কি প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল তা বোঝা যায় না। সরকার যতই গোপনতা রক্ষা করে থাকুন দলিল পত্র অবশ্যই সঠিকভাবে রক্ষা করা হয়ে থাকে, কারণ তা হ'ল ঘটনার ইতিহাস। সে ক্ষেত্রে ইতিহাসকে বিকৃত করে রাখার প্রয়াস কখনই ঘটনার যৌক্তিকতা বা সত্যতা প্রমাণ করে না। তাছাড়া তাইহোকু হাসপাতালের অধিকর্তা ডাঃ ইয়োশিমি বলেছিলেন যে ডেথ সার্টিফিকেটে মৃতের নাম লেখা হয়েছিল 'কাতা কানা'। কিন্তু এই সার্টিফিকেটে মৃতের নাম 'ওকারা ওচিরো' এবং ডাক্তারের নামটিও অন্য। তাহলে ডাঃ ইয়োশিমি যে সার্টিফিকেটের কথা বলেছেন তা কোথায়? সরকারী মরদেহ দাহক্ষেত্রে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট ছাড়া কোন মরদেহ দাহ করা যায় বলে কেউ বিশ্বাস করবেন না। সুতরাং সমস্ত ঘটনার মধ্যে কোন পর্যায়ে ঘটনার সত্যতা নিরূপণ করার মত তথ্য নেই। ডেথ সার্টিফিকেটে অপর কোন ব্যক্তির নাম সত্ত্বেও, যদি বিশ্বাস করতে হয় যে নেতাজী সুভাষচন্দ্রই মৃত, তাহ'লে ঐ স্থানে নেতাজীর নাম উল্লেখ করা থাকলে কোন্ ব্যক্তিকে মৃত বলে ধরে নেওয়া হ'ত তা জানতেও ইচ্ছা হয়।

তাইহোকুর* ঐ বিচিত্র দাহচুল্লী সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও কিছু বিচিত্র বিবরণ দিয়েছেন যা রিপোর্টের পাতায় স্থান পায় নি। কর্নেল রহমান স্বয়ং বলেছেন যে শবদাহক্ষেত্রে তুই সারিতে বার চোদ্দটি দাহচুল্লী ছিল। কিন্তু দোভাষী মিঃ নাকামুরা নক্সা এঁকে শবদাহ-ক্ষেত্রে মাত্র একটি দাহ চুল্লী দেখিয়েছেন। এবং মেজর নাগাটোমো তাঁর নক্সায় মাত্র তিনটি দাহচুল্লী একেছেন। উপরোক্ত তিনজনই প্রত্যক্ষদর্শী; অথচ তাঁদের বিবরণের মধ্যে সামান্যতম মিলও খুঁজে পাওয়া যায় না। (সংখ্যার এত বেশী ফারাক কি করে সম্ভব হয়?) দোভাষী মিঃ নাকামুরা মেজর নাগাটোমোর সঙ্গে শবদাহক্ষেত্রে গিয়েছিলেন কিনা, তা মেজর নাগাটোমো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারেন নি। কিন্তু দোভাষী মিঃ নাকামুরা বলেছেন যে মরদেহের হাড় তোলার জন্য তুটি ছোট কাঠের লাঠি এনে দিয়েছিলেন একজন পুরোহিত। কর্নেল হবিব-উর রহমান লাঠি তু'টি ধরতে পারছিলেন না বলে তিনিই (মিঃ নাকামুরা) কর্নেল রহমান এর হয়ে হাড় সংগ্রহ করার কাজটুকু সেরে দিয়েছিলেন, তবে কর্নেল রহমান ঠিক তু'বার লাঠির মাথাটুকু ছুঁয়েছিলেন। হাড়ের বাক্সটি বয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তিনি বলেছেন যে কর্নেল রহমান এর গলায় পোড়াক্ষত থাকার দরুণ তাঁর পক্ষে বাক্সটি গলায় ঝুঁলিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় নি। ঐ কাজটি করেছিলেন জনৈক জাপানী সামরিক অফিসার।

এই ধরনের সাক্ষ্য থেকে কোনভাবেই প্রমাণ হয় না যে নেতাজীর পার্থিব দেহ সত্যিই দাহ করা হয়েছিল। তদন্ত কমিটি স্বচক্ষে আলোচ্য ঘটনার কিছুই দেখেন নি। বিচারালয়ের বিচারকও কোন ঘটনাই স্বচক্ষে দেখেন না, কিন্তু ঘটনার বিচার তাঁকে করতে হয় এবং প্রত্যক্ষদশীরদের বিবরণ, পারিপার্শ্বিক প্রমাণ ও প্রামাণ্য তথ্য বিচার বিবেচনা করেই তাঁকে রায় দিতে হয়। আলোচ্য ঘটনার যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী, তাঁরা ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে প্রত্যেক পর্যায়ে এত

* Dissent Report—by Shri S. C. Bose, P-141-42

প্রকট বৈষম্য ও অসঙ্গতি রেখেছেন যে তা থেকে ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না ; বরং তাঁরা এত বেশী বিরোধী বক্তব্য রেখেছেন যে, অনুমান করে নিতে কোন অসুবিধা হয় না যে এখনও তাঁরা আদর্শ সৈনিকের মত কম্যাণ্ডার এর নির্দেশ মেনে বলে চলেছেন, "তিনি আর নেই।"

পঞ্চম অনুচ্ছেদে তদন্ত কমিটি লিখেছেন যে শবদাহ সম্বন্ধেও দু'জন জাপানী, একজন ভারতীয় (পাকিস্তানী) এবং একজন ফরমোসা-বাসীর সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। তাঁদের বিবরণে একের সঙ্গে অন্যের যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁরা সবাই যে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, তার সঙ্গে যদি তাঁরা যুক্ত না থাকবেন, তাহ'লে একই কাহিনী তাঁরা কেন বলবেন, তার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাইহোকু শবদাহক্ষেত্রে দাহ করা ছাড়া অন্য কোনভাবে নেতাজীর দেহের শেষকৃত্য করা হয়েছিল বলে কোন অভিমত পাওয়া যায় নি। মরদেহ বিমানে টোকিও পাঠানো হয়েছে বলে জানানো, সাউদার্ন আর্মির সদর দপ্তরের ২০শে আগস্টের টেলিগ্রাম থেকে সামান্য বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে, তা দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, তাঁদের নিজেদের ব্যাখ্যানুসারে নেতাজীর মরদেহ সম্বন্ধে রিপোর্ট বিমানে টোকিও পাঠানো হয়েছিল, এবং তা সম্ভবত কর্নেল টাডার সঙ্গে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁরা বোধ হয় মরদেহ বিমানে টোকিও পাঠানোর নির্দেশ সমন্বিত ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এর প্রথম টেলিগ্রামের উল্লেখ করেছিলেন, যা পরে পরিবর্তিত হয়েছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের মরদেহ যে তাইহোকু শবদাহক্ষেত্রে দাহ করা হয়েছিল, তা সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায় এবং তাঁরই ভস্মাবশেষ পরে ঐ শহরের নিশি হংগনজী মন্দিরে রেখে দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে ধুলিমাটির দেহ ধুলোয় মিলিয়ে যায় এবং অমন এক বিরাট পুরুষের সামান্য চিহ্নই পরে থাকে।

নেতাজী তদন্ত কমিটির কাছে যাঁরা সাক্ষী দিয়েছেন তাঁদের বক্তব্যের সারাংশ হ'ল নেতাজীর পার্থিব দেহ দাহ করা হয়েছিল এবং তাঁর দেহের ভস্মাবশেষ সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল। যদি এই কথাগুলি থেকেই প্রমাণ হয় যে তাইহোকুর কাহিনী সত্য তাহ'লে, তদন্ত কমিটি ঘটনার বিশদ বিবরণের জন্য তাঁদের জেরা করেছিলেন কেন? সাক্ষীদের জবানীর প্রয়োজন হয় ঘটনার সত্যতা নিরূপণ করার জন্য। বিভিন্ন সাক্ষীদের বিবরণের মধ্যে সঙ্গতি ও তথ্যগত সমর্থন না থাকলে ঘটনার সত্যতা প্রমাণ হয় না। শ্রীহারিণ শাহ্‌র স্থানীয় অনুসন্ধান রিপোর্ট ও বিভিন্ন সাক্ষীদের জবানী থেকে ঘটনা সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা থেকে কোনভাবেই কোন একটি পর্যায়ে সাক্ষীদের জবানীর মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক পর্যায়ে একজন সাক্ষীর জবানীর সঙ্গে অন্যের জবানীর তফাৎ অনেক। (১) কবে শবদেহ দাহ করা হয়েছিল তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি; (২) শবাধার কিভাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তা নির্ধারণ করা যায় নি; (৩) শবযাত্রায় কতজন যোগ দিয়েছিলেন তা সুনির্দিষ্ট হয় নি; (৪) দেহটি যেখানে দাহ করা হল বলে জানানো হয়েছে সেই জায়গার বিবরণ দিতে গিয়ে সাক্ষীরা নিজেদের মধ্যে একমত হন নি; (৫) দাহ চুল্লীতে তালা কখন দেওয়া হ'ল তা কেউ বলেন নি; (৬) দাহ চুল্লীর একটি মাত্র চাবিকে কাছে রাখার দাবীদার দু'জন; (৭) আগের দিন যিনি একটি ধূপকাঠি ধরতে পারেননি পরদিন তিনি চপ্‌স্টিক্ কি করে ধরলেন এবং অন্য একজন বললেন তিনি ধরেননি, এই বিরোধিতার কোন সমাধান সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না; (৮) চুল্লী থেকে ভস্মাবশেষের বদলে হাড় কি করে সংগৃহীত হ'ল, তা বোঝা যায় না; (৯) শবদাহক্ষেত্রে শবাধর বদল করার বিষয়টি বিভ্রান্তিকর; (১০) ভস্মাবশেষ কোন্ ধরণের পাত্রে সংগ্রহ করা হয়েছিল সেই বিষয়ে মতভেদ রয়েছে; (১১) হাড় ভর্তি ভস্মাধার কে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তা সুনির্ধারিত হয় নি। সাক্ষীদের

জবানীতে এই ধরণের অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও কি ধরে নেওয়া যায় যে আলোচ্য ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে? উত্তরে সবাই একবাক্যে বলবেন, না, কিন্তু তদন্ত কমিটি বলেছেন, হ্যাঁ। সাউদার্ন আর্মির সদর দপ্তর থেকে পাঠানো টেলিগ্রামটি নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। তদন্ত কমিটি ঐ টেলিগ্রামের ভাষার অর্থ খুঁজে বার করার চেষ্টাও করেছেন কিন্তু দ্বিতীয় টেলিগ্রামটিতে কি লেখা ছিল তার সমর্থনে প্রমাণ কোথায়? তদন্ত কমিটির চোখে, টেলিগ্রামটি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে, কিন্তু তদন্তকারী গোয়েন্দাদলের কাছে ঐ টেলিগ্রাম রহস্যের সন্ধান দিয়েছে। কমিটি অভিমত জ্ঞাপন করেছেন যে আলোচ্য ঘটনার সঙ্গে সাক্ষীরা জড়িত না থাকলে একই কাহিনী বলার কোন কারণ নেই। সাক্ষীরা আলচ্য ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নন, একথা বলার সাধ্য কারও নেই। কারণ আলোচ্য কাহিনীর বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার জন্য সাক্ষীরা সবাই অভিনেতা। সুপরিকল্পিত পথে দুর্ঘটনার পটভূমিতে একটি নাটক রচিত হ'ল। নাটকের চরিত্রগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্বাচন করা হ'ল অভিনেতাদের। সাবলীল ভঙ্গীমায় তাঁরা সুরচিত, সুপ্রযোজিত এক কাহিনীকে মঞ্চে এনে সুঅভিনয় করে গেলেন। সাক্ষীরা যে সবাই অংশীদার তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তাঁদের জবানী ঘটনার বাস্তব সত্যতা প্রমাণ করে না— প্রতিষ্ঠা করে যে আলোচ্য ঘটনা আগাগোড়া সাজানো।

১৪

নেতাজী তদন্ত কমিটির রিপোর্টের চতুর্থ পর্বের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে লেখা হয়েছে যে সাইগন বিমান বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করার পর থেকে নিশি হংগনজী মন্দিরে ভস্মাবশেষ রাখা পর্যন্ত কাহিনীটি পড়লে একজন সাধারণ ব্যক্তি একথা না ভেবেই পারবেন না যে সমস্ত বিষয়টি সুসংবদ্ধভাবে রক্ষা করা হয় নি। নেতাজীর বিমান পরিবহনের চাহিদা খুবই সামান্য ছিল। তিনি শুধু তাঁর নিজের ও অন্য দু'জন উপদেষ্টা ও অফিসার এর জন্য বিমানের ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন। বোঝা যায় না যে তাঁর এই সামান্য চাহিদা কেন মেটানো যায় নি। ঐ সময়ে, বিমানে আসন পাওয়া যে খুব কষ্টকর ছিল তা সত্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে মেজর কোনো তখন টোকিওতে বদলি হয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁকেও বিমানে আসন পাওয়ার জন্য দুই সপ্তাহ সাইগনে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। অথচ ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতোর জবানী থেকে তদন্ত কমিটি জানতে পারেন যে জাপানী বিমানের যাতায়াত ২৫শে আগস্ট এর পর থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল, অর্থাৎ নেতাজী সাইগন পরিত্যাগ করে যাওয়ার আটদিন পরে। কোন একটি বিমানে মাত্র সাতটি আসনের ব্যবস্থা করে দেওয়া সম্ভবত খুব অসুবিধাজনক ছিল না। জাপানী লিঁয়াসো মিশনের প্রধান জেনারেল সিডি আশা করেছিলেন যে প্রয়োজনীয় আসনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। কিন্তু যখন তাঁকে জানানো হয়েছিল যে প্রয়োজনীয় আসনের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় তখন তিনি নিরাশ হয়েছিলেন। বিমানটিও যে খুব ভাল অবস্থায় ছিল না তা অনুমান করে নেওয়া যায় সাইগনে বিমানের ইঞ্জিন বদল করার ঘটনা থেকে। ফরমোসা সামরিক বাহিনীর চীফ অফ্ স্টাফ্, জেনারেল ইসায়ামা জানিয়েছেন যে আলোচ্য বিমানের

ইঞ্জিনটি পুরাতন ঝরঝরে ছিল। বিমান দুর্ঘটনা যখন ঘটেছিল তখন সমস্ত বিষয়টিকে খুবই সাধারণভাবে দেখা হয়েছিল। পদস্থ কোন অফিসারই দুর্ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন নি। কিন্তু স্টাফ অফিসার, মেজর নাগাটোমোর সাক্ষ্য থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর মুহূর্তেই বিমান বন্দর থেকে দুর্ঘটনার খবর সেনাবাহিনীর দপ্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল। ফরমোসা সেনা বাহিনীর চীফ অফ্ স্টাফ্, জেনারেল ইসায়ামা খোলাখুলিভাবে জানিয়েছেন যে পরদিন সকালে অফিসে পৌঁছে তিনি দুর্ঘটনার খবর জানতে পেরেছিলেন। যদিও লেঃ কর্নেল নোনোগাকি বলেছেন যে সদর দপ্তরে খবর দেওয়া মাত্র, সেখান থেকে কয়েকজন স্টাফ্ অফিসার ছুটে এসেছিলেন এবং নেতাজী তখনও জীবিত ছিলেন। কিন্তু স্টাফ অফিসার কর্নেল মিয়াতা ও মেজর নাগাটোমো দু'জনেই বলেছেন যে নেতাজী মারা যাওয়ার পর তাঁরা এসে পৌঁছেছিলেন। মেজর নাগাটোমো বলেছেন যে, খবর পাওয়া মাত্র ফরমোসা সেনাবাহিনীর কম্যাণ্ডার জেনারেল আণ্ডো নেতাজীকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছেন যে জেনারেল আণ্ডো নিশি হংগনজী মন্দিরে অনুষ্ঠিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানেও যোগ দিয়েছিলেন। ফরমোসা সেনাবাহিনীর চীফ অফ্ জেনারেল স্টাফ, জেনারেল ইসায়ামার জানা উচিত ছিল যে সেনাবাহিনীর কম্যাণ্ডার কি করেছিলেন। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কাহিনী বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি নিজে বা জেনারেল আণ্ডো কেউই নেতাজীর মরদেহের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে হাসপাতালে যান নি বা কোন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে যোগ দেন নি। তিনি আরও বলেন যে জাপানের আত্মসমর্পণের দিন থেকেই ঐ সেনাবাহিনীর ঐ কম্যাণ্ডারটি নিজেকে তাঁর বাড়ীর মধ্যেই আবদ্ধ রেখেছিলেন এবং কোন সময় ঘরের বাইরে পর্যন্ত আসেন নি। যুক্তি স্বরূপ তিনি বলেছেন যে নেতাজীর মত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি টোকিওতে পালিয়ে যাচ্ছিলেন বলেই ঐ

ব্যাপারে কোন গুরুত্ব আরোপ না করার জন্য তাঁরা দূরে ছিলেন। এই কৈফিয়ত বিশ্বাসযোগ্য নয় কারণ তিনি নিজেই জানিয়েছেন যে এক সপ্তাহ পরে যখন ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী ডঃ বা ম ও বার্মা সেনাবাহিনীর চীফ অফ্ জেনারেল স্টাফ, জেনারেল টানাকা যখন বিমানে টোকিওর পথে তাইহোকুতে অবতরণ করেছিলেন তখন তিনিই তাঁদের অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিলেন। নেতাজীর মরদেহের কি গতি হ'ল সেই বিষয়ে স্থানীয় সেনাবাহিনীর কম্যাণ্ডার পারতপক্ষে কোন বিশেষ আগ্রহ দেখান নি। একজন যথেষ্ট নবীন অফিসার, জনৈক মেজরকে (নাগাটোমা) শুধু নিয়োগ করা হয়েছিল এবং তারপর আর বেশি কোন আগ্রহ তাঁরা বাহ্যত দেখায় নি। জেনারেল ইসামায়া বলেন, "নেতাজীর চিতাভস্ম সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়টি আমি আমার স্টাফ অফিসার এর ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলাম এবং তাঁর কাছ থেকে কোন রিপোর্ট না পাওয়ার দরুণ আমি ধরে নিয়েছিলাম যে সব কাজই সুষ্ঠুভাবে হয়েছে।" বিমান দুর্ঘটনার ব্যাপারে একটি আনুষ্ঠানিক তদন্ত সবাই আশা করতে পারেন কারণ তা অল্পবিস্তর নিয়ম মাফিক ব্যাপার। উপরন্তু, ঐ বিমানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস ও লেঃ জেনারেল সিডির মত বিশিষ্ট দু'জন আরোহী ছিলেন; কিন্তু কোন রকম তদন্তই করা হয় নি। এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হ'লে জেনারেল ইসায়ামা প্রথম বলেন যে ঐ দুর্ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করার কোন দায়িত্ব ফরমোসা সেনাবাহিনীর ছিল না। কারণ ঐ বিমানটি তাঁদের অধীনে ছিল না—আলোচ্য বিমানটি ছিল সিঙ্গাপুরস্থ তৃতীয় বিমান বহরের অধীনে। পরে তিনি স্বীকার করেন যে স্থানীয় সেনাবাহিনীর কম্যাণ্ডার এর তরফ থেকেই তদন্ত করার আশা করা গিয়েছিল। তিনি আরও বলেন যে এই বিমানটির দুর্ঘটনার ব্যাপারেই একটি রিপোর্ট তাঁরই মাধ্যমে লেঃ কর্নেল শিবুয়া জাপানের ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এ পেশ করেছিলেন। বিমান দুর্ঘটনা সম্বন্ধে আলোচিত পর্বে আগেই উল্লেখ

করা হয়েছে যে লেঃ কর্নেল শিবুয়া এই ধরণের রিপোর্টের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের এক মিত্ররাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন নেতাজী কিন্তু সত্যই তাঁর মরদেহের শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল খুবই অনাড়ম্বভাবে এবং শুধু মেজর নাগাটোমা ও ডজনখানেক সৈন্যঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। যথাযথভাবে বিবরণ দিতে গিয়ে বলা যেতে পারে, "কোন একটি ড্রামের ধ্বনিও শোনা যায় নি ; অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কোন সুরও ধ্বনিত হয়নি।" যথাযথ সামরিক সম্মান দেখিয়েই তাঁর মরদেহ কবরস্থ করাটাই আশা করা যেতে পারে—যেমন, জাতীয় পতাকায় ঢেকে দেওয়া শববাহী শকট ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে, বন্দুকের মুখ মাটির দিকে নামিয়ে সৈনিকদল নতমুখে সারিবেঁধে দাঁড়িয়ে আছে—ইত্যাদি ইত্যাদি। একথা সত্যি যে ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগস্ট আত্মসমর্পণ করার পর জাপানে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও চিন্তার অবকাশ থেকে যায় যে, যা করণীয় ছিল, তা করা হয় নি।

নেতাজী তদন্ত কমিটি সাধারণ মানুষের মনের কথা বুঝতে চেষ্টা করেছেন বলে এই অনুচ্ছেদের শুরুতেই নিদর্শন রেখেছেন। তাঁরা সাধারণের মনের যে চিন্তার কথা লিখেছেন তা ঠিক নয়। রিপোর্ট পড়ে সবার মনে একটি চিন্তাই জাগবে তাহ'ল, নেতাজী সুভাষচন্দ্র যে তাইহোকুর প্রান্তরে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন বলে প্রচার করা হয়েছে তার প্রমাণ কোথায় ? প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবী করে সাক্ষীরা যে বিবরণই দাখিল করুন, আর দলিল দস্তাবেজ ও নক্সা পেশ করে যে ইতিবৃত্তের কথাই বলা হোক, আলোচ্য ঘটনার সমর্থনে পাওয়া তথ্যের বিচার বিবেচনা করে সুনির্দিষ্টভাবে কোন সিদ্ধান্তে না পৌঁছতে পারলে অমন ঘটনা যে সত্যই ঘটেছিল তা বলা যাবে না। ঘটনা ঘটে থাকলে তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়া চাই-ই। সাইগন বিমানে আসন ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য যে বাক্যালাপ ও সম্মেলন চলেছিল বলে জানা যায় তা থেকে কোনভাবেই স্বীকার

করে নেওয়া যায় কি, যে বিমানে স্থান পাওয়ার যে ছবিটি সবার সামনে তুলে ধরা হয়েছে তা সত্য ? তদন্ত কমিটি সাক্ষীদের জবানী থেকে জানতে পেরেছেন যে অন্তত ২৫শে আগস্ট এর আগে বিমানের যাতয়াত নিয়মিত করা হয় নি। তাছাড়া আরও জানা যায় যে ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রীকে একটি বিশেষ বিমানে আলোচ্য ঘটনার সাতদিন পরে টোকিও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ফিলিপাইন এর রাষ্ট্রপতির জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অথচ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস এর জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা করা যায় নি, এমন কথা কোন্ যুক্তিতে বিশ্বাসযোগ্য তা বোঝা দুষ্কর। নেতাজীর নাম আজও জাপানের ঘরে ঘরে শোনা যায়। আজও জাপানের মন্ত্রী উক্তি করেন যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস এশিয়ার শ্রেষ্ঠ নেতা। আজাদ হিন্দ্ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন জাপান। অথচ প্রয়োজনে নেতাজীর জন্য একটি বিমানের ব্যবস্থা করাও গেল না ? এমন অদ্ভুত ব্যাপারকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারেন অদ্ভুত চিন্তাশক্তি সম্পন্ন যাঁরা তাঁরাই। যুদ্ধের সময় এক পদস্থ সামরিক অফিসার বদলি হয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু সুদীর্ঘ দু'সপ্তাহ অপেক্ষা করেই তিনি বিমানে কোন আসন পান নি এমন অলীক কথাও সাক্ষীদের জবানী থেকে শোনা গেছে। ঐ কথা কতদূর সত্য তা বলতে পারেন জাপ সরকার এর সামরিক বিভাগ। তবে একথা ঠিক যে যুদ্ধের সময় দেশের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে ঐ বিভাগেরই একজন পদস্থ অফিসার তাঁর কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য বিমানে আসন পেলেন না এমন ত্রুটি বিচ্যুতি সামরিক আদালতের বিচার্য বিষয়। নেতাজী তদন্ত কমিটি তদন্ত করে মন্তব্য করেছেন যে আলোচ্য ঘটনাকালে বিমানে আসন পাওয়া সহজ ছিল না ; কিন্তু সাতটি আসনের ব্যবস্থা করে দেওয়া নাকি কঠিনও ছিল না। সাইগন এ আসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে সেখানে যে বৈঠক চলেছিল বলে জানা যায়, সেই বিষয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। ঐ আলোচনার ক্ষেত্রে দেখা গেছে

যে বিমানে আসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে সব আলোচনা তখন চলেছিল তাতে যোগদান করেছিলেন স্বয়ং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, কর্নেল হবিব-উর রহমান এবং জাপানি অফিসারগণ। আর একথাও সত্য যে জাপানী কর্তৃপক্ষ নেতাজীকে সর্বতোভাবে সহায়তা করতে প্রস্তুত ছিলেন। সুতরাং সাইগনের ঐ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে যে কোন অভিনব পরিকল্পনা রচনা করা সম্ভব নয়, তা কেউ দৃঢ়তার সঙ্গে হলফ করে বলতে পারেন না। অন্যান্য মিত্ররাষ্ট্রের অপেক্ষাকৃত কম প্রভাবশালী প্রধানদের জন্য বিশেষ বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু নেতাজীর ক্ষেত্রে একদল সামরিক অফিসারের সঙ্গে কোন রকমে দু'টি আসনের ব্যবস্থা হয়েছিল এমন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা বিশ্বাসযোগ্য নয়, ছেলেভুলানো উপকথা। সাইগনে যে বৈঠক হয়েছিল তারই মাধ্যমে রচিত হয়েছিল তাইহোকুর রঙ্গমঞ্চের নাটক; যে নাটকের মহড়া আজও অনেকেই দিয়ে চলেছেন। নেতাজীর ইচ্ছা মতেই জাপানী কর্তৃপক্ষ একাধিক আসনের ব্যবস্থা করে দিতে অস্বীকার করেছেন, পরে তাঁরই নির্দেশে আরও একটি আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নেতাজী জানতেন যে জাপানের পক্ষে আর বেশী আসনেয় ব্যবস্থা করে দেওয়া সম্ভব নয় তবুও তিনি শ্রী আয়ার ও ক্যাপ্টেন সিংকে বিমান বন্দর পর্যন্ত যেতে বলেছিলে, এই সংবাদটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই সংবাদ বিমানে আসন ব্যবস্থার মূল কাহিনীর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দেয়।

ফরমোসা সেনাবাহিনীর চীফ অফ্ জেনারেল স্টাফ্, জেনারেল ইসায়ামার বিমানের ইঞ্জিন সম্বন্ধে বক্তব্য তদন্ত কমিটি উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। তদন্ত কমিটি সাক্ষীদের জবানী থেকে জানতে পেরেছেন বিমানের ইঞ্জিনটির অবস্থা সম্বন্ধে তাঁরা একমত হতে পারেন নি। জেনারেল ইসায়ামা স্বয়ং মন্তব্য করেছেন যে আলোচ্য বিমান সিঙ্গাপুরস্থ তৃতীয় বিমান বহরের অধীনে থাকার দরুণ ঐ বিমানের দুর্ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করার

দায়িত্ব তাঁর সেনাবিভাগের ছিল না। তাছাড়া, সাইগন বিমান বন্দরে তিনি উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে বিমানটির ইঞ্জিন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সত্যের অপলাপ। কারণ বিমানের তত্বাবধানের রেকর্ড রয়েছে তৃতীয় বিমান বহরের অধীনে, যেহেতু বিমানটি ঐ বহরের অধীনে এবং তিনি নিজে বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন না, সুতরাং স্বচক্ষে বিমানটি দেখেন নি। আর যাঁরা বিমানটি দেখেছিলেন তাঁরা বিমানের ইঞ্জিন সম্বন্ধে মতৈক্যে পৌঁছাতে পারেন নি। সুতরাং যে গোলযোগের দরুণ অর্থাৎ ইঞ্জিনে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকার জন্য বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার সম্ভাবনা, তা যে সত্যই ছিল তা কোনভাবেই প্রমাণিত হয় না। জাপ কর্তৃপক্ষ নেতাজীর জন্য যে কোনরকমে দায়সারা গোছের কাজ করেছিলেন তা বিশ্বাস করার মত কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এবং তদন্ত কমিটিও সেই মর্মে কোনপ্রকার বক্তব্য হাজির করেন নি। আলোচ্য বিমান দুর্ঘটনার ব্যাপারে কোন গুরুত্ব আরোপ না করে তাঁরা নিদর্শন রেখেছেন যে আসলে 'গুরুত্ব' আরোপ করার মত কোন ঘটনাই ঘটে নি।

নেতাজী তদন্ত কমিটি অনুসন্ধান করে নিশ্চিতভাবে জেনেছেন যে আলোচ্য দুর্ঘটনা যখন ঘটেছিল তখন পদস্থ কোন ব্যক্তিই ঘটনাস্থলে আসেন নি। কিন্তু সামরিক বিভাগের কয়েকজন নিম্ন-পদস্থ অফিসারের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে আলোচ্য দুর্ঘটনার খবর নাকি সামরিক সদর দপ্তরে পৌঁছেছিল। এই বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করতে গেলে সত্যিই নিরাশ হয়ে পড়তে হয়। তাইহোকুর সামরিক দপ্তরের কোন্ ব্যক্তি সংবাদটি প্রথম পেয়েছিলেন তা জানা যায় না। ঐ সংবাদ সদর দপ্তরে পৌঁছানোর পর কর্নেল ও মেজর পদের অফিসারদের হাসপাতালে যাওয়ার নির্দেশ কে দিয়েছিলেন তাও জানা যায় না। যাঁরা হাসপাতালে এসেছিলেন বলে দাবী করেছেন তাঁদের জবানীর মধ্যেও বৈষম্য রয়ে গেছে তাহলো, যাঁরা সদর দপ্তর থেকে নেতাজীকে দেখতে এসেছিলেন তাঁরা বলেছেন যে নেতাজীর

পরলোকগমনের পর তাঁরা এসে পৌঁছেছিলেন। আর, যাঁর ওপর নেতাজীর মরদেহের সদ্গতি করার দায়িত্ব ছিল, তিনি বলেছেন যে নেতাজী বেঁচে থাকাকালীনই সদর দপ্তরের অফিসাররা এসেছিলেন। আরও জানা যায় যে ফরমোসা বাহিনীর কম্যাণ্ডার, জেনারেল আণ্ডো নাকি নেতাজীকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানেও যোগ দিয়েছিলেন ; কিন্তু ঐ সেনাবাহিনীর চীফ অফ্ জেনারেল স্টাফ্, জেনারেল ইসায়ামা বলেছেন যে জেনারেল আণ্ডো ১৫ই আগস্টের পর তাঁর বাড়ীর বাইরে আসেন নি। এই ধরণের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য ঘটনার সত্যতা কোন ভাবেই প্রমাণ করে না।

কিন্তু আরও তাৎপর্যপূর্ণ কাহিনী শোনা গেল জেনারেল ইসায়ামাকে নিয়ে। হাসপাতালের ডাক্তারের জবানীর ওপর নির্ভর করে ধরে নেওয়া যাক যে ১৮ই আগস্ট অপরাহ্ণ দু'টো নাগাদ দুর্ঘটনা ঘটেছিল এবং রাত্রেই নেতাজী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। ঘটনার বিশদ বিবরণ অবশ্যই সামরিক দপ্তরে যথাযথভাবে পাঠানো হয়েছিল বলে ধরে নিতে হবে কারণ, ওটা নিয়ম মাফিক কাজ। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার হল, সামরিক দপ্তরের যিনি চীফ অফ্ জেনারেল স্টাফ, তিনিই আলোচ্য ঘটনা ঘটে যাওয়ার কুড়ি ঘণ্টার মধ্যেও ঘটনার খবর পেলেন না। তাঁর দপ্তর থেকে মেজর, কর্নেল ও জেনারেল পদের ব্যক্তিদের আনাগোনার কথা সাক্ষীরা বললেন, কিন্তু তিনি নিজে পরদিন অর্থাৎ ১৯শে আগস্ট অফিসে এসে তবেই ঐ মর্মান্তিক ঘটনার কথা জানলেন। এমন দায়ীত্বজ্ঞানহীনতার নিদর্শন বিশ্বের কোন সেনা বাহিনীব দপ্তর দিতে পারেন না। এই জেনারেল ইসায়ামাই আলোচ্য ঘটনার সাতদিন পরে বার্মার প্রধান-মন্ত্রী ডঃ বা ম কে অভ্যর্থনা জানাতে বিমান বন্দরে এসেছিলেন সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু নেতাজী সুভাষচন্দ্র যখন তাইহোকু বিমান বন্দরে তখন তিনি সেখানে ছিলেন বলে জানা

যায় না ; এমন কি নেতাজীর পরলোকগমনের সংবাদ পেয়ে তিনি তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন বলেও জানা যায় না। এই ধরণের ব্যবহার শিষ্টাচার বহির্ভূত কাজ। সামরিক দপ্তরের কোন প্রধানের দ্বারা হতে পারে বলে কেউই বিশ্বাস করতে পারেন না। নেতাজী তদন্ত কমিটি বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন যে স্থানীয় সেনাবাহিনীর কম্যাণ্ড বিশেষ আগ্রহ দেখান নি। এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল, কিন্তু কেন কোন আগ্রহ দেখানো হয় নি, তার কারণ উপলব্ধি করতে পেরেও কমিটি ভিন্ন বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। আলেচ্য ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে প্রকাশ ব্যক্তিরা তাঁদের জবানীর মাধ্যমে বোঝাতে কসুর করেন নি যে তাইহোকুর ঘটনা সম্পূর্ণ সাজানো। জাপ সেনাবাহিনীর চীফ অফ্ জেনারেল স্টাফ্ জেনারেল ইসায়ামা 'নেতাজীর টোকিও পালানোর' কাহিনীর কোন গুরুত্ব না দেওয়ার দরুণ আলোচ্য ঘটনা থেকে দূরে ছিলেন, কিন্তু নেতাজী আহত ও পরে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করার কথা শোনার পর খুব তৎপরতার সঙ্গে কোন কাজ করেছিলেন বলে জানাতে পারেন নি। নেতাজী সুভাষচন্দ্র যে জাপানের মিত্ররাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান তা নিশ্চয়ই তাঁর জানা ছিল বলে যদি আমরা সাব্যস্ত করি তবে তা খুব অন্যায় হবে না। এক মিত্ররাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানএর জীবনে অমন এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার খবর পাওয়ার পর যে উদাসীনতা তিনি দেখিয়েছেন, তা শুধু নীতি বহির্ভূতই নয় বরং মানবতা বিরোধীও। সেনাবাহিনীর উচ্চপদে আসীন থেকে, তাঁর পক্ষে ঐ ধরণের কাজ করা সম্ভব বলে কোন সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন মানুষ বিশ্বাস করতে পারবেন না। কিন্তু তবুও তিনি যা বলেছেন তা অকপটেই বলেছেন। আলোচ্য ঘটনার কোন গুরুত্বই তিনি দেন নি, কারণ ঐ ঘটনার গূঢ়রহস্য সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকি-বহাল ছিলেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে, অর্থাৎ যখন তাঁর কাছে খবর পৌঁছায় তখন নেতাজী আর ইহজগতে নেই (?) এই খবর পাওয়ার পরও তিনি সাধারণ শিষ্টাচার রক্ষা করে হাসপাতাল প্রাঙ্গন পর্যন্ত

আসেন নি জেনে স্বভাবতই তাঁর সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা জন্মায়, কিন্তু ঘটনাস্থলে না গিয়ে তিনি এই প্রমাণ রেখেছেন যে সেখানে তাঁর দেখে রাখার মত কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই ঘটে নি—কারণ আলোচ্য ঘটনা যে সম্পূর্ণ সাজানো ব্যাপার। সেনাবাহিনীর চীফ অফ্ জেনারেল স্টাফ, জেনারেল ইসায়ামার জবানীর মধ্যে তদন্ত কমিটি কিছুটা অসংলগ্নতা খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু তাঁর জবানীর সবটুকুই যে আলোচ্য ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন করতে খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এক রাষ্ট্রপ্রধানের দেহাবসান ঘটলে কি ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয় তা সেনাবাহিনীর প্রধানের অবশ্যই অজানা নয়। ধরে নেওয়া যাক যে এক্ষেত্রে প্রচলিত প্রবাদকে মিথ্যা প্রমাণ করে ঐ মরদেহও শত্রুর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জেনারেল ইসায়ামা তাই খুবই গোপনতা রক্ষা করে সব কাজ সুষ্ঠুরূপে করে ফেলতে স্বভাবতই যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন। এবং নিজে কোন ভাবেই প্রকাশ্যে না এসে মেজর নাগাটোমোর ওপরই সব দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলেন। কিন্তু তাহলেও একটু সংশয় থেকে যায়, তাহ'ল সবকাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হ'ল কিনা তা জেনে নেওয়ার বাধ্যবাধকতাটুকু জেনারেল ইসায়ামার তরফ থেকে থেকেই যায়; এবং মেজর নাগাটোমোর তরফে তাঁর যথাযথ দায়িত্ব পালনের রিপোর্ট তাঁর নিয়োগ কর্তার কাছে পেশ করা উচিৎ ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যায় দু'জনের কেউই তাঁদের করণীয় কাজ করেন নি। নেতাজীর পদমর্যাদা যেহেতু কারও অজ্ঞাত ছিল না, সেইহেতু বুঝতে কোন অসুবিধাই হয় না যে আলোচ্য ঘটনা সত্য হলে এই ধরণের ত্রুটি বিচ্যুতি থাকার কোন প্রশ্নই উঠ্‌ত না। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জবানী থেকে জানা যায় যে জাপ সরকারএর কেন্দ্রীয় দপ্তর টোকিও থেকে নাকি নির্দেশ এসেছিল যে নেতাজীর মরদেহ তাইহোকুর প্রান্তরেই ভস্মে পরিণত করা হোক। যদিও ঐ ধরণের নির্দেশের প্রমাণ স্বরূপ কোনও তথ্য বা নথিপত্র পেশ করা হয় নি, তবুও যদি ধরে নেওয়া যায় যে সাক্ষীদের ঐ বক্তব্য

নির্ভেজাল সত্য—তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, জাপ সরকারএর ঐ নির্দেশে কি বলা হয়েছিল যে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকারএর রাষ্ট্রপ্রধানএর মরদেহকে উপযুক্ত সম্মান না দেখিয়েই পঞ্চভূতে বিলীন করে দেওয়া হোক্? নিশ্চয় তেমন কোন নির্দেশ কোন সভ্য সরকার এর কাছ থেকে আশা করা যায় না। অপরপক্ষে যেভাবে নেতাজীর মরদেহের গতি করা হয়েছিল বলে সাক্ষীরা জানিয়েছেন, তা যে একজন রাষ্ট্রপ্রধানএর মর্যাদার উপযুক্ত হয় নি তা সবাই স্বীকার করবেন। তাহ'লে কেন ঐ ধরণের অনুপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, এই জিজ্ঞাসা ভারতের জনগণেরই শুধু নয়, সমগ্র মানব-সমাজেরই থেকে যায়। ঐ একই বিমানে আর একজন বিশিষ্ট যাত্রী ছিলেন বলেও প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন। ঐ বিশিষ্ট ব্যক্তি জেনারেল সিডির ক্ষেত্রেও যে রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শন করে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছিল তা কেউ বলেন নি। এক্ষেত্রেও কি জাপানের সামরিক দপ্তর কোন গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজন মনে করেন নি? এর যথাযথ উত্তর হ'ল—ঘটনা ঘটে থাকলে সব ব্যবস্থাই যথোপযুক্তভাবে নেওয়া হত। কিন্তু মূলেই কোন ঘটনা না ঘটলে মুখে মুখে বানিয়ে আর কত বেশী ব্যবস্থার কথা বলা যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ মতে, আলোচ্য বিমানের আরোহী তালিকায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস ও জেনারেল সিডি সহ বেশ কয়েকজন সামরিক অফিসারের নাম পাওয়া যায়। দেশের প্রয়োজনে সামরিক অফিসারদের মূল্য অনেক। ঐ অফিসারদের মহামূল্য জীবন নিয়ে যে দুর্ঘটনা ছিনিমিনি খেলল, তার সম্বন্ধে তদন্ত করাটা খুবই নিয়ম মাফিক কাজ হত এবং নেতাজী ও জেনারেল সিডির মত বিশিষ্ট যাত্রী ঐ বিমানে থাকার দরুণ দুর্ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করা স্বভাবতই উচ্চপর্যায়ের ব্যাপার, কারণ ঐ দুর্ঘটনা যে কোন অন্তর্ঘাত মূলক কাজের ফলে ঘটে নি তা তদন্ত না করে কিভাবে প্রকাশ পাবে? যে কোন দুর্ঘটনা সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক ভাবেই হোক আর

সাধারণভাবেই হোক তদন্ত হবেই। এক্ষেত্রে দুর্ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করাটা দেশের ও জাতির স্বার্থে প্রয়োজন। কিন্তু সাক্ষীদের জবানী থেকে আগেই আলোচনা করে দেখা গেছে যে জাপ সরকার আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে কোন রকম তদন্ত করেন নি। সরকারী পর্যায়ে এই ত্রুটি ঢাকবার কোন প্রয়াসও দেখা যায় না। বরং এই প্রসঙ্গে জাপ সরকারএর উচ্চ মহলের বক্তব্য প্রচারিত ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করে না। ফরমোসা সেনাবাহিনীর চীফ্ অফ্ স্টাফ জেনারেল ইসায়ামা দুর্ঘটনার ব্যাপারে কোনরকম তদন্ত করার বিষয় প্রথমে সরাসরিভাবে অস্বীকারই করেন। কারণ স্বরূপ তিনি বলেন যে বিমানটি নাকি সিঙ্গাপুরস্থ তৃতীয় বিমান বহরের অধীনের বিমান সুতরাং তাঁর দপ্তরের তরফ থেকে তদন্ত করার দায়িত্ব নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু একথা ঠিক যে বিমানটি যেখানে বিধ্বস্ত হয়েছিল বলে প্রকাশ, সেই এলাকা ফরমোসাবাহিনীর অধীনে। যে বিমানে দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি, একজন রাষ্ট্রপ্রধান, একজন জেনারেল ইসায়ামার স্বগোত্রীয় যাচ্ছিলেন বলে বলা হচ্ছে সেই বিমানের দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে তদন্ত না করার অনুকূলে স্বয়ং জেনারেল ইসায়ামা যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা কতটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে তা বক্তাও নিশ্চয় উপলব্ধি করতে পেরেছেন, কিন্তু তবুও তিনি ঐ ধরণের বিচিত্র কৈফিয়ৎ দেখিয়েছেন। তার কারণ হ'ল ঘটনার অন্তর্নিহিত-রহস্য বোঝানো। তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য শুনে স্বভাবতই এই ধারণা জন্মায় যে প্রথম বক্তব্য সংশোধন করেই তাঁর ঐ বক্তব্য। কিন্তু যখনই জেনারেল ইসায়ামার মাধ্যমে আলোচ্য দুর্ঘটনা সম্বন্ধে কোন রিপোর্ট পেশ করার বিষয়ে লেঃ কর্নেল শিবুয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন তখনই বোঝা যায় যে জেনারেল ইসায়ামা শুধুমাত্র তাঁর বক্তব্যের বিরুদ্ধাচরণ চেয়েই যেন ঐ বক্তব্য হাজির করেছেন। 'হ্যাঁ' ও 'না' এর দ্বন্দের মধ্যেই সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এই চিরন্তন সত্য মনে রেখে শুধু জেনারেল ইসায়ামাই নন, আলোচ্য ঘটনার সব সাক্ষীরা তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে সম্পূর্ণ পারস্পরিক

বিরোধীতা সৃষ্টি করেছেন। তাই হাজারবার তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও আলোচ্য ঘটনার কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে না।

আপাত দৃষ্টিতে জাপ প্রশাসন দপ্তরের যে ত্রুটি বিচ্যুতি চোখে পরে, তা থেকে মনে হয় যে জাপ সরকার নেতাজীর ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে ঐ আচরণ শুধুমাত্র সত্য গোপন করার প্রয়াস। জাপানীদের চোখে নেতাজী সুভাষচন্দ্র কি ধরণের সম্মানিত ব্যক্তি তার প্রমাণ তাঁরাই পেয়েছেন যাঁরা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগে এসেছেন। জনৈক ভারতীয় ডাক্তারের সঙ্গে এই বিষয়ে বর্তমান লেখকের আলাপ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। ঐ ডাক্তারই সম্ভবত প্রথম ভারতীয়, যাঁর সঙ্গে কর্নেল হবিব-উর রহমানএরও দেখা হয়েছিল ফরমোসায়। আলোচনা প্রসঙ্গে ডাক্তার বলেন যে জাপানের আত্মসমর্পণের পর ঐ দেশে কিছুদিন তাঁর থাকার সুযোগ হয়েছিল। সেখানকার ঘরে ঘরে, মন্দিরে মন্দিরে চন্দ্রবোসএর ছবি দেখে তাঁর মনে হয়েছিল যে জাপানীরা চন্দ্রবোসকে যতটা 'আপন' করে নিয়েছেন, ততটা 'আপন' করে নিতে অন্য কোন জাতি পেরেছেন কিনা তা ভেবে বলতে হবে। ঐ ভারতীয় ডাক্তার যখন স্বদেশে ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন কয়েক ডজন জাপানী যুবক যুবতী তাঁর সঙ্গে ভারতে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ঐ যুবক যুবতীরা তাঁকে বলেছিলেন যে, যে দেশে চন্দ্র-বোস জন্মেছেন সেই দেশের মাটিতে বসবাস করা তাঁদের কাছে স্বর্গ-সুখের সামিল। এই প্রসঙ্গে ডঃ রাধাবিনোদ পাল এর একটি মন্তব্য আছে। তিনি বলেছেন যে জাপানী যুদ্ধ বন্দীদের বিচারের সময় যতবার নেতাজীর নাম উচ্চারিত হয়েছিল, ততবারই স্বয়ং প্রাক্তন জাপ প্রধানমন্ত্রী তোজো সহ সকলেই দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। এমন এক সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতার প্রচারিত ঘটনার সমাপ্তিতে বিদায়ের সুর না বাজিয়ে জাপান প্রমাণ রেখেছেন যে ঐ কাহিনী শুধু রটনা মাত্র, ঘটনা নয়।

'নেতাজীর ভস্মাবশেষ' এই শিরোনামায় নেতাজী তদন্ত কমিটি তদন্ত রিপোর্টের পঞ্চম পর্ব লিখেছেন। এই পর্বের প্রথম অনুচ্ছেদে লেখা হয়েছে যে এই মর্মন্তুদ কাহিনীর শেষ অংশ হল নেতাজীর চিতাভস্ম নিয়ে। যেদিন শবদাহক্ষেত্র থেকে চিতাভস্ম নিয়ে আসা হয়েছিল ঐ দিনই যে ভস্মাধারে চিতাভস্ম রাখা হয়েছিল, সেই ভস্মাধারটি তাইহোকু শহরের নিশি হংগনজী মন্দিরে রেখে আসা হয়েছিল। ঐ মন্দির পর্যন্ত গিয়েছিলেন কর্নেল হবিব-উর রহমান, মেজর নাগাটোমো ও দোভাষী মিঃ নাকামুরা। মিঃ নাকামুরা বলেছেন যে ভস্মাধারটি মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের হাতে অর্পণ করা হয়েছিল এবং তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে ঐ ভস্মাধারটি যেন সযত্নে রাখা হয় এবং প্রতিদিনই যেন ঐ আধারের সামনে তাজা ফুল সাজিয়ে দেওয়া হয়। যতদিন না ঐ ভস্মাধার স্থায়ীভাবে রাখার জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ততদিন পর্যন্ত ঐ মন্দিরেই রাখতে হয়েছিল। এই রকম সাময়িকভাবে ভস্মাধার রেখে দেওয়া সম্ভবত জাপানী প্রথা, কারণ মিঃ নাকামুরা বলেছেন যে তিনি ঐ মন্দিরে জেনারেল সিডির চিতাভস্মে পূর্ণ আর একটি ভস্মাধার দেখেছিলেন। তাইহোকুর নানমন সামরিক হাসপাতালের কাছে আরও হু'টি বৌদ্ধ মন্দির ছিল। একটির নাম নিশি (পশ্চিম) হংগনজী মন্দির। ঐ মন্দিরটি হল ফরমোসার সব চেয়ে বড় মন্দির। ঐ মন্দিরে বারজন পুরোহিত ছিলেন। দ্বিতীয় মন্দিরটির নাম হিগাশি (পশ্চিম) হংগনজী মন্দির। এই মন্দিরে আটজন পুরোহিত ছিলেন। নানমন সামরিক হাসতালের কাছেই ছিল নিশি হংগনজী মন্দির, কিন্তু অন্য মন্দিরটি ছিল ৬০০ মিটার দূরে। এই বিবরণ দিয়েছেন হিগাশি হংগনজী মন্দিরের পুরোহিত রেভঃ এইচ্ হিদেমারু। তদন্ত কমিটি এই পুরোহিতকে সাক্ষী হিসাবে জেরা করেছেন। নিশি হংগনজী মন্দিরের কোন পুরোহিতকেই খুঁজে পাওয়া যায় নি। রেভঃ হিদেমারুর জবানীমতে নিশি হংগনজী মন্দিরে একটি সাদা রঙের বাক্সেতে চিতাভস্ম রাখা

রয়েছিল। তিনি বলেছেন যে, চিতাভস্ম পূর্ণ ভস্মাধারটি জাপানী সেনারাই ঐখানে রেখেছিলেন। তাঁরা যত্ন সহকারেই ঐ ভস্মাধার দেখাশোনা করেছিলেন এবং পরে তা টোকিওতে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি আরও বলেছেন যে ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসের শেষের দিকে নিশি হংগনজী মন্দিরে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মেজর নাগাটোমো বলেছেন যে, যেদিন চিতাভস্ম মন্দিরে রাখা হয়েছিল সেইদিনই বা তার পরের দিন তিনি নিশি হংগনজী মন্দিরে এক অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। স্টাফ অফিসার লেঃ কর্নেল শিবুয়াও এই মন্দিরেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেন। দেখা যায় যে হিগাশি হংগনজী মন্দিরেও এক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রেভঃ হিদেমারু বলেছিলেন যে ২২শে তারিখে (অর্থাৎ চিতাভস্ম নিশি হংগনজী মন্দিরে নিয়ে আসার পরেই) তাঁর প্রধান পুরোহিত তাঁকে বলেছিলেন যে ২৬ অথা ২৭শে আগস্ট জনৈক বিশিষ্ট ভারতীয়র প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। তিনি আরও বলেছেন যে ঐ অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপিত হয়েছিল।

রিপোর্টের অন্যান্য পর্ব আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গেছে যে এমন কোন তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নি যার ওপর নির্ভর করে প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা যায় যে আলোচ্য ঘটনা সত্যই ঘটেছিল! সাক্ষীদের জবানী থেকে নেতাজী তদন্ত কমিটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পেরেছেন বলে মনে হয়, যে তাইহোকুর বিতর্কিত শবদাহক্ষেত্র থেকে কিছুটা চিতাভস্ম একটি পাত্রে সযত্নে সংগ্রহ করে নিশি হংগনজী মন্দিরে নিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু চিতাভস্ম সংগ্রহ করার ক্ষেত্রেও যে অসঙ্গতি পাওয়া যায় তা নিয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে। শ্রীহারিণ শা'র কাছে দেওয়া মিঃ চূ শাং এর বিবৃতি পাওয়ার পর কি ধরণের পাত্রে ভস্মাবশেষ রাখা হয়েছিল সেই বিষয়েও মতপার্থক্য দেখা যায়। তাছাড়া রেভঃ হিদেমারুর ভস্মাবশেষ পূর্ণ বাক্সের বর্ণনা, মেজর নাগাটোমোর দেওয়া পেরেক আঁটা বাক্সের বর্ণনার সঙ্গে মেলে না।

কিন্তু, মেজর নাগাটোমোই বাক্সটি ভস্ম রাখার জন্য নিয়ে এসেছিলেন বলে বিবৃতি দিয়েছেন। দোভাষী মিঃ নাকামুরা ভস্মাধারটি মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের হাতে তুলে দেওয়ার কথা বলে প্রমাণ রেখেছেন যে ভস্মাধার মন্দিরে রাখার সময় তিনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন ; অথচ যাঁর ওপর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার দায়িত্ব ছিল তিনি অর্থাৎ, মেজর নাগাটোমো কিন্তু মনেই করতে পারেন নি যে দোভাষী মিঃ নাকামুরা তাঁর সঙ্গে ভস্মাবশেষ সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন কি না। এক্ষেত্রেও প্রচ্ছন্ন মতপার্থক্য দেখা যায়। নিশি হংগনজী মন্দিরে আরও একটি ভস্মাধার না কি ছিল এবং ঐ ভস্মাধারেই রাখা ছিল জেনারেল সিডির ভস্মাবশেষ। এই বক্তব্যের ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, জেনারেল সিডির চিতাভস্ম (?) কোথায় রাখা হয়েছিল, তা অন্য কোন সাক্ষীদের জবানী থেকে জানা যায় নি। মন্দিরে ভস্মাধার রেখে দেওয়া জাপানী প্রথা কি না তাও অনায়াসে জেনে নিয়েই লেখা যেত। তদন্ত কমিটি জাপানেই গিয়েছিলেন কিন্তু তা করেন নি। তাছাড়া আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, রেভঃ হিদেমারুর সাক্ষ্য দেওয়া। যে মন্দিরে চিতাভস্ম রাখা হয়েছিল বলে জানা যায় সেই মন্দিরের সঙ্গে রেভঃ হিদেমারু যুক্ত ছিলেন না। নিশি হংগনজী মন্দিরের কোন পুরোহিতকেই খুঁজে পাওয়া যায় নি কিন্তু হিগাশি হংগনজী মন্দিরের পুরোহিতকে খুঁজে পাওয়া যায়। এই যোগাযোগ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তদন্ত কমিটি রেভঃ হিদেমারুর বক্তব্য রিপোর্টে উল্লেখ করে তাঁকে গ্রহণযোগ্য সাক্ষীর স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর জবানীর সঙ্গে অন্য সাক্ষীদের জবানীর মিল কমই পাওয়া যায়। রেভঃ হিদেমারুর জবানী থেকে জানা যায় যে সাদা একটি বাক্সে চিতাভস্ম রাখা ছিল। ঐ ভস্মাধারটি জাপানী সৈনিকেরা মন্দিরে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁরাই ঐ ভস্মাধার সযত্নে দেখাশোনা করতেন। কিন্তু অন্যান্য সাক্ষীদের বিবৃতিমতে জাপানী সৈনিকেরা ঐ ভস্মাধার নিয়ে যান নি, (কারণ,

মেজর নাগাটোমো, নাকামুরা ও কর্নেল রহমান সৈনিক নন) এবং এ ভস্মাধার দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মন্দিরের - পুরোহিতের ওপর। সুতরাং ঘটনার বিবরণের মধ্যে যে যথেষ্ট গড়মিল রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিশি হংগনজী মন্দিরেই হোক, আর হিগাশি হংগনজী মন্দিরেই হোক আলোচ্য অনুষ্ঠান যে কবে হয়েছিল তা সুনির্দিষ্টভাবে কেউই বলতে পারেন নি। ঐ অনুষ্ঠানে কে কে উপস্থিত ছিলেন, সেই বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ দেখা যায়। আগেই আলোচিত হয়েছে যে জেনারেল আণ্ডো যে কোন অনুষ্ঠানে যোগ দেন নি, তা চীফ্ অফ্ জেনারেল স্টাফ, জেনারেল ইসায়ামা স্বয়ং জানিয়েছেন। দুর্ঘটনা সম্বন্ধে রিপোর্ট পাঠানোর ব্যাপারে লেঃ কর্নেল শিবুয়া যে বিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন তাও আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে লেঃ কর্নেল স্বয়ং ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন বলে দাবী করেন নি। অনুষ্ঠানের কথা তিনি জানতে পেরেছিলেন। শোনা কথার ওপর নির্ভর করা যায় না। তবে রেভঃ হিদেমারুর জবানী আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে কিছুটা নূতন তথ্য সংযোজন করে। বৌদ্ধ পুরোহিত ঘটনার যে বিবরণ দাখিল করেছেন তার অধিকাংশই তাঁর শোনা কথা। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত তাঁকে নেতাজীর নাম করে বলেন নি যে ঐ চিতাভস্ম চন্দ্রবোসএরই। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি শোনা কথার ওপর নির্ভর করেই বলেছেন যে ঐ ভস্মাবশেষ 'জনৈক বিশিষ্ট ভারতীয়র।' নেতাজী সুভাষ চন্দ্রর নাম উল্লেখ করলে তাঁকে ধর্মপথে থেকেও মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা যেত। কিন্তু, এক্ষেত্রে তিনি খুবই 'ইঙ্গিতপূর্ণভাবে ঘটনার বিবরণ রেখেছেন।

এই পর্বের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তদন্ত কমিটি লিখেছেন যে, ৫ই সেপ্টেম্বর একটি বিমান টোকিও যাচ্ছিল। ঐ বিমানেই কর্নেল হবিব-উর রহমান এর জন্য একটি আসন পাওয়া গিয়েছিল। ফরমোসা সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের কাছে তিনি বিমানে আসনের ব্যবস্থা করে

দেওয়ার জন্য আগে থেকেই অনুরোধ করেছিলেন। ঐ সেনাবাহিনীর দপ্তরের সঙ্গেই সংশ্লিস্ট স্টাফ অফিসার. লেঃ কর্নেল শিবুয়া, ঠিক করেছিলেন যে নেতাজীর চিতাভস্মপূর্ণ ঐ ভস্মাধারটির সঙ্গে একই বিমানে দামী জিনিষপত্রের বাক্সটিও পাঠিয়ে দেবেন ; এবং সেই সিদ্ধান্ত মতে তিনি লেঃ কর্নেল টি. সাকাইকে ঐগুলির দায়িত্ব নিতে বলেছিলেন। সাব-লেঃ টি. হায়াশিদাকে ঐ বাক্স দু'টি টৌকিও নিয়ে যাওয়ার জন্য তাইহোকু বিমান বন্দরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। লেঃ কর্নেল টি. সাকাই এর লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায় যে ঐ সময় তাঁর হাতে ও মুখে ব্যাণ্ডেজ থাকার দরুণ তিনি কোন মাল তুলতে পারেন নি। কর্নেল হবিব-উর রহমান-এর পরিচিত জনৈক মেজর নাকামুরাও ঐ বিমানে গিয়েছিলেন। লেঃ হায়াশিদা বলেছেন যে ৫ই সেপ্টেম্বর বেলা ১১টার সময় তিনি বিমানবন্দরে এসে পৌছেছিলেন এবং সেখানে কর্নেল হবিব-উর রহমান, লেঃ কর্নেল সাকাই ও মেজর নাকামিয়াকে তিনি অপেক্ষারত দেখেছিলেন। সেখানে দু'টি বাক্স রাখাছিল—একটিতে ছিল নেতাজীর চিতাভস্ম এবং অন্যটিতে ছিল সোনা ও অলঙ্কারপত্র। প্রথম বাক্সটি ১ফুট মাপের (১ফুট কিউব) এবং দ্বিতীয় বাক্সটি ছিল ৩ফু × ২½ফু × ২ফু-মাপের দু'টিই কাঠের তৈরী বাক্স ছিল। প্রথমটি সাদা কাপড়ে মোড়া ছিল এবং দ্বিতীয়টি ছিল চামড়ায় মোড়া। দুটি বাক্সই পেরেক দিয়ে আঁটা ছিল। জাপানী কায়দায় তিনি চিতাভস্মপূর্ণ বাক্সটি গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। লেঃ কর্নেল সাকাই এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে বিমান বন্দরটি ছিল তাইহোকুর কাছাকাছি মিনামি বিমান বন্দর। বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল বড় মাৎস্যুয়ামা বিমান বন্দরে। চিতাভস্মপূর্ণ বাক্সটি মন্দির থেকে নিয়ে বিমান বন্দরে পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন মেজর নাগাটোমো। কর্নেল হবিব-উর রহমান বলেছেন যে, যে বিমানে তাঁরা যাচ্ছিলেন ঐ বিমানটি ছিল একটি রেড ক্রশ বিমান। লেঃ কর্নেল সাকাই বলেছেন যে বিমানটি ছিল সবুজ ক্রশ চিহ্ন আঁকা ৯৭ ভারী বোমারু বিমান।

বিমানটি জাপানের সর্বদক্ষিণ প্রান্তের দ্বীপ কিয়ুসুর অন্তর্গত ফুকু-ওকার কাছে গ্যান্‌মন্‌ বিমান বন্দরে অবতরণ করেছিল। তারপর কি ঘটেছিল সেই বিষয়ে কিছু অসঙ্গতি রয়েছে। লেঃ কর্নেল সাকাই এবং লেঃ হায়াশিদা বলেছেন যে স্থানীয় সামরিক সদর দপ্তর থেকে রক্ষী হিসাবে একজন সার্জেন্ট ও দু'জন সৈনিককে নিয়ে তাঁরা সবাই পরদিন অপরাহ্ণ তিনটার সময় রেল যোগে রওনা হয়েছিলেন। লেঃ কর্নেল সাকাই জানান যে, ফুকুওকাতে তাঁরা আলাপ আলোচনা করে ঠিক করেছিলেন যে নিরাপত্তার স্বার্থে সমস্ত দলটি দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়া দরকার। তাই কর্নেল হবিব-উর রহমান ও মেজর নাকামিয়া বিমানযোগে টোকিও চলে গিয়েছিলেন এবং তিনি (লেঃ কর্নেল সাকাই) ও লেঃ হায়াশিদা চিতাভস্ম ও দামী জিনিষপত্রের বাক্সটি নিয়ে স্থানীয় সামরিক সদর দপ্তর এর তিনজন সৈনিকের প্রহরায় রেল যোগে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। ফুকুওকা থেকে যাত্রার সময় এবং টোকিওতে পৌঁছানোর সময় নিয়েও অসঙ্গতি রয়েছে। কর্নেল হবিব-উর রহমান বলেছেন যে তাঁরা সবাই রাত্রে মালবাহী রেলগাড়ী যোগে রওনা হয়েছিলেন এবং পরদিন (৬ই সেপ্টেম্বর) সকালে টোকিও পৌঁছেছিলেন। লেঃ কর্নেল সাকাই বলেছেন যে তিনি ও লেঃ হায়াশিদা ৬ই সেপ্টেম্বর সকালে ফুকুওকা ত্যাগ করেছিলেন এবং ঐ দিনই বিকালে টোকিও পৌঁছেছিলেন। জাপানের জাতীয় রেলওয়ের চলতি সময়সূচী থেকে দেখা যায় যে সবচেয়ে দ্রুতগামী এক্সপ্রেস রেলগাড়ীতেও ফুকুওকা (হাকাতা) থেকে টোকিও পৌঁছাতে সময় লাগে ২০ থেকে ২২ ঘণ্টা। ১৯৪৫ সালে, যুদ্ধের পর জাপানের রেল গাড়ী অমন দ্রুতগামী ছিল বলে মনে হয় না। সুতরাং কর্নেল হবিব-উর রহমান বা লেঃ কর্নেল সাকাই যাত্রাপথে প্রায় বার ঘণ্টা সময় লাগার কথা যা জানিয়েছেন তা ভুল। লেঃ হায়াশিদার উল্লিখিত সময় অনেকটা যুক্তিযুক্ত। তিনি বলেছেন যে তাঁরা সবাই ৬ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ তিনটার সময় ফুকুওকা থেকে যাত্রা করেছিলেন

এবং ৭ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ছ'টার সময় টোকিওতে এসে পৌঁছেছিলেন। ইম্পিরিয়াল জেনারেল স্টাফ এর দু'জন অফিসার, মেজর কিনোশিতা ও লেঃ টাকাকুরা যাঁরা চিতাভস্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের উল্লেখিত তারিখের সঙ্গে এই তারিখ মিলে যায়। যা হোক, সময় সম্বন্ধে অসঙ্গতি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এই অনুচ্ছেদ পড়তে পড়তেই মনে হয় কর্নেল হবিব-উর রহমান এর জন্য মাত্র একটি আসনের ব্যবস্থা করা হ'ল কিন্তু, তাঁর সহযাত্রী হয়ে গেলেন আরও তিনজন জাপানী সামরিক অফিসার। একটি আসনে চারজন আরোহীর যাওয়া নিশ্চয় সম্ভব নয়। সুতরাং একটি নয়, চারটি আসনের ব্যবস্থা ঐ বিমানে করা হয়েছিল। ঐ অনুচ্ছেদেই সোনা ও দামী অলঙ্কার পত্রের একটি বাক্সের কথা প্রথম জানা গেল। ঐ বহুমূল্য জিনিষগুলি কবে, কখন এবং কোথা থেকে সংগৃহীত হয়েছিল তার উল্লেখ করা হয় নি। অবশ্য ধনরত্ন প্রসঙ্গে নেতাজী তদন্ত কমিটি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেছেন। সেই পর্বের আলোচনা কালেই এই বিষয়ে বিচার করে দেখা যাবে।

কিন্তু এই পর্যায়ের আলোচনা করতে গিয়ে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন তাহ'ল সাইগন পর্বে যাঁদের উপস্থিতি দেখা গিয়েছিল বিমানের আকাশ যাত্রার পর্বে তাঁদের আর উপস্থিত থাকতে দেখা যায় না, দেখা দেয় কিছু নূতন মুখ। তাইহোকুর হাসপাতাল পর্বের সমাপ্তির সঙ্গে আবার কিছু নূতন মুখ দেখা দেয়, আর পুরাতন মুখ বিদায় নেয়। যথাক্রমে পুরাতন মুখের বিদায় ও নূতন মুখের আবির্ভাব আলোচ্য ঘটনার বৈচিত্র্য সম্বন্ধে ইঙ্গিতবহ। তাইহোকু পর্বে নেতাজীর জন্য যাঁদের খুবই উদ্‌গ্রীব হতে দেখা গিয়েছিল, তাঁরাই হঠাৎ রহস্যজনকভাবে কোথায় যেন মিলিয়ে গেলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্বে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার জন্যও তাঁদের দেখা আর পাওয়া যায় নি। আলোচ্য ঘটনাবলি যত গোপনেই রাখা হয়ে থাকুক না কেন, যাঁরা ঘটনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাঁদের কাছে গোপন

বলে আর কিছুই ছিল না। সুতরাং তাঁদের অনুপস্থিতি খুবই তাৎপর্য পূর্ণ এবং নাটকীয় ভাবধারার ইঙ্গিতবহ। বহু চরিত্রের সমন্বয়ে রচিত কোন নাটকেই সব চরিত্রগুলিকে শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত মঞ্চে দেখা যায় না, শুধুমাত্র নায়ক ছাড়া। তাইহোকুর ঘটনায় ঐ নায়ক চরিত্রে দেখা যায় কর্নেল হবির-উর রহমানকে। তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একাই পাকা অভিনেতার মত অভিনয় করে গেছেন।

চিতা ভস্ম পর্বে, বিমান বন্দরে কর্নেল হবিব-উর রহমান এর সঙ্গে মেজর নাকামিয়ার সাক্ষাৎকার খুবই নিয়ম মাফিক ব্যাপার এবং এই সাক্ষাৎকার আলোচ্য ঘটনার আর একটি সাক্ষাৎকার এর সমর্থন করে। শ্রী আয়ার এর লেখা থেকে জানা যায় যে সাইগন থেকে টোকিও পর্যন্ত তাঁর সহযাত্রী হয়ে গিয়েছিলেন কর্নেল টি. ও ক্যাপ্টেন আয়োকি। ঐ দু'জন সামরিক অফিসার হিকারী কিকান এর দ্বারা নিয়োজিত হয়েছিলেন। এই সাহচর্য শিষ্টাচারের অঙ্গ। কর্নেল রহমান এর পদমর্যাদা হ'ল, ডেপুটি চীফ অফ্ স্টাফ। সুতরাং তাঁর সঙ্গে মেজর নাকামিয়ার যাত্রা শিষ্টাচারের ব্যাপার। এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়ক এর সঙ্গে জেনারেল সিডির যাত্রাও শিষ্টাচারের মধ্যেই পড়ে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় রীতিনীতি ও শিষ্টাচার মেনে জাপ সরকার এর কাজ করে যাওয়াটা আলোচ্য ঘটনা সম্পূর্কে সন্দেহ জাগায়। জাপ সরকার করনীয় সব কিছুই করেছিলেন, কিন্তু আলোচ্য ঘটনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণ রাখতে পারেন নি, এই যুক্তি কোনভাবেই গ্রহণ যোগ্য নয়। তাইহোকুর রহস্যময় শবদাহ-ক্ষেত্র থেকে যে হাড় সংগ্রহ করা হয়েছিল সেই হাড় (পরে চিতাভস্ম বলে বলা হয়) রাখা হয়েছিল ৮ইঞ্চি মাপের একটি বাক্সে। জাপ সামরিক সদর দপ্তর থেকে নিয়োজিত মেজর নাগাটোমো নিজে শবদাহক্ষেত্রে যাওয়ার সময় ঐ বাক্সটি নিয়ে গিয়েছিলেন এবং পরে ঐ বাক্সই তিনি নিজে মন্দিরে জমা রেখেছিলেন।

যদিও ভস্মাধারের বিবরণ সম্পর্কে আরো ভিন্ন বক্তব্য পাওয়া

যায় তবুও ধরে নেওয়া গেল যে মেজর নাগাটোমোর বিবরণই ঠিক ; এবং তাঁকেই আবার ঐ বাক্সটি বিমান বন্দরে পৌঁছে দিতে দেখা যায়। সুতরাং একথা বিশ্বাস করেই নিতে হবে যে, যে বাক্সটি তিনি জমা রেখেছিলেন সেই বাক্সটিই তিনি মন্দির থেকে ফেরৎ নিয়ে বিমান বন্দরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। অবশ্য বাক্সটিতে কখন যে পেরেক আঁটা হ'ল এবং কে আঁটলেন তা জানা গেল না। কিন্তু বিমান বন্দরে মেজর নাগাটোমো যে বাক্সটি এনেছিলেন তার মাপ ১ফুট বলে দাবী করেছেন লেঃ হায়াশিদা স্বয়ং-যাঁকে বাক্স বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। দু'জনেই সামরিক দপ্তরের নির্দেশমত বাক্সটির দায়িত্ব নিয়েছিলেন, কিন্তু বাক্সটির মাপ সম্বন্ধে একের বিবরণের সঙ্গে অন্যের বিবরণ মেলে না। সুতরাং ভস্মাধারটি সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মত কোন বিবৃতি প্রত্যক্ষদর্শীরা দেন নি। আর একটি বিষয় খুবই চমকপ্রদ লাগে তাহলো শবদাহক্ষেত্র থেকে ভস্মাধার কর্নেল রহমান এর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে মেজর নাগাটোমো বলেছেন। এই বক্তব্য অবশ্য অপর একজন প্রত্যক্ষ-দর্শীর দ্বারা খণ্ডিত হয়েছে, তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হ'ল কর্নেল রহমান যখন অসুস্থ বলে সাক্ষীরাই বলে-ছেন, তখন প্রথা মানতে গিয়ে তাঁরই গলায় ভস্মাধারটি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু যখন তিনি সুস্থ, অর্থাৎ টোকিও যাত্রার সময় তাঁর গলায় বাক্সটি না ঝুলিয়ে দিয়ে কেন লেঃ হায়াশিদার গলায় ঝোলানো হ'ল, তার সঙ্গত ব্যাখ্যা কেউ করেন নি। এই থেকে মনে হয় যে, সাক্ষীরা প্রয়োজনীয় দেশীয় প্রথার দোহাই দিয়েছেন, পরে নীরব থেকেছেন। কোন্ বিমানবন্দর থেকে সবাই টোকিওর পথে যাত্রা করেছিলেন তা বলা কষ্টকর, তবে সাক্ষীরা যে বিমান বন্দরের কথা বলেছেন ঐ বিমান বন্দর তাইহোকুতেই। তাই ধরে নেওয়া যাক যে তাইহোকু থেকে বিমানে সবাই যাত্রা করেছিলেন। কর্নেল হবিব-উর রহমান যে তাইহোকুতে ছিলেন তা সত্য এবং তাইহোকু থেকে তিনি যে টোকিও

এসেছিলেন তাও সত্য। বিমানের বিবরণ দিতে গিয়ে সাক্ষীরা যে গোলযোগ রেখেছেন, তা স্বেচ্ছাকৃত অথবা এমন হতে পারে যে সমস্ত দলটি তাইহোকু থেকেই দু'ভাগে ভাগ হয়ে টোকিও যাত্রা করেছিলেন বলে তাঁদের বিবরণের মধ্যে গড়মিল দেখা যায়। কিয়ুস্যুর গ্যান্‌মন্‌ বিমান বন্দরে পৌঁছানোর পর সমস্ত দলটি কিভাবে টোকিও গিয়েছিলেন তা তদন্ত কমিটি নির্ধারন করতে পারেন নি। জাপ সামরিক দপ্তর যে দু'জন অফিসারের ওপর ভস্মাবশেষ পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের জবানীর মধ্যেই গরমিল দেখা যায়। একজন বলেন যে সবাই একসঙ্গেই গিয়েছিলেন, এবং অন্যজন বলেন যে তাঁরা দু'দলে ভাগ হয়ে আলাদা আলাদা ভাবে গিয়েছিলেন। কিন্তু একটি ঘটনা ঠিক যে মেজর নাকামিয়া, কর্নেল হবিব-উর রহমানের সঙ্গেই গিয়েছিলেন। ফুকুওকা থেকে রেলযোগে টোকিও যাওয়ার যে সময় লেগেছিল বলে সাক্ষীরা জানিয়েছেন তা রেলওয়ে টাইমটেবিল দ্বারা সমর্থিত হয় নি, এবং কবে ভস্মাবশেষ টোকিও গিয়ে পৌঁছেছিল তা প্রমাণিত হয় না। তদন্ত কমিটি এই সময়ের হেরফের-এর ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেন নি। কিন্তু গুরুত্ব দেওয়ার মত একটু কাহিনী রয়ে গেছে। ঐ কাহিনী তদন্ত কমিটিও জানেন কারণ, শ্রীআয়ার এর লেখা বইয়ে তার উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু তার গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। জাপ সামরিক দপ্তরের নির্দেশক্রমে দু'জন সামরিক অফিসার নেতাজীর চিতাভস্মের (?) দায়িত্ব নিয়ে তাইহোকু থেকে টোকিও এসেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু কর্নেল রহমান শ্রীআয়ারএর কাছে দেওয়া তাঁর জবানীতে বলেছিলেন যে তাঁকে হঠাৎ জানানো হয়েছিল যে তাইহোকু থেকে একটি এ্যাম্বুলেন্স বিমান টোকিও যাচ্ছিল এবং ঐ বিমানেই তিনি একটি আসন পেতে পারেন। তিনি নেতাজীর চিতাভস্মের দায়িত্ব নিয়ে ঐ বিমানেই যাত্রা করেছিলেন এবং ৬ই সেপ্টেম্বর টোকিওতে এসে পৌঁছলেন। এই বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে, নির্দ্বিধায় বলা যায় যে অন্যান্য পর্যায়ের মত এই পর্যায়েও মত পার্থক্য রয়েছে। প্রত্যেক

পর্যায়ে একের বিবৃতি অন্যের দ্বারা খণ্ডিত হলে ঘটনার সত্যতা কখনই নির্ধারিত হয় না।

এই পর্বের তৃতীয় অনুচ্ছেদে লেখা হয়েছে যে কর্নেল হবিব-উর রহমান, লেঃ কর্নেল সাকাই এবং লেঃ হায়াশিদা তিনজনই বলেছেন যে টোকিওতে পৌঁছানোর পরেই চিতাভস্ম ও দামী জিনিষপত্র ভর্তি বাক্স দু'টি ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অফিস তখন ছুটি হয়ে গিয়েছিল, তাই তাঁরা ডিউটি অফিসার মেজর কিনোশিতার কাছে ঐগুলি অর্পণ করেছিলেন। কমিটি মেজর কিনোশিতাকে জেরা করেছেন। তিনি বলেছেন যে ৭ই সেপ্টেম্বর রাত ১১টার সময় লেঃ কর্নেল পদমর্যাদার জনৈক অফিসার তাঁর কাছে নিরাপদে রেখে দেওয়ার জন্য দু'টি বাক্স দিয়েছিলেন। ঐ বাক্সগুলি তিনি তাইওয়ান (ফরমোসা) থেকে এনেছিলেন বলে-ছিলেন। একটি বাক্সের মাপ ৮ইঞ্চি ছিল, আর অন্যটির মাপ ছিল ১০ ইঞ্চি। একটি বাক্স ছিল হাল্কা এবং অন্যটি ভারী ছিল। বাক্স দু'টি পেরেক দিয়ে আঁটা ও কাপড় দিয়ে মোড়া ছিল, তবে সীল করা ছিল না। যে অফিসার ঐ বাক্স দু'টি এনেছিলেন তিনিই বলে-ছিলেন যে ছোট বাক্সটিতে নেতাজীর চিতাভস্ম ও বড় বাক্সটিতে সোনা রাখা ছিল। বাক্সগুলি বেশী রাত্রে পেয়েছিলেন বলেই মেজর কিনোশিতা ঐগুলি তাঁর কাছে তাঁরই ঘরে রেখে দিয়েছিলেন এবং পরদিন সকালে পরবর্তী ডিউটি অফিসার লেঃ কর্নেল টাকাকুরার হাতে অর্পণ করেছিলেন। লেঃ কর্নেল সাকাই পরদিন সকালেই ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এ গিয়েছিলেন, এবং সেখানকার মিলিটারী এ্যাফেয়ার্স সেক্সন এর চীফ তাঁরই পূর্ব পরিচিত লেঃ কর্নেল টাকাকুরার সঙ্গে দেখা করে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে চিতাভস্ম ও দামী জিনিষপত্রের বাক্স দু'টি তিনি পেয়েছিলেন। এই ডিউটি অফিসার দু'জন বাক্স দুটি গ্রহণ করার জন্য বা হস্তান্তর করার জন্য কোন রসিদ দেন-নি বা নেন নি, অথবা ঐগুলির বিষয় কোথায়ও লিখে রাখেন

নি। নেতাজীর চিতাভস্মের দায়িত্ব নেওয়ার পর লেঃ কর্নেল টাকাকুরা সদর দপ্তরের অন্যান্য অফিসারদের ডেকে নেতাজীর চিতাভস্মের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছিলেন। তারপর তিনি টেলিফোন যোগে টোকিওর ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সভাপতি শ্রীরামমূর্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন এবং চিতাভস্মের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তাঁকে সদর দপ্তরে আসতে বলেছিলেন। শ্রীমূর্তির জন্য একটি গাড়ীরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই শ্রীমূর্তি শ্রীআয়ারকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। শ্রীআয়ার অবশ্য ইতিমধ্যেই টোকিও এসে পৌঁছেছিলেন। ৮ই সেপ্টেম্বর সকালে ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এর প্রধান প্রবেশপথে এক অনাড়ম্বর ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লেঃ কর্নেল টাকাকুরা সর্বশ্রী মূর্তি এবং আয়ারকে চিতাভস্ম হস্তান্তর করেছিলেন। শ্রীমূর্তির ভাষায় অনুষ্ঠানের বর্ণনা,—"মেজর টাকাকুরা (পরবর্তীকালে লেঃ কর্নেল) এবং আরও দু'তিনজন অফিসার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জেনারেল আরিশি সেখানে উপস্থিত ছিলেন কিনা তা আমার মনে পড়ে না। তবে জেনারেল আরিশি ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স এই ছিলেন। ভস্মাধারটি সাদা কাপড়ে ঢাকা ছিল এবং তা একটি সেফটি লকার থেকে বার করে আনা হয়েছিল। বহনকারীর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়ার জন্য একটি লম্বা কাপড়ের ফালিও ঐ বাক্সে লাগানো ছিল। বাক্সটি ছিল প্রায় ১ ফুট মাপের (১ ফুট কিউব)। অন্যান্য সামরিক কর্মী যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সবাই ভস্মাধারের প্রতি শ্রদ্ধাভরে মাথা নুইয়ে ছিলেন। ঐ বাক্সটি গ্রহণ করেছিলেন শ্রীআয়ার। অসীম ভাবপ্রবণতায় তিনি বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। আমাদের পরিবহণের জন্য সামরিক বাহিনীর একটি সিডন গাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শ্রীআয়ার ও আমি ভস্মাধারটি সোজা আমার বাড়ীতেই নিয়ে গিয়েছিলাম।"

নেতাজী তদন্ত কমিটি রিপোর্ট লেখার বিষয়ে অসীম ধৈর্যের এবং

অভাবনীয় লিপি চাতুর্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। রহস্যলহরী সিরিজের রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা কাহিনীর লেখকেরাও এমন ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবেন বলে মনে হয় না। কেন না সাক্ষীদের জবানীর মধ্যে এত অসঙ্গতির মধ্যেও সঙ্গতি খুঁজে বার করার অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ কমিটির সদস্যেরা করেছেন। প্রত্যেক পর্যায়ে অগণিত অবিশ্বাস্য, অসংলগ্ন ও অসম্ভব ঘটনার সমাবেশ দেখেও সদস্যগণ খুবই সহানুভূতির সঙ্গে সাক্ষীদের বিবৃতি বিচার করে দেখেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আলোচ্য ঘটনার সাক্ষীরা স্বচক্ষে দেখেও প্রত্যেক পর্যায়ে একে অন্যের দাবী অস্বীকার করেছেন।

আলোচ্য অনুচ্ছেদে লেখা হয়েছে যে টোকিওতে পৌঁছানোর পরই চিতাভস্ম ও অলঙ্কারপত্রের বাক্সগুলি সোজা ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সএ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। স্বয়ং কর্নেল হবিব-উর রহমানও তদন্ত কমিটির কাছে এই বিবরণ দিয়েছেন বলে জানা যায়। কিন্তু কর্নেল রহমানই শ্রীআয়ার এর কাছে বলেছিলেন—নেতাজীর চিতাভস্মের দায়িত্ব আমি নিজে নিয়েছিলাম এবং ঐ বিমান যোগে যাত্রা করে ৬ই সেপ্টেম্বর টোকিও এসে পৌঁছেছিলাম।* গোপনতা রক্ষার জন্য আমাকে সরাসরি শহরতলীর কোন এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং দু'দিন পর জাপানীরা প্রথমে চিতাভস্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তারপর আমাকে টোকিও শহরে নিয়ে এসেছিলেন।" এই বক্তব্য অনেকের জবানীকেই মিথ্যা বলে প্রমাণ করে। কর্নেল হবিব-উর রহমান এর জবানীমতে, ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে জাপানীরা তাঁর কাছ থেকে চিতাভস্ম গ্রহণ করেছিলেন। জাপানী সাক্ষীদের মতে

* I took charge of Neteji's ashes and flew by that plane and reached Tokyo on the 6th Septemder, I was taken straight to one of the suburbs for the sake of secrecy and it was only two days later that the Japanese took first the ashes and then me into Tokyo city.—Col. Rehman, Unto Him a Witness, S. A, Iyer, P-115

৭ই সেপ্টেম্বর তাঁরা ভস্মাধার গ্রহণ করেছিলেন। বিমান বন্দর থেকে সোজা ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সএ ঐ ভস্মাধায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই দু'টি বক্তব্যের মধ্যে তফাৎ অনেক। এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কর্নেল রহমান স্বয়ং তাঁর নিজ জবানীর বিরোধিতা কবেছেন। আরও একটি চমকপ্রদ বৈষম্য দেখা যায় যা শুধু ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার দ্বারাই ঘটানো সম্ভব, তাহলো বাক্সগুলির মাপ। ১ ফুট মাপের ভস্মাধারাটি ৮ ইঞ্চিতে নেমেছে, কিন্তু দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা দেওয়া ঐ বিরাট বড় ধনরত্নের বাক্সটি হঠাৎ অনেক ছোট হয়ে গেল। এই রূপান্তর সম্বন্ধে তদন্ত কমিটি কোন ব্যাখ্যা রাখেন নি। তাছাড়া আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় তাহ'লে লেঃ হায়াশিদা চামড়ায় মোড়া একটি ধনরত্নের বাক্স সুদূর তাইহোকু থেকে স্বয়ং বয়ে নিয়ে এসে টোকিওতে মেজর কিনোশিতার হাতে অর্পণ করেছিলেন, কিন্তু মেজর কিনোশিতা স্বয়ং বলেছেন যে তিনি সাদা কাপড়ে মোড়া কাঠের বাক্স গ্রহণ করেছিলেন। এমন বিচিত্র বৈষম্যের পর কোনভাবেই সাক্ষীদের বক্তব্যের ওপর আস্থা রাখা যায় না। অর্পণ ও গ্রহণের মধ্যে আরও বৈষম্য দেখা যায়। ৮ই সেপ্টেম্বর সকালে টেলিফোনযোগে শ্রীমূর্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে ভস্মাধার হস্তান্তর করার ব্যাপারে লেঃ কর্নেল টাকাকুরা যে বিবরণ দিয়েছেন তার সঙ্গে ঐ প্রসঙ্গে দেওয়া শ্রী আয়ারএর বক্তব্যের অনেক গরমিল পাওয়া যায়। শ্রী আয়ার লিখেছেন যে তিনি ও শ্রী রামমূর্তি তাইহোকুর খবর পাওয়ার জন্য প্রায়ই টোকিও সদর দপ্তরে যেতেন। ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁদের বলে দেওয়া হয়েছিল পরদিন, অর্থাৎ ৮ তারিখে যোগাযোগ করতে। ৭ই সেপ্টেম্বরের রাতটুকু তাঁদের খুবই অস্বস্তির মধ্যেই কেটেছিল। পরদিন সকালেই তাঁরা দু'জনে ছুটে গিয়েছিলেন ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সএ। এই বক্তব্য থেকে টেলিফোনে যোগাযোগ করার কথা জানা যায় না। একটি ভস্মাধার তাঁদের হাতে অবশ্যই তুলে দেওয়া হয়েছিল, তবে মেজর

কিনোশিতার গ্রহণ করা ৮-ইঞ্চি বাক্সটি শ্রীআয়ার এর হাতে তুলে দেওয়া হয় নি। শ্রীমূর্তির জবানী থেকে জানা যায় যে ১ ফুট মাপের একটি বাক্স তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। এই মাপ বদল সত্যই বিচিত্র।

এর চেয়েও বিচিত্র হল—অত কষ্টকরে বয়ে নিয়ে আসা ধনরত্বের বাক্সটি কিন্তু সর্বশ্রী আয়ার ও রামমূর্তির হাতে ভস্মাধারএর সঙ্গেই হস্তান্তর করা হল না। জাপ প্রশাসন দপ্তরের এই বিচিত্র প্রয়াস প্রমাণ করে যে একমুঠো ছাই দেখিয়েই তাঁরা আলোচ্য ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। ভস্মাধার হস্তান্তর করার ব্যাপারে শ্রীআয়ারএর লেখা থেকে আরও কিছু কাহিনী জানা যায়, তাহ'ল, ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স এর সাময়িক অফিসাররা শ্রীআয়ারকে নীচে নেমে সিঁড়ির কাছে অপেক্ষারত একটি গাড়ীর সামনে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন, যাতে ভস্মাবশেষ গ্রহণ করেই তিনি ঐ গাড়িতে উঠে পড়তে পারেন।* এই ধরণের প্রয়াস প্রমাণ করে যে জাপ সরকার খুবই গোপনে সব কাজ করতে চেয়েছিলেন। এবং এই প্রয়াস প্রমাণ করে যে, সাজানো ঘটনার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে ঐ ঘটনা সত্য বলে চালানোর পরিকল্পনা করেই তাঁরা এই ধরণের রহস্যময় গোপনতার সাহায্য নিয়েছিলেন। আলোচ্য ঘটনা সত্যই ঘটে থাকলে এমন বিচিত্র প্রচেষ্টার কোনক্রমেই প্রয়োজন হত না। ভস্মাবশেষ কর্নেল রহমানই শ্রীআয়ার বা শ্রীরামমূর্তিকে দিতে পারতেন, কিন্তু তা না দিয়ে জাপ সরকারএর এক প্রতিনিধির হাত দিয়ে ঐ ভস্মাধার হস্তান্তর করে শুধু ঘটনার গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা চলেছে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য কোন প্রমান রাখে না।

---

* They asked me to go down stairs and wait at the foot of the steps near a waiting car so that I could receive the ashes and immediately step into the car.—S. A. Iyer, Unto Him A witness P-108

১৫

পঞ্চম পর্বের চতুর্থ অনুচ্ছেদে তদন্ত কমিটি লিখেছেন যে ঐ সময় শ্রীমূর্তির বাড়ীটি ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের কেন্দ্রীয় দপ্তর হিসাবেই ব্যবহার করা হ'ত। ভস্মাধারটি একটি বেদীর ওপর স্থাপন করা হয়েছিল এবং তার ওপর ফুল দেওয়া হয়েছিল আর ধূপকাঠি জ্বালানো হয়েছিল। ভস্মাধারটির ওপর তখন পর্যন্ত কিছুই লেখা ছিল না। শ্রীআয়ার নিজে ভস্মাধারটির ওপর 'নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস' নামটি লিখে দিয়েছিলেন।

বিমান দুর্ঘটনার খবর শোনার পর থেকেই শ্রীআয়ার কর্নেল হবিব-উর রহমানএর আসার অপেক্ষায় ছিলেন। শ্রীমূর্তি তাঁর জবানীতে বলেছেন : "শ্রীআয়ার তাঁকে অগণিত প্রশ্নবানে জর্জরিত করতে কালক্ষেপ করেন নি, এবং অপরপক্ষে, কর্নেল রহমানও খুবই শান্তভাবে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে এবং ভাবগম্ভীরভাবে সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে দ্বিধা করেন নি। কি ঘটনা ঘটেছিল, তার চাক্ষুষ প্রমাণ হিসাবে তিনি তাঁর হাত ও মুখ দেখিয়েছিলেন। কর্নেল রহমান তাঁর কঠিন ও ভাবগম্ভীর মুখ আর দু'চোখের জ্বলন্ত একাগ্রতার দৃষ্টিতে—যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁদের সবারই সব সন্দেহের নিরসণ করেছিলেন।" পরদিন আরও এক বৃহত্তর সমাবেশে তিনি এই কাহিনীর পুনরুল্লেখ করেছিলেন। মিত্রশক্তির দ্বারা গ্রেপ্তার হতে পারেন, এইরূপ ধারণায় কর্নেল হবিব-উর রহমান নেতাজীর কি ঘটেছিল সেই সম্পর্কে, ১৯৪৫ সালের ২৪শে আগস্ট তারিখে সহি করা একটি সংক্ষিপ্ত লিখিত বিবরণের অনুলিপি শ্রীমূর্তির হাতে দিয়েছিলেন। (পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে শ্রী জে. মূর্তি কমিটির কাছে এই বিবরণটি দেন)।

কর্নেল হবিব-উর রহমানএর সংক্ষিপ্ত বিবরণী আলোচ্য কাহিনীর অংশ বিশেষ। অত সংক্ষেপে সব কাহিনী শুনে নিয়ে যাঁরা তাঁকে বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু টোকিও হ্যামিল্টন্ হাউজ এর বাসিন্দা কতিপয় ভারতীয় ভদ্রলোক যে তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারেন নি—তাঁদের নিশ্চয় সন্দেহবাতিকগ্রস্থ বলে অবজ্ঞা করা যাবে না বা বাতিল করা যাবে না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে কর্নেল রহমান স্বয়ং এই যুক্তি বিশ্বাস করেন কি? জাপানের আত্মসমর্পণের পর তিনি টোকিওতে আশ্রয় নিচ্ছিলেন, সুতরাং গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য তিনি যে অন্য কোথায়ও চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন নি তা সত্য। তাছাড়া তাইহোকুতে যে তাঁর সঙ্গে মিত্রশক্তির ফৌজের দেখা হয়েছিল, তাও সত্য; এবং ঐখানেই তাঁর সঙ্গে যে ভারতীয় ডাক্তারের দেখা হয়েছিল, তিনিই বর্তমান লেখককে ঐ সংবাদ দিয়েছেন। লিখিত বিবরণ তো তিনি তাইপে থেকেই দিয়েছিলেন। ঐ লিখিত বিবরণটি আসল বক্তব্য নয়। ওটা মুখস্থ করার জন্য পরীক্ষার পড়া, অথবা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য মুখস্থ পড়া। ঐ বক্তব্যের সঙ্গে আরও কিছু কাহিনী জুড়ে দিয়ে পরীক্ষকদের কাছে থেকে পুরো নম্বর আদায় করে নিতে হবে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদে চিতাভস্মের বিষয়ে তদন্ত কমিটি আরও কিছু বিবরণ দিয়েছেন। কমিটি জেনেছেন যে জাপানে মারকিন দখল শুরু হয়। তাই তাঁরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান অনাড়ম্বরভাবে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অনাড়ম্বর এক অনুষ্ঠানের জন্য তাঁরা একটি ছোট মন্দিরের খোঁজ করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত শ্রীমূর্তি যেখানে থাকতেন, টোকির সেই সুগুনামিকু অঞ্চলের রেণকোজি মন্দিরেই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মন্দিরের পুরোহিত রেভঃ মোচিজুকিও ঐ প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন। শ্রীমতী সহায়এর অনুরোধক্রমে একদিনের জন্য তাঁর বাড়ীতেও চিতাভস্ম রাখা হয়েছিল এবং তাঁরাও শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছিলেন। অনুষ্ঠানের তারিখ

সম্বন্ধে কিছু গড়মিল দেখা যায়। শ্রীরামমূর্তি বলেছেন যে ১২ই অথবা ১৩ই সেপ্টেম্বর ঐ অনুষ্ঠান হয়েছিল। শ্রীআয়ার ১৪ই সেপ্টেম্বর এর কথা বলেছেন। কর্নেল হবিব-উর রহমান এর মতে (তিনি অবশ্য উপস্থিত ছিলেন না) তাঁর টোকিওতে পৌঁছানোর ৫।৬ দিন পরে ঐ অনুষ্ঠান হয়েছিল। পুরোহিত রেভঃ মোচিজুকি ১৮ই সেপ্টেম্বর এর কথা বলেছেন। শ্রী জে. মূর্তির ভাষায় তাঁর বিবরণ: "টোকিওর আই. এন্. এ. ক্যাডেট্দের সকলেই, আমার ভাই ও আমি, শ্রীমতী সহায় ও তাঁর পরিবারের সকলে, এবং আই. এন্. এ. ব্রডকাষ্টিং ইউনিট উপস্থিত ছিলেন। শ্রীআয়ারও মিছিলের সঙ্গে ছিলেন। কর্নেল রহমান মিছিলের সঙ্গে যেতে পারেন নি, কারণ মারকিন পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছিলেন। জন চল্লিশেক টোকিও ক্যাডেট ছাড়াও ঐ মিছিলে সামান্য কয়েকজন জাপানী ভদ্রলোক, জন দশ পনের জাপানী মিলিটারী অফিসার ও সিভিলিয়ান উপস্থিত ছিলেন। চিতাভস্ম বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন ভিরিক নামে জনৈক ক্যাডেট্। প্রায় ছ'মাইল দূরে রেনকোজি মন্দিরে গিয়েছিল। মন্দিরে পৌঁছানোর পর বেদীর ওপর চিতাভস্ম রাখা হয়েছিল; ফুল ও মালা স্থাপন করার সময় ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিলেন চার পাঁচজন বৌদ্ধ পুরোহিত।" লেঃ কর্নেল টাকাকুরা বলেছেন যে, ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স এর প্রতিনিধি হিসাবে তিনি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। কয়েকজন জাপানী সমেত ঐ অনুষ্ঠানে আনুমানিক ১০০জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রী জে. মূর্তি মিছিলের যে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন তা রেনকোজি মন্দিরের পুরোহিত রেভঃ মোচিজুকির দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। ৮ইঞ্চি (৮ইঞ্চি কিউব) মাপের একটি কাঠের বাক্সে চিতাভস্ম রাখা ছিল। বাক্সটি সাদা কাপড়ে মোড়া ছিল এবং তার ওপর লেখা ছিল 'নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস'। ছাপান ইংরেজী লেখা আমি সামান্য পড়তে পারি। অনুষ্ঠানে অন্য আরও ছ'জন পুরোহিতকে আমি ডেকেছিলাম। সামনে দাঁড়িয়েছিলাম

আমি নিজে। আমরা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম। শ্রীমূর্তি একটি কাগজে মুড়ে ৩০ ইয়েন দিয়েছিলেন। ঐ অর্থ আমি পুরোহিতদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছিলাম।…এক ঘণ্টা ধরে অনুষ্ঠান চলেছিল। অনুষ্ঠান শেষে সবাই চলে গিয়েছিলেন কিন্তু আমি মন্দিরেই থেকে গিয়েছিলাম একেবারে চিতাভস্মের পাশে, শুধু নিশ্চিত হওয়ার জন্য যাতে কেউ এসে তা নিয়ে না যায়।"

নেতাজী তদন্ত কমিটি শুধু অনুষ্ঠানের তারিখ সম্বন্ধে কিছু গড়মিল টের পেয়েছেন বলে লিখেছেন। দখলকারী মারকিন সৈন্যদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে ভেবেই যদি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান বর্জন করা হয়ে থাকে তাহলে মিছিল করে ভস্মাবশেষ নিয়ে যাওয়া হল কেন? মিছিল করে ভস্মাবশেষ নিয়ে যাওয়াটা নিশ্চয় অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের অঙ্গ নয়। শ্রীমূর্তি চিতাভস্ম নিয়ে মিছিল করে রেনকোজি মন্দিরে যাওয়ার কথা বলেছেন, এবং মন্দিরের পুরোহিত ঐ বক্তব্য সমর্থন করেছেন বলে তদন্ত কমিটি লিখেছেন। দু'জনের কথাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য। শ্রীআয়ার যে ঐ মিছিলে ছিলেন তাও শ্রীমূর্তি জানিয়েছেন। চিতাভস্ম মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে শ্রীআয়ার লিখেছেন যে ১৪ই সেপ্টেম্বর ওগিকুবো অঞ্চল থেকে, সুগিনামি জেলায় শ্রীরামমূর্তির বাড়ীর কাছেই এক জাপানী বৌদ্ধ মন্দিরে খুব গোপনে তাঁরা ঐ ভস্মাধারটি রেখে এসেছিলেন। এই দুই বক্তব্যের মধ্যে কোন মিল নেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তদন্ত কমিটি সাক্ষীরূপে শ্রীআয়ারকে কাছে পেয়েও কেন এই প্রসঙ্গের সত্যতা যাচাই করলেন না? শ্রীমূর্তি মিছিলে উপস্থিত ব্যক্তিদের যে আনুমানিক হিসাব দিয়েছেন তা যোগ করলে ১০০জন হয় বলে মনে হয় না, কিন্তু লেঃ কর্নেল টাকাকুরা প্রায় ১০০জন লোকের উপস্থিতির কথা বলেছেন। তাছাড়া শ্রীমূর্তির পুরোহিতের হিসাব (৪।৫ জন) রেভঃ মোচিজুকির দেওয়া হিসাবের সঙ্গে মেলে না (ন্যূনতম ৭ জন)। বৈষম্য আরও একটু রয়েছে তাহ'ল, মেজর নাগাটোমোর ৮ই ইঞ্চি

বাক্স লেঃ হায়াশিদার কাছে এসে ১ফুট মাপের হ'ল। ডিউটি অফিসার মেজর কিনোশিতা গ্রহণ করলেন ৮ইঞ্চি মাপের বাক্স; শ্রীমূর্তির সামনে যে বাক্স শ্রীআয়ার গ্রহণ করলেন তার মাপ ১ ফুট আর মন্দিরের পুরোহিত নেতাজীর নাম লেখা যে বাক্স রাখলেন তার মাপ ৮ ইঞ্চি। উচ্চতা বদলের সঙ্গে ওজনও পাল্‌টায়; আলোর জন্য রঙ বদল হয়, কিন্তু বাক্সের পরিমাপ বারবার বদল সত্যই বিচিত্র ব্যাপার। সবই বৈচিত্রময়, তাই ঘটনার আসল রূপ বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাহ'ল, একবাক্স ছাই জোগার করা হ'ল, আর বাক্সের গায়ে নাম লিখলেন শ্রীআয়ার, জাপান সরকারের কেউই ঐ কাজটি করলেন না। আলোচ্য ঘটনার প্রচারের খসড়াও তাঁরা শ্রীআয়ারএর দ্বারাই করিয়ে নিয়েছিলেন।

এই পর্বের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে কমিটি লিখেছেন যে, রেভঃ মোচিজুকি অভিমত জ্ঞাপন করেছেন যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানের পর চিতাভস্ম ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই জাপানী প্রথা। কিন্তু এক্ষেত্রে শ্রীরামমূর্তি, শ্রীমতী সহায় এবং একজন জাপানী স্টাফ অফিসার তাঁকে যথাযথ সম্মানের সঙ্গে ঐ চিতাভস্ম রেখে দিতে বলেছিলেন, কারণ ঐ ভস্মাবশেষ নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসএর মত একজন মহান্ ব্যক্তির। প্রতি বছর ১৮ই আগস্ট তারিখে রেভঃ মোচিজুকি বিগতের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন। ১৯৪৫ সালে, যেদিন চিতাভস্ম রাখা হয়েছিল তারপর থেকে ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত শ্রীরামমূর্তি ছাড়া অন্য কেহই চিতাভস্ম দেখতে বা শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করতে যান নি। ১৯৫০ সালের মে মাসে ভারতীয় মিশনের তৎকালীন প্রধান শ্রী কে. কে. চেট্টুর মন্দিরটি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে বহু ব্যক্তি ঐ মন্দির পরিদর্শনে গিয়েছেন, এমনকি ১৯৫১ সালে শ্রীআয়ারও ঐ মন্দিরে গিয়েছিলেন। গতবছর (১৯৫৫) ১৮ই আগস্ট তারিখে সেখানে মৃত্যুবার্ষিকী দিবসে বেশ বড় রকমের এক অনুষ্ঠান হয়েছে। ঐ অনুষ্ঠানে মাদাম তেজো, জেনারেল নাকামুরা, জেনারেল কাওয়াবে,

জেনারেল মৃতাগুচি, জেনারেল কাতাকুরা, প্রমুখ খ্যাতনানা ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কমিটি রেনকোজি মন্দির পরিদর্শন করেছেন এবং একটি বিবৃতিও রেকর্ড করা হয়েছে (আনেক্সার-১ এ দেওয়া আছে)। মন্দিরের ভিতরকার ও বাইয়ের অংশের এবং যে কাস্কেট-এ চিতাভস্ম রাখা আছে তার ভিতরের ও বাইরের অংশের বহু ছবি তোলা হয়েছে। আনেক্সার ২-এ ছবিগুলি রয়েছে।

সপ্তম অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে তা থেকে দেখা যাবে যে চিতা-ভস্ম পর্যায়ক্রমে শবদাহক্ষেত্র থেকে নিশি হংগনজী মন্দিরে, সেখান থেকে মিনামি বিমান বন্দরে এবং তারপর টোকিওর ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স এ স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। পর পর্যায়ে, প্রথমে শ্রীরামমূর্তির বাড়ীতে, তারপর শ্রীমতী সহায়এর বাড়ীতে, এবং পরিশেষে রেনকোজি মন্দিরে তা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই যোগসূত্রের মধ্যে কোন ছেদ নেই।

চিতাভস্ম যে বিশেষ যত্ন সহকারে মন্দিরেই রাখা ছিল, তা নিকটবর্তী এক মন্দিরের পুরোহিতের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স এ, প্রথম ডিউটি অফিসার তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানেই চিতাভস্ম রেখেছিলেন এবং পরবর্তী ডিউটি অফিসার ঐ চিতাভস্ম নেতাজীর আন্দোলনের স্থানীয় প্রতিনিধি শ্রীরামমূর্তিকে দিয়েছিলেন। রেভঃ মোচিজুকি যথেষ্ট যত্ন সহকারেই ঐ চিতাভস্ম তদারক করেছেন। কোন পর্যায়েই চিতাভস্ম পূর্ণ ভস্মাধারটি সীল করা হয় নি, যথাযথ কোন রসিদও দেওয়া হয় নি, অথবা তার ওপর অবিরাম দৃষ্টিও রাখা হয় নি।

তদন্ত কমিটি রিপোর্ট পড়ে একটি কথাই বার বার মনের কোণে জেগে ওঠে, তাহ'ল বিচারক যদি ভেবেই রাখেন যে মৃত্যুদণ্ড দিতেই হবে তাহলে বিচারের এই প্রহসন না করে সরাসরি দণ্ডাজ্ঞা দিয়ে দিলেই বা ক্ষতি কি ? তদন্ত কমিটি কোন ভাবেই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি যে, কবে শবদাহক্ষেত্র থেকে চিতাভস্ম সংগৃহীত

হয়েছিল এবং কবে তা রেনকোজি মন্দিরে জমা দেওয়া হয়েছিল। সেই ভস্মাধারে কতগুলি হাড় সংগ্রহ করার পর তার যে আকার পরিবর্তন হয়েছে তা আগেই আলোচিত হয়েছে। তদন্তকমিটি পরিষ্কার লিখেছেন যে অবিসংবাদিতভাবে সনাক্তকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি; কিন্তু বিশ্বাস করার নাকি যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে শব-দাহক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত ভস্মই রেনকোজি মন্দিরে জমা রাখা আছে। অনুমানের ওপর নির্ভর করে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ল তা যুক্তিগ্রাহ্য হয় না। শবদাহক্ষেত্রে যে দেহ দাহ করা হয়েছিল তার নাম কারও মতে 'কাত কানা' আর রেকর্ড মতে 'ওকারা ওচিরো'।

তদন্ত কমিটি তদন্ত করেই মন্তব্য করেছেন যে ভস্মাধারের ওপর অবিরাম নজর রাখা হয় নি। তদারককারী ঐ দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা ভস্মাধার তদারক করার কোন পর্যায়ে কোন গাফিলতির কথা স্বীকার করেন নি। তদন্ত কমিটি শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে মন্তব্য করেছেন যে রেনকোজি মন্দিরে রাখা ভস্মাবশেষ নেতাজীর। এই মন্তব্য ভিত্তিহীন। ঐ ঘটনা সাজানো ঘটনারই অংশ বিশেষ।

এই অধ্যায়ের অষ্টম অনুচ্ছেদে তদন্ত কমিটি লিখেছেন যে, তিনজন সাক্ষী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে রেনকোজি মন্দিরে রাখা চিতাভস্ম নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসএর নয়। যাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, তাঁদের অন্যতম হলেন শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী, এম. পি.। তিনি শ্রী জে সি. সিন্‌হা ও অন্য এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ১৯৫৫ সালে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে যোগদান করতে জাপানে গিয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে রেনকোজি মন্দিরও পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন "আমার একটা অনুভূতি হয়েছিল যে ঐ চিতাভস্ম নেতাজীর ভস্মাবশেষ নয়, কারণ ঐ মন্দিরটি অত্যন্ত জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল। মন্দিরটি ছোট এবং লোকালয় থেকে অনেকটা দূরে অবস্থিত। টোকিও শহর থেকে প্রায় আঠার থেকে কুড়ি মাইল দূরে, বা কিছু কমবেশীও হতে পারে। সেখানে খুবই অনাড়ম্বরভাবে পুরনো একটি চাদরে মুড়ে

চিতাভস্ম রাখা হয়েছে, এবং নেতাজীর চিতাভস্ম যে ধরণের আড়ম্বরে থাকা উচিত তার চিহ্ন নেই। ঐ ধরণের মনোভাব আমার মনে জেগেছিল এবং আমি তা কমিটিকে জানাতে চাই।" দেখা যায় যে এই অভিমত মনগড়া এবং তথ্যপ্রমাণ ও পারিপার্শিক অবস্থার ওপর যাচাই করে করা হয় নি। মন্দিরের অবস্থা সম্পর্কে শ্রীমতী ইলা পাল যে তথ্য দিয়েছেন তা খুবই ভুল। মন্দিরটির অবস্থান টোকিও থেকে ১৮।২০ মাইল দূরে নয়। ১৯৫৬ সালের ৩০শে মে কমিটি রেনকোজি মন্দির পরিদর্শন করেছেন। নোট এর উদ্ধৃত অংশ থেকে জানা যাবে যে মন্দিরের অবস্থান কেমন এবং চিতাভস্ম কিভাবে সংরক্ষিত হয়েছে:

"শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় ৬মাইল দূরে টোকিওর সুগুনামিকু অঞ্চলে যেখানে ভারতীয় দূতাবাস, রেনকোজি মন্দিরের অবস্থান সেইখানেই। মন্দিরটি মাঝারি ধরণের, জাপানী বৌদ্ধ মন্দিরের ধাঁচে কাঠের তৈরী। মন্দিরটি ঘিরে রয়েছে ছোট একটি জাপানী বাগান। মন্দিরটি যদিও খুব বেশী বড় নয় কিন্তু সুন্দরভাবে সংরক্ষিত। চিতাভস্ম রাখা আছে বেদীর ঠিক পিছনেই সবচেয়ে পবিত্রস্থানে একটি বড় কাঁচের বাক্সে। এই বাক্সে রয়েছে বহু পূজনীয় জিনিষপত্র যেমন, সোনার তৈরী একটি বোধিসত্ত্ব মূর্তি। কাঁচের বাক্সের বাঁ দিকে রাখা আছে একটি প্রায় দু'ফুট উঁচু প্যাগোডা ধরণের একটি কাঠের কাস্কেট। এর সামনেই রাখা হয়েছে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস-এর একটি ছোট্ট ছবি।

কাঁচের বাক্সের বাইরে ও বাঁ দিকের কোণে নেতাজীর একটি বড় ধরণের ছবি রাখা আছে। ঐ ছবির সামনে ধূপকাঠি জ্বলছিল। রেভাঃ মোচিজুকি প্যাগোডা আকারের কাস্কেট থেকে লাল রঙ করা চতুর্ভূজ আকারের একটি কাঠের বাক্স বার করে আনলেন। ওটা খুলে ফেলার পর, ভিতরে এক ধরণের সাদা কাপড়ে মোড়া প্রায় ৮ ইঞ্চি মাপের একটি বাক্স দেখা গেল। ঐ বাক্সের গায়ে বড় ইংরাজী হরফে কালো কালিতে লেখা ছিল "নেতাজী সুভাষ চন্দ্র

বোস"। ছোট পাত্রটির মধ্যে রাখা জিনিষ পরীক্ষা করে দেখা হয় নি। রেভঃ মোছিজুকি যখন এইগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলেন, তখন তিনি কোন এক পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন। একের পর এক সব পাত্রগুলি তিনি আবার জায়গামত রেখে দেন এবং কাঁচের বাক্সের দরজায় তালা লাগিয়ে নেন।...বেশীরভাগ জাপানী মন্দিরের মতই আলোচ্য মন্দিরটি ভিতরে ও বাইরে খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রেভঃ মোচিজুকি যে চিতাভস্মের যথেষ্ট যত্ন নিয়ে থাকেন এবং রেনকোজি মন্দিরের কর্তৃপক্ষের সীমিত আয়ের মধ্যেও যে ভস্মাবশেষ যথাযথভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে সেই বিষয়ে কমিটি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

মাননীয়া সদস্যা আলোচ্য রিপোর্ট পড়েছেন কিনা তা বর্তমান লেখকের জানা নেই। তবে, একথা সত্য যে লোকসভার সদস্যরা তথ্যকে 'অসত্য' বলার পিছনে কোন নির্ভরযোগ্য যুক্তি তদন্ত কমিটি রাখতে পারেন নি।

তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন তা তো তাঁর নিজের চোখে দেখা। শ্রীমতী পালচৌধুরীকে যা দেখানো হয়েছে তিনি তাই দেখেছেন এবং তিনি যা দেখেছেন তদন্ত কমিটির কাছে প্রকৃত কথাই বলেছেন। এতে কি মিথ্যা বলা হল, তা বোঝা দুষ্কর। দুই দলের বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, তাঁরা ভিন্ন মন্দির ও ভিন্ন ভস্মাধার দেখেছেন। এই বিচিত্র দর্শনের জন্য দায়ী জাপান এবং এই দুই ভিন্ন স্থান ভারতের প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরে আলোচ্য ঘটনার পিছনের রহস্যের বিচিত্র ইঙ্গিত রেখেছেন। তদন্ত কমিটি শ্রীমতী পালচৌধুরীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর জাপানে তদন্ত করতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা প্রশ্ন করে জেনে নিলেই পারতেন যে শ্রীমতী পালচৌধুরীকে কোন্ মন্দির ও কোন্ ভস্মাধার দেখানো হয়েছিল? মন্তব্য করার আগে তদন্ত কমিটির মনে রাখা উচিত ছিল যে জাপানই যা করণীয় তা করেছেন। আলোচ্য ঘটনা সত্য হলে এমন বিভিন্ন দর্শন হ'ত না।

নবম অনুচ্ছেদে তদন্ত কমিটি লিখেছেন যে শ্রী জে. সি. সিন্‌হা, যিনি ১৯৫৫ সালে শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরীর সঙ্গে জাপানে গিয়েছিলেন তাঁর সন্দেহের কারণ একটু স্বতন্ত্র। তিনি বলেন যে, মিঃ ভিরিক নামে এক যুবকের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। তিনিই সেই ক্যাডেট্—যিনি ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট, আসল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিনে চিতাভস্মপূর্ণ ভস্মাধারটি রেনকোজি মন্দিরে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। মিঃ ভিরিক জাপানে ফিরে এসেছিলেন এবং টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছিলেন। আলোচ্য ঘটনার সাক্ষী শ্রী জে. মূর্তিও এই প্রসঙ্গে তাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। শ্রী সিন্‌হার বক্তব্য থেকে জানা যায় মিঃ ভিরিক তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন, কিন্তু মন্দিরের পথ খুঁজে বার করতে এবং ভস্মাধার কোথায় রাখা হয়েছিল তা দেখাতে তাঁর অসুবিধা হয়েছিল। মিঃ ভিরিক শ্রী সিন্‌হার কাছে স্বীকার করেছিলেন যে ১৯৪৫ সালে চিতাভস্ম জমা দেওয়ার পর তিনি আর কখনও রেনকোজি মন্দিরে যান নি। শ্রী সিন্‌হা তাঁর অবিশ্বাসের কারণ ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, "...বিগত তিন বছর যাবৎ যে ব্যক্তি টোকিওতে অছেন সেই মিঃ ভিরিকএর মতে ঐ চিতাভস্মই যদি নেতাজীর ভস্মাবশেষ হয় এবং তিনি যদি সত্যই সেই ব্যক্তি হন, যিনি মন্দির পর্যন্ত ভস্মাবশেষ বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাহ'লে বিদায়ী মহান্ নেতার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে তিনি বহুবার ঐ মন্দিরে যেতেন।"

নেতাজী তদন্ত কমিটি মিঃ ভিরিকএর পক্ষ সমর্থন করে অনেক যুক্তির অবতারণা করেছেন। বিভিন্ন বক্তব্য রেখে অসম্ভব শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টাই করা হয়েছে। মিঃ ভিরিক এর পক্ষ সমর্থন করে তদন্ত কমিটি অজান্তে নিজ বক্তব্যেরই বিরোধিতা করেছেন। মিঃ ভিরিক মন্দির পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন শ্রী সিন্‌হার সঙ্গে। শ্রী সিন্‌হা যে শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরীর সঙ্গী হয়ে জাপানে

গিয়েছিলেন তা আগেই জানা গেছে। সুতরাং মিঃ ভিরিক যে মন্দিরের পথ ও ভস্মাধার খুঁজে বার করতে অসুবিধায় পড়েছিলেন তা যে ঐ জরাজীর্ণ মন্দির ও পুরনো চাদরে ঢাকা ভস্মাধার তাতে কোন সন্দেহই নেই। অর্থাৎ, জাপানে ভস্মাধার সংরক্ষণ ও মন্দিরে ভস্মাধার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে যথেষ্ট গোলযোগ রয়েছে। কমিটি যা দেখেছেন, মিঃ ভিরিক তা দেখান নি, কিন্তু মিঃ ভিরিকই নাকি সেই ব্যক্তি যিনি ভস্মাধার বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এমন বিচিত্র বৈষম্যের পর ভস্মাধার ও মন্দিরের ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে কোন মন্তব্যই করা যায় না।

এই অধ্যায়ের দশম অনুচ্ছেদে তদন্ত কমিটি লিখেছেন যে, তৃতীয় যে ব্যক্তি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তাঁর নাম, শ্রী এস্. এম্. গোস্বামী। শ্রীগোস্বামী দু'বার কমিটির সামনে হাজির হয়েছিলেন। ১৬ই জুন তারিখে রেকর্ড করা তাঁর দ্বিতীয় বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, ১৯৫৩ সালে তিনি দেখেছিলেন যে ভস্মাধারের ওপর "নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস" নামটি টানা অক্ষরে (ইটালিক্স) লেখা, কিন্তু ১৯৫৬ সালের ৫ই জুন তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় ছাপা একটি ছবিতে "নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস" নামটি বড় হরফে (ব্লক) লেখা দেখে তিনি হতবাক হয়েছেন। উপসংহারে তিনি বলেন যে ১৯৫৩ সালের পর থেকে সমস্ত বিষয়টিই পরিবর্তিত হয়েছে।

শ্রীআয়ার ১৯৫১ সালে টোকিও গিয়েছিলেন এবং তখন তিনি রেনকোজি মন্দিরও পরিদর্শন করেছিলেন। ভস্মাধারের একটি ছবি তিনি পেশ করেছেন। ১৯৫৬ সালের জুন মাসে কমিটিও ভস্মাধারের একটি ছবি তুলেছে। এই ছবিগুলিতে "নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস" লেখাটি একই রকম বলে মনে হয়। লেখাগুলি বড় হরফের। শ্রীআয়ার এর পেশ করা ছবির নকল ও কমিটির তোলা ছবির নকল আনেক্সার এ দেওয়া আছে। দেখা যাবে যে শ্রী গোস্বামী সম্পূর্ণ ভুল বিবৃতি দিয়েছেন। এই সাক্ষীদের বিবৃতিগুলি বিচার বিবেচনা

করে পরিষ্কার বোঝা যায় যে চিতাভস্ম নেতাজীর নয় বলে সন্দেহ প্রকাশ করে কারণগুলি দেখানো হয়েছে, তা হয় অবাস্তব, নয়তো ভুল তথ্যের ওপর নির্ভরশীল।

শেষ পর্যন্ত তদন্ত কমিটি "নেতাজীর চিতাভস্ম" শীর্ষক পর্বের যবনিকা টেনেছেন। ভস্মাবশেষ সম্বন্ধে তদন্ত করে কমিটি যা জানতে পেরেছেন সপ্তম অনুচ্ছেদে খুব ছন্দময় ভাষায়, ভাবাবেগ দিয়ে তা লেখা হয়েছে। চিতাভস্ম সম্বন্ধে যে সব যুক্তি তাঁরা খাড়া করেছেন, তা সবই তাঁদের মতে অকাট্য প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল। খুব উদার মনোভাব নিয়ে, সব কিছু বিচার করে একথাও লেখা হয়েছে যে অবিসংবাদি সত্য পরিচয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নি। এই মন্তব্য থেকে একথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে ভস্মাবশেষ সম্পর্কে সব সন্দেহের নিরসন করার মত অকাট্য প্রমাণ নেই। তদন্ত কমিটির মাননীয় সদস্যদ্বয় সব সম্ভাবনার কথাই ভাবতে পারেন, কিন্তু কেহ যদি ঐ সম্ভাবনার বিরুদ্ধাচরণ করেন তবেই তাঁর বক্তব্য বর্জনীয়। লেখার ধরণ পালটানোর দরুণ শ্রী গোস্বামীর মনে স্বভাবতই সন্দেহ জেগেছে। কিন্তু তাঁর সন্দেহের কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নি কারণ কমিটি ভস্মাধারের ওপর বড় হরফের লেখা দেখেছেন। শ্রী আয়ারএর পেশ করা ছবির লেখার সঙ্গে কমিটির তোলা ছবির হরফের যে হুবহু মিল রয়েছে তাও কমিটি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারেন নি। একই ধরণের লেখা বলে মনে হয়, আর একই লেখা এই দুই বক্তব্যের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। ভাষার মারপ্যাঁচ দিয়ে কমিটি বোকা বানাবার চেষ্টা করেছেন। রিপোর্টে ভস্মাধারের দু'টি ছবি রয়েছে। দু'টিতেই নেতাজীর নাম লেখা আছে। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে একটিতেও শুদ্ধ বানান লেখা হয় নি। শ্রী আয়ার কোন্ ছবিটি কমিটির কাছে পেশ করেছিলেন তা বোঝা যায় না, তবে নাম লেখা ছবি দু'টিতে যে দু'টি পাত্র দেখান হয়েছে তা একই পাত্র নয়। পাঠকবর্গ ছবি দু'টি দেখলেই তফাৎ অনুধাবন করতে পারবেন।

তদন্ত কমিটি শ্রীমতী পালচৌধুরীর তথ্যকে অসত্য বলেছেন এবং শ্রীগোস্বামীর তথ্যকে বলেছেন সম্পূর্ণ ভুল। শ্রীগোস্বামীর যে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে তার চেয়ে আরও একটু বেশী তথ্য পাওয়া গিয়েছিল হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডএর ১৯৫৩ সালের ৫ই এপ্রিলের প্রকাশনে। শ্রীগোস্বামী সাংবাদিককে বলেছিলেন যে ভস্মাধারটি সাদা 'অয়েল ক্লথে' মোড়া এবং তার মাপ ১৪"×১০"×১০" ইঞ্চি। অয়েল ক্লথটি তিনি সম্পূর্ণ নূতনই দেখেছিলেন এবং বাক্সের ওপর লেখা নেতাজীর নাম কলমের উল্টোদিক দিয়ে লেখা হয়েছিল বলে তাঁর মনে হয়েছিল। লেখাটাও শ্রীগোস্বামীর কাছে নূতন বলে মনে হয়েছিল। শ্রীগোস্বামীর স্বচক্ষে দেখা ভস্মাধার ভুল এবং শ্রীমতী পালচৌধুরী যা দেখেছেন তাও অসত্য; কিন্তু তদন্ত কমিটি যা দেখেছেন তাই নির্ভেজাল সত্য। অবশ্য কমিটি সযত্নে রাখা ছোট বাক্সটিতে কি রয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখেন নি, কিন্তু তবুও ধরে নিতে হবে যে ঐ বাক্সে কমিটি যা বলেছেন তাই রয়েছে। ঘটনার সমর্থনে যে বক্তব্যগুলি কমিটি সংগ্রহ করেছেন, ঐ বক্তব্যের বিরোধী কোন বক্তব্য যা আলোচ্য ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করে না তা নির্দ্বিধায় এক কলমের খোঁচায় নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে বিরোধী বক্তব্য বাদ দিলেও, যাঁরা ঘটনার সমর্থনে বক্তব্য রেখেছেন তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে সরাসরি মত পার্থক্য ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করে না।

রেনকোজি মন্দিরের পাট চুকিয়ে তদন্ত কমিটি রিপোর্টে আরও একটি পর্ব জুড়ে দিয়েছেন ঐ পর্বের নামকরণ করা হয়েছে "ধনরত্ন"। পর্বের প্রথম অনুচ্ছেদে লেখা হয়েছে যে যদিও কমিটির বিচার্য বিষয় শেষ যাত্রায় নেতাজীর সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ধনরত্নের উল্লেখ নেই কিন্তু তদন্তের সময় বেশ কয়েকজন সাক্ষী ধনরত্নের কথা উল্লেখ করেছেন। সত্য বলতে কি, খবরের কাগজে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি বিচার করলেই দেখা যায় যে ধনরত্নের কি গতি হয়েছিল তা জানতে জাপানে যথেষ্ট

আগ্রহ রয়েছে। এই বিষয়ে জনগণের আগ্রহ এবং সাক্ষ্য প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে কমিটি অনুভব করেন যে এই রিপোর্টে ধনরত্ন সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা উচিত।

তদন্ত কমিটির সদস্যদের ঔচিত্য বোধ ও সূক্ষ্ম অনুভূতির তারিফ না করে পারা যায় না। জনগণের আগ্রহ অনুমান করতে পেরে তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিচার্য বিষয়ের বহির্ভূত ধনরত্ন সম্বন্ধে একটি পর্ব লিখে ফেলেছেন। জনসাধারণের মনের কথা যখন তাঁদের হৃদয়ে পৌঁছেছে, তখন একথা তাঁদের মনে হয় নি কেন যে জনগণ তদন্ত কমিটির বিশদ বক্তব্য জানতেও আগ্রহী? এই রিপোর্ট জনগণের জ্ঞাতার্থে সাধারণ্যে প্রচার করলে সব তথ্য তাঁদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হ'ত। এখানে অবশ্য জনগণ বলতে তদন্ত কমিটি জাপানের জনগণকে বুঝিয়েছেন, কারণ ধনরত্ন সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ জাপানের কাগজেই নাকি প্রকাশিত হয়েছিল।

এই পর্বের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তদন্ত কমিটি লিখেছেন নেতাজীর ইচ্ছাই ছিল তাঁর জাপানী মিত্রদের ওপর যতদূর সম্ভব কম নির্ভরশীল হওয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ থেকেই আজাদ হিন্দ্ ফৌজের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করা। এই উদ্দেশ্যে নেতাজী ও তাঁর সহকারীগণ নিয়মিত অর্থ সংগ্রহ করতেন এবং এইভাবে বহু অর্থই সংগৃহীত হয়েছিল। অর্থ মন্ত্রীর অধীনে "নেতাজী ফাণ্ড কমিটি" নামে একটি বিশেষ কমিটিও গঠিত হয়েছিল। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ভারতীয়েরা উদারভাবে সোনা রূপা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিষপত্র দান করেছিলেন। ১৯৪৫ সালে নেতাজীর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে তাঁকে সোনা দিয়ে ওজন করা হয়েছিল। শুধু অর্থ ও মূল্যবান ধনরত্নই নয়, স্থাবর সম্পত্তি ও দান করা হ'ত। রেঙ্গুনের হাবিব সাহেব একুনে তাঁর সমস্ত ভূ-সম্পত্তি, অর্থ ও অলঙ্কারপত্র দান করেছিলেন, যার মূল্যমান দাঁড়ায় এককোটি তিনলক্ষ টাকার মত। পরিবর্তে তিনি নেতাজীর কাছে এক জোড়া খাঁকি সার্ট ও প্যাণ্ট

চেয়েছিলেন যা পরে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য কাজ করতে পারেন (মেজর জেনারেল এ. সি. চ্যাটার্জী লিখিত ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল্ ফর্ ফ্রিডম, পৃঃ ১৬০) আজাদ হিন্দ্ সরকার এর মূলধন লেনদেন করতো আজাদ হিন্দ্ ব্যাঙ্ক। রেঙ্গুন থেকে পশ্চাদপসারণের সময় নেতাজী কি পরিমাণ সম্পদ সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। শ্রীদেবনাথ দাস বলেন যে রেঙ্গুন থেকে পশ্চাদ-পসারণের সময় অলঙ্কারপত্র ও সোনার বাঁট সমেত এককোটি টাকা মূল্যের ধনসম্পদ আজাদ হিন্দ্ ব্যাঙ্ক থেকে তোলা হয়েছিল এবং সতেরটি ছোট সীল করা বাক্স ভর্তি করে তা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। জেনারেল ভোঁসলে বলেছেন যে নেতাজী তাঁর সঙ্গে ছয়টি ষ্টিলের বাক্স ভর্তি করে সোনার অলঙ্কারপত্র ও অর্থ নিয়ে ব্যাঙ্ককে এসেছিলেন। অলঙ্কারপত্রগুলি ছিল দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের দান। তিনি অলঙ্কারগুলি দেখেন নি, সুতরাং ঐগুলির মূল্য সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণা নেই। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেই বৃটিশ গোয়েন্দাদলের প্রতিনিধিরা আজাদ হিন্দ্ ব্যাঙ্কএর চেয়ারম্যান শ্রীদীননাথকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। তিনি বলেছেন যে ১৯৪৫ সালের ২৪শে এপ্রিল নেতাজী যখন রেঙ্গুন ত্যাগ করে যান তখন ব্যাঙ্ক থেকে তিনি ১৪০ পাউণ্ড সোনা নিয়ে গিয়েছিলেন। ব্যাঙ্কক-এর ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের অন্যতম নেতা পণ্ডিত রঘুনাথ শর্মা বলেছেন যে জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত সোনা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিষপত্র নেতাজী সঙ্গে করেই নিয়ে গিয়েছিলেন, যার মোট দাম এককোটি টাকারও বেশী হবে। নেতাজী যে তাঁর সঙ্গে কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে গিয়েছিলেন, তা সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়; কিন্তু ধনরত্নের পরিমাণ কত ছিল এবং তার মূল্য কত সেই বিষয়ে প্রথম থেকেই সন্দেহ ও বৈষম্যে দেখা যায়। পণ্ডিত রঘুনাথ শর্মা বলেছেন যে মূল্যবান জিনিষগুলি দশ বারটি ষ্টিলের বাক্সে রাখা হয়েছিল— মাপ, ১৩"×১২"×১০" ইঞ্চি; কয়েকটি বাক্স অবশ্য সামান্য ছোট

মাপের। জেনারেল ভোঁসলে বলেন যে নেতাজীর প্রস্থানের সময় ছয়টি ষ্টিলের বাক্সের জিনিসপত্র দু'টি ক্যানভাসএর থলেতে আবার বাঁধা হয়েছিল। কিন্তু শ্রীদেবনাথ দাস বলেছেন যে ব্যাঙ্কক ত্যাগ করে যাওয়ার আগে সতেরটি ধনরত্নের বাক্সের মূল্যবান জিনিষপত্র ৩০ থেকে ৩৬ ইঞ্চি লম্বা দু'টি চামড়ার স্যুটকেসে পুরে দেওয়া হয়েছিল। দু'টি বড় চামড়ার স্যুটকেসে এক কোটি টাকা মূল্যের সোনা ও অলঙ্কারপত্র নিয়ে যাওয়া সম্ভব কিনা তা বিশ্বাস করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। নেতাজীর ব্যক্তিগত ভৃত্য কুন্দন সিংকে কমিটি জিজ্ঞাসবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন যে ধনরত্ন বিভিন্ন মাপের ষ্টিলের বাক্সে ভর্তি করা হয়েছিল—মাপ, ২০" X ১৩" X ১৬" ইঞ্চি এবং ১১" X ৬" X ৬" ইঞ্চি। নেতাজী ব্যাঙ্কক পরিত্যাগ করে যাওয়ার আগে বাক্সগুলি যখন পরীক্ষা করা হচ্ছিল তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ভাষায়: "বাক্সগুলিতে যে ধরনের অলঙ্কারপত্র ছিল তা সাধারণতঃ ভারতীয় মহিলারা পরিধান করেন। যেমন, মেয়েদের গলার হার, ঘড়ি, নেক্‌লেস, চুড়ি, ব্রেসলেট, কানের দুল ইত্যাদি। ঐগুলির বেশীর ভাগই ছিল মেয়েদের ব্যবহারের জিনিষ। কিছু পাউণ্ড এবং গিনিও ছিল। গিনি আঁটা কিছু হারও ঐ জিনিষের মধ্যে ছিল। আর কিছু সোনার ছোট তার ছিল, কিন্তু কোন সোনার বাঁট ছিল না। চার বাক্স ভর্তি ধনরত্ন ছাড়াও নেতাজীর ব্যক্তিগত ব্যবহারের কিছু জিনিসপত্র এবং অন্যান্য কিছু মূল্যবান জিনিষ যা তিনি সিঙ্গাপুর থেকে নিয়ে এসেছিলেন, সেইগুলি সবই একটি চামড়ার এ্যাটাচি কেস-এ রাখা হয়েছিল। এইগুলির মধ্যে নেতাজীকে দেওয়া হিটলারএর একটি উপহার, একটি সোনার সিগারেট কেসও ছিল।" হিকারী কিকানের লেঃ কুনিজুকা অবিরতই নেতাজীর সংস্পর্শে ছিলেন। তিনি বলেছেন যে ঐ রাত্রেই তাঁকে মূল্যবান জিনিষগুলি দেখানো হয়েছিল। তিনি কুন্দন সিংএর সঙ্গে একমত হয়েছেন, কিন্তু ক'টি বাক্স ছিল তা তিনি উল্লেখ করেন নি।

নেতাজীর জীবনের শেষ ক'টি দিনের ইতিহাসের খাঁটি সাক্ষী হয়েই প্রত্যক্ষদর্শীরা ক্ষান্ত হন নি, ধনরত্নের হিসাবটাও তাঁরা ঠিক ঠিক ভাবে খেয়াল করে রেখেছেন। তদন্ত কমিটি অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছেন যে প্রচুর ধন সম্পদ সঙ্গে নিয়েই নেতাজী শেষ যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু ঐ সম্পদের পরিমাণ কি? ঐ ব্যাপারেই যত সমস্যা। স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার জন্য যে অর্থ, অলঙ্কারপত্র ও স্থাবর সম্পত্তি গৃহীত হত, তা নিশ্চয়ই নেতাজীর কাছে থাকত না। ঐ সম্পদ অবশ্যই আজাদ হিন্দ্ ব্যাঙ্কে জমা পড়ত। ব্যাঙ্ক থেকে কি পরিমাণ সম্পদ তুলে নেওয়া হয়েছে সেই সম্বন্ধে কোন বিবৃতি আজাদ হিন্দ্ সরকারএর অর্থ মন্ত্রকের কোন মুখপাত্রের কাছ থেকে পাওয়া গেছে বলে জানা যায় না। ঐ সময় অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন, শ্রীএন্. রাঘবন, এবং ঐ দপ্তরের সচিব পদে ছিলেন শ্রীবি. কে. দাস। এঁদের খোঁজ খবর করা হয়েছিল বলেও জানা যায় না। আজাদ হিন্দ্ ব্যাঙ্কএর চেয়ারম্যানএর জবানীমতে ১৪০ পাউণ্ড সোনা নেতাজী সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। পণ্ডিত রঘুনাথ শর্মার জবানীমতে নেতাজী জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত এক কোটি টাকারও বেশী পরিমাণের সম্পদ সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাহলে যে সম্পদ নেতাজী সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করে নিতে হবে, তার পরিমাণ দাঁড়ায় এক কোটি টাকার সম্পদ ও ১৪০ পাউণ্ড সোনা। শ্রীদেবনাথ দাসএর উল্লেখ করা সতের বাক্স ধনরত্ন আবার ভর্তি করা হ'ল দু'টি বড় স্যুটকেসএ। পণ্ডিত রঘুনাথ শর্মা দেখেছেন দশ বারটি স্টীলের বাক্স। জেনারেল ভোঁসলে ছয়টি ষ্টিলের বাক্সের সম্পদ দু'টি ক্যানভাসের থলেতে ভর্তি করতে দেখেছিলেন। তাহ'লে বাকি চার থেকে ছয়টি বাক্সের হিসাব নেই। আর শ্রীকুন্দন সিং যে দু'টি মাত্র বাক্সের কথা বলেছেন তার মাপ শ্রীদেবনাথ দাসএর দেওয়া মাপের চেয়ে অনেক ছোট। শ্রীআয়ারএর লেখা থেকে ধনসম্পদ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তিনি কিন্তু সিঙ্গাপুর থেকে নেতাজীর সহযাত্রী

হয়ে সাইগন পর্যন্ত এসেছিলেন। সাইগনএর বিশ্রাম স্থল থেকে বিমান বন্দরে আসার সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র, কর্নেল হবিব-উর রহমান ও শ্রীআয়ার একই গাড়ীতে ছিলেন। আর অন্য একটি গাড়ীতে ছিলেন সর্বশ্রী দেবনাথ দাস, গুলজারা সিং, প্রীতম সিং, এবং আবিদ হাসান। শ্রীদেবনাথ দাসএর পক্ষে ধনসম্পদের খবর রাখা সম্ভব, কারণ তিনি সাইগন বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর বক্তব্য কারও দ্বারা সমর্থিত হয় নি। তাহ'লে ঐ বিপুল সম্পদ গেল কোথায়?

ধনরত্ন পর্বের তৃতীয় অনুচ্ছেদে তদন্ত কমিটি অভিমত রেখেছেন যে নেতাজী তাঁর শেষ পরিদর্শনের সময় সিঙ্গাপুর ও ব্যাঙ্কক্এ বহু টাকা দান করেন। তাঁর জাপানী সচিব ও দোভাষী, শ্রীনেগিশি বলেন যে সিঙ্গাপুর পরিত্যাগ করে যাওয়ার আগে নেতাজীর নির্দেশ মত তিনি জাপান সরকার থেকে পাওয়া দশ কোটি ইয়েন ঋণের মধ্যে জাপানী ব্যাঙ্ক থেকে তিনি আট কোটি ইয়েন তুলে নেন। ঐ ঋণ তোলা হয়েছিল কাগজের টাকায় এবং আই. এন্. এ. ও বেসামরিক ব্যক্তিদের জন্য ঐ টাকা খরচ করা হয়েছিল। শ্রীদেবনাথ দাস বলেন যে, ১৭ই আগস্ট ব্যাঙ্কক ত্যাগ করে যাওয়ার পুর্ব মুহূর্তে নেতাজী চুলালোংগকর্ণ হাসপাতাল ও বিশ্ববিদ্যালয়কে পনের লক্ষ টিক্যাল্স দান করেন এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সব অফিসার ও কর্মীদের দুই থেকে তিন মাসের অগ্রিম মাইনে মঞ্জুর করে দেন। তিনি আরও বলেন যে বার্মা থেকে নিয়ে আসা ধনরত্ন থেকে ঐ অর্থ খরচ করা হয় নি, ঐ অর্থ খরচ হয়েছিল ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের তহবিল থেকে। এই সাক্ষীই বলেছেন যে নেতাজীর মালপত্রের মধ্যে দলিল দস্তাবেজ ও অর্থে ভর্তি একটি বড় স্যুটকেস ছিল। কর্মচঞ্চল শেষ দিনগুলির ছবি খুবই অস্পষ্ট। ঠিক কতটা সোনা ও অলঙ্কারপত্র তিনি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তা জানা যায় না। দলিল দস্তাবেজগুলি যাতে মিত্র-শক্তির হাতে না পড়ে সেইজন্য ঐগুলি নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল

বলেই ঘটনার পুনঃ সংযোজন অসম্ভব। শুধু এই কথাই বলা যেতে পারে যে শেষ পর্যায়ে নেতাজী বহু টাকা ব্যয় করেছিলেন এবং কিছু মূল্যবান জিনিষপত্র, অলঙ্কার, ইত্যাদি. তাঁর সঙ্গে নিয়ে নিয়েছিলেন। আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, নেতাজী তাঁর সঙ্গে ধনরত্ন নিয়ে যেতে চান নি। পণ্ডিত রঘুনাথ শর্মার সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, মাত্র কয়েকদিন আগে নেতাজী তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে তিনি ধনরত্নের দায়িত্ব নেবেন কিনা। উত্তরে পণ্ডিত রঘুনাথ শর্মা অসম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন। শ্রীদেবনাথ দাস বলেছিলেন যে সাইগন বিমান বন্দরে আবার প্রস্তাব করেলিলেন যে তিনি ধনরত্ন রেখে দিয়ে যাবেন। শ্রীদেবনাথ দাস ও মেজর হাসান এই প্রস্তাবে রাজী না হওয়ার দরুণ নেতাজী ঐ সম্পদ তাঁর সঙ্গেই নিয়ে গিয়েছিলেন।

সাইগন বিমান বন্দরে যে শ্রীদেবনাথ দাস উপস্থিত ছিলেন, তা সত্য এবং এই প্রত্যক্ষদর্শী দলিল দস্তাবেজ প্রসঙ্গে যা বলেছেন তাও সত্য। কিন্তু তদন্ত কমিটি কি ভাবে জানলেন যে দলিল পত্র নষ্ট করা হয়েছিল? যেসব দলিল দস্তাবেজে আজাদ হিন্দ্ সরকার ও নেতাজীর সংগ্রামী জীবনের অনেক ইতিহাসই লেখা রয়েছে সেইগুলি যে নেতাজী তাঁর সঙ্গেই নিয়ে গিয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহই নেই। হয় তো কিছু কাগজপত্র নষ্ট করা হয়েছিল, কিন্তু তা যে অতি প্রয়োজনীয় নয়, তা আন্দাজ করে নেওয়া যায়। নেতাজীর কর্মময় জীবনের ঘটনাবলী যদি সত্যই স্পষ্ট হত, তবে তার পক্ষে এমন দুঃসাহসিক কাজ করা সম্ভব হ'ত না, কারণ, খয়ের খাঁর বংশধররা এখনও পৃথিবীর মাটি থেকে বিদায় নেয় নি। নেতাজীর বৈশিষ্ট যে তাঁর কোন কার্যক্রমেরই সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না, যতক্ষণ না তার ফল পাওয়া যায়।

এই পর্বের চতুর্থ অনুচ্ছেদ থেকে জানা যায় যে জাপানী ও ভারতীয় সব প্রত্যক্ষদর্শীরাই সাইগনএ ধনরত্নের ব্যাপারে পরিষ্কার বক্তব্য রেখেছেন। যা যেভাবে আছে থাকুক, কিন্তু একথা চূড়ান্ত-

ভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে নেতাজী সাইগন থেকে সোনা ও মূল্যবান জিনিষে ভর্তি প্রায় তিরিশ ইঞ্চি লম্বা দু'টি বড় চামড়ার স্যুটকেস সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। আলোচিত বক্তব্যের পুনরুল্লেখ করে বলা যেতে পারে যে জিনিষের মূল্যমান এক কোটি টাকার মতই হবে, তবে এমন কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই যা থেকে স্যুটকেস-গুলিতে নিয়ে যাওয়া জিনিষপত্রের বিশদ তালিকা বা তার মূল্য সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। পুনরুক্তি হবে মনে করে এই অনুচ্ছেদটির অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম।

অনুসন্ধান চালিয়ে তদন্ত কমিটি নিশ্চিত হতে পেরেছেন যে নেতাজী সাইগন থেকে তাঁর শেষযাত্রায় প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে গিয়েছিলেন। আলোচ্য বিমানেই যদি ঐ ধনরত্ন নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে তাহলে প্রত্যক্ষদর্শীরা সবাই একমত হতে পারছেন না কেন? ঐ বিমানে যদি ধনরত্ন নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে তাহলে দলিল দস্তাবেজ-গুলি কোথাথায় গেল? এই প্রসঙ্গে যে বিভ্রান্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে ভিন্নতর কিছু ভাববার অবকাশ করে দেয়।

পঞ্চম অনুচ্ছেদে নেতাজী তদন্ত কমিটি লিখেছেন যে আলোচ্য বিমানটি ১৮ই আগস্ট তাইহোকুতে বিধ্বস্ত হয়েছিল। কর্নেল হবিব-উর রহমান তাঁর জবানীতে বলেছেন যে, পরদিন তিনি অনুসন্ধান করেছিলেন মালপত্রগুলির কি অবস্থা হয়েছিল জানার জন্য; বিশেষ ভাবে দু'টি চামড়ার স্যুটকেসএর খোঁজ তিনি করেছিলেন, যাতে সোনা ও অলঙ্কারপত্র ছিল। তাঁকে বলা হয়েছিল যে বিমানটি সম্পূর্ণভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল এবং বিমানের মালপত্রগুলিও আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। তবে, কিছু আধপোড়া অলঙ্কারপত্র ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল এবং ঐ উদ্ধারপ্রাপ্ত অলঙ্কারপত্র সামরিক সদর দপ্তরের নিরাপদ তদারকিতে রাখা হয়েছে। বিমানবন্দর প্রতিরক্ষার ভারপ্রাপ্ত অফিসার মেজর কে. সাকাই ও বিমান বন্দরের ভারপ্রাপ্ত অফিসার

ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতের তদারকিতে সংগ্রহ করার কাজ চালনো হয়েছিল। মেজর কে, সাকাই জানিয়েছেন যে দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার ঘণ্টা দুই পরে যখন তিনি ঘটনাস্থলে এসেছিলেন, তখন তিনি দেখেছিলেন যে ক্যাপ্টেন নাকামুরা ও তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীরা মাটিতে পড়ে থাকা জিনিষপত্র সংগ্রহ করে চলেছেন। তাঁদের সংখ্যা অপ্রচুর থাকার দরুণ তিনি তাঁর অধীনস্থ তিরিশজন কর্মীকে কাজ করার জন্য নিয়োগ করেছিলেন। অপরপক্ষে ক্যাপ্টেন নাকামুরা বলেছেন যে লেঃ কর্নেল নোনোগাকির নির্দেশমত তিনি তাঁর অধীনস্থ কর্মীদের মূল্যবান জিনিষপত্র সংগ্রহ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনি দেখেছিলেন যে জনৈক জাপানী অফিসার লেঃ ইয়াশিদার অধীনে মেজর সাকাইএর অধীনস্থ কর্মীরা কাজ করে চলেছেন। দু'জন অফিসারই অবশ্য একমত হয়েছেন যে আধপোড়া কালো নেকলেস, আংটি, মেডেল ইত্যাদি অলঙ্কারপত্র সংগৃহীত হয়েছিল। এইগুলি ভর্তি করা হয়েছিল ১৮ লিটার পরিমাপের একটি গ্যাসোলিনের টিনে এবং টিনের ঢাকনাটি ফালি কাগজ দিয়ে সীল করে দেওয়া হয়েছিল, আর অফিসাররা ঐ শীলের ওপর তাঁদের নিজস্ব শীলমোহর এঁটে দিয়েছিলেন। পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে কিছুটা অসঙ্গতি রয়ে গেছে। মেজর সাকাই জানিয়েছেন যে মূল্যবান জিনিষপত্রের টিনটি মাত্র একরাত্রির জন্য পাহারায় রাখা হয়েছিল এবং পরদিন সামরিক সদর দপ্তরে লেঃ কর্নেল শিবুয়াকে হস্তান্তরিত করা হয়েছিল। অপরপক্ষে ক্যাপ্টেন নাকামুরা বলেন যে টিনটি বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ করার আশ্রয় স্থলে ৪।৫ দিন প্রহরাধীনে রাখা হয়েছিল এবং তারপর লেঃ কর্নেল শিবুয়াকে হস্তান্তর করে দেওয়া হয়েছিল। ৫ই সেপ্টেম্বর কর্নেল হবিব-উর রহমানকে বিমানে টোকিও পাঠানো হয়েছিল। লেঃ টি. সাকাই ও লেঃ হায়াশিদা তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এঁদের দুজনকে ফরমোসার সেনাবাহিনী সদর দপ্তর থেকে, নেতাজীর চিতাভস্ম এবং

তাঁর মূল্যবান জিনিষপত্রগুলি নিয়ে যাওয়ার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। মেজর সাকাই ও ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতো, দু'জনেই ১৮ লিটার পরিমাপের একটি গ্যাসোলিনের টিনের কথা বলেছেন। সদর দপ্তরের স্টাফ অফিসার লেঃ কর্নেল শিবুয়াও টিনটির উল্লেখ করেছেন। লেঃ কর্নেল সাকাই তাঁর বিবরণীতে পাত্রটির বর্ণনা দিয়েছেন—"তেলের টিনের মত একটি বড় মালপত্রের বোঝা।" কিন্তু কর্নেল হবিব-উর রহমান এবং লেঃ হায়াসিদা একটি কাঠের বাক্স'র কথা বলেছেন।

কর্নেল হবিব-উর রহমান চামড়ার স্যুটকেস দুটি খোঁজ করে আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে একটু তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি যে ঘটনার আদ্যান্ত জানেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঐ বিধ্বস্ত বিমানের পাশে তিনি নাকি দাঁড়িয়েছিলেন। দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে সকলকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় নি তাও প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানী থেকে জানা গেছে। আগেই আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গেছে যে বিমানটির কি অবস্থা ঘটেছিল সেই বিষয়ে সাক্ষীরা একমত হতে পারেন নি, অথচ সকলেই নাকি আলোচ্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। যে বিমান খাড়াভাবে মাটিতে পড়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং আগুনও ধরে গিয়েছিল, সেই বিমান থেকে চামড়ার স্যুটকেস পাওয়ার আশা কিভাবে করা যায় তা ভেবে পাওয়া যায় না। তবুও কর্নেল রহমান চামড়ার বাক্সগুলির খোঁজ করেছেন। যদিও তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী এবং আলোচ্য বিমানটির কি পরিণতি হয়েছিল তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তবুও তাঁকে অন্য একজন বলে দিয়েছিলেন যে বিমানটি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। কর্নেল রহমানও ঐ জবাব শোনার পর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন বলেই মনে হয়। কিন্তু আধপোড়া অলঙ্কারগুলি সম্বন্ধে তিনি আর কোন খোঁজখবর নিয়েছিলেন বলে জানা যায় না। তবে একথাও সত্য যে আলোচ্য বিমানের ধ্বংসস্তূপ থেকে ধনরত্নের খোঁজ না পাওয়া গেলেও নেতাজী যে ঐ বিমানেরই যাত্রী ছিলেন তা

প্রমাণ করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং বিমান বন্দর থেকে অলঙ্কার-পত্র ও সোনার বাঁট উদ্ধার করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সোনার বাঁটগুলি কোথায় গেল? আলোচ্য বিমানের ধ্বংসস্তূপ থেকে সোনার বাঁট পাওয়া গেল না, দলিল দস্তাবেজের কোন হদিস পাওয়া গেল না, এবং ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষীরা যে সঙ্গতিপূর্ণ কোন বক্তব্য কোন পর্যায়েই রাখতে পারেন নি তাও সত্য। এই প্রসঙ্গে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে অলঙ্কার পত্র সংগ্রহ করার বিষয়ে দেখা যায় যে সামরিক বিভাগের দু'জন দায়িত্বশীল অফিসার তাঁদের অধীনস্থ কর্মীদের সহযোগিতায় ধ্বংসস্তূপ থেকে অলঙ্কারপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু এই পর্যায়েও, মাত্র দু'জন অফিসার একে অন্যের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। মেজর সাকাই ঘটনাস্থলে এসে ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতোকে তাঁর কর্মীসহ সংগ্রহ করার কাজ চালিয়ে যেতে দেখেছিলেন বলে জানিয়েছেন। অপরপক্ষে ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতো জানিয়েছেন যে ঘটনাস্থলে এসে তিনি মেজর সাকাইএর লোকজনকে সংগ্রহ করার কাজ করতে দেখেছিলেন। পরস্পর বিরোধী এই ধরণের বক্তব্য থেকে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়; তবু দু'জনেই বলেছেন যে আধ-পোড়া অলঙ্কারপত্র সংগৃহীত হয়েছিল। এঁরা কেউই কিন্তু সোনার বাঁট বা আজাদ হিন্দ্ সরকারএর দলিল দস্তাবেজের কথা বলেন নি। যে পাত্রে অলঙ্কার পত্র সংগৃহিত হয়েছিল বলে সংগ্রাহকরা জানিয়ে-ছিলেন, সেই পাত্রটিই নাকি বিমানে টোকিও পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু যাঁদের সঙ্গে অলঙ্কারের পাত্রটি টোকিও গিয়েছিল তাঁরা তো সংগ্রাহকদের বর্ণিত আধারের কথা বলেনই নি, উপরন্তু আধার সম্বন্ধে তাঁরাও একমত হতে পারেন নি। বিমান বন্দরে ১৮ লিটারের একটি গ্যাসোলিনএর টিনে অলঙ্কারপত্র সংগৃহীত হয়েছিল, কিন্তু যাঁরা তাইহোকু থেকে টোকিও পর্যন্ত ভস্ম ও অলঙ্কারপত্র নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের কেউ উল্লেখ করেছেন তেলের টিনের মত একটি বড় বোঝার

এবং অন্যেরা উল্লেখ করেছেন একটি কাঠের বাক্সের কথা। তাছাড়া আরও বৈষম্য পাওয়া যায়। তদন্ত কমিটির রিপোর্টের পঞ্চম পর্বের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে লেখা আছে যে ফরমোসা সেনাবাহিনীর স্টাফ অফিসার লেঃ কর্নেল শিবুয়া, লেঃ কর্নেল সাকাইকে ভস্মাধার ও মূল্যবান জিনিষপত্রের বাক্সটির দায়িত্ব নিতে বলেছিলেন। কিন্তু এই অনুচ্ছেদে লেখা হয়েছে যে লেঃ কর্নেল শিবুয়া নাকি টিনের কথাই উল্লেখ করেছেন। এই দুই বক্তব্যের মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। কাঠের বাক্স ও টিন এক জিনিষ নয়। দুর্ঘটনাস্থল থেকে অলঙ্কার-পত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ হস্তান্তর ও টোকিও পাঠানো সম্পর্কে এমন বিচিত্র অসঙ্গতি খুঁজে পাওয়ার পর 'আলোচ্য ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে ওঠে।' কিন্তু তবুও সাক্ষীরা নাকি দৃঢ়তার সঙ্গে দাবী করেন, আলোচ্য ঘটনার বিবরণ অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

ধনরত্ন পর্বের পরবর্তী অনুচ্ছেদে, অর্থাৎ ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে তদন্ত কমিটি লিখেছেন যে মূল্যবান জিনিষপত্রের বাক্সটি ৭ই সেপ্টেম্বর বিকালে টোকিওর ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেডকোয়ার্টার্সএ সমর্পণ করা হয়েছিল। ডিউটি অফিসার মেজর কিনোশিতা যিনি প্রথম ঐ বাক্সটি গ্রহণ করেছিলেন, তিনিই পরদিন লেঃ কর্নেল টাকাকুরাকে ঐ দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। দু'জনেই বলেন যে বাক্সটি পেরেক দিয়ে আঁটা ছিল, কিন্তু সীল করা ছিল না। সীল করা গ্যাসোলিনের টিন কিভাবে একটি কাঠের বাক্সে রূপান্তরিত হয়েছিল তা বোঝা যায় না। লেঃ কর্নেল টাকাকুরা বলেন যে ৮ই সেপ্টেম্বর সকালে তিনি শ্রীরামমূর্তির সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিলেন। পরে শ্রীরামমূর্তি শ্রীআয়ারকে সঙ্গে নিয়ে এসে নেতাজীর চিতাভস্ম ও মূল্যবান জিনিষপত্রের দায়িত্ব বুঝে নিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীরামমূর্তি বলেন যে কর্নেল হবিব-উর রহমান টোকিওতে পৌঁছানোর ২।৩ দিন পরে (৯ই বা ১০ই সেপ্টেম্বর হবে) তাঁকে মূল্যবান জিনিষপত্রের বাক্সটি নিয়ে আসতে বলেছিলেন এবং সেইমতে শ্রীরামমূর্তি

ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স'এ গিয়ে ঐ বাক্সটি নিয়ে এসেছিলেন। বাক্সটি বেশ ভারীই ছিল এবং তা বয়ে নিয়ে আসতে একটি কুলিও ডাকা হয়েছিল। কর্নেল হবিব-উর রহমান বলেন যে তিনি টোকিওতে পৌঁছানোর কয়েকদিন পর, সর্বশ্রী আয়ার ও রামমূর্তিকে ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স'এ ডেকে পাঠানো হয়েছিল এবং মূল্যবান জিনিষপত্রের বাক্সটি তাঁদের হস্তান্তর করা হয়েছিল। শ্রী জে. মূর্তি তাঁর ভাইয়ের বক্তব্য সমর্থন করেন। বাক্সটি কোথায় গ্রহণ করা হয়েছিল সেই সম্বন্ধে শ্রীআয়ার কিছুই বলেন না, তবে তিনি উল্লেখ করেন যে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি ও কর্নেল হবিব-উর রহমান যে বাড়ীতে থাকতেন সেই বাড়ীতেই তিনি, কর্নেল রহমান, শ্রীরামমূর্তি ও শ্রী জে. মূর্তিকে আধপোড়া অলঙ্কারপত্র পরিষ্কার ও বাছাই করতে দেখেছিলেন। বাক্সটি কে গ্রহণ করেছিলেন এবং কত তারিখে, সেই সম্বন্ধে গুরুতর বৈষম্য রয়েছে। শ্রীরামমূর্তি বলেছেন যে কর্নেল হবিব-উর রহমান নিজে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে বাক্সটি তাঁর সামনেই তাইহোকুতে প্যাক করা হয়েছিল। ঐটি সেই বাক্সই। কিন্তু কর্নেল রহমান স্বয়ং বলেছেন যে বাক্সটির সীল ভাঙ্গা ছিল, মনে হচ্ছিল কোনরকম রদবদল করা হয়েছিল। বাক্সটির মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল সোনার অলঙ্কার এবং দামী পাথর; সবই আধপোড়া এবং ধ্বংসস্তূপের ধূলিকণা ও ধাতুর সঙ্গে মিশে যাওয়া। ঐগুলিকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা হয়েছিল, বেশী সোনা বা বেশী মূল্যধাতুর ভিত্তিতে। পরে ঐগুলিকে আবার একটি বাক্সে ভর্তি করে পেরেক দিয়ে আটা হয়েছিল। মূল্যবান জিনিষগুলির ওজন দাঁড়িয়েছিল এগার কিলোগ্রাম। জিনিষগুলি হিসাব করে একটি তালিকা তৈরী করা হয়েছিল এবং কর্নেল হবিব-উর রহমান ঐ তালিকায় সহি দিয়েছিলেন। তালিকার অনুলিপি আনেক্সারএ দেওয়া আছে। নেতাজীর সংগ্রামের উত্তরাধিকারী রূপে ভারতের মাটিতে যে কর্তৃপক্ষই আসুন না কেন, তাঁদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যই

কর্নেল রহমান ঐ মূল্যবান জিনিষগুলি শ্রীরামমূর্তির কাছে রেখে দিয়েছিলেন। ঐ সময়ে শ্রীআয়ারও একই ধরণের নির্দেশ দিয়ে শ্রীরামমূর্তির কাছে ৩০০ গ্রাম সোনা ও ২০,০০০ ইয়েন গচ্ছিত রেখেছিলেন। মিত্রশক্তির দ্বারা মূল্যবান সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ এড়ানোর জন্যই তাঁরা এই কাজ করেছিলেন।

নেতাজী তদন্ত কমিটি ধনরত্নের বাক্সটি হস্তান্তরের তারিখ ৭ই সেপ্টেম্বর বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আগে আলোচনা করে দেখা গেছে যে কর্নেল রহমান শ্রীআয়ার এর আছে যে জবানী দিয়েছিলেন তাতে এই তারিখের (৭ই) কথা তিনি উল্লেখ করেন নি। সংগৃহীত অলঙ্কারপত্রে ভর্তি গ্যাসোলিনের টিনটি কিভাবে কাঠের বাক্সে রূপান্তরিত হয়েছিল সেই সূত্র কমিটি উদ্ধার করতে পারেন নি। অবশ্য খাড়াভাবে মাটিতে পড়ে গিয়ে বিধ্বস্ত হওয়া বিমানের সীট বেল্ট হীন যাত্রীরা বিমানের মেঝেতে হাত পা ছড়িয়ে বসে থেকে, বিমানটি মাটিতে পড়ার সময়ও কিভাবে নিজেদের জায়গায় বসেছিলেন, সেই রহস্য পাঠকবর্গ নিশ্চয় উদ্ধার করতে পারবেন না। ধনরত্ন সংগ্রহের ব্যাপারে যেমন গোলযোগ দেখা যায়, তেমনি গোলযোগ দেখা যায় ঐগুলি সংরক্ষণের ব্যাপারে, এবং পরবর্তী পর্যায়ে তা হস্তান্তর করার ব্যাপারে। তদন্ত কমিটি এই ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পান নি যে কবে এবং কার হাতে ঐ আধপোড়া সম্পদ হস্তান্তরিত হয়েছিল। কর্নেল রহমান তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন যে উদ্ধারপ্রাপ্ত ধনরত্নের বাক্সটি তাঁর সামনেই প্যাক করা হয়েছিল। যদি আলোচ্য ঘটনার দিনই ঘটনাস্থল থেকে অলঙ্কারপত্রগুলি সংগৃহীত হয়ে থাকে এবং পরে কোন একসময় তা সেনাবাহিনীর দপ্তরে লেঃ কর্নেল শিবুয়াকে হস্তান্তরিত করা হয়ে থাকে, তবে কর্নেল রহমান কিভাবে ঐ অলঙ্কারগুলি প্যাক করতে দেখেছিলেন তা বোঝা যায় না। অলঙ্কার গুলি দুর্ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে বা কর্নেল রহমান সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর তাঁর সামনে নিয়ে গিয়ে প্যাক করা

হয়েছিল বলে কোন সাক্ষীই বলেন নি। যাহোক, বাক্সটি যখন কর্নেল রহমান ও শ্রীরামমূর্তির কাছে এসে পৌঁছায় তখনকার অবস্থা সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে মতান্তর দেখা যায়। শ্রীরামমূর্তির মতে কর্নেল রহমান বাক্সটি দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং কর্নেল রহমানএর মতে ঐ বাক্স রদ বদল করা হয়েছিল অর্থাৎ তিনি বাক্সটি দেখে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। কর্নেল রহমান সর্বসাকুল্যে ১১ কেজি উদ্ধার প্রাপ্ত অলঙ্কার পেয়েছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে যে হিসাব পাওয়া যায়, যেমন, ব্যাঙ্ক থেকে তোলা ১৪০ পাউণ্ড সোনা, নেতাজীর মালপত্রে ছিল ১৫০ কিলো সোনা, এক কোটি টাকারও বেশী অলঙ্কার পত্র; এইগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত মাত্র ১১ কিলোতে দাঁড়াল? ঘটনাস্থলে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সবাই কয়েক কিলো সোনার তাল গোপনে আত্মসাৎ করেছিলেন বলেই কি বিশ্বাস করে নিতে হবে? উত্তরে প্রত্যক্ষদর্শীরা হয়ত স্মিত হেসে বলবেন যে যা খুশী ধরে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সামরিক এক্তিয়ারে যে ঘটনা ঘটেছিল বলে সাক্ষীরা বলেন সেই এক্তিয়ারে এমন ছলচাতুরী চলতে পারে না।

সপ্তম অনুচ্ছেদে লেখা হয়েছে যে শ্রীমূর্তি ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত মূল্যবান ধনরত্ন তাঁর কাছেই রেখেছিলেন। টাকাগুলিও তিনি ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখেন নি। এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন যে দখলকারী ফৌজ জাপানী ব্যাঙ্কের সম্পদের হিসাব পাবেনই, এবং তাঁরা যাতে ঐ মূল্যবান সম্পদ বাজেয়াপ্ত না করতে পারেন তাই তিনি এই কাজ করেছিলেন। এত বছরের মধ্যেও তিনি কোন ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার কোন ব্যবস্থা করেন নি এবং ঐ সময়েই শ্রীরামমূর্তি স্বীকার করেছিলেন যে ধনরত্ন তাঁর কাছেই গচ্ছিত ছিল এবং তিনি ঐগুলি টোকিওর ভারতীয় দূতাবাসকে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে শ্রীআয়ার এর জাপান যাত্রার ব্যয়ভার তিনি কিছুটা

বহন করেছিলেন। ভারতে ফিরে এসে শ্রীআয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে টোকিওস্থ ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে ঐ ধনরত্ন গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী ঐ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন এবং তাঁরই নির্দেশমতে ১৯৫১ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর ভারতীয় দূতাবাস ঐ ধনরত্ন গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৫ সালে কর্নেল রহমান, শ্রীরামমূর্তিকে মূল্যবান জিনিষের যে তালিকা তৈরী করে দিয়েছিলেন, তারই অনুলিপির ওপর দূতাবাসের প্রধান সচিব, শ্রীভি. সি. ত্রিবেদী ধনরত্ন প্রাপ্তির সই দিয়েছিলেন। একই দিনে শ্রীআয়ার যে ৩০০ গ্রাম সোনা ও ২০,০০০ ইয়েন রেখে গিয়েছিলেন, তাও শ্রীরামমূর্তি অর্পণ করেছিলেন। ভারতীয় দূতাবাস মূল্যবান জিনিসগুলি আবার মিলিয়ে ওজন করে দেখেছিলেন। দেখা গিয়েছিল যে কর্নেল রহমান তাঁর তালিকায় যে ওজন লিখে রেখেছিলেন তার চেয়ে পরিমাণ কিছু বেশীই ছিল।

নেতাজী রহস্যের কিনারা করার জন্য মিত্রশক্তির ঝানু গোয়েন্দারা সম্ভাব্য সব রকম চেষ্টাই চালিয়েছিলেন। কর্নেল হবিব-উর রহমান ও অন্যান্য জাপানী অফিসারদের বহু ধরণের জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, বিমান দুর্ঘটনা শুধু প্রত্যক্ষদর্শীদের (?) বিবরণী থেকেই প্রমাণিত হয় না; বিধ্বস্ত বিমানের ধ্বংসস্তূপ ও সেখান থেকে উদ্ধার করা জিনিষপত্রও প্রমাণ স্বরূপ দাখিল করতে হয়। ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা কোন জিনিষই যে জাপ সরকার আলোচ্য ঘটনার পরে পেশ করেন নি, তা সকলেরই জানা। এই উদ্ধারপ্রাপ্ত জিনিষগুলি যদি তখন তাঁর প্রবাসী ভারতীয়দের সামনে পেশ করতেন তাহলে জনমনের অনেক সংশয় দূর হয়ে যেত, কিন্তু তা করা হয় নি। ধনরত্নের ক্ষেত্রে, উদ্ধার করা জিনিষগুলি যাতে মিত্রশক্তি বাজেয়াপ্ত করতে না পারেন সেইজন্য ঐগুলি খুব সতর্কতা সহকারে গোপনে রাখা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন শ্রীমূর্তি। কর্নেল রহমানএর লিখিত

জবানী হস্তার্পণ করার তাৎপর্য বুঝতে অসুবিধা হয় না, কিন্তু শ্রীমূর্তির গোপনতার প্রয়াস কি যথাযথ? শ্রীআয়ারএর দেওয়া সোনা ও অর্থ বাজেয়াপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি ব্যাঙ্কে জমা দেননি বলার দরুণ কোন মন্তব্য নাও করা যেতে পারে, কিন্তু আধপোড়া কালো সোনার অলঙ্কারগুলি বাজেয়াপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? ঐ উদ্ধারপ্রাপ্ত অলঙ্কারগুলিই দুর্ঘটনার প্রমাণ। ঐ প্রমাণ আলোচ্য ঘটনার প্রচারকালে পেশ করলে কি ক্ষতি ছিল? এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরাই। কিন্তু একথাও সত্য যে চন্দ্র বোসকে খুঁজে বার করার জন্য সেখানে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে ঝানু গোয়েন্দারা অনুসন্ধান চালিয়ে গেছেন এবং জাপ সরকারএর সামরিক বিভাগের দলিল দস্তাবেজ এবং নথিপত্রও ঘেঁটে দেখেছেন, সেইখানে টোকিও শহরে বাস করে শ্রীমূর্তি মিত্রশক্তির দৃষ্টি এড়িয়ে ধনরত্নের বোঝা নিজের কাছে রেখেছিলেন এটা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে শ্রীমূর্তি অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। কিন্তু তিনি যে শ্রীআয়ারএর নির্দেশমত সব ব্যাপার গোপন রেখেছিলেন সেই সম্পর্কে শ্রীআয়ারএর সমর্থন কোথায়?

অষ্টম অনুচ্ছেদে নেতাজী তদন্ত কমিটি লিখেছেন যে মূলবান জিনিষগুলি ভারতে নিয়ে এসে রাষ্ট্রপতি ভবনের জাতীয় যাদুঘরে রাখা হয়েছে। উল্লিখিত হয়েছে যে কমিটি এই মূল্যবান জিনিষগুলি সংগ্রহ-শালায় পরিদর্শন করেছেন। এইগুলির আনুমানিক দাম এক লক্ষ টাকা। যাদুঘর দু'বার পরিদর্শন করা হয়েছিল এবং দ্বিতীয়বার কমিটি নেতাজীর ব্যক্তিগত ভৃত্য কুন্দন সিংকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। তৃতীয় পর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুন্দন সিং বেশ কিছু সামগ্রী নেতাজীর বলে সনাক্ত করেছিলেন। যাদুঘরে যেসব সামগ্রী রয়েছে সেইগুলি হ'ল, অলঙ্কারপত্র ও ছোটখাট গহনা; যেগুলি দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার ভারতীয়গণ নেতাজীকে উপহার স্বরূপ দিয়েছিলেন এবং নেতাজী তাঁর শেষ যাত্রায় ঐগুলি নিয়ে গিয়েছিলেন বলে বিভিন্ন

সাক্ষীরা বলেছেন। এটা সুস্পষ্ট যে আধপোড়া ক্ষতিগ্রস্ত সোনা ও অলঙ্কারপত্রের টুকরোগুলি যেগুলি জাতীয় যাদুঘরে রাখা আছে,—সেইগুলিই নেতাজীর শেষ যাত্রাপথের মালপত্রের অংশবিশেষ। ঐগুলিই তাইহোকু বিমান বন্দর থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল এবং পরে শ্রীমূর্তির কাছ থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এও দেখা যায় যে শ্রীমূর্তি ১৯৫১ সালে যেগুলি হস্তান্তর করেছিলেন সেইগুলি ১৯৪৫ সালে কর্নেল হবিব-উর রহমানএর সহি করা তালিকার সঙ্গে মিলে যায়। কিন্তু পরিস্কার বোঝা যায় না যে নেতাজী কত জিনিষ সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তার কতটা উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়েছিল। নেতাজী যে দু'টি স্যুটকেস ভর্তি করে মূল্যবান জিনিষগুলি নিয়েছিলেন তা ওজন করা হয় নি। কমিটির সদস্যদের কাছে শুধু সাক্ষীদের সাক্ষ্যই রয়েছে যে স্যুটকেস দু'টি বেশ ভারীই ছিল। শুধুমাত্র একজন সাক্ষী, লেঃ কর্নেল নোনোগাকি বলেছেন যে প্রত্যেকটির ওজন ছিল ২০ কিলো করে। মূলধাতু ও ছাইয়ের সঙ্গে মিশে যাওয়া মাত্র ১১ কিলো পোড়া অলঙ্কারপত্র উদ্ধার করা হয়েছিল। পরিষ্কার বোঝা যায় যে, নেতাজী যে পরিমাণ জিনিষ নিয়ে গিয়েছিলেন তার তুলনায় উদ্ধারপ্রাপ্ত জিনিষ অনেক কম। কমিটি ছিন্ন ভিন্ন সূত্রগুলিকে যেমন তেমন ভাবে জুড়ে দেবার কসরৎ করেছেন। কিন্তু এই যোগসূত্রের মধ্যে অনেক ফাঁক ও বহু অসঙ্গতি রয়েছে। পরিষ্কার বোঝা যায় না দুর্ঘটনার অনতিকাল পরেই বিমানটি ঘিরে ফেলা হয়েছিল কিনা এবং মূল্যবান জিনিষগুলি সংগ্রহ করার কাজ যথাযথ তদারকে শুরু হয়েছিল কিনা। সংগ্রহ করার পর জিনিষগুলি কয়েক দিনের জন্য বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ আশ্রয়স্থলে রাখা হয়েছিল, না পরদিন সকালেই তাইহোকুর জাপানী সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেই বিষয়েও অসঙ্গতি রয়েছে। পাত্রটি সম্বন্ধেও সন্দেহ রয়েছে। কয়েকজন বলেন যে ঐ পাত্রটি ছিল একটি গ্যাসোলিনের টিন, কিন্তু অন্যেরা বলেন যে পাত্রটি ছিল একটি কাঠের বাক্স। যদি

গ্যাসোলিনের টীনটিই প্রথমে ভর্তি করে সীল করা হয়ে থাকে, তাহ'লে কে ঐ টিনটি খুলেছিলেন, কেন খুলেছিলেন এবং জিনিষগুলি আবার কেন কাঠের বাক্সে ভর্তি করেছিলেন ?

টোকিওতে শ্রীরামমূর্তিকে যে বাক্সটি দেওয়া হয়েছিল, তা পেরেক দিয়ে আটকানো ছিল কিন্তু সীল করা ছিল না। মেজর টাকাকুরা বলেন যে তিনি শ্রীমূর্তি ও শ্রীআয়ারকে চিতাভস্মের সঙ্গে ধনরত্নের বাক্সটিও অর্পণ করেছিলেন, কিন্তু শ্রীমূর্তি জানান যে চিতাভস্মের বাক্সটি নিয়ে যাওয়ার কয়েকদিন পরে মূল্যবান জিনিষের বাক্সটি নিয়ে যাওয়ার জন্য ডাকা হয়েছিল। কর্নেল রহমান বলেন যে সর্বশ্রী আয়ার ও মূর্তি ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেডকোয়ার্টার্সএ গিয়ে বাক্সটি নিয়ে এসেছিলেন। শ্রীআয়ার জানিয়েছেন যে তাঁকে ডাকা হয় নি, কিন্তু যখন শ্রীমূর্তি, তাঁর ভাই ও কর্নেল রহমান অলঙ্কারের ভাঙ্গা টুক্‌রোগুলি পরিষ্কার করে বেছে রাখছিলেন তখন ঘটনাচক্রে তিনি সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স বাক্সটি প্রাপ্তির কোন রসিদ দেন নি বা হস্তান্তরিত করে কোন রসিদ নেন নি। শ্রীমূর্তি বলেন যে কর্নেল রহমান সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি তাইহোকুতে যেভাবে বাক্সটি প্যাক করেছিলেন সেইভাবেই বাক্সটি ছিল, কিন্তু কর্নেল রহমান বলেন যে বাক্সটিতে রদবদল করা হয়েছিল বলে বোঝা যাচ্ছিল, ওজন অনেক কম ছিল ; জিনিষও ছিল অর্ধেকের কম। কমিটি সদস্যদের কাছে যেসব সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে তা থেকে ধনরত্ন সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

শেষ পর্যন্ত বহু প্রতীক্ষিত রিপোর্টের বয়ান শেষ হয়েছে। ভারতের জাতীয় যাদুঘরে যে আধপোড়া অলঙ্কারপত্রগুলি রাখা আছে, ঐগুলিই নাকি নেতাজীর সঙ্গে নিয়ে যাওয়া মালপত্রের অংশ বিশেষ। নেতাজী তদন্ত কমিটি মহাভারতের সঞ্জয়ের ন্যায় দিব্যদৃষ্টিতে আলোচ্য ঘটনা দেখেন নি। প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবী করে যাঁরা কমিটির সামনে

এসে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাঁদের জবানীর ভিত্তিতেই কমিটিকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। যে অলঙ্কারপত্রগুলি তদন্ত কমিটি দেখেছেন, ঐগুলিই যে তাইহোকুর ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল তার যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ কোথায়? তদন্ত করে কমিটি সদস্যগণ সুনির্দিষ্টভাবে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মত আদৌ কোন তথ্য পান নি। সাইগন থেকে যাত্রা করার সময় নেতাজী কতটা ধনসম্পদ তাঁর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাই যখন নির্ধারণ করা যায় নি, তখন কোন্ প্রমাণের ভিত্তিতে তদন্ত কমিটি মন্তব্য করলেন যে উদ্ধারপ্রাপ্ত আধপোড়া অলঙ্কারপত্র সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সম্পদের তুলনায় অনেক কম? তদন্ত কমিটি অনুসন্ধান করে প্রমাণ পান নি যে বিধ্বস্ত বিমানটি (?) ঘিরে ফেলা হয়েছিল। কোন্ ব্যক্তি ধ্বংসাবশেষ থেকে ধনরত্ন উদ্ধার করেছিলেন, কোন্ ধরণের পাত্রে সংগৃহীত সামগ্রী রাখা হয়েছিল, কোথায় ঐ পাত্রটি রাখা হয়েছিল, কতদিন তা রাখা হয়েছিল এবং কার উপস্থিতিতে অলঙ্কারপত্রের পাত্রটি প্যাক করা হয়েছিল, পাত্রটির ওজন কত ছিল, কবে ঐ পাত্রটি হস্তান্তর করা হয়েছিল, ইত্যাদি বিষয়ে তদন্ত কমিটি কোন যোগসূত্র খুঁজে পান নি। যে ধরণের অসঙ্গতির উল্লেখ করে নেতাজী তদন্ত কমিটি ধনরত্নের প্রসঙ্গে কোন নির্দিষ্ট মতামত পেশ করতে পারেন নি বলে জানিয়েছেন— অনুরূপ অগণিত অসঙ্গতি, বিমান দুর্ঘটনা ও তাইহোকুর হাসপাতাল পর্বেও তা দেখা গেছে, কিন্তু ঐ ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি কেন সুনির্দিষ্ট মতামত দিলেন, তা অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় না।

নেতাজী তদন্ত কমিটি ধনরত্ন প্রসঙ্গে এক স্বতন্ত্র কমিটি গঠন করার সুপারিশ করেছেন। অবশ্য সুপারিশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা এই মন্তব্য করতেও দ্বিধা করেন নি যে ঐ ধরণের তদন্ত কতটা লাভ-জনক হবে তা অনিশ্চিত। কিন্তু তদন্ত কমিটি কি যাঁরা আলোচ্য প্রসঙ্গে বিবৃতি দিতে এসেছিলেন তাঁদের সবার জবানীই রেকর্ড করেছিলেন? অন্ততঃ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যে বিবৃতি দেওয়ার

সুযোগ দেওয়া হয় নি তা সত্য। জনৈক জাপানী খনি-মালিক দাবী করেন যে জাপ সেনাবাহিনীর অফিসাররা তাঁকে বলেছিলেন যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস এর নিখোঁজ ধনরত্ন জাপানের দক্ষিণ-মধ্য অঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় বিমান থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এই জাপানী খনিমালিকটির নাম, মিঃ বোন্দাই মোরী। তিনি আরও দাবী করেন যে জাপানের ঐ পার্বত্য এলাকার অধিবাসীগণ দেখেছিলেন যে একটি জাপানী সামরিক বিমান প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে উড়ে যাওয়ার পথে হঠাৎ ছোঁ মেরে নীচের দিকে নেমে আসে এবং পাহাড়ী এলাকার ওপর কয়েকটি বাক্স ফেলে দিয়ে যায়। মারকিন সামরিক অফিসারও পরে ঐ এলাকায় অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন এবং ১৯৪৭ সালে প্রাক্তন জাপ সামরিক অফিসারদের একটি দল ঐ অঞ্চল তন্ন তন্ন করে খোঁজ করেছিলেন। সামরিক অফিসারদের ঐ দলটি একবার ১৯৪৮ সালে ও ১৯৪৯ সালে আবার অনুসন্ধানের কাজে এসেছিলেন। তাঁরাই মিঃ মোরীকে বলেছিলেন যে ঐ অঞ্চলে চন্দ্র বোস এর যে ধনরত্ন ফেলা হয়েছিল তারই খোঁজ করছেন। মিঃ মোরী সাংবাদিকদের কাছে জানান যে তিনি নেতাজী রহস্য সম্পর্কে তদন্তকারী ভারতীয় কমিটির সঙ্গে সাক্ষাতকার চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে সাক্ষাতকারের সুযোগ দেওয়া হয় নি। খবরটি নিম্নরূপ :—

Netaji's Jewels Airdropped In Mountain Area in Japan

Mine owner's Revealation Gives New Twist To The Mystery.

Tokyo-May, 12.

A Japanese mineowner has claimed that Japanese army officers had told him that Netaji Subhas Chandra Bose's "missiug jewels" were air dopped into the rugged mountain country in South Central Japan, a few days after the second world war ended

giving a new twist to the "mystery" about "Bose's Jewels."

The question of jewels has engaged the attention of the Japanese press here with the arrival, this week of the three-man Indian Commission investigating into the death of Netaji Bose. A day after the Commission reached Tokyo, its Chairman Shah Nawaz Khan said in an interview, he knew the "So called treasure" which Netaji Bose was supposed to carry was a 'myth.' Shah Nawaz Khan, who was a member of Bose's Government-in-exile, said they were ornaments of no great value which were now in the National Museum at New Delhi.

Immediately after the publication of this interview, two Indians. Mr. L. C. Miglani and Mr. A. M. Nair, who were connected with the Indian Indpendence movement here, declared in a statement that "the treasure has a vital link with the Bose case."

The Japanese press to day carried report quoting a mineowner Bondai Mori as saying that Japanese Army officials had told him that Bose's missing jewels" were air dropped into the rugged mountain country in South-Central Japan, a few days after world war two ended.

SEARCH FOR TREASURE

Mr. Mori said that the residents of the area saw a Japanese Military plane fly in the direction of the Pacific Ocean swoop low over the mountain area and drop some boxes.

American army officers searched the area later and then in 1947 a group of former Japanese Military

officials were there combing the area. The same group returned in 1948 and again in 1949. The group, Mr. Mori Said, told him that they were looking for Bose's jewels which were dropped in the region.

Mr. Mori also said that he had offered to meet the Indian Commission but he had not been given any appointment.

(Reuter)
The Sunday Amrita Bazar Patrika
13. 5. 56

রয়টার পরিবেশিত এই সংবাদ একই সময়ে দি ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজেও প্রকাশিত হয়েছিল। জাপানের কাগজ যে নেতাজীর ধনরত্ন সম্বন্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন তা সত্য। নেতাজী তদন্ত কমিটির কাছে এই খবর অবশ্যই গিয়ে পৌঁছেছিল, কিন্তু ঐ সূত্রের ভিত্তিতে সদস্যগণ কোন অনুসন্ধান চালান নি। বিমান থেকে ফেলে দেওয়া ধনরত্নের বাক্সগুলির সঙ্গে নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্যের যথেষ্ট মিল রয়েছে বলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত দু'জন ভারতীয়ও দাবী করেছিলেন। তদন্ত কমিটি যখন 'নেতাজী রহস্য' সম্বন্ধে, অনুসন্ধান করতেই জাপানে গিয়েছিলেন, তখন শ্রী এল. সি. মিগলানী ও শ্রী এ. এম্‌. নায়ারএর খোঁজ করে তাঁদের সাক্ষ্য কেন নিলেন না, তা অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় না। এই দুজন ভারতীয়র জবানী আদায় করে নিলে তদন্তের কাজ আরও সুন্দরভাবে করা হত। জাপানী ব্যবসায়ী মিঃ বোন্দাই মোরীর সাক্ষ্য নিলে আলোচ্য ঘটনার অনেক রহস্যের উদ্‌ঘাটন হত। তদন্ত কমিটি একমাস জাপানে কাটিয়ে জুনমাসের প্রথম সপ্তাহে টোকিও ত্যাগ করেছিলন। মিঃ বোন্দাই মোরী সাক্ষ্য দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তদন্ত কমিটি টোকিওতে পৌঁছানোর কয়েকদিনের মধ্যেই। সুদীর্ঘ সময় টোকিওতে থাকা সত্বেও সদস্যগণ তাকে কেন

বিবৃতি দেওয়ার জন্য ডাকলেন না, তার যৌক্তিকতা তদন্ত রিপোর্টে লেখা হয় নি। তবে একথা সত্য যে নিখোঁজ মণিমুক্তার সঙ্গে নেতাজীর রহস্যময় যাত্রার অদৃশ্য যোগাযোগ রয়েছে। যে অলঙ্কার-গুলি ভারতীয় দূতাবাস মারফৎ ভারতের রাজধানীতে জাতীয় যাদুঘরে রাখা হয়েছে সেইগুলি যে তাইহোকু ঘটনাকে রহস্যময় করে দেওয়ার জন্যই সাজানো হয়েছিল, তার প্রমাণ ঐ রত্নগুলিই দিতে পারে। ধনরত্ন প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান এর বক্তব্য সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান মারফৎ ভারতে এসে পৌঁছেছিল। খবরটিতে লেখা ছিল :

FANTASTIC STORY OF JEWEL ENQUIRY

Netaji's Treasures : Mission Has Nothing To Do With It

Tokyo May 4.

Major-General Shah Nawaz Chairman of the Netaji Enquiry Commitee along with members of the team arrived here to day, to investigate into the mystey of Netaji's death.

On being interviewed by reporters, the Chairman Said his mission was mainly *to interview people who might offer any direct evidence of Shri Bose's death.*

NO JEWEL INVESTIGATION

The Chairman denied reports that the mission would look into the whereabouts of large quantity of jewels which Bose reportedly carried at the time he died The jewels carried a wartime value of four million rupees. Mr. Khan said the reports of a jewel investigation "fantastic."

Mr. Khan said some of the jewel worth less than the wartime value of one million rupees had been returned to the Indian Government.

He Said hearing into the circumstances of Mr. Bose's death have been held in several places but there was yet no documentary evidence.

ASHES TO BE EXAMINED

The mission will examine ashes said to be of Mr. Bose in a Tokyo temple and if they are found to be that of the Indian leader they will be taken back to India with full State honours.

Commenting on the purpose of his mission, he said, "we do not expect to find much because the British Intelligence found nothing after a very thorough search in 1945.

He said Mr. Bose was regarded as national Hero in India and the "mysterious circumstances of his death add to his legendary status."

(P. T. I.)
Amrita Bazar Patrika.
6. 5. 56

অর্থাৎ, নেতাজী তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান সাংবাদিকদের কাছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছিলেন যে তাঁর উদ্দেশ্য হ'ল মূখ্যত সেইসব ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা যাঁরা শ্রী বোসএর "মৃত্যু সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দাখিল করতে পারবেন।" তিনি আরও জানিয়েছিলেন যে নেতাজী যে ধনরত্ন সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন সেই বিপুল সম্পদের অবস্থান সম্পর্কে কোন তদন্তই করা হবে না। ঐ বিপুল সম্পদের তৎকালীন মূল্যমান আনুমানিক ৪০ লক্ষ টাকা। ভারত সরকারকে কিছু ধনরত্ন ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল যার যুদ্ধকালীন মূল্যমান ১০লক্ষ টাকার কম হবে। কমিটির চেয়ারম্যান সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে শ্রীবোসএর মৃত্যুর পরিস্থিতি সম্পর্কে বহু জায়গায় শুনানী

চলেছে কিন্তু টোকিওতে পৌঁছানোর সময় পর্য্যন্ত কোন নথিগত প্রমাণ পাওয়া যায় নি। মন্দিরে সুরক্ষিত ভস্ম সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে ঐ ভস্ম পরীক্ষা করে দেখা হবে এবং যদি তা ভারতীয় নেতারই ভস্মাবশেষ হয়ে থাকে তবে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সঙ্গে ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা-করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে কমিটি মনে করে যে খুব বেশী কিছু তথ্য পাওয়া যাবে না, কারণ ১৯৪৫ সালে বৃটিশ গোয়েন্দা বাহিনী তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালিয়েও কিছুই পান নি।

নেতাজী তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান যে নেতাজীর মৃত্যুর দিন তারিখ ঠিক করবার জন্যই টোকিওতে গিয়েছিলেন তা তাঁর ঐ উপরে উল্লিখিত উক্তি পাঠ করবার পর আর তাতে কোন সন্দেহ নেই।* নেতাজী যে মৃত সেই খবর তিনি জানতেন, তবে তিনি কি পরিস্থিতিতে মারা গিয়েছিলেন, তা জানার জন্যই তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান উদ্‌গ্রীব ছিলেন। মৃত্যুর বিরোধী বা বিপক্ষে কোন সাক্ষ্য যে নেওয়া হবে না বা বিবেচনা করা হবে না তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নিখোঁজ ধনরত্নের সঙ্গে যে নেতাজী রহস্যের এক গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ রয়েছে তা বুঝতে পেরেই তদন্ত কমিটি ঐ প্রসঙ্গে কোন তথ্যানুসন্ধান করার কাজ সুপরিকল্পিত পথেই এড়িয়ে গেছেন। রিপোর্ট পড়ে, বিভিন্ন সাক্ষীদের জবানী থেকে অনুমান করে নেওয়া যায় যে কয়েক কোটি টাকার ধনরত্ন আলোচ্য ঘটনার সময় নেতাজীর মালপত্রের সঙ্গে ছিল। কিন্তু তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান কোথা থেকে জানলেন যে ৪০ লক্ষ টাকার সম্পদ নিয়ে নেতাজী যাচ্ছিলেন তা বোঝা যায় না। তাছাড়া চেয়ারম্যানএর বক্তব্য মতে ভারত সরকারএর কাছে ১০ লক্ষ টাকার কিছু কম মূল্যের সম্পদ রয়েছে, কিন্তু রিপোর্টে লেখা হয়েছে যে জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত

---

* "—to interview people who might offer any direct evidence of Shri Bose's death."

(P. T. I Amrita Bazar Patrika 6. 5. 56)

সম্পদের মূল্য আনুমানিক এক লক্ষ টাকা। এই গোলমেলে কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। নিখোঁজ সম্পদ মারকিন সেনাবাহিনী খুঁজছিলেন কিন্তু তাঁরা ঐ সম্পদ পেয়েছিলেন বলে জানা যায় নি। আলোচ্য ঘটনার পরে নেতাজী সম্পর্কে রাজশক্তির গোয়েন্দা বাহিনী যে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কিছু হদিস বার করতে পারেন নি তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান তা স্বীকার করেছেন; এবং একথাও স্বীকার করেছেন যে নথিপত্রে আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কিত কোন প্রমাণের চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় নি। তাহলে তদন্তের এই প্রহসন কেন? জাপান সরকার এমন কোন তথ্যগত প্রমাণ পেশ করতে পারেন নি যা থেকে আলোচ্য ঘটনা সত্য বলে ধরে নেওয়া যায়। গোয়েন্দাবাহিনী ঘটনার অনতিকাল পরে অনুসন্ধান চালিয়েও যেখানে কোন প্রমাণ খুঁজে বার করতে পারেন নি, সেই ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ দশবছর পরে শুধু বাছাই করা কিছু সাক্ষীর বক্তব্য সুন্দরভাবে গুছিয়ে, সাজানো ঘটনাকে সত্য বলে প্রমাণ করার প্রয়াস সত্যই প্রসংশনীয়। অনিবার্যরূপে এই একটিমাত্র সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ছাড়া গত্যন্তর থাকে না—তা হ'ল যে, এ সব হ'য়েছে—Political reasonএর জন্য—রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য।

১৬

নেতাজী তদন্ত কমিটির রিপোর্ট শেষ হয়েছে ষষ্ঠ পর্বে। যদিও মূল-তদন্ত-বিষয় সম্বন্ধে এটা অবান্তর। সেইজন্য আমরাও পাঠকবর্গের ধৈর্যের প্রতি নজর রেখে সংক্ষিপ্ত বয়ান রাখছি।

['সুপারিশ']

কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস এক বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছেন এবং টোকিওর রেনকোজি মন্দিরে যে চিতাভস্ম রাখা আছে সেটা তাঁরই ভস্মাবশেষ। রেভঃ মোচিজুকি ও রেনকোজি মন্দিরের অছিগণ ইতিমধ্যেই বহু বছর ধরে ঐ চিতাভস্ম সম্মানে রেখেছেন। তাঁদের এই প্রয়াস ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। যদি ঐ চিতাভস্মকে আসল (?) বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে রেনকোজি মন্দির নিশ্চয়ই তার স্থায়ী আবাস হতে পারে না।···

স্বাঃ শাহনওয়াজ খাঁন

এস্. এন্. মৈত্র

নেতাজী তদন্ত কমিটির রিপোর্টের প্রত্যেক পর্যায়েই বিস্ময় সৃষ্টি করার মত যথেষ্ট উপাদান রয়েছে। কমিটির 'সুপারিশ পর্ব'ও সেই রস থেকে বঞ্চিত নয়।

কমিটির এই মন্তব্য প্রমাণ করে রেনকোজি মন্দিরের ভস্মাবশেষ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব তাঁরা নিজেদের ওপর রাখেন নি। যদিও তাঁরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে রেনকোজি মন্দিরে রাখা চিতাভস্ম নেতাজীরই ভস্মাবশেষ, তবুও ঐ চিতাভস্ম খাঁটি বলে ধরে নিলে তবেই ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রশ্ন উঠবে; অর্থাৎ মেকি বলে ধরে নেওয়ার অবকাশ রয়েছে। আশ্চর্য এই গোলকধাঁধা।

নেতাজী তদন্ত কমিটি তাঁদের রিপোর্টে নেতাজীর শেষ পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। আজাদ হিন্দ সরকারএর সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নেতাজীর ছিল তা যে কেউ অনায়াসে বলতে পারেন, কিন্তু ঐ পরিকল্পনা রূপায়ন করার জন্য তিনি যে পথ নির্ধারণ করেছিলেন সেই সম্বন্ধে সুনিশ্চিতভাবে কারও কিছু বলা সম্ভব নয়। এইখানেই নেতাজীর নেতৃত্বের স্বাতন্ত্র। তিনি গোপন-পরিকল্পনা গোপনেই রাখতেন এবং কারও পক্ষে তা সঠিকভাবে জানা সম্ভব ছিল না। নেতাজী যে কোথায় যাচ্ছিলেন তা কেউই জানতেন না এবং শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করেই সবাই নেতাজীর শেষ পরিকল্পনা সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করেছেন। সুনির্দিষ্টভাবে কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না যে নেতাজী কোথায় যাচ্ছিলেন। যদিও নেতাজী নিজেই তাঁর সাইগন থেকে যাত্রাকে "অনিশ্চিতের পথে অভিযান" বলে অভিহিত করেছেন। একথা স্পষ্ট যে এক তিনি ছাড়া সবাই তাঁর গন্তব্যস্থল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ছিলেন। অমন এক দুঃসাহসিক অভিযানকে অনুমান করে বুঝে ফেলা সম্ভব কিনা তা পাঠকবর্গই বিচার করে দেখবেন।

সাইগন বিমান বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করার আগে, বিমানে আসনের ব্যবস্থা করে নেওয়ার ব্যাপারে যে নাটকীয় পরিস্থিতির কথা জানা যায় তা রহস্যময়। সাইগনে বিমানের ব্যবস্থা করার প্রসঙ্গে যে ধরণের বক্তব্য পাওয়া যায় তা থেকে যদি কেউ অনুমান করে নেন যে আসন ব্যবস্থা করে দেওয়ার ব্যাপারে যে গোপন আলোচনা চলছিল ঐ সময়ই সুনির্দিষ্ট হচ্ছিল রহস্যময় যাত্রাপর্ব তাহলে বোধহয় অযৌক্তিক হবে না। জাপ সরকার এর সামরিক কর্তৃপক্ষ ও জাপ লিঁয়াসো মিশন হিকারী কিকানের অধিকর্তার সঙ্গে বৈঠকে বসে-ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্বয়ং আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত অনুগামী কর্নেল হবিব-উর রহমান। ব্যাঙ্কক থেকে সাইগন পর্যন্ত আসার জন্য দু'টি বিমানের ব্যবস্থা করতে হিকারী কিকানের

অধিকর্তাকে বিন্দুমাত্র অসুবিধায় পড়তে হয় নি, কিন্তু সাইগন বিমান বন্দরে মাত্র দু'টি আসনের ব্যবস্থা করতে সবাইকে যেন হিম্‌সিম্ খেতে হয়েছিল। বিমানের যাতায়াতের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণই আরোপ করা হয় নি। সুতরাং সাইগনে একের পর এক গোপন বৈঠক চালিয়ে যাওয়ার পর মাত্র দু'টি আসনের ব্যবস্থা করে নেওয়ার ব্যাপারটি পরিকল্পনার অংশ বিশেষ।

সাইগন থেকে যে বিমানটি নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে যাত্রা করেছিল সেই বিমানে কতজন যাত্রী ছিলেন তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি। যে কোন বিমান আকাশে ওঠার আগে যাত্রী তালিকা রাখাটা নিয়ম মাফিক ব্যাপার। এক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। সাইগন সামরিক কর্তৃপক্ষ বা জাপ সরকার এর তরফ থেকে কোন যাত্রী তালিকা পেশ করা সম্ভব হয় নি। যে যাত্রী তালিকা গোয়েন্দাবাহিনী আলোচ্য ঘটনার পর বাজেয়াপ্ত করেছিলেন বলে জানা যায়, ঐ যাত্রী তালিকাটি যদি গ্রহণযোগ্য হ'ত, তাহলে ঐ তালিকা উল্লেখ করতে আপত্তি কি ছিল তা বোঝা যায় না। সাইগন বিমানবন্দরে নেতাজীর মালপত্র বিমানে তোলা নিয়ে আপত্তি উঠেছিল বলে যে বক্তব্য জানা যায়, তা অন্য অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর দ্বারা সমর্থিত হয় নি। যে বিমানটি নেতাজীকে নিয়ে আকাশে উঠেছিল সেই বিমানটির ইঞ্জিনের অবস্থা কেমন ছিল তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি কারণ, এই প্রসঙ্গে সাক্ষীদের জবানী সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে বলা চলে না যে আনকোরা নূতন বিমানে ইঞ্জিন বদল করার প্রয়োজন হয়। ইঞ্জিন বদল করার প্রসঙ্গ সত্য হলে অন্যান্য সাক্ষীদের পক্ষে তা জানা অসম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। তাছাড়া ইঞ্জিন বদল করার প্রসঙ্গ সত্য বলে প্রমাণ করতে হলে এই প্রমাণও দাখিল করতে হয় যে, কখন বিমানটি সাইগনে এসেছিল এবং ইঞ্জিন বদল করতে কতক্ষণ সময় লেগেছিল ইত্যাদি।

আলোচ্য বিমানের যাত্রী বলে যাঁরা সাক্ষী দিয়েছেন, তাঁদের জবানীতে একটি বিষয়ে তাঁরা একমত হয়েছেন যে সমস্ত যাত্রাপথে যাত্রাবিরতি ঘটানো সত্ত্বেও বিমানের আরোহী তাঁদের বসার জায়গা বদল করেন নি। কিন্তু চমকপ্রদ ব্যাপার হ'ল, যাত্রীরা কে কোথায় বসেছিলেন সেই বিষয়ে একমত হতে পারেন নি। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বিমানের ঠিক কোন জায়গায় বসেছিলেন তাও আরোহীরা বলতে পারেন নি। একই বিমানের যাত্রী, উড়ে চলেছেন এশিয়ার সর্বজনমান্য শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপ্রধানকে নিয়ে, অথচ ঐ যাত্রীদের মধ্যে নেতাজীর বসার জায়গা সম্বন্ধে মতপার্থক্য আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে ভিন্নতর কিছু ভাববার অবকাশ করে দেয়। সাইগন থেকে যাত্রা করে হঠাৎ টুরেন-এ যাত্রাবিরতি ঘটানো বিস্ময়কর ব্যাপার। সাইগন থেকে টুরেন পর্যন্ত যাত্রাপথে বিমানটিতে কোন গোলযোগ দেখা গিয়েছিল বলে বিমান যাত্রীদের কেউই বলেন নি। বিমানে কোন গোলযোগ দেখা না গেলে বিমানচালক তাঁর ইচ্ছামত কিভাবে যাত্রাপথে হঠাৎ কোন এক অনির্ধারিত স্থানে বিমানটিকে নামিয়ে আনতে পারেন? যে বিমানের যাত্রী একজন রাষ্ট্রপ্রধান ও একজন উচ্চপদস্থ সামরিক অধিকর্তা সেখানে এই দুই বিশিষ্ট ব্যক্তির নিরাপত্তার প্রশ্ন রয়েছে, সেই বিমানটিকে হঠাৎ যাত্রাপথের মাঝে কোন একস্থানে নামিয়ে আনা বিমান চালকের খেয়াল খুশীমত সম্ভব নয়। এই যাত্রা বিরতিই আলোচ্য ঘটনার রহস্যোদ্ঘাটনের ইঙ্গিত বহন করে। টুরেনএ বিমানের যাত্রীরা কোথায় রাত্রের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই জায়গাটির নাম সবাই অজ্ঞাত কারণে একযোগে বিস্মৃত হয়েছেন। তখনকার সবচেয়ে বড় হোটেলেএ সব যাত্রীরা রাত কাটিয়ে ছিলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিশেষ করে কোন রাষ্ট্রপ্রধানকে ইচ্ছামত কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় না। কারণ নিরাপত্তার প্রশ্ন আছে। বড় হোটেল হ'ল বহু ব্যক্তির আস্তানা। সেখানে খুবই গোপনতা রক্ষা করে নেতাজীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে জানা যায়। সেই ক্ষেত্রে

বড় হোটেলের মত একটা প্রকাশ্যস্থানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সাক্ষীরা যদি জানতেন যে বিমানবন্দরের লাউঞ্জেই রাত কাটানো হয়েছিল, তাহ'লে তাঁদের বক্তব্য অংশত যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করা যেত। যে জায়গায় বিমানটির যাত্রাবিরতি করার কথা ছিল না সেইখানে বিমানচালক বিমানটি মাটিতে নামিয়ে আনলেন, আর যেখানে যাত্রাবিরতি করার কথা সেইখানে যাত্রাবিরতি করলেন না, এমন খামখেয়ালীভাবে বিমান চালনা করা সম্ভব নয়। হিতো বিমান বন্দরে যাত্রাবিরতি না করার কারণ সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। একজন জানালেন যে ভাল আবহাওয়া থাকার দরুণ বেশী পথ চলে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে বিমানটি হিতো বিমানবন্দরে না নামিয়ে চলে যাওয়া হয়েছিল তাইহোকু বিমান বন্দরে, এবং অন্যজন জানালেন যে রাশিয়ার অগ্রগতির কথা জানতে পেরেই তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর চিন্তা এসেছিল, তাই হিতো বিমানবন্দরে যাত্রাবিরতি ঘটানো হয় নি।…টুরেনএ যাত্রাবিরতি করা এবং হিতোতে যাত্রা-বিরতি না করা প্রমাণ করে যে আলোচ্য ঘটনার রহস্যের সূত্র ঐখানেই নিহিত।

আলোচ্য বিমানটি তাইহোকু বিমানবন্দরে নামার পর ঐ বিমানের ইঞ্জিনে কিছু গোলযোগ দেখা গিয়েছিল বলে সাক্ষীরা জানিয়েছেন। আনকোরা নূতন ইঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু গোলযোগ কে খুঁজে পেলেন তা নির্ধারণ করা যায় না। বিমানের যাত্রী মেজর কোনোর জবানী থেকে জানা যায় যে বিমানের ইঞ্জিনটির গোলযোগ তিনিই ধরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাইহোকু বিমান বন্দরের গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ার ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতোর মতে তিনিই ইঞ্জিনের গোলযোগ ধরিয়ে দিয়েছিলেন। এই দু'জন সাক্ষী কিন্তু ইঞ্জিনের গোলযোগ ধরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে একে অন্যের নাম উল্লেখ করেন নি। তাইহোকু থেকে বিমানটি বেলা দু'টো তিরিশ মিনিটের সময় যাত্রা করেছিল বলে বেশীরভাগ

সাক্ষীরাই নাকি তদন্ত কমিটিকে জানিয়েছেন। তাইহোকু হাস-পাতালের ডাক্তার জানিয়েছেন বেলা দু'টার সময় তিনি টেলিফোনে খবর পেয়েছিলেন যে বিমান দুর্ঘটনায় আহত কিছু ব্যক্তি হাসপাতালে আসছেন। বিমানটি বেলা দু'টোর সময়ও যদি যাত্রা করে থাকে, তাহলেও দু'টোর সময়ই বিমানবন্দর থেকে টেলিফোনে হাসপাতালে খবর পাঠানো অসম্ভব। সুতরাং তাইহোকু বিমানবন্দর থেকে যাত্রার সময় নিয়ে যথেষ্ট গড়মিল।

তাইহোকু বিমান বন্দর থেকে আকাশে ওঠার ঠিক কতক্ষণ পরে আসল গোলযোগ শুরু হয় তা নির্ধারণ করা যায় না। বিমানটি মাটি থেকে কতটা ওপরে উঠেছিল, সাক্ষীদের জবানী থেকে তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। আকাশে ওঠার পর কি ঘটেছিল সেই বিষয়েও সাক্ষীদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। কেউ একবার এক বিকট শব্দ শুনেছিলেন, আর কেউ দু'বার বিকট শব্দ শুনেছিলেন। তারপর বিমানটির যে পরিণতি হ'ল সেই বিষয়ে সাক্ষীরা আবার একমত হয়েছেন, তাহলো বিমানটি খাড়াভাবে মাটিতে নেমে এসেছিল। তদন্ত কমিটি বিমান বিশেষজ্ঞের মতামত নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে আকাশ থেকে মাটিতে পড়তে বিমানের সময় লেগে-ছিল মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। ঐ কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বিমানের চালক যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন বিমানটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ; কর্নেল হবিব-উর রহমান লক্ষ্য করেছেন নেতাজীর নির্বিকার ভাব ; মেজর কোনো দু'তিনবার বিমানের ইগ্‌নিশন সুইচ্‌ বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং লক্ষ্য করেছেন যে নেতাজীর বসার আসনের কাছে রাখা পেট্রল ট্যাঙ্কটি গড়িয়ে তাঁর ও নেতাজীর মাঝখানে এসে থেমে রইল। বিমানের মেঝেতে সীট বেল্ট বিহীন যাত্রীরা কেউ কারও ঘাড়ের ওপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন বলে কোন সাক্ষীই জানান নি। এমন বিচিত্র ঘটনা ঘটা কি করে সম্ভব, তা স্বপ্নেও বোঝা দুঃসাধ্য। খাড়াভাবে মাটিতে নেমে আসা বিমানের যাত্রীরা ও

বিমানের মালপত্র গড়িয়ে সামনের দিকে আসে নি বরং পেট্রল ট্যাঙ্ক গড়িয়ে উল্টোদিকে পিছনে মাঝপথে থেমে গেল, এমন ভৌতিক রহস্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা ভূতের ওঝা ছাড়া বৈজ্ঞানিকের সাধ্যাতীত। যে বিমানের যাত্রীরা ও মালপত্রের বোঝা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে পর্যন্ত অস্বীকার করে, তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করা সত্যিই অসম্ভব। স্বয়ং নিউটন পর্যন্ত ঘায়েল হয়ে যাবেন এই ঘটনা শুনে। খাড়াভাবে মাটিতে নেমে আসার পর বিমানটির কি তুর্গতি হয়েছিল সেই বিষয়েও সাক্ষীরা একমত হতে পারেন নি। কেউ বলেছেন বিমানটি যথাযথই ছিল, কোথাও এতটুকু ভাঙ্গে নি, কেউ বলেছিলেন, বিমানটি তুভাগ হয়ে তু'দিকে ছিট্‌কে চলে গিয়েছিল, কেউ বলেছেন বিমান সামনের দিকে ভেঙ্গে টুকরো হয়েছিল, আবার কেউ বলেছেন বিমানটি মাঝখান থেকে ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাইহোক্ বিমান বন্দরের তু'জন প্রত্যক্ষদর্শীর একজন দেখেছেন, বিমানের প্রপেলারটি মাটিতে গেঁথে গিয়েছিল এবং অন্যজন দেখেছেন বিমানের ইঞ্জিনটি মাটিতে গেঁথে গিয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের কারও মতে বিমানটির সামনের দিকে আগুন ধরে গিয়েছিল এবং অন্যেরা জানিয়েছেন সমস্ত বিমানটিই আগুনে জ্বলছিল। বিমানটির ধ্বংস হবার বিবরণে সাক্ষীদের জবানীর মধ্যে এমন বৈচিত্র্যময় অসঙ্গতি থেকে নির্ণয় করা সম্ভব নয় যে বিমানটির কি পরিণতি হয়েছিল।

আলোচ্য বিমানটি আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এসে কোথায় পরে বিধ্বস্ত হয়েছিল তাও নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি, কারণ সাক্ষীদের জবানীতে সঙ্গতি নেই। কেউ বলেছেন বিমান বন্দরের রানওয়ের ওপরই বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছিল, কেউ বলেছেন রানওয়ে থেকে ২০।৩০ মিটার দূরে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছিল, কেউ বলেছেন রানওয়ে থেকে ১০০ মিটার দূরে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছিল, আবার কেউ বলেছেন বিমান বন্দর থেকে তু'এক মাইল দূরে বিমানটি বিধ্বস্ত

হয়েছিল। এই ধরণের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না যে বিমানটি কোথায় বিধ্বস্ত হয়েছিল।

আলোচ্য দুর্ঘটনায় অনেক আরোহীই নিহত হলেন। কতজন যে নিহত হলেন, তা সঠিকভাবে কেউই বলতে পারেন নি। তবে, জেনারেল সিডির মত বিশিষ্ট যাত্রীটিকে প্রত্যক্ষদর্শীরা ভুলে যান নি এবং তিনি ঐ বিমান দুর্ঘটনাতেই নিহত হয়েছেন বলে বলছেন। কিন্তু জাপ সরকারএর সরকারী রেকর্ড বলে, যে জেনারেল সিডি তাইহোকু বিমান বন্দরে দেশের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। জাপান আত্মসমর্পণ করেছিলেন ১৫ই আগস্ট, আর আলোচ্য ঘটনা নাকি ১৮ই আগস্ট ঘটে। সুতরাং যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর 'যুদ্ধে মৃত্যু' এবং আলোচ্য ঘটনার সঙ্গে তিনি জড়িত থেকে নিহত হলেও ঐ 'যুদ্ধেই মৃত্যু' ঘটা সত্যিই বিচিত্র। তাই সামরিক বিভাগের অন্য যে ক'জন মৃত ব্যক্তির নাম সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, তাঁদের সরকারী রেকর্ড পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন হয় না, কারণ কারও মৃত্যুর কারণই বিমান দুর্ঘটনা নয়। আলোচ্য বিমানের অপর যাত্রী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস। দুর্ঘটনার ফলে তাঁর কি হয়েছিল তা অনেকেই শ্যেন দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। নেতাজী ও জেনারেল সিডি একই বিমানে একই সময়ে এক সঙ্গেই মারা গিয়েছেন।

নেতাজী ও সিডি দু'জনেই মিত্রশক্তির বিপক্ষে যুদ্ধে রত। অতএব জেনারেল সিডি যদি "যুদ্ধে মৃত" হন তবে নেতাজীর সম্বন্ধে সেই ভাষা প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে নেতাজীর মৃত্যুকে যদি "দুর্ঘটনায় মারা যান" বলে অভিহিত করা হয় তবে জেনারেল সিডির সম্পর্কেও ব্যাকরণ অনুযায়ী ঐরূপ ভাষা ব্যবহার করতে হবে। খেই হারিয়ে আবোল-তাবোল শব্দ ব্যবহার আমাদের প্রাজ্ঞ ভারত সরকারের বৈশিষ্ট হলেও পৃথিবীর অন্য কোন সরকার, বিশেষ করে জাপান সরকারের এমন গুণ আছে তা কেউ বলবেন না।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে আলোচ্য ঘটনার অনতিকাল পরে কি

অবস্থায় দেখা গিয়েছিল সেই বিষয়ে সাক্ষীরা একমত হতে পারেন নি। কেউ নেতাজীকে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন এবং কেউ দেখেছিলেন জামাকাপড় পরা অবস্থায়ই দাঁড়িয়ে থাকতে। কেউ বলেছেন নেতাজীর সম্পূর্ণ শরীর আগুনে পুড়ে গিয়েছিল, আবার কেউ বলেছেন যেখানে পেট্রল পড়েছিল সেখানেই আগুন লেগেছিল। কর্নেল হবিব-উর রহমান স্বয়ং দাবী করেছেন যে নেতাজীর শরীরের আগুন নেভাতে তাঁকে খুব কষ্ট করতে হয়েছিল এবং তিনি নেতাজীর শরীরের আগুন নিভিয়ে তাঁকে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছিলেন। আলোচ্য বিমানের অপর আরোহী মেজর টাকাহাসি দাবী করেছেন যে তিনিই নেতাজীর শরীরের আগুন নিভিয়েছিলেন। কর্নেল হবিব-উর রহমান অবশ্য ঐ সময় কাছাকাছিই ছিলেন কিন্তু তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। এমন বিচিত্র মত পার্থক্য ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করে না। তদন্ত কমিটি কর্নেল রহমানএর দাবী যুক্তিসঙ্গত বলে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু অপর দাবীদার মেজর টাকাহাসি একজন পদস্থ সামরিক অফিসার। তিনিই যে সত্যি বিবরণ দিচ্ছেন না তা কি করে বলা যায়?

বিমানের অন্যান্য যাত্রীদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল সেই বিবরণ দিতে গিয়েও সাক্ষীরা একমত হতে পারেন নি। ঐ বিমানের অপর একজন যাত্রী ক্যাপ্টেন আয়োগি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য যে, তিনি বিধ্বস্ত বিমানের সর্বনাশা ধ্বংসস্তূপ থেকে বাইরে আসতে পারেন নি, কিন্তু যিনি আহত যাত্রীদের চিকিৎসা করে-ছিলেন বলে দাবী করেছেন তিনিই জানিয়েছেন যে ক্যাপ্টেন আয়োগি হাসপাতালে মারা যান।

কেউ বলেছেন যে নেতাজীকে লরিতে শুইয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, আবার, কেউ বলেছেন যে নেতাজীকে শিডোশা নামের এক ধরণের বিচিত্র গাড়ীতে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নেতাজীর একমাত্র ভারতীয় সহযাত্রী

কর্নেল হবিব-উর রহমান নেতাজীর মাথায় চার ইঞ্চি লম্বা একটি ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করার জন্য নিজের রুমাল চেপে ধরেছিলেন বলে দাবী করেছেন, চিকিৎসক নেতাজীর শরীরের কোথাও কোন কাটা ক্ষত দেখতে পান নি। হাসপাতালের দু'জন ডাক্তারের বক্তব্যের মধ্যেও অনেক অসঙ্গতি। একজন ডাক্তার বলেছেন যে নেতাজীর দেহে রক্ত দেওয়া হয়েছিল এবং ঐ রক্ত নেওয়া হয়েছিল জনৈক জাপানী সৈনিকের দেহ থেকে। কিন্তু অন্য-জন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে নেতাজীর দেহে কোন রক্ত দেওয়া হয় নি। কিন্তু এর চেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা হ'ল হাসপাতালের অধিকর্তা তাঁর সাহায্যকারী ডাক্তারএর নাম বলতে পারেন নি। যে হাসপাতালে মাত্র তিনজন চিকিৎসক ছিলেন ইয়োসিমি ও অন্যজন তাঁর সহকারী ডাক্তার স্নুরুতা। কিন্তু তৃতীয় ডাক্তারটির নাম জানা যায় না। এর পরও কি সুনির্দিষ্ট ভাবে বলতে কোন দ্বিধা থাকে যে আলোচ্য ঘটনা সত্য নয়? নেতাজীকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে কর্নেল হবিব-উর রহমান জানিয়েছেন কিন্তু হাসপাতালের চিকিৎসকরা তা বলেন নি।

আলোচ্য ঘটনার শেষ পরিণতি হ'ল নেতাজীর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। নেতাজীর সহযাত্রী হয়ে যাঁরা ঐ রহস্যময় বিমানে গিয়ে-ছিলেন, যাঁরা উদ্বেগজনক অবস্থায়ও নেতাজীর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন, তাঁরা কিন্তু ঐ অন্তিম মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন না। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়, তাঁরাও নেতাজীর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় সম্বন্ধে একমত হতে পারেন নি। কেউ বলেছেন রাত আটটার কিছু পরেই নেতাজী মারা যান, কেউ বলেছেন রাত ন'টায়, আবার কেউ বলেছেন রাত দশটায়। এবং হাসপাতালের চিকিৎসকই অন্য এক জায়গায় নেতাজীর মৃত্যু সময় ভিন্ন বলেছেন আর জাপ সরকারী এক টেলিগ্রামে মৃত্যুর সময় জানানো হয়েছে মাঝরাতে। এমন

বিচিত্র বিবৃতি থেকে সঠিক সময় নির্ধারণ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। একের বিবরণের সঙ্গে অন্যের বিবরণের মাথা খুঁড়েও কোন মিল খুজে পাওয়া যায় না। এমন বিচিত্র ব্যাপার কোন ভাবেই ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করে না। যে কোন ব্যক্তিই একটি নির্দিষ্ট সময়ে মরে। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে কোন ব্যক্তিই বার বার ভিন্ন ভিন্ন সময় নিতে পারে না।

মরদেহ কখন শয্যা থেকে সরানো হ'ল, কখন তা শবাধারে রাখা হ'ল ইত্যাদি বিষয়ে সাক্ষীরা নীরব। কবে যে ঐ পার্থিব দেহটিকে জ্বালানো হ'ল, তাও সাক্ষীরা সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারেন নি। জাপ সরকারএর এক মিত্র রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান গুরুতরভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে এলেন কিন্তু তাঁকে দেখতে জাপ সরকারী কর্তৃপক্ষের কেউই হাসপাতালে এলেন না। এমন ব্যবহার কোন সভ্য সরকার এর কাছ থেকেই আশা করা যায় না। নেতাজীর মৃত্যুর খবর নাকি সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে পৌঁছানো হয়েছিল, কিন্তু সেনাবাহিনীর প্রধানের জবানী থেকে জানা যায় পরদিন সকালে দপ্তরে এসে তিনি ঐ মর্মন্তুদ খবর জেনেছিলেন। একজন রাষ্ট্রপ্রধানএর মৃত্যুর খবর সেনাবাহিনীর প্রধানএর কাছে পৌঁছানো হল না জেনে বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না যে গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনাই ঘটে নি। আলোচ্য ঘটনা সত্য হলে সেনাবাহিনীর প্রধানই নয়, জাপানের রাষ্ট্রপ্রধানও ছুটে আসতেন। সামরিক বিভাগের জনৈক পদস্থ অফিসারএর জবানী থেকে যদিও জানা গেল যে নেতাজীর নিষ্প্রাণ পার্থিব দেহটিকে দেখতে একজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার হাসপাতাল পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেনাবাহিনীর প্রধানের বক্তব্য থেকে জানা গেল ঐ উচ্চপদস্থ অফিসার ১৫ই আগস্টের পর তাঁর ঘর ছেড়ে বাইরেই যান নি। সুতরাং, হাসপাতালে কোন উচ্চপদস্থ অফিসারএর উপস্থিতি সম্পর্কে কোন প্রমাণ মেলে না।

নেতাজীর মরদেহ দাহ করার আগে কোন ছবি কেন তোলা হয়

নি সেই প্রশ্নের জবাব রেখেছেন দুজন সাক্ষী। একজন বলেছেন যে মরদেহের ছবি তোলা জাপানী প্রথার বিরোধী এবং অন্যজন বলেছেন যে নেতাজীর বিকৃত মুখের ছবি তোলার অনুমতি তিনি দেন নি। এমন অসঙ্গতিমূলক বিবৃতি ঘটনার সমর্থনে কোন প্রমাণ রাখে না। শবাধারে রাখা দেহটি কবে যে চিতায় তোলা হয়েছিল তাও নির্ধারিত হয় নি, এমন কি, কিভাবে ঐ শবাধার দাহক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাও সাক্ষীরা একমত হয়ে জানাতে পারেন নি। কেউ বলেছেন যে শোভাযাত্রা করেই শবাধার নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, আবার কেউ বলেছেন কোন শোভাযাত্রা না করেই ঐ শবাধার নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শবদাহ করতে গেলে মৃতের নামে মৃত্যুর সার্টিফিকেট দিতে হয়। হাসপাতালের অধিকর্তা মৃত্যুর সর্টিফিকেট লিখে দিয়েছিলেন 'কাতা কানা' নামে, আর সাংবাদিক শ্রী হারিণ শাহ্ তাইহোকুর সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে যে সার্টিফিকেট খুঁজে পেয়েছিলেন তাতে লেখা ছিল 'ওকারা ওচিরোর' নাম।

শবাদাহক্ষেত্রে ক'টি দাহচুল্লী ছিল সেই বিষয়েও সাক্ষীরা একমত নন। দাহচুল্লীতে মরদেহটি ঢুকিয়ে দেওয়ার পর কর্নেল রহমান ও অন্যান্য পদস্থ অফিসারগণ দাহক্ষেত্রের ঘরের মধ্যে এসেছিলেন বলে জানা যায়। মরদেহ চুল্লীতে ঢোকানোর সময় কর্নেল হবিব-উর রহমান পর্যন্ত যে সামনে উপস্থিত ছিলেন, ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন না, একথা অপর কেহ দূরের কথা—কর্নেল রহমান এর সচেতন মনও বিশ্বাস করে না। দাহচুল্লির একটিমাত্র চাবি দু'জন সাক্ষী তাঁদের কাছে রেখেছিলেন বলে দাবী করেছেন। তাহ'লে চাবীটি কার কাছে ছিল তা কে বলতে পারেন? এমন ধাঁধার উত্তর সাক্ষীরা স্বয়ং দিতে পারবেন বলে মনে হয় না। শবদাহক্ষেত্র থেকে চিতাভস্ম সংগ্রহ করতে কে কে গিয়েছিলেন তা সামরিক বিভাগের পদস্থ অফিসারও বলতে পারেন নি। আগের দিন যিনি একটি ধূপ-কাঠি আঙ্গুল দিয়ে ধরতে পারেন নি, পরদিন তিনিই হাতে দুটি ছোট

কাঠের লাঠি (চপ্‌স্টিক) ধরেছিলেন শুনে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। শবদাহক্ষেত্র থেকে সাক্ষীরা হাড় সংগ্রহ করেছিলেন বলেই জানা যায়, ভস্ম নয়। ঐ সংগৃহীত হাড় আপনা থেকেই ভস্মে পরিণত হয় ; তা কি অবস্থায় রাখা হয়েছিল তাও সুনির্ধারিত নয়। ভস্মাধারটি শবদাহক্ষেত্র থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় নাকি কর্নেল রহমানএর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কারণ ঐ ভাবে ভস্মাবশেষ নিয়ে যাওয়া জাপানী প্রথা। কিন্তু ভস্মাধারটি টোকিও নিয়ে যাওয়ার পথে জাপানী প্রথামত বিমান বন্দর পর্যন্ত কারও গলায় ঝুলিয়ে আনা হয়েছিল বলে জানা যায় না। অবশ্য তাইহোকু বিমান বন্দরে ঐ ভস্মাধার একজন সামরিক অফিসারের গলায় আবার ঝোলানো হয়েছিল বলে জানা যায়, কিন্তু তিনি কর্নেল রহমান নন। জাপানী প্রথার এমন বিচিত্র প্রয়োগ, কাঠের বাক্সে রাখা পদার্থের ওপর সন্দিগ্ধ করে তোলে। তাইহোকু বিমান বন্দর থেকে টোকিওর ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স পর্যন্ত ভস্মাবশেষ ভর্তি (?) কাঠের বাক্সটি নিয়ে আসার ব্যাপারেও গোলযোগ দেখা যায়। মাত্র চারজন ব্যক্তি ৫ই সেপ্টেম্বর তাইহোকু থেকে রওনা হয়ে টোকিওতে এসেছিলেন। কিন্তু এই চারজন ব্যক্তিও কাঠের বাক্সটি টোকিওতে পৌঁছানোর ব্যাপারে একমত হয়ে একই বিবরণ দাখিল করতে পারেন নি ; টোকিওতে খুব গোপনভাবেই যে ভস্মে পূর্ণ (?) বাক্সটি শ্রীআয়ারের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহই নেই। টোকিওস্থ ভারতীয়দের এক্তিয়ার থেকে ঐ বাক্সটি যে কিভাবে এক মন্দিরে রেখে আসা হয়েছিল তাও পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না। একজন ভারতীয়র বিবরণ মতে মিছিল করেই ঐ বাক্সটি রেনকোজি মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিন্তু অন্যজন, অর্থাৎ শ্রীআয়ার এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে খুব গোপনে ঐ বাক্সটি এক মন্দিরে রেখে আসা হয়েছিল। এমন বিচিত্র বৈষম্যের সঙ্গে যোগ হয় আর এক চমক্‌প্রদ ঘটনা তা হ'ল, ভস্মে পূর্ণ বাক্সটির রূপান্তর। বাক্সটি কখনও

একফুট আর কখনও আট ইঞ্চি মাপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। বাক্সটি নাকি পেরেক দিয়ে আঁটাও ছিল, কিন্তু কে, কখন, কোথায় পেরেক এঁটেছিলেন তা কেউই জানাতে পারেন নি।

ধনরত্নের ক্ষেত্রেও যে বহু বিচিত্র অসঙ্গতির সমাবেশ দেখা গেছে তাও সত্য; কর্নেল রহমান স্বয়ং শ্রীআয়ার এর কাছে বিবৃতি দিয়েছিলেন যে তিনিই চিতাভস্মের দায়িত্ব নিয়ে টৌকিও ফিরে এসেছেন, তা যে অন্য সাক্ষীরা সমর্থন করেন নি তা রিপোর্ট থেকেই জানা যায়। ধনরত্ন সংগ্রহ করার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে সম্ভব হয় নি তা তদন্ত কমিটিই লিখেছিলেন। একজন সাক্ষীর জবানী অন্যজনের দ্বারা সমর্থিত হয় নি। পরস্পর বিরোধী বক্তব্য দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেও বহুবার দেখা গেছে কিন্তু সেক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি প্রচারিত ঘটনা সত্য বলে অভিমত রেখেছেন। একই ধরণের বক্তব্যের বিচার বিবেচনা করে তদন্ত কমিটি এক পর্যায়ে প্রচারিত ঘটনার সংবাদকে সমর্থন করেছেন এবং অপর পর্যায়ে তা অসঙ্গতিপূর্ণ বলে বর্জন করেছেন।

ধনরত্নের অধ্যায়ে আর বেশী আলোচনা করে পাঠকবর্গের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। জাপ সরকার এমন এক মর্মন্তুদ ঘটনার কোন আনুষ্ঠানিক তদন্ত করেন নি বলে জানিয়েছেন। আনুষ্ঠানিক তদন্ত না করা হলেও ঐ প্রসঙ্গে কোন রিপোর্ট যে সদর দপ্তরে পাঠানো হয়েছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায় না। জাপসরকারের এক উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার জানিয়েছেন যে তাঁর অধীনস্থ এক অফিসার আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট তাঁরই মাধ্যমে টৌকিওর সদর দপ্তরে পাঠিয়ে ছিলেন। কিন্তু ঐ অফিসারই স্বয়ং তেমন কোন রিপোর্টের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। সাক্ষীদের জবানীর মধ্যে অসঙ্গতি ও জাপ সরকারী মহলের বিচিত্র ঔদাসীন্যই প্রমাণ করে আলোচ্য ঘটনা সম্পূর্ণ সাজানো। জাপ সরকার নেতাজী তদন্ত কমিটি টৌকিও পৌঁছানোর আগেই আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে

অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন বলে জানা যায়। তদন্ত কমিটি টোকিও পৌঁছানোর পর জাপ সরকারী মহল থেকে একটি তালিকা তাঁদের কাছে পেশ করে দেওয়া হয়। তখন উল্লেখ করা হয় যে ঐ তালিকায় উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে কিছু তথ্য জানাতে পারবেন। সুদীর্ঘ দশবছর পর জাপ সরকার এর তরফ থেকে প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধানের কাজ ও সাক্ষী তালিকা প্রস্তুত করা ও ঐ তালিকা নেতাজী তদন্ত ককিটির কাছে পেশ করাটা আলোচ্য ঘটনার সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ ভিন্ন ইঙ্গিতই করে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র জীবিত বলে দাবী করে যাঁরা তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হয়েছেন তাঁদের নাম, সর্বশ্রী অরবিন্দ বসু, মথুরা-লিঙ্গম্ থেবর, এস্. এম্. গোস্বামী, লেঃ এন্. বি. দাস, এ. কে. গুপ্ত, শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী ও শ্রী জে. সি. সিন্‌হা। কিন্তু এই ক'জন সাক্ষী ছাড়া আরও অনেকেই নেতাজী জীবিত বলে তদন্ত কমিটির কাছে দাবী করেছেন। ঐ ব্যক্তিদের কথা তদন্ত রিপোর্টে উল্লিখিত হয় নি, তবে তাঁদের নাম সাক্ষীতালিকায় রয়েছে। আরও যে সব সাক্ষী নেতাজী জীবিত বলে দাবী করেছেন, তাঁরা হলেন ক্যাপ্টেন গুলজারা সিং, শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ বসু, মিং কাজো সাতো, কর্নেল ঠাকুর সিং, মিঃ এন্, কিটাজাওয়া, ডাঃ এস্. এন্. দত্ত, শ্রীনারায়ণ দাস, শ্রী এস্. এন্. সেন। এঁদের মধ্যে মিঃ কাজো সাতো ও লেঃ এন্, বি. দাস তাঁদের জবানীতে বলেছেন যে তাঁরা নেতাজীকে একটি আলাদা বিমানে যেতে দেখেছিলেন। ঐ বিমানে নেতাজীর সহযাত্রী হয়ে কর্নেল হবিব-উর রহমান যান নি।* ডাঃ এস্, এন্, দত্ত মন্তব্য করেছেন যে তাইহোকুতে একটি বিমানকে পরিকল্পিত পথে কোন কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে সামান্য বিধ্বস্ত করে দেওয়া হয়। ঐ বিধ্বস্ত বিমানটিকেই পুলিশ দল মেরামত করতে দেখেছিলেন; নেতাজীর মুখ তখন এমনভাবে ব্যাণ্ডেজ করে দেওয়া হয় যে তাঁকে সনাক্ত করাও

* Dissentient Report, S. C. Bose, P-158

তখন অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং তারপর কর্নেল হবিব-উর রহমান এর হাত কারবোলিক এ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রাতের অন্ধকারে পাইলট নেভিগেটর, জেনারেল সিডি ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁদের গন্তব্য-স্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। দুর্ঘটনায় ঐ চারজনই মৃত বলে ঘোষিত। পরদিন সকালে প্রচার করা হয় যে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র রাত্রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন এবং কোন এক মৃত ব্যক্তির দেহকে কাপড় চাপা দিয়ে বা একটি শবাধারকে সযত্নে হাসপাতালের একটি ঘরে রেখে দেওয়া হয়। চারদিন ইতিমধ্যে পার হয়ে যায়। ঐ চারদিনের মধ্যে বিমান দুর্ঘটনার কাহিনী সত্য বলে প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ তৈরী করে ফেলা হয়। ইতিমধ্যে নেতাজীর নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর খবর পৌঁছায়। তারপর জাপ সরকার নেতাজীর মৃত্যু কাহিনী প্রচার করেন। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন যে আত্মসমর্পণের পর জাপ সরকার জেনারেল ম্যাক্ আর্থার এর অসন্তুষ্টি ঘটাতে চান নি। জাপ সরকার যদি নেতাজীকে ইঙ্গ-মারকিন শক্তির হাতে তুলে দিতেন, তাহ'লে ঐ কাজ হ'ত অত্যন্ত হীন ও জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার সামিল। নেতাজীকে রক্ষা করার জন্য তাঁদের সামনে একটি রাস্তাই খোলা ছিল, তা হ'ল তিনি নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার পর তাঁর মৃত্যুর কথা প্রচার করা। তাঁরা যদি জানতেন যে নেতাজী তাঁদের অঞ্চল থেকে কোন এক অনিশ্চিত গন্তব্যস্থলের পথে চলে গেছেন তাহলে একজন যুদ্ধপরাধীকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য তাঁরাই অভিযুক্ত হতেন। মিঃ কাজো সাতো তাঁর জবানীতে বলেন যে, সকাল সাতটা নাগাদ একটি বিমান সামান্য দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। ঐ বিমানে মাত্র দু'জন যাত্রী ছিলেন। প্রথম যাত্রী বিমানে দরজা খুলে লাফিয়ে বাইরে আসেন। ঐ যাত্রীটিকে দেখতে নেতাজীর মতই। দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে বিমান থেকে বাইরে বার করে আনা হয়েছিল। উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারএর

কাছ থেকে তিনি জেনেছিলেন যে ঐ বিমানে যাত্রী ছিলেন 'চন্দ্র বোস'। বিমানের ঐ দু'জন যাত্রীদের কেউই আহত হন নি। তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করেছিলেন বলে মিঃ সাতো জানিয়েছেন। অপর একজন সাক্ষী, শ্রী এস্. এন্. সেন জানান যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র আলোচ্য বিমানের আরোহী ছিলেন না।

কিন্তু আরও অনেক রিপোর্ট আছে যা প্রমাণ করে যে আলোচ্য ঘটনা সম্পূর্ণ সাজানো। ১৯৪৫ সালের ৩১শে আগস্ট নয়াদিল্লীর একটি খবর হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। খবরটি নিম্নরূপ—

Subhas Bose said to be alive

New Delhi, Aug. 29—The American journalist who asked for clarification of Pandit Nehru's attitude to Subhas Chandra Bose, asserted that Subhas was "alive and seen four days ago in Saigon. "Pandit Nehru felt surprised and said that it was the first time he heard the suggestion that Bose was alive.

এই বক্তব্য শুনে পণ্ডিত নেহেরু বিস্মিত হ'ন এবং বলেন যে বোস যে জীবিত তা তিনি এই প্রথম শুনলেন। এই সাংবাদিকের বিবরণ মতে ২৫ আগস্ট ১৯৪৫ নাগাদ নেতাজীকে সাইগনএ দেখা গিয়েছিল। সাইগন এ, শ্রীরমনীও গোঁসাইএর দেওয়া বিবৃতি আগেই আলোচিত হয়েছে। ঐ বিবৃতি মতে, শ্রীআয়ার ও শ্রীচ্যাটার্জী সাইগন থেকে চলে যাওয়ার দু'দিন পরে নেতাজী দু'জন জাপানী অফিসারের সঙ্গে বাংলোতে এসে তাঁদের খোঁজ করেছিলেন। শ্রীআয়ার সাইগন ত্যাগ করেছিলেন ২০শে আগস্ট। তা হ'লে, ২২শে বা ২৩শে আগস্ট নেতাজী সেখানে এসে ছিলেন বলে জানা যায়। ২৫শে আগস্ট নেতাজীকে সাইগনএ দেখতে পাওয়া গেলে ২২ বা ২৩ তারিখে তাঁর পক্ষে সেখানে থাকা অসম্ভব নয়। সুতরাং

শ্রীরমনীও গোঁসাইএর জবানী তদন্ত কমিটি বাতিল করে দিলেও, মারকিন সাংবাদিকদের বক্তব্য কিন্তু তাঁর বিবৃতি সমর্থন করে।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজেরকর্নেল রেজভীকে আজ হয়তো অনেকেরই মনে নেই। কিন্তু আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সঙ্গে যুক্ত কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামী তাঁকে ভোলেন নি। কর্নেল রেজভী বলেছিলেন যে ১৯৪৫ সালের ১৯শে আগস্ট, তিনি নেতাজীর সঙ্গে একই জীপে ছিলেন। এঁর জবানী অবশ্যই প্রমাণ করে যে ১৮ই আগস্ট তারিখের ঘটনা সত্য নয়। লালকেল্লার ঐতিহাসিক বিচারের ছবি আজও নিশ্চয়ই কারও স্মৃতিপট থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। ১৯৪৬ সালের কথা। লালকেল্লার বিচার যখন সমাপ্তির পথে তখন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের পক্ষ সমর্থনকারী আইনবিদ্, স্বর্গত ভুলাভাই দেশাই অসুস্থ। ঐ সময় একদিন কর্নেল হবিব-উর রহমানকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যে সুভাষ কি সত্যই মৃত ? শ্রদ্ধাভরে সামরিক কায়দায় সম্মান প্রদর্শন করে কর্নেল হবিব-উর রহমান বলেছিলেন যে তিনি সৈনিক, তাঁকে কম্যাণ্ড মেনে চলতে হয়। যুগান্তর কাগজের সাংবাদিক জানিয়েছিলেন: "পরলোকগত ভুলাভাই দেশাই একবার যখন কর্নেল রহমানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সুভাষ কি সত্যই মৃত না জীবিত ? তখন হবিব-উর রহমান বলেছিলেন; আমি সৈনিক, আমাকে আদেশ মেনে চলতে হয়।" (যুগান্তর ২৮শে মে ১৯৫১)

১৯৪৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে কলকাতার বেলগাছিয়া ভিলায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বহু সংগ্রামী সৈনিক নেতাজী জন্মোৎসব পালন করার জন্য সমবেত হয়েছিলেন। ঐ সমাবেশে সামরিক পোষাকে সজ্জিত হয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন কর্নেল হবিব-উর রহমান। বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ফৌজী ভাইদের মধ্যে আলাপ আলোচনা হয়েছিল। কর্নেল হবিব-উর রহমান ঐ আলোচনায় তাঁর সহযোদ্ধাদের মর্মন্তুদ কাহিনীর অনেক কথাই ঠিক ঠিক বলে চলেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ এক সময় তিনি বলে

ফেলেছিলেন, "আমাকে যে পোষাকে এখানে দেখছেন, এই পোষাকেই আমি বিমান দুর্ঘটনার সময় নেতাজীর সঙ্গে ছিলাম।" কর্নেল রহমান এর বক্তব্য যাঁরা শুনেছিলেন তাঁরা মুহূর্তের জন্য বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন তাঁর মুখের দিকে, তারপর শুরু হয়েছিল প্রশ্নবান। কর্নেল রহমান মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, "না, এই ধরণের পোষাক পরেই আমি সেদিন নেতাজীর সঙ্গে ছিলাম।" কর্নেল রহমান উত্তর দিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু ঐ সমাবেশে সমবেত স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বুঝে নিয়েছিলেন যে প্রচারিত ঘটনার নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। কর্নেল হবিব-উর রহমানের পোষাক সম্বন্ধে আরও একটু বিবরণ পাওয়া যায় শ্রীআয়ার এর লেখায়।* আলোচ্য ঘটনার পর প্রথম যখন টোকিওতে কর্নেল রহমানএর সঙ্গে শ্রীআয়ারএর দেখা হয় তখন তাঁর পরনে ছিল একই ধরণের পোষাক যা পরে তিনি নেতাজীর সাঙ্গ শেষ যাত্রায় গিয়েছিলেন। তাইহোকুর সর্বগ্রাসী আগুন দেহ স্পর্শ করতে পেরেছিল, কিন্তু খাঁটি সৈনিকের পোষাক স্পর্শ করতে পারে নি !!

কর্নেল হবিব-উর রহমান বিমান দুর্ঘটনার বিবরণ স্বতন্ত্রভাবে নেতাজী তদন্ত কমিটি শ্রীশাহনওয়াজ খাঁনএর কাছেও দিয়েছিলেন। ঐ বিবরণে কর্নেল রহমান বলেছিলেন যে বিমানটি ফরমোসা বিমান বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে টোকিওর পথে যাচ্ছিল। হঠাৎ বিমানের সঙ্গে কোন কিছুর ধাক্কা লাগে; সংঘর্ষ বেশ জোরদার বলেই মনে হয়েছিল। কোন শিকারী পাখীই বোধ হয় হঠাৎ বিমানের পাখার ওপর নেমে পড়েছিল। বিমানটি তখন প্রায় ৩০০ ফুট ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। ঐ সংঘর্ষের দরুণ বিমানটি বিমান বন্দরের কাছেই

---

* He was dressed in a woollen khaki bushcoat, breeches of the same colour and top-boots in which he had set out from Saigon three weeks ago.

—Unto Him A Witness—S. A. Ayer P-110

একটি ছোট পাহাড়ের ওপর এসে পড়েছিল এবং পরমুহূর্তেই জ্বলে উঠেছিল সর্বগ্রাসী অনল। তিনি লাফিয়ে জ্বলন্ত বিমানের বাইরে চলে এসেছিলেন এবং আহত নেতাজীকেও আগুন থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। দুর্ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে কর্নেল রহমান আরও বলেছিলেন যে নেতাজীর মাথায় দু'জায়গায় আঘাত লেগেছিল। ঐ আঘাত দু'টি খুবই গুরুতর ছিল কিন্তু ঠিক আধঘণ্টা নেতাজী সজ্ঞানেই ছিলেন।" কর্নেল হবিব-উর রহমানএর এই বিবরণের সঙ্গে তদন্ত কমিটির কাছে দেওয়া বিবরণের কোন মিল নেই। তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীখাঁন নিশ্চয়ই এই গড়মিল লক্ষ্য করেছিলেন কিন্তু এই বিষয়ে কর্নেল হবিব-উর রহমানকে তিনি কোন জেরা করেন নি। কর্নেল হবিব-উর রহমান আলোচ্য ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। ঘটনার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি সবই নাকি দেখেছিলেন। বহু জায়গায়ই তাঁকে ঘটনার বিবরণ দিতে হয়েছে। তদন্ত কমিটি তাঁর অন্তত তিনটি বিবরণের ইতিহাস জানতে পেরেছিলেন; (১) শ্রীশাহনওয়াজ খাঁন-এর কাছে দেওয়া বিবৃতি, (২) শ্রী এস্. এ. আয়ারএর কাছে দেওয়া বিবৃতি (৩) শ্রীমূর্তির হাতে দেওয়া লিখিত বিবরণ। এই তিনটি বিবরণের মধ্যে অনেক পর্যায়ে যেমন গড়মিল দেখা যায়, ঠিক তেমনি গড়মিল রয়েছে তদন্ত কমিটির কাছে দেওয়া বিবৃতিতে। অন্যত্র দেওয়া বিবৃতির কথা বাদ দিলেও, তাঁর দেওয়ার চারিটি বিবৃতির বিবরণ এক নয়। একই ব্যক্তি, একই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, একই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন, কিন্তু তাঁরই বিবরণের মধ্যে তারতম; কখনই প্রমাণ করে না যে তিনি সত্য ঘটনার সত্য বিবরণ দিচ্ছেন।

নেতাজী তদন্ত কমিটি রিপোর্টের প্রত্যেক পর্যায়েই জাপ সরকারএর প্রশাসন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলার কথা উল্লেখ করেছেন। তদন্ত কমিটি এই মন্তব্যও করেছেন যে যদি যুদ্ধোত্তর জাপানে বিশৃঙ্খলা দেখা না দিত তাহ'লে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থায়ই যথাযথভাবে নেওয়া হ'ত এবং আলোচ্য ঘটনার সমর্থনে যথাযথ প্রমাণ রাখা হ'ত।

শ্রীআয়ারকে সাইগন থেকে টোকিওতে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর সঙ্গে জাপানী সামরিক বিভাগের অফিসারদের মধ্যে যে আলাপ আলোচনা হয়েছিল তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ বাক্যালাপ থেকে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে আত্মসমর্পণের পর জাপ সরকারএ কোন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় নি। নেতজী তদন্ত কমিটির মাননীয় সদস্যদ্বয় জাপ সরকার এর মধ্যে আত্মসমর্পণের পর বিশৃঙ্খলার প্রমাণ কোন্ তথ্যপ্রমাণ থেকে পেয়েছেন তার কোন নিদর্শন নেই। ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগস্ট আত্মসমর্পণের পর জাপ সরকার খুবই সুশৃঙ্খল ভাবে কাজ চালিয়ে যচ্ছিলেন। যুদ্ধোত্তর জাপানের অবস্থা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারক ডঃ রাধাবিনোদ পাল এর মন্তব্য রয়েছে। আন্তর্জাতিক আদালতে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ সংক্রান্ত মামলায় রায় দান করতে গিয়ে মহামান্য বিচারক ডঃ রাধাবিনোদ পাল মন্তব্য করেছেন—The case of the accused before us cannot in anyway be linked to the case either of Nepoleon or of Hitler. The constitution of Japan was fully working. The Sovereign, the Army and the civil officials, all remained connected as usual and in normal ways with the Society."*—অর্থাৎ বিচারকের কাছে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মামলা কোনভাবেই নেপোলীয়ন বা হিট্‌লার এর মামলার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া যায় না। জাপান এর সংবিধান সম্পূর্ণভাবে কাজ করছিল। সার্বভৌম সম্রাট, সেনাবাহিনীর বে-সামরিক কর্তৃপক্ষ, সকলেই পূর্বেকার মত এবং স্বাভাবিক ভাবেই সমাজের সঙ্গে যোগাযোগে ছিলেন। এই রায় অবশ্যই সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করে যে আত্মসমর্পণের পর জাপ সরকারএ কোনরকম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় নি। বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কে যে ঘোষণা জাপান করেছিলেন তা ঘোষণা মাত্র; এবং প্রামাণ্য কোন তথ্য

---

* International Military Tribunal for the Far East, P-698

পেশ না করে তাঁরা বুঝিয়েছেন যে প্রচারিত কাহিনী শুধুমাত্র প্রচার, ঘটনা নয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে জার্মান ইণ্টেলিজেন্স দপ্তরের মিঃ পল লুভারখুম লিখেছেন যে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর কোন প্রমাণ নেই। এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মিঃ ইলিয়ট এরিক্সন এক প্রবন্ধে লেখেন* —There is a strong possibility that Bose is alive. At the end of the war, when the Japanese front collapsed in Burma, Bose, if he showed himself ran a great risk of being prosecuted as an International War Criminal. He was supposed to have tried to escape from Burma by plane and died in a crash. Yet numerous people report seeing him after his supposed death, including a nurse in a field hospital who treated him for minor injuries. His body was never found and Allied Intelligence Officers could find no evidence that he died in the wreckage of the plane he was supposed to have fallen in. The rumour presists that he soon took another plane this time to Yenan, then the Capital of Communist China. At that time India was not yet free, and Bose could have easily been hunting for a new possible enemy of England who would precipitated another war that might collapse the British Empire. অর্থাৎ, শ্রীসুভাষচন্দ্র বোস-এর বেঁচে থাকার সম্ভাবনাই বেশী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে জাপান যখন ব্রহ্ম সীমান্তে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে, তখন সুভাষচন্দ্র যদি দেখা দিতেন তাহলে তাঁকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে অভিযুক্ত হওয়ার ঝুঁকি নিতে হ'ত। বার্মা থেকে বিমানে অন্যত্র চলে যাওয়ার পথেই নাকি

* Jawaharlal Nehru and the Red threat to India-Elliot Erikson—National Republic U. S. A., Feb. 1954.

তিনি বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন বলে ধর নেওয়া হয়। কিন্তু বহু ব্যক্তি ঐ তথাকথিত দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পরও তাঁকে দেখেছেন বলে বিবৃত করেছেন, এমন কি একটি ফিল্ড হাসপাতালের জনৈক নার্স ও তাঁকে দেখেছেন এবং তাঁর সামান্য আঘাতের চিকিৎসা করেছেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর মরদেহ পাওয়া যায় নি, এবং তিনি যে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন তেমন কোন তথ্য প্রমাণ মিত্রশক্তির গোয়েন্দা বাহিনী খুঁজে পান নি। শোনা যায় যে কালক্ষেপ না করে অন্য একটি বিমানে তিনি কম্যুনিস্ট চীন এর রাজধানী ইয়েনান এর পথে রওনা হয়ে যান। ভারতবর্ষ তখনও স্বাধীনতা পায় নি, তাই বোস বৃটেন এর কোন শত্রু রাষ্ট্রেরই খোঁজ করে বেড়াচ্ছিলেন, যে রাষ্ট্র আরও একটি যুদ্ধের সূচনা করতে পারবে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতন ঘটাবে। তদন্ত কমিটির বিবরণে লেখা হয়েছে যে বৃটিশ ও মারকিন গোয়েন্দা বাহিনীর বিবরণ নেতাজীর মৃত্যুর ঘটনা সমর্থন করেছে। কিন্তু ঐ বক্তব্য যে সত্য নয়, তা উপরোক্ত মন্তব্য থেকেই জানা যায়। সুদূর মারকিন যুক্তরাজ্যের গোয়েন্দা বাহিনীর একজন সদস্যা প্রঃ মিস্ এমিলি এরিক্সন লিখেছেন যে—The Government and people of U. S. A. do not believe the so called death of Chandra Bose in that reported plane crash. More over, some people have seen him after the incident including a field nurse. There is every possibility that Bose is alive—"* এই মন্তব্য প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। তাহ'লে, সুভাষচন্দ্র বোস এর মৃত্যু কাহিনী যে মারকিন সরকার এবং আমেরিকার অধিবাসীরা বিশ্বাস করেন না তা সত্য।

ভারতবর্ষ থেকে যে গোয়েন্দাবাহিনী বিমান দুর্ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে তদন্ত করতে দূর প্রাচ্যে গিয়েছিলেন, তাঁদের একজন সন্ধানী

---

* National Republic—Sep. 1956

দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন কর্নেল হবিব-উর রহমানএর চোখের জল। তিনি বলতেন, "প্রয়োজনে মানুষ যে কত সুন্দরভাবে কাঁদতে পারে, কর্নেল হবিব-উর রহমানকে কাঁদতে না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না।" একদিন তাঁর দপ্তরে বসে তিনি কাজ করে চলেছেন এমন সময় কয়েকজন সাংবাদিক এসে তাঁকে ঘেরাও করেছেন। সাংবাদিকরা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছিলেন অপরাধ বিষয়ে। সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসাবাদ অনেকক্ষণই স্থায়ী হ'ল। তিনিও তাঁর জ্ঞান মত সব প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর দিয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসাবাদের পালা শেষ করে সাংবাদিকরা খুশী মনেই ফিরে গেলেন। কিন্তু, গোলযোগ শুরু হ'ল কয়েকদিন পরেই। তাইহোকু রহস্য নিয়ে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হ'ল। ঐ সংবাদে তাইহোকুর ঘটনা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হ'ল। সংবাদের সূত্র ধরে সরকারী মহলে খোঁজ খবর করা শুরু হ'ল। কার মন্তব্যের ওপর ভিত্তি করে ঐ খবর প্রকাশিত হ'ল, তা খুঁজে বার করতে খুব বেশী সময় লাগল না। কিছু দিনের মধ্যেই গোয়েন্দা দলের ঐ ভদ্রলোকের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করে চিঠি এল। চিঠি পেয়ে ভদ্রলোক আকাশ থেকে পড়লেন। কখন যে সাংবাদিকদের তিনি তাইহোকু প্রসঙ্গে বা নেতাজী প্রসঙ্গে কিছু বলেছিলেন তাই-ই মনে করতে পারলেন না। প্রশ্নোত্তরের ছলে সুযোগ সন্ধানী কুশলী সাংবাদিক কখন যে আসল তথ্য জেনে নিয়েছিলেন তা ভদ্রলোক বুঝতেই পারেন নি। সখেদে তাঁর অধীনস্থ কর্মীদের তিনি বলেছিলেন, "দেখুন তো আবার কি ঝামেলায় পড়লাম।" ভদ্রলোক চিঠির জবাব কি দিয়েছিলেন তা জানা যায় নি; তবে ঐ ঘটনার পর থেকে তদন্তের বিষয় তিনি সব সময় এড়িয়ে যেতেন। শুধু একটি কথাই কালেভদ্রে বলতেন, "রটনা আর ঘটনার অর্থ এক নয়।

আলোচ্য ঘটনার প্রধান সাক্ষী কর্নেল হবিব-উর রহমানএর সঙ্গে একজন ভারতীয় ডাক্তারের যে তাইহোকুতে দেখা হয়েছিল তা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ ডাক্তার ভদ্রলোক আলোচ্য ঘটনার সময় রেডক্রসএর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাইহোকুর হাসপাতালেই কর্নেল রহমান এর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। কর্নেল হবিব-উর রহমানকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনি কি নেতাজীর সঙ্গে ছিলেন?" উত্তরে কর্নেল হবিব-উর রহমান জানিয়েছিলেন, "হ্যাঁ।" ভারতীয় ডাক্তার দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছিলেন, "নেতাজী কি সত্যিই মারা গেছেন?" উত্তরে কর্নেল হবিব-উর রহমান মুখে কিছু বলেন নি, শুধু মাথা দুলিয়ে ইসারায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। উক্ত ভারতীয় ডাক্তার মন্তব্য করেছেন যে কর্নেল হবিব-উর রহমান-এর ইসারার অর্থ 'হ্যাঁ' নয়, 'না'। তিনি আরও মন্তব্য করেন যে কর্নেল হবিব-উর রহমানএর দেহে এমন কোন বিশেষ ক্ষতচিহ্ন তিনি দেখতে পাননি, যা থেকে চিকিৎসকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যে বিমান দুর্ঘটনায়ই তিনি আহত হয়েছিলেন। এই ভারতীয় ডাক্তার কয়েক-দিনের জন্য টোকিওর হ্যামিল্টন হাউসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঐ সময় তাঁর সঙ্গে সর্বশ্রী বাগ্‌চী, সাঁতরা, গোপাল দাস, প্রমুখ বেশ কয়েকজন ভারতীয়র দেখা হয়েছিল। নেতাজীর বিষয় নিয়ে ঐ সব ভারতীয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ আলোচনাও হয়েছিল। নেতাজীর মৃত্যু কাহিনী সম্বন্ধে তাঁরা প্রথমে মুখই খোলেন নি। পরে টোকিও থেকে রওনা হয়ে ভারতে ফিরে আসার সময় ঐ ভারতীয়দের একজন তাঁকে বলেছিলেন, "নিশ্চিন্তে থাকুন, যথাসময়ে আবার নেতাজীর দেখা পাওয়া যাবে।" ডাক্তার ভদ্রলোক অবশ্য ঐ ভারতীয়র নাম উল্লেখ করলেন না। ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা চলা কালে ভদ্র-লোকের অন্দর মহল থেকে ডাক এল। বর্তমান লেখকের কানে ভেসে এল জনৈকা মহিলার কণ্ঠস্বর। "কেন অত কথা বলছ। এতদিন যখন চুপ করে আছ, তখন এখনও চুপ করেই থাক না। কোথা থেকে আপদ আসবে কে জানে?" ডাক্তার বুঝেছিলেন যে অন্দর মহলের সাবধানবাণী পাশের ঘর থেকে শোনা গেছে।

ঠিক এই ধরনের সাবধান বাণী অন্য কারও মুখ থেকে শোনা যায় নি কিন্তু তাঁদের চোখে মুখে কেমন যেন একটা ভাব ফুটে উঠেছে, কোথায় যেন একটু সঙ্কোচ জেগেছে। নেতাজী সম্পর্কে কোন তথ্য জানা থাকলে তা প্রকাশ করতে দ্বিধা থাকার কারণ বর্তমান লেখকের জানা নেই। তবে একথা ঠিক যে, রহস্যের কিছু কিছু তথ্যও যাঁদের জানা রয়েছে তাঁরাও যেন এক অজানা আশঙ্কায় নীরব হয়ে যান।

কর্নেল হবিব-উর রহমানএর সঙ্গে অনেকেরই মুখোমুখি সাক্ষাত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন আইন বিষয়ে আজাদ হিন্দ্ সরকারএর মন্ত্রী শ্রী এ. এন. সরকার। কর্নেল রহমান সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—From the perspective of medico-legal jurisprudence, I examined physical marks left on the person of the colonel and noted his demeanour and that officer behaved, when I smiled at him understandingly. Admittedly, there is no evidence in corroboration of Netaji's death whether direct or indirect—neither substantive nor circumstantial."* কর্নেলএর আচার ব্যবহারও তিনি সন্ধানী দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছিলেন। সমস্ত বিষয়টি অনুধাবন করার হাসি যখন তিনি হেসেছিলেন, তখন কর্নেল হবিব-উর রহমান কি ধরণের ব্যবহার করেছিলেন তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। শ্রীসরকার মন্তব্য করেছেন যে, সত্যই নেতাজীর মৃত্যুর সমর্থনে তথ্যগত বা পারিপার্শ্বিক, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রমাণ নেই।

কর্নেল হবিব-উর রহমান সেই দিনও হেসেছিলেন, আজও হাসছেন। কর্নেল রহমানএর দেহের ক্ষত দেখে শ্রীসরকার হেসেছিলেন স্বস্তির হাসি। আলোচ্য ঘটনার প্রকল্প তৈরী হওয়ার মুহূর্তে কর্নেল রহমান নিশ্চয়ই মনে মনে হেসেছিলেন, আর দুর্ঘটনার সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর থেকে তিনি হেসেই চলেছেন সাফল্যের

* "The Nation"···Netaji number 1947

হাসি। এই সাফল্যের হাসির পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে সেইদিনই যেদিন নেতার পরিকল্পনা স্বার্থক রূপ নেবে। কর্নেল হবিব-উর রহমান, আপনাকে প্রণাম। আপনাকে হাজার হাজার প্রণাম। আপনার আনুগত্যের তুলনা করে কিছু লেখা বর্তমান লেখকের পক্ষে অসম্ভব। মন্ত্রগুপ্তির শপথ অনেকেই নেন। মন্ত্রগুপ্তির পবিত্রতা আপনি যেভাবে রক্ষা করেছেন তার তুলনা হয় না। ষড়রিপুর হাতছানি থেকে নিজেকে সযত্নে দূরে রেখে নেতার প্রতি যে অকৃত্রিম স্নেহ, মমতা, ভালবাসা ও শ্রদ্ধার নিদর্শন আপনি রেখেছেন তা উত্তর-পুরুষের জীবন পথের পাথেয় হয়ে থাকবে। মাতৃভূমির জন্য আপনি যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা অতুলনীয়। নেতাজীর কর্মময় জীবনে আপনার অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে। সৈনিক জীবনের প্রতীক আপনি। আপনি আদর্শ ভল্যান্টিয়ারএর প্রতিভূ। আপনাকে প্রণাম। অখ্যাত তাইহোকু আজ প্রখ্যাত। এই কাজে আপনার অবদান কতটা তা আপনি স্বীকার না করলেও অন্যদের তা অজানা নয়। যদি আপনার মত সুযোগ্য সহচর ও নেতাগত প্রাণ অনুগামী না থাকত, তাহ'লে বিশ্ববরেণ্য মহাবিপ্লবী নেতার সুচিন্তিত পরিকল্পনা হয়ত প্রহসনে পরিণত হ'ত। রহস্যের সৃষ্টি করতে আপনার অবদান যতটা, ঐ রহস্যের চাবিকাঠি দেখিয়ে আলোর সন্ধান দিতেও ততটা সাহায্যই আপনি করেছেন। নেতাজীর পরিকল্পনার স্বার্থক রূপায়ন আপনার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। কর্নেল হবিব-উর রহমান,—জয়হিন্দ্।

১৭

বিমান দুর্ঘটনার রহস্য সম্পর্কে এক নূতন ইঙ্গিত পাওয়া যায় আজাদ হিন্দ সরকারএর মন্ত্রী শ্রী এ. এন. সরকারের লেখা থেকে। তিনি জানান যে ১৯৪৫ সালের ১২ই আগস্ট নেতাজীকে ওয়াকিবহাল করার জন্য কিছু জরুরী সংবাদ ও গোপন কাগজপত্র নিয়ে তিনি সিঙ্গাপুর রওনা হয়ে যান। সিঙ্গাপুরএ পৌঁছে তিনি সরাসরি নেতাজীর আবাসস্থলে চলে যান। সেখানে পৌঁছে তিনি এইভেবে বিস্মিত হ'ন যে নেতাজী স্বয়ং তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। নেতাজীর হাতে তিনি ঐ মূল্যবান সংবাদ ও গোপন কাগজপত্রগুলি তুলে দেন। ঐ কাগজপত্রগুলি পড়তে পড়তে নেতাজীর চোখে দেখা গিয়েছিল আলোর ঝলসানি, হাতদু'টি হয়েছিল বজ্রমুষ্ঠি। শ্রী সরকার-এর লেখা থেকে জানা যায় যে, ১৪ই আগস্ট হিকারী কিকানএর প্রধান কর্নেল মোরতার সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে নেতাজীর গোপন আলাপ আলোচনা হয়েছিল।* ঐ দিন রাত্রে আজাদ হিন্দ্ সরকারএর মন্ত্রীপরিষদের এক জরুরী সভা বসে। ঐ সভায় জাপ সরকারএর আত্মসমর্পণের পরিপ্রেক্ষিতে আজাদ হিন্দ্ সরকারএর পরবর্তী কর্মসূচী সম্পর্কে আলাপ আলোচনা চলে। সভার শেষে নেতাজীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—"আজাদ হিন্দ্ ফৌজ কিভাবে আত্মসমর্পণ করার কথা চিন্তা করিতে পারে? আমরা কি সংগ্রাম করিয়া মৃত্যুর জন্য শপথ গ্রহণ করি নাই; শত্রুর গুলি বুক পাতিয়া লইয়া, দিল্লীর ধুলিধুসর পথ চুম্বন করিয়া আমরা নিশ্চল, নিষ্প্রাণ হইয়া পড়িয়া থাকিব।...না, আমরা আত্মসমর্পণ করিতে পারিনা, ঐ শব্দটি আমাদের কপালে লেখা হইবে না। হ্যাঁ, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে

---

* Netaji Cannot Die—A. N. Sircar, Nation—Netaji Number, 1947.

আমরা অনুপ্রেরণার উৎস হইয়াই থাকিব—প্রেরণার এক চীরপ্রদীপ্ত উৎস হিসাবে, পুনর্বর্তনের এক আলোক সঙ্কেতের মত।" তারপর কয়েক মিনিটের জন্য তিনি নিজের মধ্যে হারিয়ে যান। তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে উচ্চারিত হয় কয়েকটি শব্দ—"আমি যদি আর ফিরিয়া না আসি, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি?"—নেতাজীর এই উক্তি প্রমাণ করে যে তাঁর রচিত সংগ্রামের সমাপ্তি তিনি ঘোষণা করেন নি। ঐ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি এমন এক ঝুঁকি নিতে চলেছিলেন যে, তার ফলে প্রতিপদক্ষেপেই তাঁর জীবন সংশয়ের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তবুও তিনি মুহূর্তের জন্য থম্‌কে দাঁড়ান নি। দুঃসাহসিক পথের হাতছানিতে তিনি বীরদর্পে এগিয়ে গেছেন। চাই মাতৃভূমির স্বাধীনতা, সেই জন্য যে কোন মূল্য দিতে তিনি প্রস্তুত। সাইগন-এর পথে যাত্রা করার আগে, বিমানে প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে নেতাজী শেষবারের মত বিমানবন্দরে উপস্থিত সহ-যোদ্ধাদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন—"We will meet again in India, if not here, and in the meantime you must reorganise yourself in the altered circumstances ; and if spared, return to India and identify yourself with the people in whom all power centered and work together with your hats off to the Father of the Nation,—the symbol of all that is noblest and the best in the national life of India, Mahatma Gandhi".*

সহকর্মীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর প্রথম পর্যায়ের যাত্রা শুরু করলেন। নেতাজী আরও নির্দেশ দিয়ে যান যে বিরোধী শক্তির নাগপাশ থেকে ছাড়া পেলে আজাদ হিন্দ্‌-এর যোদ্ধারা যেন ভারতের জনগনের মাঝে ফিরে যান এবং জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশমত কাজ করেন। শ্রী আয়ার

* Ibid

লিখেছেন যে—"That afternoon Netaji reached Bangkok and on enquiry was satisfied that plans had matured and it was simply left to him to follow it up"—এই বক্তব্য থেকে জানা যায় যে নেতাজী যে পরিকল্পনা করেছিলেন সেই পরিকল্পনামতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যে খুবই সুষ্ঠুভাবে করা হয়েছিল সেই খবর ব্যাঙ্কক-এই তাঁর কাছে পৌঁছেছিল। শ্রী সরকার-এর মতে নেতাজীর দ্বিতীয় পর্যায়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৬ই আগস্ট সকালে সাইগনের পথে যাত্রা করে। এই পর্যায়ের যাত্রা প্রসঙ্গে শ্রীসরকার লিখেছেন—After interviewing Field Marshal Count Terauchi, Japanse Chief of the southern Command who ratified the plan, Netaji proceeded to Taihoku, Capital of Taiwn (Formosa) and rested for the night."* অর্থাৎ জাপানী সাউদার্ন কম্যাণ্ড সেনাবাহিনীর প্রধান ফিল্ডমার্শাল তিরাউচির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে নেতাজী জানতে পারলেন যে তাঁর পরিকল্পনা মত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তারপর তিনি তাইহোকুর পথে যাত্রা করলেন এবং ঐ তাইহোকুতেই রাত্রের মত যাত্রা বিরতি করলেন।

নেতাজীর ঐতিহাসিক যাত্রার তৃতীয় পর্যায়ের বিবরণ দিয়ে শ্রী সরকার লিখেছেন—The third stage of the epic journey commenced on the 17th August when Netaji, accordoing to plan, set off in a plane ostensibly bound for Fukuoka in Kyusu (Japan)···That plane took off from Taihoku Air port and wind its way on taking altitude and disapearing gradually. Soon after, the droning of plane was heard overhead and an aircraft came down rapidly in flames. On an inspection of the wreckage, the charred body of one, who was identified as Lt. General Itagaki, was discovered

* Ibid

in the burnt plane together with a few other dead-bodies of his suit—But Netaji was heard of no more nor was any trace of that august person seen there or any where—The Great Leader simply disappearcd and went beyond the ken of human knowledge। Meanwile the Domie News Agency spread the news that Netaji died as a result of the plane accident and that the cue was taken up and flashed about in streamer headlines the world over.*

এই বক্তব্য থেকে জানা যায় নেতাজীর তৃতীয় পর্যায়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৭ই আগস্ট তারিখে। জাপানের কিয়ুস্যু দ্বীপের ফুকুওকাতে যাবে বলে প্রচারিত এক বিমানে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মতেই নেতাজী যাত্রা শুরু করেন। তাইহোকু বিমান বন্দর থেকে যাত্রা করে বিমানটি ধীরে ধীরে আকাশে উঠে দিগন্তে মিলিয়ে যায়। পরমুহূর্তেই আকাশে এক বিমানের শব্দ শোনা যায় এবং একটি বিমান জ্বলন্ত অবস্থায় ঝড়ের বেগে মাটিতে নেমে আসে। ঐ বিমানের ধ্বংসস্তূপ থেকে বেশ কয়েকটি অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তিকে লেঃ জেনারেল ইটাগাকী বলে সনাক্ত করাও হয়। কিন্তু নেতাজীর কথা আর শোনা যায় না, তাঁর কোন খোঁজও পাওয়া যায় না। মহান্ নেতা যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে যান, মানুষের বুদ্ধিমত্তার সীমা সেই পর্যন্ত পৌঁছায় না। ইতিমধ্যে ডোমি নিউজ এজেন্সি প্রচার করে দেয় যে নেতাজী এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। এই খবরের ভিত্তিতেই সারা বিশ্বের কাগজে বড় শিরোনামায় দুর্ঘটনার খবর প্রকাশিত হয়। আজাদ হিন্দ্ সরকারের মন্ত্রী শ্রীসরকারএর এই বক্তব্যকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়, কারণ একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হয়ে কোন তথ্য প্রমাণের ওপর নির্ভর না করে তিনি অবশ্যই এই বক্তব্য রাখেন নি। তাইহোকুর বিমান বন্দরের

* Ibid

ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা মরদেহের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে জনৈক সামরিক অফিসারএর নাম উল্লেখ করে তিনি প্রমাণ রেখেছেন যে তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তাৎপর্যময় তথ্য রয়েছে। শ্রীসরকারএর বক্তব্যের মধ্যে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে। তাহ'ল, জাপ সরকারএর প্রতিনিধিদের সঙ্গে নেতাজীর গোপন বৈঠক এবং সাউদার্ন আর্মির ফিল্ড মার্শাল তিরাউচির সঙ্গে তাঁর সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ আলোচনা। নেতাজী সাইগন থেকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করেই যাত্রা করেছিলেন এবং ঐ রহস্যময় দুর্ঘটনা পরিকল্পনার অংশ বিশেষ। শ্রী সরকার তাঁর প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন যে—Along with the thousands of the I. N. A and millions of our country men, I am inevitably of opinion that Netaji is living in a very real sense and doing his best for the full-fledged independence of India as a whole on a purely national basis.* হাজার হাজার আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ফৌজী ভাই এবং কোটি কোটি দেশবাসীর মত শ্রীসরকারও সুনিশ্চিত যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র সশরীরে অবস্থান করছেন এবং জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছেন। শ্রীসরকার শুধু এই মন্তব্য করেই তাঁর লেখনী বন্ধ করেন নি। তিনি আগামী দিনের সম্ভাবনার কথাও বলেছেন :—
"History shows that the Miracle Man that Netaji is, can vanish into thin air when needed and can emerge in flesh and blood when so demanded by the exigencies of the situation······the man of Destiny will appear when the Stage is set and Zero hour strikes !"† অর্থাৎ ইতিহাস বলে যে নেতাজীর মত অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি প্রয়োজনে বায়ুমণ্ডলে মিলিয়ে যেতে

---

* Ibid † Ibid

পারেন প্রয়োজনে আবার আবির্ভূত হতে পারেন। চরম সময় সমাগত হলে ভারতের ভাগ্যবিধাতা আবার আবির্ভূত হবেন।

নেতাজী যে জীবিত আছেন, তারই সমর্থনে আরও একজন তাঁর সুনির্দিষ্ট অভিমত রেখেছেন। এঁর নাম ডঃ এ. সি. সেন। ইনি পাটনার এগ্রিকাল্‌চারাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট এর অবসরপ্রাপ্ত ডাইরেক্টর। তিনি মন্তব্য করেন :*

That Netaji was not involved in the so called aircrash is a naked truth well known not only to the British Intelligence Service but also to many Indians, and I presume, to many V.I.Ps of Delhi too

The reasons for the former's silence may be ascribed to the oath of secrecy taken by them and for the later to the fear of losing their party-power and personal importance.

I repeat here my information which I had submitted long ago to the Shah Nawaz Committee. I do not know what the committee thought of that. I collected my information while I was in war service in the technical personnel of the then Emergency King's Commission, which enabled me to have many friends among English and Indian Army Officers. The information thus received is brefly stated below —

(i) A few weeks after the reported death news my colleague, an English Captain, told me that the aircrash was a framedup thing, spread to safe guard the movements of Netaji.

(ii) A couple of months later, an Indian captain (from South India) told me that his uncle, who was

---

Hindusthan Standard—17. 5. 65.

a senior C.I.D. officer in Madras Province, was sent to join a search party of British Intelligence and Scotland Yard men to trace the movements of Netaji in South East China. This party returned after six months without much success.

(iii) After I was "demobbed" and was on tour in my civil appoinment, I met by chance a Punjabi Lieutenant at a big railway junction. He was returning home from Chungkiang in February, 1947. This young officer had been on a short training course under me at my (Army) H. Q. He told me over a cup of tea that he was attached to a British Army party in charge of ration, and the order to the party was to shoot Netaji "at sight."

One midnight, his sepoys brought the news that Netaji was camping with a party about 400 yds. away and was in dire need of food. He with another man of his camp cautiously went with some bread and tinned food and gave it personally to Netaji, got his blessing and hurriedly returned to his camp without telling a word about it to others. This happened in November, 1946.

(iv) The English Captain referred to in (i) above told me at Cambridge, England, in 1950, in course of our talks, that his information was that Netaji was captured by the Russians, and that the British could not get him though every efforts was made to do so. My friends could not say what happened to Netaji after that.

অর্থাৎ, তথাকথিত ঐ বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী যে জড়িত ছিলেন না তা প্রকৃত সত্য। এই সত্য শুধুমাত্র বৃটিশ গোয়েন্দাবাহিনীরই

মোরীর ক্ষেত্রে অবশ্য একটি অজুহাত দেখানোর সুযোগ রয়েছে যে তদন্ত কমিটির বিচার্য বিষয়ের এক্তিয়ারের মধ্যে ঐ বিষয় ছিল না কিন্তু ডঃ সেনএর ক্ষেত্রে কোন অজুহাতই খাটে না। ডঃ সেন যে সব সামরিক অফিসারদের সম্বন্ধে লিখেছেন তাঁরা সকলেই তাঁর পরিচিত, সুতরাং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে এবং তাঁরই পরিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত করা হলে অনেক অজানা রহস্যই উদ্ঘাটিত হ'ত।

নেতাজী রহস্যের অনেক ইঙ্গিতই অবশ্য বিভিন্ন সময়ে পাওয়া গেছে। মাননীয় মিঃ ডি. ভ্যালেরা এসেছিলেন ভারতবর্ষে। ফরোয়ার্ড ব্লকএর জনৈক নেতা তাঁকে নেতাজী সম্পর্কে কিছু বলতে বললেন। মিঃ ভ্যালেরা উত্তরে বললেন—"I expected to meet him in India"। আর নেতাজীর ঐ সময়ে গোপনে ভারতে অবস্থিতি যে আদৌ অলীক নয় তা প্রমাণ করা কঠিন নয়। তবে এই প্রসঙ্গে ভিন্নাকারে প্রকাশ করা হবে।

১৯৫৯ সালের শেষের দিকে পাকিস্তানে লাহোর থেকে প্রকাশিত সিভিল এবং মিলিটারী গেজেট-এ কর্নেল হবিব-উর রহমানএর এক বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি বলেন যে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে এতদিন ধরে তিনি যা বলে এসেছেন তা ঠিক নয়। তিনি গর্বভরে দাবী করেন যে তিনি একজন সৈনিক। সৈনিককে কম্যাণ্ডার এর নির্দেশ মেনে চলতে হয়। তাঁকে যেভাবে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তিনি সেই ভাবেই কাজ করেছেন। আলোচ্য ঘটনাকে সত্য বলে চালানোর জন্য তাঁকে যে ঝুঁকি নিতে হয়েছে, যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে এবং ঘটনার ইতিবৃত্ত জেনেও তাঁকে রূঢ় বাস্তবের রঙ্গমঞ্চে যে ধরণের সাবলীল অভিনয় সুদীর্ঘ সময় ধরে করতে হয়েছে তার তুলনা হয় না। তাইহোকুর বিচিত্র রঙ্গমঞ্চের অভিনয় শেষ করে টোকিও পৌঁছানোর পরও যে তাঁকে আবার অভিনয়ের জন্য তৎপর থাকতে হয়েছিল তা সত্য। সেই তারিখটা ছিল ২৩শে সেপ্টেম্বর। কর্নেল হবিব-উর রহমান টোকিও ক্যাডেট্দের এক সমাবেশে ভাষণ

দিচ্ছিলেন। ঐ সমাবেশে ক্যাডেট্‌দের বলা হয়েছিল যে তাঁদের উদ্বেগের কোন কারণ নেই।* কর্নেল রহমানের এই সান্ত্বনা যদিও পরিহাসের মতই মনে হয়, কিন্তু আসলে প্রচারিত ঘটনা সম্পর্কে এই বক্তব্য খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস দুর্ঘটনায় মৃত বলে প্রচারিত, কিন্তু টোকিও ক্যাডেটদের তাতে চিন্তার কোন কারণ নেই, এই দুই বক্তব্যের অর্থ এক নয়। ঐ সমাবেশেই জনৈক মিলিটারী পুলিস অফিসার এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি নাকি কর্নেল রহমানকে তাঁর সদর দপ্তরে নিয়ে যেতেই এসেছিলেন। কিন্তু যখন সমাবেশ শেষ হয়ে গিয়েছিল তখন আগন্তুক মিলিটারী পুলিস অফিসার কর্নেল হবিব-উর রহমানকে নিয়ে তাঁর সদর দপ্তরে যান নি, গিয়েছিলেন শ্রীরামমূর্তির বাড়ীতে রাত্রের ডিনার খেতে। ঐ ভোজসভায় খুবই তৃপ্তিসহকারে সমবেত সকলে রাত্রের ডিনার খেয়েছিলেন। ডিনার পর্ব শেষ করে কর্নেল হবিব-উর রহমানকে সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়ার সময় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই চোখের জলও ফেলেছিলেন। কিন্তু কর্নেল রহমানকে ঐ মুহূর্তে খুবই স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা গিয়েছিল।†

কর্নেল হবিব-উর রহমান এর জন্য সবাই যখন ভেঙ্গে পড়েছিলেন তখন, তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক থাকাটা অস্বাভাবিক এবং জাপানী মিলিটারী পুলিশের পক্ষে কর্নেল রহমানকে আটক করে সদর দপ্তরে নিয়ে যেতে এসে রাত্রের ভোজ খেয়ে ফিরে যাওয়াটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

* The boys had all gathered in a small room, sitting cross legged and listening to Habib who told them that they had nothing to worry—Unto him Witness-P-117

† —and fed the Japanese officer who forgot the cares and anxities of defeated Japan for the time being. He then drove off with Habib after touching farewell... Habib looked unconcerned and tried to cheer us up.

—Ibid-P-118

এমন বিচিত্র ঘটনা আরও অনেক পর্যায়েই ঘটেছে। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল কর্নেল হবিব-উর রহমানএর কোন এক গোপন স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা। ১৯৪৫ সালের ১৮ই নভেম্বর মারকিন দপ্তর থেকে জনৈক প্রতিনিধি এসে শ্রীআয়ারকে জানিয়ে গিয়েছিলেন যে পরদিন ভোরে তাঁকে ও কর্নেল রহমানকে দিল্লী নিয়ে যাওয়া হবে।

জাপানী পররাষ্ট্র দপ্তর মারফৎ শ্রীআয়ার এর কাছে আগেই খবর এসেছিল যে তাঁকে ভারতে নিয়ে যাওয়া হবে। এই সংবাদ কর্নেল হবিব-উর রহমানএর কাছেও অবশ্যই পৌছেছিল কারণ, তিনিই আলোচ্য ঘটনার প্রধান সাক্ষী। ১৯শে নভেম্বর তারিখে কর্নেল রহমানকেও দিল্লীতে নিয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু ১৮ই নভেম্বর তারিখে সকালে তিনি হঠাৎ টৌকিও থেকে প্রায় একশত মাইল দূরের কোন অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন। কর্নেল রহমান কোথায় ছিলেন তা শ্রী আয়ার এরও জানা ছিল না। দিল্লীতে ফিরে আসার ঠিক আগের দিন কর্নেল রহমান এর টৌকিও ত্যাগ করে হঠাৎ অন্যত্র গোপন কোন স্থানে চলে যাওয়াটা খুব সাধারণভাবে বা হালকাভাবে নিশ্চয়ই দেখা যায় না। শ্রীরামমূর্তি কর্নেল রহমানএর এই অজ্ঞাত যাত্রার কথা জানতেন বলেই বিশ্বাস হয়, কারণ তিনিই কর্নেল রহমানকে খুঁজে বার করে পরদিন খুব ভোরে টৌকিও ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন।* আলোচ্য ঘটনার সঙ্গে শ্রীরামমূর্তিও যে যথেষ্ট জড়িত তা সত্য এবং কর্নেল রহমানএর গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে তাঁর সম্যক জ্ঞান থাকাটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে শ্রীরামমূর্তি ঘটনার কাহিনী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল এবং কর্নেল রহমান টৌকিও ত্যাগ করে

---

* Habib had left that morning for a place some one hundred miles away···where he was at that moment, and, if he had reached the destination where he was putting up··· Ram Murti with him in his jeep and set out on the trail of Habib.—Ibid—P-122

ভারতে ফিরে যাওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে কি ব্যাপারে হঠাৎ টোকিও শহরের বাইরে গিয়েছিলেন, তাও তাঁর অজানা ছিল না।

প্রচারিত ঘটনার মধ্যে যে অনেক ইঙ্গিতই রয়েছে তা নেতাজী তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীশাহনওয়াজ খাঁন এর অজানা নয়। তাঁর তদন্তের রিপোর্টে তিনি কি বক্তব্য রেখেছেন এবং কোন তথ্য প্রমাণের ওপর নির্ভর করে তিনি কি মন্তব্য করেছেন সেই বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই রিপোর্ট ভারত সরকার এর কাছে পেশ করে দেওয়ার সুদীর্ঘ ছয় বছর পরে শ্রীশাহনওয়াজ খাঁন রাজধানীর রেলভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডাকেন। ঐ সম্মেলনে নেতাজী তদন্ত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করে সাংবাদিকগণ বলেন—Mr. Khan appeared unconvincing. সাংবাদিকদের বিশ্বাস উৎপাদন করার মত তথ্য তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান পেশ করতে পারেন নি। ঐ সম্মেলনে শ্রীখাঁন আরও জানিয়েছেন যে মারকিন ও বৃটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের সম্পূর্ণ রিপোর্ট তিনি পান নি। তাঁর এই বক্তব্য তদন্ত রিপোর্টে দেওয়া মন্তব্যের বিরোধী। বিভিন্ন গোয়েন্দা দলের রিপোর্ট আলোচ্য দুর্ঘটনা সমর্থন করে বলেই তিনি জানিয়েছিলেন। যদি সম্পূর্ণ রিপোর্টই তিনি না দেখে থাকেন, তবে আংশিক রিপোর্টের ভিত্তিতে তিনি ঐ ধরণের বক্তব্য কি ভাবে রেখেছেন। সাংবাদিকেরা শ্রীখাঁনকে প্রশ্ন করেছিলেন যে পেট্রলের অমন ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, যা নেতাজীর মৃত্যু ঘটাতে সম্ভব হয়েছিল, তা কি হাত দিয়ে নিভিয়ে ফেলা সম্ভব? শ্রীখাঁন এই প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারেন নি।* এই জবাব যে তাঁর পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়, তা অনুমান করা যায়। শ্রীখাঁন সাংবাদিক সম্মেলনে যা বলেছিলেন, তদন্ত রিপোর্টে যদি তা লিখতেন তা'হলে কমিটির বক্তব্যকে আমরা খানিকটা সাধুবাদ দিতে পারতাম।

নেতাজী তদন্ত কমিটি অনুসন্ধান চালানোর পরে ঐ রহস্য সম্বন্ধে

---

* Hindusthan Standard—28. 2. 62.

বহু তথ্য জনগোচরে এসেছে। ঐ তথ্যগুলি সম্বন্ধে অবশ্য তদন্ত কমিটির করণীয় কিছুই নেই ; কিন্তু নেতাজী তদন্ত কমিটি গঠন করার আগে যে সব বক্তব্য জনগোচরে এসেছিল সেইগুলি সম্বন্ধে যথাযথ বিচার বিবেচনা করে দেখা তদন্ত কমিটির সদস্যদ্বয়ের অবশ্যই উচিত ছিল। একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৭৪ সালে কলকাতার মনুমেণ্ট ময়দানে কেন্দ্রীয় নেতাজী জন্মোৎসব কমিটির সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি মিঃ জে. জে. ওসাওয়া। মিঃ ওসাওয়া, 'টু গ্রেট ইণ্ডিয়ান ইন্ জাপান' নামক বিখ্যাত বইয়ের লেখকও। তিনি একজন প্যাসিফিষ্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁকে জাপানের জেলেও কিছুদিন কাটাতে হয়েছিল। শ্রীসুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ভারতীয় লোকসভার অনেক সদস্যের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় রয়েছে।

মিঃ ওসাওয়ার সঙ্গে একান্তে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ারএর ক্যাপ্টেন বিশ্বজিত দত্তর। মিঃ ওসাওয়া তখন শ্রীবিশ্বজিত দত্তর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ডঃ হাতার। ডঃ হাতা টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ডকটরেট। টোকিও থেকে কলকাতায় এসে তিনি মহাবোধি সোসাইটি হলে অবস্থান করেছিলেন। ডঃ হাতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর শ্রীদত্ত তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে তিনি কি উদ্দেশ্যে সুদূর টোকিও থেকে ভারতে এসেছেন। উত্তরে ডঃ হাতা বলেছিলেন যে নেতাজীর চিতাভস্মের ব্যাপার নিয়ে তিনি ভারত এসেছেন। টোকিওর যে মন্দিরে নেতাজীর ভস্মাবশেষ রাখা আছে, সেই রেনকোজি মন্দিরের পুরোহিত তাঁকে ভারতে পাঠিয়েছেন নেতাজীর চিতাভস্মের একটা গতি করার জন্য। ডঃ হাতার বক্তব্য শুনে শ্রীদত্ত সম্ভবত সেই মুহূর্তে একটু কৌতুকই অনুভব করেছিলেন। কারণ রেনকোজি মন্দিরে রাখা ভস্মের জন্য জাপ সরকার-এর তরফ থেকে কোন প্রতিনিধি প্রেরিত হয় নি, হয়েছে

মন্দিরের পুরোহিতের তরফ থেকে। ডঃ হাতা আরও জানিয়েছিলেন যে মন্দিরের পুরোহিত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। নেতাজীর ভস্মাবশেষ বলে যে চিতাভস্ম ঐ মন্দিরে রাখা আছে তা তিনি যথাযথ সম্মানের সঙ্গেই রেখেছেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরও ঐ ভস্ম যথাযথ সম্মানের সঙ্গে রাখা সম্ভব হবে কিনা তা ভেবেই ঐ বয়স্ক পুরোহিত শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তাই রেনকোজি মন্দিরের পুরোহিতের ঐকান্তিক ইচ্ছা যে ঐ চিতাভস্ম তিনি মৃত্যুর আগে ভারতের জনগণের হাতে বা ভারত সরকার এর হাতে তুলে দিয়ে যান। তাঁর ইচ্ছাপূরণের সুযোগ করার জন্যই তিনি ডঃ হাতাকে সুদূর টোকিও থেকে ভারতে পাঠিয়েছেন। কিন্তু ডঃ হাতার সঙ্গে ভারতের বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের পরিচয় নেই। শ্রীদত্ত খুবই ধৈর্যসহকারে ডঃ হাতার বক্তব্য শুনেছিলেন। স্বভাবতই তাঁর মনের কোণে তখন অনেক প্রশ্নই জেগেছিল। ডঃ হাতার কাছে তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে ঐ ভস্মাবশেষ কিভাবে রেনকোজি মন্দিরে এসেছিল। উত্তরে ডঃ হাতা জানিয়েছিলেন যে ঐ চিতাভস্ম নিয়ে দু'জন অপরিচিত ভারতীয় ঐ মন্দিরে এসেছিলেন। জাপান তখন মিত্রশক্তির করতলগত। কেউই চিতাভস্ম রাখার দায়িত্ব নিতে চাইছিলেন না। কিন্তু রেনকোজি মন্দিরের পুরোহিত সব জেনেও বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। ঐ দু'জন অপরিচিত আগন্তুককে তিনি বলেছিলেন, "যে কোন পরিণতির জন্য আমি প্রস্তুত। ঐ ভস্ম এখানেই রাখুন। যথাযথ সম্মানের সঙ্গেই ঐ ভস্ম আমি সংরক্ষণ করব।" আগন্তুকদ্বয় চিতাভস্ম পুরোহিতের হেফাজতে রেখে চলে গিয়েছিলেন। শ্রীদত্ত তখন প্রশ্ন করেছিলেন, "ঐ চিতাভস্ম যে নেতাজীরই ভস্মাবশেষ তা আপনারা কি ভাবে জানতে পেরেছিলেন?" ডঃ হাতা উত্তর দিয়েছিলেন, "ঐ বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না।" শ্রীদত্ত আবার প্রশ্ন করেছিলেন, "ঐ ভস্ম, কোন জীবজন্তুর বা অন্য কারও তো হতে পারে?" উত্তরে ডঃ হাতা বলেছিলেন, "তাও হতে পারে। আমরা এই সম্বন্ধে কিছু

জানি না।" শ্রীদত্ত বুঝেছিলেন যে, যে মন্দিরের কর্তৃপক্ষ চিতাভস্ম সম্বন্ধে কোন আলোকপাতই করতে পারেন না, তাঁদের প্রতিনিধিকে প্রশ্নবানে জর্জ্জরিত করা বৃথা। কিন্তু ডঃ হাতা যে উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতের মাটিতে পা দিয়েছিলেন অর্থাৎ যথাযোগ্য কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করাটাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য, তাই শ্রীদত্ত ডঃ হাতাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর কম্যাণ্ডার মেজর সত্যভূষণ গুপ্তর কাছে। মেজর গুপ্ত, ডঃ হাতার মুখে তাঁর বিবরণ শুনে হেসে বলেছিলেন, "ওঁদের কাছে পাঠাও না।" মেজর গুপ্তর একান্ত অনুগত অনুচর শ্রীবিশ্বজিত দত্ত বুঝেছিলেন তাঁর ইঙ্গিত। লেখা হয়েছিল একখানি পরিচিত পত্র জেনারেল ভোঁসলেকে উদ্দেশ করে। ডঃ হাতা পরিচয় পত্রখানি নিয়ে মেজর গুপ্তকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে চলে গিয়েছিলেন রাজধানীতে। কিন্তু তারপর কি ঘটেছিল তা আর জানা যায় নি। রাজধানীর প্রশস্ত রাজপথ পেরিয়ে পাহাড় থেকে সযত্নে কেটে এনে বসানো পাথরের সিঁড়িগুলি বেয়ে ডঃ হাতা কত ওপরে উঠেছিলেন তার হদিস পাওয়া যায় নি।

ঐ চিতাভস্ম যে কোন জীবজন্তুর ভস্ম হতে পারে, কিন্তু কোন মানবদেহের ভস্মাবশেষ যে নয় মার্কিন বিশেষজ্ঞগণ তা পরীক্ষা করে দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছেন।* এই প্রসঙ্গে একটু ইতিহাসও জানা যায়, তাহ'ল মারকিন সরকার এর তরফ থেকে উচ্চপদাধিকারী একজন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে কয়েকজন রাসায়ণবিদ্‌কে টোকিও পাঠানো হয়েছিল। তাঁরা ঐ ভস্ম পরীক্ষা করে সুনির্দিষ্ট মতামত দেন যে ঐ ভস্মাবশেষ কোন মানবদেহের নয়। তারপর মারকিন দেশের হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি গবেষণা বৃত্তি দেওয়া হয়। ঐ গবেষণা কার্যে রত মিঃ লেন গর্ডন ভারতে এসেছিলেন, তাঁর গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে এবং তাঁর পরেই এসেছিলেন দ্বিতীয় গবেষক

---

* যুগান্তর পত্রিকা—১৫।৪।৬২

শ্রীরঞ্জন বড়ুয়া। এঁদের কাহিনী নিয়ে এই পর্যায়ে বিশদ আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক তাই পর পর্বে যথোপযুক্ত স্থানে এঁদের বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা যাবে।

১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট যে ঘটনা ঘটেছিল বলে জাপ সরকার জানিয়েছেন, তা জাপ সরকার এর মারফৎ ডোমিনিউজ এজেন্সির কাছে গেলেও, খবরের খসড়া করে দিয়েছিলেন আজাদ হিন্দ্ সরকার এর প্রচার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং রেনকোজি মন্দিরে যে ভস্ম জমা রাখা হয়েছে তা গ্রহণ করেছিলেন তিনিই ; ঐ ভস্মাধারে নেতাজীর নামও লিখেছিলেন তিনি, এবং মন্দিরে রেখে দিয়েও এসেছিলেন তিনিই। নেতাজী সম্পর্কে তদন্তের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন ভারত সরকার। নেতাজী যে মৃত সেই সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন ভারতের নেতাজী তদন্ত কমিটি। কিন্তু তারপরও ঘটেছে অনেক ঘটনা। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ৺পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁর লেখা এক চিঠিতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসএর অগ্রজ শ্রীসুরেশ চন্দ্র বসুকে জানিয়েছিলেন যে তাঁর কাছে নেতাজীর মৃত্যুর কোন প্রত্যক্ষ যথেষ্ট ও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই।* এই বক্তব্যের অর্থ দাঁড়ায় যে নেতাজী তদন্ত কমিটি যে তথ্য প্রমাণ পেশ করেছেন তা পরোক্ষ, অনির্দিষ্ট ও যথেষ্ট নয়। এই ধরণের প্রমাণের ভিত্তিতে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে অবশ্যই পৌছানো উচিত নয়, কিন্তু তদন্ত কমিটি ঔচিত্যবোধ বিসর্জন দিয়ে অনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট মতামত পেশ করেছেন। তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বহু ব্যক্তির কাজের উচ্চপ্রশংসা করা হয়েছে এবং ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন অনেকেই! কিন্তু যাঁর জন্য নেতাজী তদন্ত কমিটির রিপোর্টে এমন বৈচিত্র প্রকাশ পেয়েছে তাঁকেই ধন্যবাদ দেওয়া হয় নি। তিনি হলেন তদন্ত কমিটির সদস্য শ্রীএস্. এন্. মৈত্র। তিনি যদি এই রিপোর্ট না লিখতেন তাহলে হয়তো তাইহোকুর রহস্যের বিস্তারে এত অসঙ্গতি ধরা পড়ত না। তদন্ত

* Letter on 704···P 101/62 dt. 13. 5. 62

কমিটির তরফ থেকে লিখিত ধন্যবাদ তিনি না পেলেও, তাঁর রিপোর্টের পাঠকবর্গ অবশ্যই তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন।

যে সকল তথ্য প্রমাণ বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে পাওয়া যায়, তা থেকে সুনির্দিষ্টভাবেই প্রমাণ হয় যে প্রচারিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয় নি, ওটা সম্পূর্ণ সুপরিকল্পিত সাজানো ঘটনার রটনা। এই ব্যাপারে জাপ সরকার এর পূর্ণ সহযোগিতা না থাকলে তাইহোকুর রঙ্গমঞ্চে এমন বর্ণাঢ্য নাটক উপস্থাপিত করা সম্ভব হত না। সুতরাং একটি বিষয় বিচার বিবেচনা করে দেখা অবশ্যই প্রয়োজন, তাহ'ল, জাপান সরকার এমন গুরুদায়িত্বভার নিলেন কেন? নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস ভারতের নেতা। অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সৃষ্টি হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য। জাপান যতদিন স্বাধীন ছিলেন ততদিন সর্বতোভাবে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন। আত্মসমর্পণ করার পর নেতাজীকে সাহায্য করা যথেষ্ট ঝুঁকির ব্যাপার, কারণ নেতাজী সুভাষচন্দ্র মিত্রশক্তির প্রধান শিকার কিন্তু তবুও জাপ সরকার নেতাজীকে সাহায্য করেছেন। জাপ সরকারএর তরফ থেকে মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করার পরও, নেতাজীকে সাহায্য করার কারণ খুঁজে না পাওয়া গেলে, প্রচারিত কাহিনীর দায়িত্ব নেওয়ার যৌক্তিকতা প্রমাণ হয় না।

জাপ সরকার এর এই দায়িত্ব নেওয়ার কারণ খুঁজে পেতে গেলে ইতিহাসের পুরানো পাতা খুলে ফিরে যেতে হবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন জাপানে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকেই পরলোকগত বিপ্লবীনেতা রাসবিহারী বসু ভারতের স্বাধীনতার জন্য এক অভিনব আন্দোলনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য তিনি ধীরে ধীরে যথাযথ মহলের সঙ্গে যোগাযোগ করতেও শুরু করে-ছিলেন। জাপানের ব্ল্যাক ড্রাগন সংস্থার কর্ণধার পরলোকগত মিৎসুরু টোমায়া, বিপ্লবী রাসবিহারীর স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিকল্পনা ধৈর্যভরে

শুনেছিলেন। ঐ পরিকল্পনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার বিবেচনা করে দেখার পর পরলোকগত টোমায়া শুধু তা সমর্থন করেই ক্ষান্ত হন নি, বিপ্লবী রাসবিহারীর প্রস্তাবিত আন্দোলনে প্রয়োজনীয় যথাযথ সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়েছিলেন। জাপানের মাটিতে জন্ম নিয়েছিল ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ। ভারতের বাইরে যেসব বিপ্লবী আত্মগোপন করে ছিলেন তাঁরা একে একে গিয়ে সমবেত হয়েছিলেন ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের পতাকাতলে। সুসংগঠিত লীগ ধীরে ধীরে ভারতের বাইরে অবস্থানকারী ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করে চলেছিল। বিশ্ব রাজনীতির জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে তাল রেখে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ এর নেতৃবৃন্দ অপেক্ষা করছিলেন উপযুক্ত সময়ের জন্য। সুদীর্ঘ সময় প্রতীক্ষা করার পর শেষ পর্যন্ত উপযুক্ত সময় এ'ল। শুরু হ'ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জাপান সরকার বৃটিশ ও মারকিন সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। পরলোকগত রাসবিহারী বসু, যথাসময়ে জাপ সরকারের কাছে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের জন্য সাহায্য চাইলেন। বিপ্লবী বসুর প্রস্তাব জাপ সরকারী কর্তৃপক্ষ বিচার বিবেচনা করে দেখতে লাগলেন। ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুর এর পতন হ'ল। ১৬ই ফেব্রুয়ারি জাপ সরকার ভারত সম্বন্ধে তাঁদের সুনির্দিষ্ট নীতি ব্যক্ত করলেন। জাপানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ তোজো ঘোষণা করলেন—

It is a golden opportunity for India having, as it does, several thousand years of history and splendid cultural tradition, to rid herself of the ruthless despotism of British and to participate in the construction of the Greater East Asia co-prosperity sphere. Japan expects that India will restore its proper status as India for the Indians and it will not stint herself in extending assistance to the patriotic efforts of the Indians. Should India fail to awaken

to her Mission forgetting her history and tradition, and continue as before to be beguiled by the British cajolery and manipulation and act at their beck and call, I cannot but fear that an opportunity for the renaissance of the Indian people would be forever lost.

জাপানের জন প্রতিনিধি সভায় জাপ প্রধানমন্ত্রী মিঃ তোজো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করলেন যে হাজার বছরের দীপ্তিমান ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারিণী ভারতের কাছে, বৃটেনের নির্মম স্বেচ্ছাচারী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া সহ-সমৃদ্ধি মণ্ডল গড়ে তোলার কাজে যোগ দেওয়ার এই এক স্বর্ণ সুযোগ এসেছে। জাপান আশা করেন যে ভারত তাঁর যথাযথ মর্যাদা ফিরে পাবেন, যেমন ভারত শুধু ভারতীয়ের জন্যই এবং তার জন্য ভারতীয়দের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সাহায্য করতে জাপান কার্পণ্য করবেন না। ভারত যদি তাঁর ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ভুলে গিয়ে অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য জাগ্রত হয়ে উঠতে ব্যর্থ হয় এবং পূর্বেকার মতই বৃটিশের তোষামোদ ও ছলকলায় প্রবঞ্চিত হয়ে তাঁদের নির্দেশ মতই চলতে থাকেন, তাহ'লে মিঃ তোজো শঙ্কিত না হয়ে পারেন না যে ভারতের জনগণের পুনরুজ্জীবনের এক সুযোগ চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাবে। জাপ প্রধামন্ত্রীর এই ঘোষণা স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের কাছে দুর্বোধ্য রইল না। পরলোকগত রাসবিহারী বসু প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে এলেন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আগে থেকে নেওয়া ছিল। কারণ বিপ্লবী নেতা সম্যকরূপেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে সর্বাত্মক সংগ্রাম করার সুযোগ ঘনিয়ে আসছে। জাপ পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে তিনি পূর্ণোদ্যমে প্রস্তুত হতে লাগলেন রাজশক্তির বিরূদ্ধে আঘাত হানার জন্য। শুরু হল সৈন্য তৈরী ও সৈন্য সংগ্রহ করার কাজ। এক ঐতিহাসিক লগ্নে জাপ সরকারী প্রতিনিধি ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স

লীগের কাছে বৃটিশ ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের হস্তান্তর করলেন। আজাদ হিন্দ্ সরকারএর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সকলেরই জানা। কিন্তু যে ইতিহাস নিয়ে সারা বিশ্বের রাজনীতিতে আলোড়ন দেখা দিয়েছিল তাহল ১৯৪৩ সালের ৫ই ও ৬ই নভেম্বরএর টোকিও সম্মেলনের কাহিনী। ঐ সম্মেলনে ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী ডঃ বা ম সরাসরি ঘোষণা করেছিলেন যে সম্মেলনে যোগদানকারী সব দেশই আজাদ হিন্দ্ সরকারকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে স্বাধীন ভারতবর্ষ সৃষ্টি না হলে স্বাধীন এশিয়ার জন্ম হতে পারে না। এই মন্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দেখিয়ে তিনি বলেছিলেন :

It is with Indian manpower, Indian resources and Indian wealth, Great Britian built her great, her vast predatory empire. I am speaking from my personal experience that my own country collapsed before the British, because the British, according to their traditional policy never fought themselves. They fought and won Burma with Indians just as they fought every war with every other persons except themselves. This war they will fight to the last Russian, they will fight to the last Indian, they will fiight to the last American. But Britain according to her traditional policy, will never use her own self and resources. She conquered Burma with Indian manpower and Indian wealth. That is why she persued the same policy downward to the right and from India upward to the left across Asia. It was Indian wealth that maintainad British power, and it was Indian manpower that gave Britain the instrument of a colonial policy. That is why you will understand me when I say that if we wish to destroy that

predatory empire, if we wish to destroy Anti-Asiatic Powers, we must burn them out and drive them out of that their Asiatic stronghold and that stronghold is India. The British Empire cannot be goaded until and unless British power, British domination of India is destroyed.

আজাদ হিন্দ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার নিগূঢ় কারণ স্পষ্ট হ'ল, ডঃ বা মর ঘোষণা থেকে। বৃটিশরাজ যে বিশাল সাম্রাজ্য ভোগ করে চলেছেন, তার সৃটি হয়েছে ভারতের জনবল ও ভারতের সম্পদের দ্বারা। বৃটিশ শক্তির এশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যূহ হ'ল ভারতবর্ষ। ভারতে বৃটিশ রাজের প্রভুত্ব ও শক্তি ধ্বংস করতে না পারলে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে কোনভাবেই উৎখাত করা যাবে না। তাই এশিয়ার সব কয়টি দেশ আজাদ হিন্দ সরকারকে সাহায্য করতে বদ্ধপরিকর, কারণ যদি ঐ সরকার তাঁদের সংগ্রামে সাফল্যলাভ করেন তাহ'লে বৃটিশ রাজ শুধু মাত্র ভারতবর্ষ থেকেই বিতাড়িত হবে না, এশিয়ার মাটি থেকে তাঁদের চিরতরে বিদায় নিতে হবে। আজাদ হিন্দ সরকারের সশস্ত্র সংগ্রামের নেতৃত্বের গুরুভার যিনি নিয়েছিলেন তাঁর সুচিন্তিত সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ সম্বন্ধে এশিয়ার অন্য কোন দেশের কোন নেতারই কোন সন্দেহ ছিল না। এশিয়ার নেতৃবৃন্দের কাছে তিনি শুধু ভারতেরই নেতা নন, এশিয়ারও এক মহান্ নেতা এবং ভারতীয়ের দৃষ্টিতে তিনি নেতার নেতা, নেতাজী। ঐ সম্মেলনে জাপ সরকার নেতাজীকে জাপানের সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছিলেন। টোকিওর ঐতিহাসিক সম্মেলনে পূর্ব এশিয়ার নেতৃকুল বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া গঠনের প্রস্তাব নিয়েছিলেন। বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া মণ্ডল সৃষ্টি করার জন্য সম্মেলনে পাঁচটি নীতিও মেনে নেওয়া হয়েছিল। সহযোগী দেশগুলি শুধু পারস্পরিক প্রীতি, সমৃদ্ধি ও প্রগতির কথাই ভাববেন না, বিশ্বের শান্তিকামী সব দেশগুলির সঙ্গে সৌহার্দ গড়ে তুলে বিশ্বমানবতার প্রগতির দিকেও নজর দেবেন। কিন্তু নেতাজীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল

একটু ভিন্ন সুর। সেই সুরে এশিয়াবাসী চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। নেতাজী স্বপ্ন দেখেছিলেন সমগ্র এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিকে এক মৈত্রীবন্ধনে বেঁধে ফেলার। এশিয়ার মানুষ এক হবে। এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি যদি এক হয়ে যায়, তাহ'লে বিশ্বের মানুষ হিংসা বিদ্বেষ ভুলে বিশ্বমানবতার শান্তি পতাকাতলে এসে দাঁড়াতে বেশী সময় নেবেন না। নেতাজীর নেতৃত্বে এগিয়ে চলা আজাদ হিন্দ্ ফৌজ, তাঁদের শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য অঙ্গীকার বদ্ধ। সংগ্রামী সৈনিকদের যথাযথ সাহায্য করলে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অবশ্যই আসবে। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হয় তাহ'লে বৃটিশরাজ তাঁদের করতলগত অন্যদেশগুলিকেও স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, তার নিদর্শন পাওয়া গেছে ১৯৪৭ সালের পর। ভারতীয়দের হাতে ভারতের শাসনভার তুলে দেওয়ার পর বৃটিশরাজ একে একে তাঁর করতলগত আফ্রিকা ও এশিয়ার অন্য দেশগুলির শাসনভারও দেশীয় কর্তৃপক্ষের ওপরই ন্যস্ত করতে বাধ্য হয়েছেন। ভারত স্বাধীন হলে এশিয়া স্বাধীন হবে এই উপলব্ধিই এশিয়ার জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, নেতাজীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য। জাপ সরকারএর মন্ত্রীসভার পরিবর্তন এসেছিল। মিঃ তোজোর আসনে আসীন হয়েছিলেন মিঃ কাইসো। এই সরকারী পরিবর্তনে আজাদ হিন্দ সরকারএর প্রতি জাপ সরকারএর নীতির কোন পরিবর্তন হয় নি। নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে সর্বতোভাবে সাহায্য করাটা জাপানের স্বার্থেই প্রয়োজন ছিল। কারণ ভারত থেকে ইংরাজ বিতাড়নের সংগ্রামে তিনিই সর্বাধিনায়ক। স্বদেশের স্বার্থে ও এশিয়ার স্বার্থে নেতাজীকে সাহায্য করা জাপানের একান্ত প্রয়োজন। তাই জাপানের কাইসো সরকারও নেতাজীকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে লাগলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ বীর বিক্রমে নির্ভুল পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন ভারত সীমান্তের দিকে। ভারতের অভ্যন্তরে যথাযথ ব্যক্তি বিশেষের কাছে নেতাজীর প্রয়োজনীয় নির্দেশ এসে

পৌঁছাল। নেতাজীর সুনির্দিষ্ট নির্দেশ পেয়ে ভারতে অবস্থান রত নেতাজীর নির্বাচিত ব্যক্তিরা নির্দেশ মত প্রস্তুত হতে থাকলেন। সব দিক বিচার বিবেচনা করে মিত্রশক্তি নূতন রণকৌশল নিলেন। বুদ্ধি ও শক্তির লড়াইয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি ক্রমে জটিল রূপ নিল। ভবিষ্যৎ চিরদিনই অনিশ্চিত। একদিন জাপানের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগ ঘনিয়ে এ'ল। জাপানের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হ'ল। জাপান আত্মসমর্পণ করলেন। কিন্তু, পৃথিবীর বুকে মাথা উচু করে স্বাধীন জাতি হিসাবে বেঁচে থাকতে কে না চায়? একটি স্বাধীন জাতি তাঁর স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে গিয়ে যে কি ব্যথায় ভেঙ্গে পড়েন তা উপলব্ধি করতে পারেন শুধু ভুক্তভোগীরাই। পরাধীনতার দাসখত লিখে দেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে জাপসরকার অবশ্যই একবার পূর্বাপর বিচার বিবেচর করে দেখেছিলেন। জাপানের আত্মসমর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই যে আজাদ হিন্দ সরকারএর সংগ্রামের সাময়িক যবনিকাপাত ঘট্‌বে তা উপলব্ধি করতে জাপ কর্তৃপক্ষের অবশ্যই কোন অসুবিধা হয় নি। এশিয়ার মাটি আবার কবে যে দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবে, তাই বা কে বলতে পারে? কিন্তু, মাত্র একজন নেতাই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বীরদর্পে ঘোষণা করেছেন যে ভারতের স্বাধীনতা আর বেশী দূরে নয়। ভারত যদি স্বাধীন হয় তবে এশিয়ার অন্য পরাধীন দেশগুলিরও স্বাধীন হওয়ার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত থাকবে না। সুতরাং ঐ অবিসম্বাদিত নেতা, হিজ্ এক্সেলেন্সি চন্দ্র বোস যদি কোন উপায়ে জীবিত ও মুক্ত থাকতে পারেন তাহ'লে আবার কোন এক উপযুক্ত মুহূর্তে তিনি অবশ্যই প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন। চন্দ্র বোসএর প্রতি জাপানের প্রগাঢ় শ্রদ্ধার কথা সবারই জানা। মিত্ররাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়াটা ন্যায় নীতি বিরুদ্ধ বটে কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল দেশের স্বার্থ, জাতির স্বার্থ ও এশিয়ার স্বার্থ দেখা। ভারতের স্বাধীনতা সূর্য উদিত হলে তার রক্তিম আভায় এশিয়ার বুক থেকে পরাধীনতার অমানিশা ঘুঁচে যাবে। সুতরাং

হিজ্ এক্সেলেন্সিকে তাঁর ইচ্ছামত সবরকম সুযোগ সুবিধা করে দিতেই হবে। জাপান সরকার আত্মসমর্পণ করলেন, কিন্তু হিজ্ এক্সেলেন্সি চন্দ্র বোসএর জন্য সব ঝুঁকি নিতে তৎপর হলেন। নিজেদের ভবিষ্যৎ স্বার্থে, পরিকল্পিত পথেই রচিত হ'ল, তাইহোকুর রহস্যঘন নাটক, আর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের কথা ভেবে জাপ সরকার তাইহোকু রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যাবলী ও চরিত্রগুলিকে স্থাপন করলেন জনসমক্ষে। রাজনীতিক্ষেত্রে প্রয়োজনে সবই করণীয়—বাঁচা আর মরা একই জীবনের দুই প্রান্ত, বাঁচতে গেলে মরতে হবেই।

১৮

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসএর রহস্যজনক অন্তর্ধান নয়, বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু সম্বন্ধে বিশদ তদন্ত করে নেতাজী তদন্ত কমিটি যে রিপোর্ট সরকার এর কাছে দাখিল করেছিলেন, তা যথা সময়ে লোকসভায় পেশ করা হয়েছিল। লোকসভায় উপস্থিত সভ্যগণ সেদিন শুনেছিলেন যে তদন্ত রিপোর্টে যদিও বেশ কিছু নগণ্য (?) অসঙ্গতি বর্তমান তবুও তদন্ত কমিটির রিপোর্ট মতে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনাতেই প্রাণ হারিয়েছেন। নেতাজী রহস্য সম্বন্ধে তদন্ত করে যাঁরা তদন্ত রিপোর্ট লিখেছিলেন এবং যাঁরা ঐ রিপোর্ট গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের কাছে আলোচ্য রহস্য সম্বন্ধে অসঙ্গতি যে ধরা পড়েছিল তাতে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু একথাও সত্যি যে সামান্যতম অসঙ্গতিও বর্তমান থাকলে বিচারক সন্দেহের অবকাশে (benefit of doubt) আসামীকে রেহাই দিয়ে থাকেন। নেতাজী রহস্যের ক্ষেত্রে বহু অসঙ্গতি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুদণ্ড বহাল করা হয়েছে। মৃত্যুর সমর্থনে সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ না পেয়েও নেতাজীকে মৃত বলে ঘোষণা করা, সাধারণের কাছে সন্দেহজনক ও দুর্বোধ্য হয়েছে। এই রহস্যের ঘটা আরও ঘন হয়েছে যখন দেখা গেছে যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মুক্তি যোদ্ধাদের ভারতের কোন প্রয়োজনে কাজে লাগানো হয় নি। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সংগ্রামী যোদ্ধাদের প্রতি অভ্যর্থনার ঘটা দেখে স্বভাবতই মনে হয়, ভারতের জনগণের মর্যাদা কি? একটু ভাবতে গেলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে মিঃ লিওনার্ড মোজ্‌লের লেখা মাত্র একটি বাক্য—"Official documents dealing with the transfer of power in India will not be officially released untill 1999."*

* Last Days of British Raj—Leonard Mosley—Introduction.

ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তরের মূল দলিল ১৯৯৯ সালের আগে সরকারীভাবে প্রকাশ করা হবে না। অর্থাৎ ক্ষমতা হস্তান্তর করার ৫১ বছর পরে মূল দলিল জনগোচরে আনা হবে। এই যে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, এও তো একটি সর্ত বলেই মনে হয়। এমন সর্ত কি প্রয়োজনে মেনে নেওয়া হ'ল তাও ভারতের জনগণের জানার উপায় নেই।

এমন কেন হ'ল? ভারতের জনগণ কি চেয়েছিলেন? নেতাজীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল—'আমাদের পবিত্র মাতৃভূমিকে দ্বিধা বিভক্ত করা হইবে না।' ভারতের অন্যতম স্বাধীনতা যোদ্ধা সীমান্ত গান্ধীর কণ্ঠে শোনা গেছে—Neither the issue of partition nor of a Referendum in the N. W. F. Province was discussed with us. When a referendum was mentioned to us we strongly objected to it as the 1946 election had specifically been held on the very issue viz. the issue of India and pakistan. Gandhiji supported us and opposed partition. But Sardar Patel and Rajaji pressed for it. Speaking to me with great excitement the Sardar said that we were worrying over nothing.* ভারত বিভাগের বিষয় নিয়ে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নেতৃকুলের সঙ্গে কোন আলোচনাই হয় নি বলে সীমান্ত গান্ধী জানিয়েছেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচন বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তানের বিষয় নিয়েই হয়েছিল। কিন্তু সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ও শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী উভয়েই চাপ দিচ্ছিলেন। সীমান্ত গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে সর্দার প্যাটেল খুবই উত্তেজনার সঙ্গে বলেছিলেন যে তাঁরা সবাই অহেতুক উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। সর্দার প্যাটেল ও শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর উৎসাহ ও সীমান্ত গান্ধীর ক্ষোভ যে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ

* The Statesman—6. 10. 65.

নেই। ভারত বিভাগের পর ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরূপে সর্দার প্যাটেল আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সংগ্রামী যোদ্ধাদের বিষয়ে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই বিষয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যেন তাঁদের পুণর্নিয়োগ করা না হয় এবং তাঁরা যেন রাজনীতিক্ষেত্রেও কোন স্থান করে নিতে না পারেন সেই দিকে তিনি যথেষ্ট সন্ধানী দৃষ্টি রেখেছিলেন।) ভারতের মাটিতে রাজশক্তির দাবার চালের কি ফল হয়েছে তা অনুধাবন করতে আজ কারও বোধহয় কোন অসুবিধাই হয় না। নেতাজী সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন যেন কোন পরিস্থিতিতেই যেন মাতৃভুমি বিভক্ত করা না হয়; কিন্তু কোন এক অশুভ মুহূর্তে স্বীকার করে নেওয়া হ'ল যে ভারত বিভাগ করেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। আজাদ হিন্দ্ সংগ্রামের যোদ্ধাদের পরিচয় ছিল তাঁরা ভারত সন্তান, তাঁদের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক ভেদ নেই। কিন্তু ভারত বিভক্ত হ'ল সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র পরিষ্কার ঘোষণা করেছিলেন—'বৃটিশ সরকার-এর প্রতি ভারতবাসীর শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের কোন প্রশ্নই নাই।'

অপর পক্ষে, শ্রী চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর মন্তব্য—The latest political disease in India is the notion spread by ultra patriots that the United Kingdom is an enemy of India is as rediculous as it is sheer ingratitude. অর্থাৎ ভারতের সর্বাধুনিক রাজনৈতিক রোগ হ'ল চরমপন্থী দেশ-প্রেমীদের প্রচারিত মতবাদ যে বৃটেন ভারতের শত্রু। এই মতবাদ শুধু হাস্যকরই নয়, চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচায়কও। শ্রীরাজা-গোপালাচারী ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল রূপে কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন। তার মতে, ভারতের বৃটেনের কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকা উচিত। কিন্তু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার আগে একটি প্রশ্ন স্বভাবতই জাগে তাহলো ভারতের মাটিতে স্থায়ীভাবে সাম্প্রদায়িকতারূপ

আত্মধ্বংসের বীজ পুঁতে বিভক্ত ভারতের শাসনক্ষমতা পাওয়ার জন্যই কি ভারতের অগণিত দেশব্রতী প্রাণবলি দিয়েছেন ?

ভারতের শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করলে একটি দলিল যে লিখিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহই নেই। স্বয়ং স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্স বৃটেনের হাউস অফ কমন্স সভায় এক বিবৃতি দান করার সময় বলেছেন যে 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি সর্ত বিশেষ। ঐ দলিলে বংশগত এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হবে।'* এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে যদি ধরে নেওয়া যায় যে, বৃটেন ভারতের শুভকামনা করে সর্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে নজর রেখেই ঐ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তাহলেও কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ভারতের মর্যাদা কি সেই বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। এই প্রসঙ্গে একটি চমকপ্রদ মামলার উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৫৪ সালের গোড়ার দিকে ভারতে বসবাসকারী আবদুল জাহির নামে জনৈক কাবুলি কলকাতার সিটি সিভিল কোর্টে, মহামান্য বিচারক কে. কে. মিত্র'র এজলাসে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করেছিলেন। আবদুল জাহিরকে বিদেশী আইনএ (foreigner Act) প্রথমে ভারত ত্যাগ করে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়, কিন্তু ঐ নির্দেশ অমান্য করে ভারতে থেকে যাওয়ার দরুণ পরে তাঁকে গ্রেপ্তারও করা হয়। আবদুল জাহির এর পক্ষ সমর্থনকারী কৌঁসুলী মহামান্য আদালতের কাছে প্রার্থনা জানান যে 'ভারত বৃটিশ কমনওয়েলথের সদস্য। সেই জন্যই বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশের মত ভারতের ওপর ১৯১৩, ১৯৪৩ এবং ১৯৪৮ সালের বৃটিশ নাগরিকত্ব আইন প্রযোজ্য। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, বৃটিশ শাসনের আমলে ভারতবাসীর যে মর্যাদা ছিল, তার কোনও পরিবর্তন হয় নি।' কৌঁসুলী আরও প্রার্থনা জানান যে ভারত প্রজাতন্ত্র হওয়ার পরও বৃটিশ নাগরিকত্ব আইন ভারতের ওপর

---

* নয়া ভারতের কোষ্ঠী বিচার—নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রযোজ্য রয়েছে। বৃটিশ পার্লামেণ্টএ—'ইণ্ডিয়া (কন্‌সিকোয়েনসিয়াল প্রভিশন্‌স) অ্যাক্ট—১৯৪৯ পাশ করা হয়েছে এবং ভারতের সংবিধানের ৩২৭ নং ধারায় বৃটিশ নাগরিকত্ব আইন প্রজাতন্ত্র হওয়ার পরেও ভারতের ওপর প্রযোজ্য রাখার বিধান রয়েছে। ভারতে ঐ আইন চালু আছে।' এই আবেদন ভারতের জনমনে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে পারে নি তা সহজেই অনুমান করা যায়।

১৯৪৯ সালে বৃটিশ পার্লামেণ্ট-এ ঘোষণা করা হয়েছিল যে ভারত এক সভ্‌রেন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট রিপাবলিক-এর রূপ পরিগ্রহ করছে, অথচ বৃটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থেরও পূর্ণ সদস্য থাকবে, এ এক ঐতিহাসিক চুক্তি। এই বছরই বৃটিশ পার্লামেণ্টে কন্‌সিকোয়েনসিয়াল প্রভিশন্‌স অ্যাক্ট পাশ হয়। এই আইনে উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী রিপাব্‌লিক গঠন করার পরও বৃটিশ আইনে ভারতের মর্যাদা, অধিকার, সুযোগ সুবিধা, রিপাব্‌লিক গঠন করার আগে যা ছিল, সেই রকমই থাকবে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন—"আমাদের পুরানো সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভিত্তিতে আমরা এক নূতন ও আধুনিক জাতি গড়িয়া তুলিতে চাই।" আমাদের আমিত্ব কতটুকু বজায় আছে তার উপলব্ধি আমাদের অনেক কম, তবে সংবিধানে অনেক কথাই লেখা আছে। আমাদের ভাববার ও বোঝবার বুদ্ধিমত্তা সম্ভবতঃ তুল্যমূল্যভাবে কমই। নেতাদের দেখানো পথ বেয়েই আমরা এগিয়ে চলেছি। আমাদের নেতৃকুলের মধ্যেও মত ও পথের অনেক বিভেদ রয়েছে। আমরা সমস্যায় পড়ি কোন্ মত ও পথ সঠিক।

ভারতের নেতৃকুল যে মত ও পথের কথাই বলুন না কেন, সবার চেয়ে বড় প্রশ্ন আমাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা কি? বৃটেনের ম্যাজিস্ট্রেট এক মামলার রায় দান করতে গিয়ে মন্তব্য করেন যে ভারত ইউনাইটেড্ কিংডমএর বাইরে সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র নয়। ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতিও ভারতের মর্যাদা সম্বন্ধে অনুরূপ রায় দেন। পশ্চিমবঙ্গ

বিধান সভার সদস্য শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র লণ্ডনের ম্যাজিস্ট্রেটএর রায়-এর একটি অনুলিপি কাগজের দপ্তরে সরবরাহ করেন। লণ্ডনের ম্যাজিস্ট্রেটের ও ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতির মন্তব্য ছাড়াও দেখা যায় যে ১৯৬০ সালের পরে বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ফর্মে লেখা আছে যে ভারত সম্রাজ্ঞীর ডোমিনিয়ন।* শ্রীমৈত্র প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে ভারতের সাংবিধানিক মর্যাদা কি? তিনি আরও জানান যে লণ্ডনের ম্যাজিস্ট্রেট ভারতকে বৃটিশ ডোমিনিয়ন বলেই ক্ষান্ত হয় নি, তিনি এই মন্তব্যও করেছেন যে মেইনটেনান্স অর্ডার (ফেসিলিটিস ফর এনফোর্সমেণ্ট) এ্যাক্ট ১৯২০ও এই দেশের পক্ষে প্রযোজ্য। মুহূর্তের মধ্যে একটু গুঞ্জন ওঠে, কিন্তু পরমুহূর্তেই নেমে আসে শ্মশানের নীরবতা। ভারতের সাংবিধানিক মর্যাদা নিয়ে আর কোন প্রশ্ন ওঠে না।

ভরতবর্ষের ওপর কার কত প্রভাব এবং কেন ঐ প্রভাব তা নিয়ে অনেক আলোচনাই হয়েছে। স্বাধীনতা পাওয়ার আগে থেকেই যেন এক বিশেষ ধরনের প্রভাব কাজ করে আসছে। ১৯৪৬ সালের একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ৺পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গিয়েছিলেন সিঙ্গাপুর পরিদর্শনে। ঐ সময় ৺পণ্ডিত নেহরু আজাদ হিন্দ্ স্মৃতি সৌধে মালা দেন নি। এই ঘটনার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় লর্ড মাউণ্টব্যাটেনএর বক্তব্যে। কেম্ব্রিজএর ক্রাইষ্ট কলেজে নেহরু স্মৃতি বক্তৃতায় তিনি উল্লেখ করেন‡—The I. N. A. had broken their oath of loyalty and taken part in savage acts aganist their fellow prisoners of war who refused to fight for the Japanese. I pointed out (to Mr. Nehru) that when India become Independent, she would need to rely on men who did not break their oath

---

* Amrit Bazar Patrika—15.8.65

‡ The Statesman—16.11.68

and that soldiers should be loyal to the Government they have undertaken to serve. He saw the point and agreed not to lay the wreath.

অর্থাৎ, অজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ তাঁদের আনুগত্যের শপথ ভঙ্গ করেছিলেন এবং তাঁদেরই সহবন্দীরা যাঁরা জাপানের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছিলেন তাঁদের প্রতি বর্বরোচিত আচরণ করেছিলেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন, পণ্ডিত নেহরুকে বুঝিয়ে দিয়ে-ছিলেন যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে সেইসব ব্যক্তিদের ওপরই নির্ভর করতে হবে যাঁরা শপথ ভঙ্গ করেন নি। সৈন্যদের কর্তব্যই হচ্ছে সেই সরকার এর প্রতি অনুগত থাকা, যার অধীনে তাঁরা কর্মরত। পণ্ডিত নেহেরু এই যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন এবং মালা প্রদান করা থেকে বিরত থাকতে সম্মত হয়েছিলেন। লর্ড মাউণ্ট-ব্যাটেনএর বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে ১৯৪১ সালের ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে। বৃটিশ ভারতীয় সৈন্যদের জাপানের হাতে হস্তান্তর করেছিলেন কর্নেল হাণ্ট। হস্তান্তর করার সময় তিনি সৈন্যদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন যে এতদিন ধরে তোমরা যেমনভাবে আমাদের নির্দেশ মেনে চলেছ, আজ থেকে ঠিক তেমনিভাবে এঁদের (জাপ সরকার-এর) নির্দেশ মত তোমরা চলবে। তোমাদের সব দায় দায়িত্ব আজ থেকে জাপ সরকারএর। কর্নেল হাণ্ট এর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের সৈন্যরা, আজাদ হিন্দ্‌ সরকার এর পক্ষ সমর্থন না করে যদি জাপ সরকারএর নির্দেশ-মত বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন তাহ'লেও তাঁদের বিশ্বাসঘাতক বলা যেত না। পক্ষান্তরে, তাঁরা যদি নির্দেশ না মেনে বৃটিশ সরকার এর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা থেকে বিরত থাকতেন তাহলেই তাঁদেরকে নির্দেশ লঙ্ঘনকারী বলা যেত। কর্নেল হাণ্টএর নির্দেশমত তাঁরা জাপ সরকার এর নির্দেশ মেনেছেন, এতে বিশ্বাসঘাতকতার গন্ধ কোথায় পাওয়া যায় তা বোঝা দুষ্কর।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজএর যোদ্ধাদের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন ও বিধি নিয়মের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রয়োগ যে কত হয়েছে তা বিশ্বাস করতেও মন চায় না। কিন্তু যা ঘটেছে তা সত্যি। মিঃ ওপেন হায়াইমারএর মতে—"যদি আইন মাফিক যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়, তবে যাঁরা একই সঙ্গে বিদ্রোহী হতে পারতেন তাঁরাও আন্তর্জাতিক নিয়মের আওতায় পড়বেন।" ১৯১৭ সালে পোলিশ জাতীয় সেনাবাহিনীকে তৎকালীন মিত্রপক্ষ যুদ্ধরত বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। ১৯১৮ সালে মিত্রপক্ষ, চেকোশ্লোভাকিয়া বিদ্রোহীদের স্বতন্ত্র ও যোদ্ধৃপক্ষ বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। বৃটিশ ইয়ার বুক অফ ইণ্টারন্যাশান্যাল ল' অফ ১৯৩৭এ লেখা আছে, 'যোদ্ধা বলে স্বীকার করে নেওয়া মানেই একটি আইন মাফিক যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে বলে ধরে নেওয়া।' বৃটিশ কর্তৃপক্ষ আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন যে তাঁরা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন (charged to wage War on the King Emperor) তাহলে বৃটিশ কর্তৃপক্ষইতো স্বীকার করে নিয়েছেন যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় পড়েন। অতএব আন্তর্জাতিক বিধিনিয়ম মতে কোন পথেই তাঁদের বিচার বৃটিশ কর্তৃপক্ষ করতে পারেন না। তাছাড়া এ্যাক্সিস শক্তি এবং আয়র্ল্যাণ্ডএর মত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রও আজাদ হিন্দ্ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সুতরাং আজাদ হিন্দ্ সরকার এর প্রতি ব্যবহারে বৃটিশরাজ যে সব বিধিনিয়মেরই ও আন্তর্জাতিক আইনের ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আরও একটি বক্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, তাহলো তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিলএর। ১৯৩৭ সালের ১৪ই এপ্রিল বৃটিশ পার্লামেন্ট এ তিনি ঘোষণা করেছিলেন—বিদ্রোহীরা হেরে যেতে পারেন, কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন এমন একটি পক্ষে যে সব রক্ষা কবচ আছে সেইগুলি থেকে বিদ্রোহীদের বঞ্চিত করা যাবে না। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ এর ক্ষেত্রে কোন রক্ষা কবচই যে মানা হয় নি তা পরিষ্কার।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা স্বভাবতই নক্কারজনক বলে মনে হয়। লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে তিনি আরও একবার সন্তুষ্ট করেছিলেন। আইন সভায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তির দাবীতে এক সর্বদলীয় প্রস্তাব এসেছিল। ঐ ব্যাপারে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন সত্যিই উভয় সঙ্কটে পড়েছিলেন। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তির প্রস্তাবে বিরোধিতা করলে ভারতবাসীর বিরুদ্ধাচরণ করা হ'ত, অপরপক্ষে ঐ প্রস্তাব সমর্থ করলে বৃটিশ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক মর্শাল অচিনলেক্‌কে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হ'ত। এমন অস্বস্তিকর এক পরিস্থিতি থেকে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে রক্ষা করেছিলেন, ৺পণ্ডিত নেহেরু স্বয়ং। তাঁর তৎপরতায় সর্বদলীয় প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয়েছিল।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের যোদ্ধারা রাজশক্তির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এই মিথ্যা অভিযোগ এনে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও স্বার্থান্ধ কয়েকজনকে প্রভাবান্বিত করা গেলেও ইতিহাসের দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া যায় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে আজাদ হিন্দ্ সরকারএর অভ্যুদয় এক অভিনব ও অকল্পনীয় দৃষ্টান্ত রেখেছে। আজাদ হিন্দ্ সরকারএর অভিযান যদি বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় না করা হ'ত তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে অভিনবত্ব থাকত না। আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই তখন বিদেশের মাটিতে ছিলেন এবং বেশীর ভাগই ছিলেন যুদ্ধবন্দী হয়ে বিদেশীর দাসত্বকে অস্বীকার করে যাঁরা মাতৃভূমির স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার জন্য অনাহার ও অনিদ্রা বরণ করে নিয়েছিলেন এবং নিঃসঙ্কোচে রক্তের হোলি খেলেছিলেন, তাঁরা বীর সন্তানের আখ্যা না পেয়ে বিশ্বাসঘাতক আখ্যায় ভূষিত হয়েছেন। আর যাঁরা ব্যবসায়ীর মূখোস পড়ে অন্য এক রাষ্ট্রতেই নিজেদের উপনিবেশ গড়ে তুলিছিলেন, তাঁরা হলেন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতে যে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও নবজাগরণের ঝড় এসেছিল তার

জন্য মূলতঃ দায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকার। এই প্রসঙ্গে শ্রীগিরিজা কুমার মুখার্জ্জী লিখেছেন—* Whatever we may, however, say about it now, this question, I think, will be between the British Viceroys and the British Cabinet become available to us, for then alone, we would know why the British decided to leave India, particularly in 1947 and not before or after. Those historians, who are now sifting the documents of this period, are coming more and more to the conclusion that the revolutionary situation which arose in India in 1946 and 1947 could not have arisen without the I. N. A. trial, i.e. without the existence of the I. N. A. ভারতের মুক্তি আন্দোলনে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অবদান সম্বন্ধে যিনি যে ধারণাই পোষণ করুন না কেন, এর সন্তোষজনক উত্তর তখনই দেওয়া যাবে যখন বৃটিশ ভাইসরয় ও বৃটিশ কেবিনেট এর মধ্যে যে সব গোপন পত্র বিনিময় হয়েছিল সেইগুলি পাওয়া যাবে। তখনই শুধু জানা যাবে যে বৃটিশ ১৯৪৭ সালেই কেন ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কেন আগে বা পরে অন্য কোন সময়ে ঐ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। যেসব ঐতিহাসিক এই সময়ের নথিপত্র পরীক্ষা করে চলেছেন, তাঁরা ধীরে ধীরে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হচ্ছেন যে ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতে যে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিচার না হলে, অর্থাৎ আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অস্তিত্ব না থাকলে তা সম্ভব হ'ত না। শ্রীমুখার্জ্জীর লেখা থেকে আরও জানা যায় যে ১৯৪৭ সালে বৃটিশ সরকার এর ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড এর মত শক্তিগুলিও দৃঢ়তার সঙ্গে বিরোধিতা করেছিলেন, কারণ তাঁদের উপনিবেশগুলি ভারতে বৃটিশ শক্তির ওপরই নির্ভরশীল ছিল। বৃটিশরাজ ভারত শাসন

---

* Europe at War—Girija Kumar Mukherjee

হস্তান্তর করে যাওয়ার পর তাঁদের উপনিবেশগুলিও হাতছাড়া হয়ে যায়। ভারতবর্ষের ক্ষমতা হস্তান্তর আফ্রিকা ও এশিয়ার পরাধীন দেশগুলিরও স্বাধীনতা এনে দেয়। ভারতের শাসন ক্ষমতা হাতছাড়া করার সুদূর প্রসারী ফল সম্বন্ধে বৃটিশ রাজএর কোন অজ্ঞতাই ছিল না, তবুও তাঁরা ভারত ছাড়লেন।

ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাস প্রসঙ্গে মিঃ মাইকেল এডোয়ার্ড মন্তব্য করেছেন যে লালকেল্লার প্রাকারে সুভাষচন্দ্র এর ছায়ামূর্তি কল্পনা না করলে বৃটেন ভারতের স্বাধীনতা এত তাড়াতাড়ি দিতেন কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের মনে যখন আপসমূলক মনোভাব দানা বাঁধছিল তখন সুভাষচন্দ্রএর মত এক মহান্ ব্যক্তিত্ব সাহসের সঙ্গে এক ভিন্ন ও সশস্ত্র পথ বেছে নিয়েছিলেন বলেই ভারতের স্বাধীনতা এত ত্বরান্বিত হয়েছিল। অনেকেই নেতাজীর কর্মপদ্ধতি, চিন্তাধারা ও তাঁর ত্যাগের ফলশ্রুতি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এর কারণ হতে পারে, যাঁকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা, অন্যথায় নেতাজীর কর্মময় জীবন সম্পর্কে অজ্ঞতা ও হীনম্মন্যতা ভাব। নেতাজীর কর্মময় জীবনের দুর্বার গতি, অভিনবত্ব, দুর্গম বিপদসঙ্কুল পথে এগিয়ে চলার নেশা আর রহস্যের অপূর্ব সমন্বয় দেখা গেছে। গোপনতা রক্ষায় তিনি অদ্বিতীয়। তাই তাঁকে ঘিরে রয়েছে রহস্যজাল। তিনি সত্যিই দুর্বোধ্য। মনের অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে তাঁকে বিচার না করতে পারলে তিনি অজানাই থেকে যাবেন। কোন একজনের মন্তব্য থেকে নেতাজী সম্পর্কে কোন ধারণা পোষণ করা শুধু অযৌক্তিকই হবে না, ভুল করা হবে। অনেকেই বলেন যে নেতাজী জার্মানীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। তিনি হলেন একজন ফ্যাসিস্ত। এই প্রসঙ্গে শ্রীসুভাষচন্দ্র বোস-এরই মন্তব্য রয়েছে—If by Facist is indicated those who call themselves Hitlers, super Hitlers or budding Hitlers, then one may say that these specimens of humanity

are to be found in the Rightist Camp. (19. 8. 39)
নেতাজীকে ফ্যাসিস্ত বলে ঘোষণা করার জন্য এক পরিকল্পনা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। ঐ পরিকল্পনামতে, যে রাষ্ট্রনায়ককে ফ্যাসিস্ত ঘোষণা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল তিনি (স্টালিন) সরাসরি ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে মন্তব্য করেছিলেন যে কোন যুক্তিতেই চন্দ্র বোসকে ফ্যাসিস্ত বলা যায় না, তাঁর একমাত্র পরিচয় হ'ল, তিনি একজন গোঁড়া দেশপ্রেমী।

জার্মানীর সঙ্গে নেতাজীর সম্পর্ক প্রসঙ্গে শ্রীগিরিজা কুমার মুখার্জী লিখেছেন—'Let me now add that contrary to British official propaganda in pre-independence India, Subhas Bose had no contact whatsoever with any prominent member of the Nationalist Socialist Party, and the Free India Centre established by him in Berlin with Semi-diplomatic status, entertained relations only with the German Foreign Office, like many other neutral missions accredited to the German Government.

একথা সত্য যে, দেশের স্বার্থে রাষ্ট্রনায়কদের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অন্যান্য রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে বিচিত্র রাজনৈতিক বোঝাপড়া করতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়া বৃটেনের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু উভয় রাষ্ট্র সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থী। ঐ মিত্রতার অর্থ অবশ্যই দেশের স্বাধীনতা বলি দেওয়া নয়, বা আত্মসম্মান বিসর্জন দেওয়াও নয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে ভারতের শাসকগোষ্ঠীর শত্রুর সঙ্গে মিত্রতা করেছিলেন। এই যোগাযোগে অন্যায় কোথায়? শাসকগোষ্ঠীর কোন মিত্ররাষ্ট্র অবশ্যই তাঁকে সহায়তা করবেন না। ভারত ত্যাগ করে জার্মান যাওয়ার পথে সুভাষচন্দ্র রাশিয়ায়ও নেমেছিলেন। তখন রাশিয়া তাঁকে সাহায্য করেন নি এবং এর কারণ হল রাশিয়ার সঙ্গে বৃটেনের তৎকালীন

যোগাযোগ, কিন্তু তাঁর স্বল্পকালীন অবস্থানের সময় রাশিয়া সম্মানজনক ব্যবস্থাই করেছিলেন।

ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে সুভাষচন্দ্র একাই ছুটে গেছেন অনিশ্চিতের পথে। তাঁর দুর্গম পথ পরিক্রমায় তিনি সঙ্গীহীন। তাঁর সহযোগী হওয়ার জন্য বহু ব্যক্তিই এগিয়ে এসেছেন, কিন্তু সুভাষচন্দ্র স্বয়ং সব ঝুঁকি নিয়ে একাই চলেছেন। শ্রীগিরিজা কুমার মুখার্জীর ভাষায়—Subhas's one great desire in life was to face all the consequences of his action as far as possible without involving others."

১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট নেতাজীর রহস্যজনক অন্তর্ধানের পর ইতিহাস নগ্নতাই লক্ষ্য করেছে। গোপনে অনেক প্রচেষ্টা, অনেক সলা পরামর্শ ও অনেক প্রতিরোধ ব্যূহ রচিত হয়েছে, কিন্তু কর্মে অবিচল নেতা, সব কিছু এড়িয়ে গিয়ে অনায়াসে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে এগিয়ে গেছেন। কোথায়, কিভাবে যে তিনি নিজেকে নিরাপদে রেখেছেন তার বিশদ বিবরণ বর্তমানে পাওয়া সম্ভব নয়। তবে যেদিন তাঁর পুনঃ আবির্ভাব হবে সেদিন প্রকাশ পাবে যে তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। সাইগন বন্দর থেকে তিনি বিমানে যাত্রা করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু টুরেন বা তাইহোকু থেকে তিনি আবার ফিরে এসেছিলেন সাইগনে। আলোচ্য ঘটনার পরিকল্পনা নেতাজীরই ছিল; কিন্তু ঘটনার ইতিহাস রচনা করেছিলেন কর্নেল হবিব-উর রহমান ও তাঁর জাপানী সহকর্মীগণ।

এই প্রসঙ্গে একটি সংবাদ উদ্ধৃত করা হ'ল—

"সিঙ্গাপুর থেকে সাবমেরিনে নেতাজীর অন্তর্ধান"

"কলকাতা, ৩রা মার্চ—সিঙ্গাপুর থেকে নেতাজীর শেষ অন্তর্ধান বিমানে নয়, সাবমেরিনেই হয়েছিল। আর সেই কারণে তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ সন্দেহাতীত নয়।—বর্তমানে কলকাতা পুলিশ বিভাগে নিযুক্ত সৈন্য বাহিনীর একজন প্রাক্তন

অফিসার গতকাল যুগান্তরের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য জানান।

এ ছাড়া, তিনি একটি তরবারী দেখিয়ে দাবী করেন যে, এই তরবারী নেতাজী ব্যবহার করেছিলেন।

উক্ত অফিসার বর্তমান শতকের পঞ্চমদশকে সিঙ্গাপুরে জুরং অন্তরীন বন্দী শিবিরের পরিচালনায় নিযুক্ত থাকা কালীন সংগৃহীত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে এই দাবী করেন।

এই অফিসারটি আরও বলেন যে, সিঙ্গাপুরে সৈন্য বাহিনীতে চাকরী রত অবস্থায় তিনি নেতাজীর জনৈক জাপানী ঘনিষ্ঠ পার্শ্বচরের সঙ্গে পরিচিত হন এবং সেই পার্শ্বচরই 'চন্দ্র বোস' কর্তৃক ব্যবহৃত এই তরবারিটি তাঁকে উপহার দেন।

উক্ত পার্শ্বচরের কথায় তিনি জানতে পারেন যে, সিঙ্গাপুর থেকে শেষ অন্তর্ধানের প্রাক্‌কালে নেতাজী একটি মোটরে বুকিতিমা থেকে সমুদ্র তীরের কোন এক স্থানে যান। ঐ জাপানী ভদ্রলোকই সেই গাড়ীর চালক ছিলেন। নেতাজীর নির্দেশ মত আধ ঘণ্টা সেখানে অপেক্ষা করে নেতাজী ফিরে না আসায় উক্ত পার্শ্বচর সেই গাড়িতেই ফিরে আসেন।

উক্ত অফিসার আরও দাবী করেন যে, পরে তিনি স্বয়ং সেই স্থান পরিদর্শন করেন। স্থানটি তিনদিকে সমুদ্রবেষ্টিত থাকায় একমাত্র সাবমেরিন ছাড়া, বিমান বা অন্য কোন যানে নেতাজীর অন্তর্ধান সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করেন। শেষবারের মত সিঙ্গাপুর ত্যাগ করার সময় মোটরে উক্ত জাপানী সামরিক বাহিনীর উচ্চ পদস্থ অফিসার নেতাজীর সঙ্গে ছিলেন। তরবারিটি ঐ গাড়িতেই পাওয়া গিয়েছিল।

উক্ত অফিসার পরে তৎকালীন বিমান বাহিনীর অফিসার, পরে তৎকালীন বিমান বাহিনীর এয়ার ভাইস মার্শাল শ্রীসুব্রত মুখার্জির সাহায্যে তরবারিটি ভারতে প্রেরণ করেন।

এই সূত্র ধরে নেতাজীর অন্তর্ধান সংক্রান্ত রহস্যের নতুন কিনারা পাওয়া যেতে পারে বলে তিনি দাবী করেন।"

কিন্তু, আজ নেতাজী কোথায়? নেতাজীর আবার ফিরে আসার মত পরিস্থিতি কি এখনও তৈরী হয় নি? পরবর্তী পর্বে এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য পেশ করার আকাঙ্ক্ষা রইল।

পরিশিষ্ট

বইটি পড়ে পাঠকবর্গের মনে অবশ্যই প্রশ্ন জাগবে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস জীবিত জেনেও ৺পণ্ডিত নেহেরু তাঁকে মৃত বলে প্রতিপন্ন করার জন্য এত তৎপর হয়েছিলেন কেন? এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রাজনীতি ক্ষেত্রে যাঁরাই বিশ্বাস করতেন বা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে নেতাজী সুভাষ জীবিত তাঁদেরই প্রাপ্য হয়েছে রাজনৈতিক অপমৃত্যু। দক্ষিণপন্থী ৺ভুলাভাই দেশাই ত্রিপুরী কংগ্রেসএ বামপন্থী সুভাষ বিতাড়ন যজ্ঞে অগ্রগণ্য ছিলেন। ইনি দশ বছরেরও বেশী সময় ধরে কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেসের নেতা ছিলেন। কিন্তু ১৯৪৫ সালের সংসদীয় নির্বাচনে এঁকে দলীয় প্রার্থীর টিকিট পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। কারণ, ইনি সুভাষ অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন যে সুভাষচন্দ্র জীবিত। ৺শরৎচন্দ্র বসুর কংগ্রেস থেকে বিতাড়ন ও চরিত্র হনন করার কথা সর্বজনবিদিত। ৺সর্দার শার্দুল সিং কবিশের কে চোর প্রতিপন্ন করে আট বছরের কারাদণ্ড ভোগ করানো হয়েছিল। ৺মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করার পরিকল্পনার আঁচ পেয়েও তাঁর নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। ৺ডঃ রাধাবিনোদ পালকে অপদস্থ করার জন্য আয়করের বোঝা চাপিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাড়ী বিক্রি করে দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র এর প্রতিদ্বন্দ্বী ৺পট্টভি সীতারামিয়া পরবর্তীকালে নেতাজীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আন্তরিকভাবে অকুণ্ঠ প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। এঁর লেখা সংশোধিত কংগ্রেসের ইতিহাস পড়েই এই প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর সুভাষ অনুরাগই তাঁকে সযত্নে বর্জনের কারণ হয়েছিল। আচার্য জে. বি, কৃপালনী চিরদিনই সুভাষ বিরোধী ছিলেন। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস-এ সভাপতির ভাষণে তিনি ব্যক্ত করেছিলেন যে কংগ্রেস ষাট বছরে যা করতে পারে নি নেতাজী মাত্র আড়াই বছরে তা করতে সক্ষম হয়েছেন। এই বক্তব্যই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের কাল হ'ল। ৺পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন আজাদ হিন্দ ফৌজের যোদ্ধা ও নেতাজী পন্থীদের মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। ৺পণ্ডিত নেহেরু'র বিরোধিতার জন্য তিনি কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ভারতের ইতিহাসে অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে, যার সামান্যতম খবরই জনগোচরে এসেছে। শ্রীসুভাষচন্দ্র বোসকে ঘিরে একসময় অনেক রাজনীতির খেলাই চলেছিল, সেই খেলা আজও চলেছে, তবে তার রূপ ভিন্ন। গোপন সলাপরামর্শ ও গোপন আঁতাত বহু স্তরেই রয়েছে। আগামী দিনে এই ভিন্ন রহস্যের বিচিত্র রূপ অবশ্যই প্রকাশিত হবে।

INTRODUCTION

During his lifetime, Netaji Subhas Chandra Bose had captured the imagination of the Indian public by his daring exploits, such as his escape from India to Germany, his voyage to the Far East in the submarine, and his fight with the British in Burma. with his Indian National Army. The limelight was followed by a sudden blackout in August 1945. The information about the last stages of his life came out in bits and pieces, but not a coherent whole. Naturally, the public desired that all the facts should be enquired into, and made known. This desire was voiced in Parliament from time to time. In response to this, the Prime Minister, on the 3rd December, 1955, announced in Parliament that an Official Committee would be appointed to go into the matter. Accordingly, the Government of India appointed a committee as per Notification No.F.30 (26) FEA/55, dated the fifth April '56 consisting of the following.

Shri Shahnawaz Khan, M.P. (Major General, I.N.A.), Parliamentary Secretary to the Minister for Transport and Railway.

Shri Suresh Chandra Bose, elder brother of Netaji Subhas Chandra Bose.

Shri S. N. Maitra, I.C.S., Chief Commissioner, Andaman and Nicobar Islands.

Shri Maitra was a nominee of the Government of West Bengal.

The terms of reference of the Committee were,

"To enquire into and to report to the Government of India on the circumstances concerning the departure of Netaji Subhas Chandra Bose from Bangkok about the 16th August, 1945, his alleged death as a result of an Aircraft

accident, and subsequent developments connected therewith."

2. The Committee began its work early in April and finished its labour by the end of July. The principal line followed by the Committee was to examine as witnesses all persons in India and Far East who had useful information on the last phase of Netaji's activities. They also studied reports of secret enquiries concerning Netaji, conducted by Civil and Military Intelligence soon after the War. Over and above official documents, the members of the Committee also studied books and articles concerning Netaji Subhas Chandra Bose. In all, the Committee examined 67 witnesses. A complete list of witnesses will be found in annexure 1. Of these, 32 witnesses were examined at Tokyo (Japan), 4 at Bangkok (Thailand), 3 at Saigon (Vietnam) and the balance of 28 at Delhi and Calcutta (India). A number of persons who were known to have been associated with Netaji in the last stages, were requested to appear before the Committee in India directly, and abroad with the help of Indian Mission and Foreign Offices of the Governments of those countries. In addition, press notes were issued asking people who had information to give, to make it available to the Committee. The response to the press notes was encouraging. It may be mentioned here that throughout the period of its work, a large number of news items appeared in Indian and Japanese papers concerning the Committee's work. This was measure of interest people continued to take in Netaji Subhas Chandra Bose. In India the Committee examined five of the six persons who accompanied Netaji on his last flight from Bangkok including Mr. S. A. Aiyer, Mr. Debnath Das and Col. Habibur Rehman. Col. Rehman came all the way from Pakistan to appear before the Committee. The Committee also examined General J. K. Bhonsle, Chief of the General Staff of the I. N. A. The Commission examined not only those who had information to give, but those who had theories to propound.

Everybody was given a chance. The fitst witness called by the Committee was Mr. M. Thevar, M.L.A. (Madras) who had made several statements that he had been in contact with Netaji recently. Unfortunately, Mr. Thevar refused to share his secret with the members of the Committee. The members of the Committee left India on the 26th of April, and the first halt was at Bangkok. Bangkok was one of the most important centres of the Indian Independence movement, and was the headquarters of Netaji's Government when he retreated from Burma. There the witnesses examined included Sardar Ishar Singh and Pandit Raghunath Sharma who were leading members of the Indian Independence League in Netaji's time. Saigon was also one of the centres of the movement, and Netaji's plane took off from there. At Saigon, the witnesses examined included Mr. Anandamohan Sahai, Secretary General to the Azad Hind Government, and now Indian Consul General, Hanoi. From Saigon the members of the Committee flew out to have a look at Tourane on the Vietnam coast, from where Netaji's plane took off on its fateful journey on the morning of the 18th August, 1945.

3. The members of the Committee reached Tokyo (Japan) on the 5th of May and spent a month there. They found that Netaji's name was still a household word in Japan, and a great deal of interest was taken about him both by the public and the press. In addition to these witnesses who were called through the Japanese Foreign Office, a large number of Japanese volunteered and gave evidence, in response to newspaper notices. To mention one case, Mr. J. Nakamura, who was an Interpreter, and was present at Netaji's death bed, although 70 years of age, came on his own all the way from Kyushu, about 1,200 Kilometres from Tokyo. The members of the Committee were much struck by the interest displayed by the Japanese public in their enquiry, and by the patience and courtesy with which Japanese witnesses stood long examination through an inter-

preter. They came from different walks of life. There were ex-soldiers and ex-Generals, businessmen and truck drivers. The Committee was fortunate in being able to examine four of the six Japanese survivors of the plane crash, as well as two doctors who attended Netaji during his last hours.

4. The members of the Committee were anxious to visit Formosa which was the actual scene of occurance of the plane crash, Netaji's death, and his cremation. There were difficulties in doing so, as there were no diplomatic relations between the Government of India and the authorities in Formosa. A reference was made to the Government of India, who informed the Committee that they did not consider a visit to Formosa feasible. So the attempt had to be given up.

5. After examining the witnesses, the Committee was engaged in studying the evidence recorded by them, as well as obtaining and reading all the papers concerning the last phase of Netaji, much of which was in the form of secret Intelligence Reports recorded immediately after the war. Books dealing with Netaji or the I.N.A. were also studied. Thereafter, the members of the Committee discussed the whole matter among themselves and a list of points which was agreed upon by all the three members, including Shri Suresh Chandra Bose, was drawn up on the 30th June, 1956. This paper was signed by all the three members, a copy of which will be found in Annexure 1. All the members agreed then that there had been an air crash at Taihoku in Formosa, in which Netaji met his death; that he was cremated there, and the ashes now lying at the Renkoji temple in Tokyo are in all probability his ashes. Since then, for reason of his own, Shri Bose has taken a different view and has not signed the report.

6. After going carefully through the evidence and relevant papers, the picture emerged was like this.

In the last stages when Japan's defeat seemed inevitable,

Netaji Subhas Chandra Bose was preparing to shift his struggle, from South-East Asia to Russia via Manchuria. He left Bangkok on the 16th, and Saigon on the 17th August 1945, in an aeroplane bound for Manchuria. That plane crashed in flames at Taihoku in Formosa on the 18th August. As a result of serious burns sustained, Netaji died in a Taihoku hospital on the same night. His body was cremated at Taihoku. His ashes were flown to Tokyo early in September and deposited at Renkoji Temple. Netaji carried some treasure with him, details of which cannot be ascertained. A small part of his treasure was salvaged and subsequently recovered. To bring out the above picture, it was decided that the Report should deal with the following points.

(1) Last plans of Netaji Subhas Chandra Bose.
(2) Air crash at Taihoku (Formosa)
(3) Death of Netaji Subhas Chandra Bose
(4) Cremation of Netaji's body
(5) Netaji's ashes
(6) Treasure

Each point is dealt with in a self-contained chapter.

The conclusions of the Chairman and the other member who has signed the Report are also given in each chapter. In a final chapter (7), a suggestion has been made that Netaji's ashes should be brought to India with due honour. The Report is in two parts :

Part A—Report (with three annexures) :

Anexure I.—Copies of relevant papers.
„ II—Photographs.
„ III—Sketches and plans.

Part B—Evidence of witnesses (with photograph of some witnesses).

7. A large number of witnesses were examined in Japan. Tracing the witnesses and securing their attendence would not have been possible without the ever-ready help and co-operation of the Japanese Foreign Office (Gaimusho).

Mr. Shigemitsu, Foreign Minister of Japan, who had held the same position in Netaji's time, extended to the Committee every courtesy and consideration. The Committee wishes to thank the Government of Japan, Mr. Shigemitsu, and the staff of the Japanese Foreign Office, most sincerely for their help and kindness. The Indian Embassy in Tokyo also were very helpful. In particular, the Committee has pleasure in recording appreciation of the services of Mr. J. Rehman who was attached to the Committee throughout their stay in Japan. Assistance was also received from the Indian Missions at Bangkok and Saigon. The Committee wishes to thank the Ministries of Defence, External Affairs and the Intelligence Bureau of the Home Ministry for lending their secret Intelligence Reports. Shri R. Dayal who was attached to the Chairman of the Committee as P.A. worked very hard from the very beginning to the end, and gave satisfaction all round. And finally, the Committee wishes to thank, with all sincerity, the Government of India, for making the arrangements for the work of the Committee, at home and abroad, and the opportunity given to them to make a first hand study of an important chapter in the history of our times.

CHAPTER I

Last plans of Netaji Subhas Chandra Bose.

The terms of reference of the Committee are :

"To enquire into and to report the Government of India on the circumstances concerning the departure of Netaji Subhas Chandra Bose from Bangkok about the 16th August 1945, his alleged death as a result of an aircraft accident and subsequent developments connected therewith."

2. We have been asked to write the last page which had upto now remained blank ; but to do so, it is necessary to know a little of the background of the first and intermediate pages. Early in 1942, the Japanese Army overran large parts of South-East Asia, which had been under colonial domination under the European powers, and in so doing, they released a great impetus to nationalism. There were three million Indians in South-East Asia who took a leading part in this movement. They formed the Indian Independence League under Mr. Rash Behari Bose. Singapore fell on 15th February 1942, and the large British Indian Army stationed there surrendered. Out of this was formed the first Indian National Army under General Mohan Singh. This movement, however, was without a real leader of sufficient political stature. From the very start, the movement was waiting for Netaji Subhas Chandra Bose, who was then in Europe, having escaped from detention in India in 1941. After a long and perilous journey by submarine, Netaji arrived in South-East Asia, and took charge of the Indian Independence movement on the 4th of July 1943. Soon after, he assumed supreme command of the Indian National Army. Addressing a review of Indian National Army at Singapore on 5th July, he first uttered his famous battle cry, 'Chalo-Delhi ! Delhi Chalo ! On the 21st

October 1943, the provisional Government of Azad Hind was formed. There was great enthusiasm and men and money poured in. The Japanese Army had overran Burma and was poised for the invasion of India through Assam. Troops of the Indian National Army were sent to the front, and they took a gallant part in this fighting around Imphal and Kohima. Netaji toured all over East-Asia, and visited Japan more than once. Although belonging to a subject nation, and dependent on Japan for keeping his army in the field, he left an indelible impression of his personality on all those who came in contact with him. Even to-day his name is a household word in South-East Asia and Japan. Between his arrival in Singapore in July 1943, and his departure from Bangkok in August 1945, barely two years passed, but great things were attempted, and partly achieved, during this short period. Under the stress of war, the Indian Independence movement in South-East Asia had some of the qualities of an epic. Its full story is yet to be written. The story can be divided into several chapters. The first chapter, the spring of hope, ended with the incursion into the fringes of India and the failure to take Imphal. That was in April 1944. There was lack of air-cover, artillery and food. Then the monsoon set in. The forward elements of the Indian National Army along with the Japanese Army, fell back accross the Chindwin in Upper Burma. The rivers were in flood and sick men were carried on the backs of their comrades. Many have heard of the historic march of the Communist Fourth Route Army across China to Yenan, but few know the story of the heroic retreat of the I.N.A. across Burma. Netaji, however, was not daunted by failure, and continued to work hard at reorganising the Indian National Army. Addressing a public meeting at Bangkok at this time, he said, "March to Delhi still continues to be our battle cry. We may not march to Delhi via Imphal, but it must be borne in mind that, like Rome, there are many roads leading to Delhi."

3. There were changes in the Government of Japan and General Tojo was replaced by Koiso. In October 1944 Netaji visited Japan for the third and last time to meet the members of the new Government of Japan and discuss important matters with them. But at that time there had been further reverses for the Axis powers in Europe, and for the Japanese in Asia. The British force had advanced far into Burma and were threatening Mandalay. The Americans were active in the Pacific. The chances of a Japanese victory seemed more and more remote. From the very outset, Netaji had declared that his battle was for the Independence of India, and whatever happened to his allies, Germans or Japanese, his war would continue till the liberation of India was achieved. From the time of his last visit to Japan Netaji looked out for another vantage-point from which to fight the British. He saw that the only countty which could afford any assistance was Russia. He foresaw and discussed with his Advisers, Members of the Government and Officers, that it would not be long before Russia fell out with the Anglo-Americans, and that the war times alliance between the two was a temporary phase. He went even to the extent of predicting that there would be a third world war in ten years' time between Russia on the one hand, and the Anglo-Americans on the other. Netaji felt that for him it would be good policy to take shelter in Russia, from where he could come out in time to continue his war of liberation against the British. On his way back from Tokyo in October 1944, Netaji met at Shanghai Mr. Anand Mohan Sahay who had long been in Japan. He asked Mr. Sahay to go to Tokyo and try to establish contact with the Soviet Ambassador there, Mr. Jacob Malik. Mr. Sahay, who is at present our Consul General in Hanoi, was examined at Saigon. He said that he sounded several important personalities, including the Foreign Minister, Mr. Shigemitsu, and the Home Minister, Mr. Wzawa, but they advised him that it would be useless to contact the Soviet

Ambassador. So Mr. Sahay returned to Singapore and told Netaji the result of his mission. The quest, however, was not given up. The question of a "second front" became urgent in the middle of 1945, after the retreat from Rangoon and the collapse of Germany. An official reference was made to the Government of Japan by Netaji to contact the Russian authorities on his behalf. Mr. Debnath Das has kindly supplied the Committee with a copy of the Japanese Government's reply which was received sometime in June 1945. After thanking Netaji for his continuing co-operation with Japan, it says, "Nippon Government deems it almost without hope of success to get directly in touch with the Soviet Government on behalf of your Excellency, and it has no intention of doing so." Mr. Debnath Das has stated that about this time several alternative plans were considered. The first was to go to India and prepare for an armed revolution inside the country : Alternative, to go to Yenan (Communist China) : And thirdly, to try and contact the Russian through the Japanese. The third alternative seemed to have found favour with Netaji. A direct approach to Russia seemed difficult ; Manchuria, which was next door, and held by the Japanese forces, was increasingly considered as the best place to move to. But in case all these failed, Netaji advised Mr. Debnath Das to organise cells in South-East Asia which could be used for going underground.

4. About the same time movement of the Headquarters of the Indian National Army and the Indian Independence League to China was also seriously considered. General Isoda, who was the head of the Japanese *Liasion Mission* (Hikari Kikan), and through whom all correspondence with Japan passed, has given valuable information on this point. He has said that the first proposal was that the headquarters should be moved to Shanghai, but this did not materialise. There is reason to believe that the Japanese Southern Army Command felt that if Netaji moved out of South-East Asia, it would be difficult to control the I.N.A. The second

alternative was that the Headquarters should be moved to Saigon, with branches at Shanghai and Peking, or some other city in North China. The reason for establishing a branch in North China was that Netaji would be nearer Russian territory and be in a better position to contact the Soviet authorities. The Government of Japan and the Imperial General Headquarters were at first reluctant to accept this scheme, but they agreed when General Isoda explained to them that Netaji did not intend to cut off connection with Japan but to have an alternative connection with Russia. This plan was apparently approved by the Govt. of Japan in the middle of May. By that time British forces had broken through Meiktila and Rangoon was lost. Netaji stayed at Rangoon as long as possible and moved out only at the last moment on the 25th April 1945. He retreated to Bangkok, arriving there on the 14th of May. The Chapter of retreat which began at Imphal in June 1944 ended at Bangkok in May 1945. This was the second Chapter of the I. N. A. story. The third Chapter was brief. From Netaji's arrival in Bangkok on the 14th May, to his flight from Saigon on the 17th August, there were barely three months. To go back to the approved plan, before it could be given effect to Netaji moved to Singapore, especially to broadcast a series of talks to India, not to accept the terms offered by the Viceroy, Lord Wavell. Even at that time Netaji and his advisors calculated that there would be at least six months' interval between the collapse of Germany, and the eventual surrender of Japan. It was hoped that by that time, the Hqrs. would be shifted to somewhere further east and some contact made with the Russians. But Russia declared war on Japan on August 9th and atom bombs were dropped by Americans on the Japanese mainland. All calculations were thus upset and Japan surrendsred on the 15th August 1945.

5. Mr. S. A. Aiyer in Chapter V of his book "Unto Him A Witness" has vividly described the rush and turmoil of

those days. Netaji was on visit to Seramban in Malay. On the 12th of August, Dr. Lakshmayya and Mr. Ganapathy of the Indian Independence League Headquarters rushed up in a car, and gave him the shattering news that Japan had surrendered. Netaji received this news in a calm and even carefree manner typical of him. To quote Mr. Aiyer's words, "He first broke into smile, and almost his first words were : So that is that. Now what next ? It was the soldier speaking. He was already thinking of the next move and the next battle. He was not going to be beaten. Japan's surrender was not India's surrender." Netaji returned to Singapore immediately and held a non-stop series of conferences, night and day, with his advisers and officers. Against their advice Netaji was determined to remain behind and surrender at Singapore with his troops. But on the 14th evening they were joined by Mr. A. N. Sarkar, a member of the Provisional Government of Azad Hind, who arrived from Bangkok with words from General Isoda, Chief of the Hikari Kikan and Mr. Hachiya, Japanese Minister to the Provisional Government of Azad Hind. Mr. Sarkar told Netaji that Messrs Isoda and Hachiya were anxious to help him to get away from Malay and Thailand further east, so that he would not fall into the hands of the Anglo-Americans. At last Netaji was persuaded not to remain behind at Singapore, and to proceed east. The final decision was to quote Mr. Ayer, "Out of Malay definitely to some Russian territory certainly, to Russia itself ; if possible." There were reasons why Netaji should go to Tokyo at that time. There was the pressing question whether I.N.A. should surrender as part of the Japanese forces, or as a separate army. Netaji and advisers were anxious that there shoud be an independent surrender as the I. N. A. represented an independent State. The Japanese Commander in Singapore could not give an answer as he had no instruction. Probably, the authorities in Tokyo only could give a definite answer. Mr. N. Kitazawa a member of the House of Representatives, Japan, was

examined by the Committee. During the war he was a Counsellor attached to the Japanese Ambassy in Rangoon. He has stated that a week before surrender, the Japanese Government communicated to all Heads of States who were allied with them that they would be prepared to give them shelter in Japan. Accordingly, Presiaent Laurell of Phillipines, Dr. Ba Maw of Burma and Mr. Chankunpao, Head of the Chinese Government in Nankin, took refuse in Japan. So far as Mr Kitazawa knew, this offer was communicated to Netaji by Mr. Hachiya. It is not certain whether Netaji accepted the offer because Netaji's concern throughout had been continuance of his struggle, without of personal safety. Mr. Kunizuka of the Hikari Kikan, who was attached to Netaji throughout the period, has stated that Netaji was not in favour of taking shelter in Japan, as Japan was a small country, and the Occupation Forces would be there soon. Perhaps, Netaji accepted it only as a gesture of courtesy.

6. On the 16th August Netaji came to Bangkok. Mr. Hachiya, the Japanese Minister to the Provisional Government of Azad Hind, met him and delivered to him a message which conveyed the decision of the Japanese Government to surrender. It thanked Netaji for the co-operation extended to them in the prosecution of war. The message also contained an offer from the Government of Japan to be of any assistance to him. Mr. Hachiya says that Netaji told him that the Government of Japan having surrendered unconditionally, they would not be in a position to afford any protection to him. He was, therefore, more inclined to contact Russia. About this, however, the local authorities at Bangkok could not give much help. All they could do was to carry him to Saigon, and discuss and take orders from Field Marshal Count Terauchi, who was the Japanese Supreme Commander in South-East Asia. Col. Yano, Staff Officer of that Command knew that Netaji was coming, and that he wishes to go to Russia. He has said that Field

Marshal Terauchi could not give any decision himself, but wished that Netaji should proceed to Tokyo and discuss the matter with the Government of Japan. So, there were a number of reasons for Netaji to go to Tokyo, although his ultimate goal was Russia via Manchuria. General Isoda, who, as the Head of the Hikari Kikan, was consulted by Netaji on his return to Bangkok, says that Netaji "expressed a desire to go to Russia. I promised to give all the help that I could give to Netaji···Eventually, the plan that was finally settled was that Netaji would first go to Tokyo, thank the Japanese Government for all the assistance that they had given him···and then proceed to Russia via Manchuria."

7. There was no time then to contact Russian authorities or to make out details plans ahead. Russia was at war with Japan, and the Russian armies were advancing into Manchuria. Even if Netaji reached Manchuria, what would happen to him and the few trusted lieutenants, whom he wanted to take with him, was uncertain. All that he could hope was that they would be taken prisoners first establish their *bonafides* as fighters for India's Freedom, and later on secure Russian assistance for their objective. The details were uncertain ; the purpose was fixed. Netaji himself described his last journey as "an Adventure into the unknown." He chose Col. Habibur Rehman, Major Abid Hasan, Col. Gulzara Singh and Col. Pritam Singh. Mr. Debnath Das and Mr. S. A. Ayer to accompany him. but they were not told where he was going. They all knew vaguely that they were going to Manchuria. General Bhonsle, Chief of the General Staff. who was left behind by Netaji in charge of the I. N. A. says, "on the eve of his departure, I enquired from Netaji whether he had been able to decide where he would make for finally, after his discussion with the Japanese Government, and his reply was that he was hoping to go to Russia, but that he would talk over the matter further with the Japanese Governmect." At Saigon, almost by chance, Netaji was met by Lt. General

Shidei who was proceeding as chief of Staff of the Kwantung Army in Manchuria. General Shidei was a leading Japanese expert on matters Russian. According to Mr. Negishi, who was with the party upto Saigon, it was suggested that Netaji should accompany General Shidei to Manchuria and he apparently fell in with the suggestion. The plane was proceeding to Tokyo by the following route : Saigon—Heito—Taihoku (Formosa)—Dairen (Manchuria)—Tokyo. A little element of doubt remained whether Netaji would proceed by the same plane to Tokyo or break the journey at Dairen. Japan had surrendered. There was profound depression, and the elaborate machinery of Government was running down. Netaji was flying two days after surrender for an uncertain destination. It was indeed a leap in the dark. From this leap he did not return.

CHAPTER II

Air Crash at Taihoku (Formosa)

In persuance of his plan, Netaji was moving out of South-East Asia. He left Singapore on the morning of 16th August 1945, with Col. Habibur Rehman, Col. Pritam Singh, Mr. S. A. Ayer and Mr. Negishi, the Japanese Interpreter, and arrived at Bangkok, the same afternoon. It was arranged that Messrs. Thivy, Chatterjee and Raghavan would follow him. At Bangkok he held meetings with his Ministers, Military advisers, leading Members of the Indian Independence League, and made last-minute dispositions. General Bhonsle was to be left in command of the Indian National Army, and a Committee consisting of Sardar Ishar Singh, Pandit Raghunath Sharma and Shri Permanand was to look after the affairs of the League at Bangkok. Large donations were made to Chulalongkorn Hospital and University, the Indian Association, Bangkok, and Thai-Bharat Cultural Lodge, and all officers and men were sanctioned two or three months pay. A small number of Civil and Military advisers and Officers were selected by Netaji to accompany him. These were :

Col. Habibur Rehman
Major Abid Hasan
Col. Pritam Singh
Col. Gulzara Singh
Mr. Debnath Das and
Mr. S. A. Ayer.

The movement plan was as usual discussed with General Isoda, Chief of the Japanese Liaison Mission (Hikari Khan). The later arranged for two aeroplanes to take the party to Saigon. Saigon was the Headquarters of the Southern Army Commanded by Field Marshal Count Terauchi, who

was in over all command of all Japanese forces in South-East Asia. Arrangements for transport beyond Saigon were to be made by the Headquarters of that Command.

2. On the morning of the 17th August (slightly different times are given by different witnesses) Netaji and his party arrived at Bangkok Aerodrome. They were seen off by a large number of officers and leaders of the Indian National Army and Indian Independence League. General Isoda of the Hikari Kikan, Mr. Hachiya, the Japanese Envoy to the Provisional Government of Azad Hind, and Mr. Negishi (Interpreter) also accompanied Netaji upto Saigon. In addition to Netaji's personal kit packed in three or four Suit-Cases, two large Suit-Cases about 36" inches long were also put on the board of the plane. The two large suit-cases contained gold ornaments and other valuables—more will be hard of them later. The party travelled in two aeroplanes and arrived safely at Saigon. There is some variation in the time of arrival at Saigon given by different witnesses. Shri Debnath Das says that they arrived at 8 A.M., whereas, according to Col. Habibur Rehman, the time of arrival was 10 A.M., which is also the time mentioned by Mr. S. A. Ayer. From the aerodrome, the party drove into the town, and took rest in two houses belonging to an Indian gentleman, Mr. Chotirmal. Whereas in Bangkok, important witnesses were available, unfortunately at Saigon, most of the Indians who were active in Netaji's time were no longer there. One alleged eye-witness was an Indian darwan, Ramneo Gosai. He said that Netaji came to the Bungalow, accompanied only by two Japanese Officers and left hurriedly after having lunch. The statement of this witness may be ascribed to failing memory after eleven years. One Mr. Narain Das, then of the Indian Independence League, Saigon, and now of Tangier, has said that Ramneo told him the same story. Against his testimony, we have the evidence of the much more reliable persons who accompanied Netaji to Saigon. This witness also said that

Messrs. Ayer and Chatterjee left that Bungalow in Saigon only two days before Netaji's arrival, and that Netaji was enquiring about them. In point of fact, Mr. Ayer was actually accompanying Netaji.

3. At Saigon, however, the arrangement did not work according to expectation. No special plane was available to carry Netaji and his party. F. M. Terauchi's Headquarters had been informed before hand by the Hikari Kikan of Netaji's pending arrival at Saigon. Col. Yano who was on the staff of the Southern Army has stated that F. M. Terauchi had decided that Netaji should reach Tokyo as soon as possible, but owing to difficulty in obtaining passages by aeroplane, Netaji alone should go. The Headquarters of Southern Army at that time was located at Dalat, a short distance from Saigon, and there were officers posted at Saigon to carry out the orders of the Headquarters. The actual arrangements for transport by air were being made by Col. Kojima, while Lt. Col. Tada, a staff officer from the Headquarters, Southern Army, who usually dealt with the Hikari Kikan, met Netaji's party which included General Isoda. Lt. Col. Tada informed General Isoda that only one seat was available for Netaji on a plane that was leaving Saigon very soon the same day. General Isoda was naturally annoyed. and proceeded at once to Dalat to speak to F. M. Terauchi. On arrival at Dalat Airport, General Isoda was informed by Col. Yano that it was no use seeing the Field Marshal but he advised him to wait a little at the aerodrome. In point of fact, the Headquarters was in a state of confusion following the Japanese surrender three days earlier. Soon afterwards General Numata, Chief of General Staff of the Southern Army, rang up General Isoda and told him that he had brought the matter to the notice of the Field Marshal and 2 or 3 seats besides that of Netaji would be available in a plane shortly. With this assurance General Isoda returned to Saigon, but there he was again met by Lt. Col. Tada, who gave him the disappointting information that

the final decision was that only one seat besides Netaji's would be available. When the first proposal of only one seat was broached, Netaji turned it down flat. He insisted that the entire party of his officers and advisers should go with him. There was a lot of discussion on this subject between Netaji and his advisers on the one hand, and the Japanese officers on the other. His advisers thought that Netaji should not go all by himself. According to Mr. Debnath Das, who was an adviser in the Provisional Government of Azad Hind, the Japanese officers had said that Saigon was no longer safe on account of Allied and insurgent activities, and, therefore, Netaji should move on as quickly as possible. When the second offer of two seats was made, there were further discussions. During the course of these discussions, according to Col. Pritam Singh of the I. N. A., the Japanese gave out that as the allied forces had restricted the flights of their planes after surrender, they could not be sure whether aeroplanes would be available in the future, and advised Netaji to accept the two seats offered. In the end, Netaji reluctantly agreed to accept the two seats but on condition that those who were left behind were provided with transport on the following day. General Isoda promised to do his best.

4. Netaji selected Col. Habibur Rehman to accompany him. His choice was apparently approved of by the rest of his party, as he was Senior Staff Officer, and had been in close touch with Netaji for a long time. This has been mentioned by Col. Pritam Singh and Col. Gulzara Singh of the I.N.A. Netaji still did not give up hope of getting more seats in the plane. He told all members of his party to pack up their kit, and come with him to the aerodrome to try their luck. On arrival at Saigon Airport, however, the party was disappointed, as only two seats were available Netaji's baggage was unloaded from his car. The Chief Pilot said that the baggage was too heavy, and could not be put on the plane, as it was already overloaded. Consequently,

Netaji himself discarded a part of his baggage containing books, clothes etc. The party came in the aerodrome in two cars. Netaji came in the first car. While all these arguments were being made, the plane was waiting at the aerodrome. There were a number of Japanese Officers who were to go in the same plane. The Japanese were very impatient to start, but this was delayed for about half an hour or so for the arrival of the second car. This car carried two leather suitcases containing jewellery etc., and Netaji refused to move without them. The plane was already overloaded, and there were protests against loading in any more. In spite of this, the heavy treasure boxes were loaded into the plane. Among the Japanese passengers was a distinguished Military Officer, Lt. General Shidei, lately Chief of the General Staff of the Burma Army, who was proceeding to Manchuria as Chief of Staff of the Kwantung Army. General Shidie came out of the plane and greeted Netaji. Although there was an element of chance in Netaji's travelling by the same plane as with General Shidie, it appears that Netaji fell in with the idea that he should go upto Dairen (Manchuria) with General Shidei. Mr. Negishi, at that time an interpreter attached to Netaji's Headquarters, says, "General Shidei was supposed to be an expert on Russian affairs, in the Japanese Army, and was considered to be a key man for negotiations with Russia. It was suggested that Netaji should accompany him to Manchuria." It may be mentioned here that before he took up the job of Interpreter, he was working in the important firm of Mitshubishi, and is now the head of that firm in India. Lt. Col. Nonogaki, an Air Staff Officer of the Japanese Army, says, "The plane was schedule to carry General Shidei to Manchuria. Netaji agreed to go with him to Dairen in Manchuria. So there was no change in the schedule of the plane." The plane itself was a twin engined heavy bomber of 97.2 (sally) type, and belonged to the third Air Force Army stationed at Singapore. There is divergence of opinion on whether

it was a new or an old plane. According to Capt. Arai, and Major Kono, the plane was of the newest type. General Isoda goes so far as to say that it was a brand new one. But Lt. Col. Nonogaki has stated that it was an old plane. General Isayama says that the engine of the plane was worn out. It is unlikely that the plane was brand new one. The Ground Engineer Capt. Nakamura alias Yamamoto has stated that, while testing the engine at Taihoku, the Chief Pilot Major Takizawa had told him that the port engine had been replaced by a brand new one at Saigon. A brand new plane would not require the replacement of an engine.

5. Besides General Shidei, the plane was carrying five other Japanese Military Officers as passengers. These were :

Lt. Col. Tadeo Sakai, a Staff Officer of the Burma Army
Lt. Col. Shiro Nonogaki, an Air Staff Officer
Major Taro Kono, an Air Staft Officer
Major Ihaho Takahashi, a Staff Officer
Capt. Keikichi Arai, Air Force Engineer

Lt. Col. Sakai is now in Formossa on a special mission. The others are now civilians. Lt. Col. Nonogaki is now the Branch Manager at Osaka of the firm of Tokyo Kagyo Byocki Shokai Ltd. Major Kono has his printing business in Tokyo. Major Takahashi leaves at Kanagawa city in Zushi prefection. Capt. Arai is a lecturer at the Tokyo and Kieo Universities. The crew consisted of five or six persons :

Chief Pilot— Major Takizawa
Co-Pilot — W/O Ayoagi
Navigator — Sergeant Okishta
Radio-Operator—N. C. O. Tominaga

and one or two engineers, whose names have not come out. Including Netaji and his Adjutant, Col. Habibur Rehman, the plane carried 13 or 14 persons in all. Netaji was in uniform wearing a khaki drill bush-shirt, trousers and shoes, with I.N.A. Cap and badges. He bade good bye to all those

who had come to see him, and shook hands with them, telling them that they would meet him soon. After that, he boarded the plane through an entrance on the port side followed by Col. Habibur Rehman. That was the last time his faithful followers, whom he left behind saw him.

6. At the instance of General Shidei. Lt. Col. Nonogaki made arrangements for the seating of the passengers. As there were no proper seats, passengers had to squat on the floor, Netaji being provided with cushion. General Shidei, Netaji and Col. Habibur Rehman were given the best seats. General Shidei took the seat usually occupied by the Co-pilot. The crew were in the nose of the plane, while the other Military passengers took their seats in the rear of the plane. Col. Habibur Rehman has given a detailed description of the seating arrangements, which is reproduced below, and has illustrated it by sketch :

> "The member of occupants in the plane including the crew was 12 or 13. In the nose portion of the plane were probably a Co-pilot, a Radio Officer and Navigator. The seat of the pilot was behind them on the Port side, and opposite to him on the starboard side was seating Lt. General Shidei. Immediately behind the Pilot was seating Netaji, and nobody opposite to him, as the space was restricted by the patrol tanks. I was seating immediately behind Netaji. The Co-pilot's seat occupied by Lt. General Shidei was offered to Netaji but he did not accept, as it was too small for him. In the turret was standing one officer of the Air Force, and in the rear portion, probably 4 other Officers of the Japanese Air Force or Army. I do not exactly remember their ranks, except the names of one Lt. Col. Nonogaki and of Capt. Arai whom I met later, after the crash, in the hospital."

The Committee has examined four of Col. Habibur Rehman's fellow-passengers, namely Lt. Col. Nonogaki, Major

Kono, Major Takahashi and Capt. Arai. Regarding seating arrangements, the versions of the different witnesses tally to a great extent. They all say the same thing about the relative position of Netaji, General Shidei and Col. Habibur Rehman and the fact that the crew were in the nose and the other officers at the back. There are, however, some discripancies as to the number of the crew : Some say it was four, others say it was five. There is, however, an important difference regarding Major Kono. According to Col. Habibur Rehman and Capt. Arai, Major Kono was in the rear, but Major Kono says that he sat ahead of Netaji and talked to him during the flight. Col. Nonogaki also confirms this positions. In the first written statement, dated 24.8.1945, by Col. Habibur Rehman, which was handed over to the Committee by Mr. J. Murti, it was however stated that there was a Japanese officer sitting between the Pilot and Netaji. So it seems more or less certain that Major Kono was sitting in the front of the plane.

7. The plane took off quite well from Saigon Airfield in the afternoon of the 17th August. There is some difference about the exact time, but most witnesses say that the plane took off between 5 and 5-30 P.M. As there was delay in starting the plane, the Pilot decided to halt for the night at the Tourane on the Indo-China coast, instead of flying straight to Formosa. Tourane was reached safely in a couple of hours. There Netaji and the other Officers spent the night at the largest hotel in the town. Although the witnesses examined by the Committee could not give the name of the hotel, there is reason to believe that the hotel in question was Hotel Morin which the Committee visited during their trip to the Far-East. While taking off at Saigon, the plane had to run the entire length of the runway before it was airborne. This showed that it was overloaded. While the other rested at Tourane, the Chief Pilot, assisted by Major Kono, both Air Force Officers, were busy making the plane lighter. According to Major Kono, no fewer than

12 anti-aircraft machineguns, and all the ammunitions were taken down from the plane. Some surplus luggage was also discarded, and the total weight reduced by 600 kilos. Thereafter these officers attended to the maintenance of the plane and satisfied themselves that everything was correct.

8. An early start was made next morning (18th August) at about 5 A.M, when the sun was rising. The passengers and crew took their seats *in the same order as before.* The plane was to follow the route: Saigon—Tourane—Heito (Formosa) —Taihoku (Formosa)—Dairen (Manchuria)—Tokyo. According to Major Takahashi, the normal route for aeroplanes at that time was to proceed to Tokyo *via* Dairen (Manchuria). The plane was much lighter and the take-off was very normal. During the flight from Tourane to Heito, the weather was perfect and the engines worked smoothly. The plane was flying at an altitude of about 12,000 ft. and it was quite cold inside the plane. As the weather was favourable, it was decided to cover some more distance, pass over Heito, and land at Taihoku which is the Japanese name for Taipeh, capital of Formosa. According to Major Kono. during the flight, information was received that the Russians had occupied Port Arthur. It was feared that they might be in Dairen before long, and it became all the more necessary to reach there as quickly as possible. The plane landed safely and smoothly at Taihoku Airfield sometime in the afternoon. The landing time has been stated by different witnesses between 11 A.M. to 2 P.M.

9. On landing, everybody got down from the plane and walked to a nearby tent, rested there, and had light lunch of sandwiches and bananas. The tent had been pitched for a Japanese prince who was expected to pass through Taihoku. The prince was carrying orders from the Emperor to various Army Commanders to surrender. As the plane had been flying high, Col. Habibur Rehman was feeling cold, and on landing, changed into warm serge uniform of bush-coat,

breeches and top-boots. He asked Netaji, who said that he did not feel cold. All the same, Col. Habibur Rehman handed him a pull-over. It is not clear whether Netaji did put on the warm pullover or not. Different witnesses have given the time of halt at Taihoku Airfield from half an hour to two hours. During this time, the plane was refuelled. The engines of the plane was also tested and checked. This was done by the Chief Pilot Major Takizawa, helped by Major Kono, and the ground staff of the aerodrome, headed by Capt. Nakamura *alias* Yamamoto. As the state of the engine has important bearing on the subsequent crash, it might be worthwhile to quote the relevant portions from the statements of Major Kono and Capt. Nakamura *alias* Yamamoto. Major Kono says, "Mr. Takizawa tested it inside, and I tested it from outside. I noticed that the engine of the left side of the plane was not functioning properly. I, therefore, went inside the plane and after examining the engine inside, I found it to be working all right.

An engineer also accompanies the plane. He was accompanying it on this occasion also. I do not remember his name. He also tested the engine and certified its airworthiness." Capt. Nakamura *alias* Yamamoto who was the ground engineer in charge of maintenance at Taihoku Aerodrome says, "At about 1-20 P.M. Major Takizawa and Co-pilot Ayoagi got into the plane and tested it. I was standing just in front of the Plane. When they started the engine, I found that one of them was defective. I raised my hand to indicate to him (Major Takizawa) that the engine of the left side was defective. On my signal indicating that the engine was defective, Major Takizawa leaned out to listen to me. I told him that the left engine was defective, and should be put right. Major Takizawa slowed down the engine and told me that it was a brand new engine which had been replaced at Saigon. After slowing down the engine he adjusted Saigon. After slowing down the engine he adjusted it for about 5 minutes. The engine was tested twice by Major

Takizawa. After being adjusted, I satisfied myself that the condition of the engine was alright. Major Takizawa also agreed with me that there was nothing wrong with the engine."

10. Thereafter, all the passengers, after having had their rest and lunch took their seats again in the plane in the same order of seating as before, that is to say, with the crew in the nose of the plane, Major Kono sitting behind the pilot on the port side, behind them Netaji and Col. Habibur Rehman, on the star-board side General Shidei, and in the rear portion the other Japanese officers. Although the engine had been tested, the take-off from Taihoku was not quite normal. The best account of the take-off has been given by Capt. Nakamura alias Yamamoto, who was a Ground Engineer, and who was watching the plane. The other passengers inside the bomber could not see very much, as there were very few openings. There is some difference between the witnesses as to the actual time of the taking-off but most of them put the time between 2 and 2-30 in the afternoon. Capt. Nakamura alias Yamamoto says, "After everybody had taken seat in the plane, the plane taxied to one end of the runway. Having reached the point, the engines of the plane speeded upto the maximum speed and then slowed down. This was a normal procedure which all Japanese planes followed to test the fitness of the engines. Having satisfied that the engines were correct, the plane was speeded and allowed to run down the runway. The length of the runway was 890 metres. In the case of heavy bombers, normally the tail gets lifted halfway down the run-way but in this case, the tail was not lifted off the ground until it had run approximately 3/4th down the runway. At that time I was standing at a point which was about 30 metres away from the air-strip. About 50 metres before the end of the runway, the plane took off and made a steep ascent." The plane had carried the distinguished leader of the Indian Independence Movement and his fellow-passengers

from Saigon to Tourane, and from Tourane to Formosa over the South China sea in safety, and nobody had any idea, that disaster would overtake the plane without warning and so.soon after leaving Taihoku airfield.

11. Hardly had the plane got airborne, when a loud explosion was heard, and the plane tilted to the left. Col. Habibur Rehman has said that it was a noise like cannon shot. The propellor and the port engine fell out. Capt. Nakamura alias Yamamoto who was watching says, "Imme-diately on taking off, the plane tilted to its left side and I saw something fall down from the plane, which I later found was the propellor." Major K. Sakai who came to the scene sometime later says that he found the port engine buried in the ground. The Pilot Major Takizawa and the Co-Pilot Ayoagi made desparate attempts to save the situation but without success. The list could not be rectified within the short height that the plane had gained. Witnesses inside the plane have given different estimates of the height, but most of them say that the maximum height gained was about 30 metres. Capt. Nakamura alias Yamamoto, who had the best view, has estimated the height between 30 to 40 metres. Mr. A. M. N. Sastri, an Aircraft Inspector of the Directorate General of Civil Aviation, Government of India, has said, in answer to a question, that considering that the aircraft left the ground 50 metres before the end of the runway and started climbing, the figure of 30 to 40 metres given by witness Capt. Nakamura alias Yamamoto appeared to him to be reasonable. The plane nosedived, making a wailing noise. The passengers inside the plane had not even seat-belts and naturally lost their balance. The baggage came tumbling down. Col. Habibur Rehman said that he was struck in the back by some of the packages. Capt. Arai has graphically described his feelings by saying that earth was rushing towards him. Major Kono had the presence of mind to try and switch off the ignition to prevent the plane from catching fire, but failed to do so as he could not keep his balance. He fell two or three times in the

attempt. The plane crashed to the ground and immediately caught fire in the front position. According to Mr. A. M. N. Sastri, it would take only 3 seconds to fall from a height of 50 metres. Some witnesses, like Lt. Col. Nonogaki, have stated that the plane crashed on the concrete runway ; on the other extreme, Col. Habibur Rehman has said that the crash took place one or two miles outside the aerodrome. The most credible version is probably that of the Ground Engineer, Capt. Nakamura alias Yamamoto, who says that the plane crashed about 100 metres beyond the concrete runway. His version is supported by Major Sakai who was in Command of defence of Taihoku Aerodrome. He says that he saw the wreckage of the plane lying 20 to 30 metres from the end of the runway. One of the passengers, Major Takahashi, also says that the crash took place just outside the concrete runway, but within the boundary of the aerodrome.

12. As the plane came down on its nose, it crashed on its left side and caught fire in its front position. It appears from the statements of the witnesses that the plane also suffered severe damage, and broke into two. Capt. Arai, Lt. Col. Nonogaki and Major Kono have stated that on crashing the plane broke into two. They have illustrated the point at which the plane broke into two by supplying sketches of the plane. Major Sakai, who came to the scene immediately after the accident and saw the wreckage of the plane also supports this version. On the other hand according to Col. Habibur Rehman, the plane split in the front position, while Capt. Nakamura alias Yamamoto is positive that the plane was intact and body was not broken. He, however, says that the fire was confined to the front part of the plane. It is likely that the plane, on falling to the ground, would sustain damage to its structure. So, on examining the probabilities and weight of evidence a major breakage in the rear part of the fuselage may be accepted. There might have been breakages and split elsewhere also. But a study of the photograph of the wreckage (annexure—II) it does not appear that the broken parts got separated nor is any support lent to the

statement of Lt. Col. Nonogaki that the two split parts went in different directions on the ground.

13. What happened to the persons inside the aeroplane? The Crash affected different persons differently. Of the seven persons in the plane who ultimately survived, the Committee has examined in person five of them, and read the statement recorded by a sixth, Lt. Col. T. Sakai. Lt. Col. Nonogaki who was in the turret was luckiest. As the plane crashed, he was thrown out to the ground almost unhurt. He got up and ran away from the burning plane and took shelter behind a pile of stone, against which the wrecked plane ultimately came to a halt. Lt. Col. Sakai, Major Takahasi and Capt. Arai became senseless the moment the plane crashed, but found themselves soon after on the ground, and moved away from the burning plane. Clearly, they had been thrown out. In the process, they received injuries and burns. Lt. Col. Sakai stated that he received bruises on his head and some other parts and burns on his face and hands, but they were not serious. Major Takahashi's left ankle was sprained. Injuries of Capt. Arai were more serious. The right side of his face, the upper side of both his hands and the front portion of his fore arm got burnt. Marks of these burns were still visible when he appeared before the Committee 11 years later. Major Kono was clearly an alert and observant person. At the moment of crash, instead of being flustered, he had his wits about him, and noticed what others were doing. He says, "As the plane was falling to the ground, the patrol tank inside the plane fell down, and came between me and Mr. Bose. I looked backwards but could not see Mr. Bose because of this tank. I could see General Shidei after the plane crashed. He had a cut injury at the back of his head. Major Takizawa was hit in the face and on fore head by steering which he was operating. N. C. O. Ayoagi was hit in the chest which was bleeding, and he was leaning forward. There was another engineer between me and N.C.O. Ayoagi. I do not know what happened to him. During this time, the fire spread greatly and the heat became unbearable. I broke

open the plastic cover on top of the plane and escaped through it. While escaping, the fire was so strong that I had to protect my eyes by covering them with my hands which, as a result, got burnt, and my face and legs were also burnt. As I was escaping from the plane, I got splashed by patrol which was coming out from a pipe, which connected the patrol tank with the engine which had been brought down. The patrol which was so splashed caught fire. I ran about 30 metres and then rolled on the ground and put out the fire ; at the same time I also took off my outer garment which had caught fire. In this way, I managed to put out the fire that was burning on me."

It may be mentioned here that Major Kono was under treatment for 18 months, and even after the protracted treatment the skin of his face looked severely burnt when he appeared before the Committee 11 years after. He lost his teeth and wore false teeth. Four of the fingers of his right hand, i.e. excepting the thumb, were damaged and mishapen, and he could not clinch his right fist. The little finger of the left hand was also damaged and he could not clinch that fist in full. Both his hands were deformed. A Picture of Major Kono's pair of hands was taken. They all tell their own story.

14. Now we come to Col. Habibur Rehman and Netaji Subhas Chandra Bose. An extract from the statement of Col. Habibur Rehman as to what happened to him and Netaji immediately after the crash is given below in extenso :

"Within a few seconds, the plane crashed on the ground, and fore-portion of the plane split and caught fire. Netaji turned towards me. I said, please get out through the front : there is no way in the rear : (Angey Say Nikaley, Pichay Say Rasta Nahin Hay). He could not get through the entrance door as it was all blocked and jammed by packages and other things. So Netaji got out through the fire ; actually he rushed through the fire. I followed him through the same flames. The moment I got out I saw him about 10 yards ahead of me, standing, looking in the opposite direction to mine towards

the west. His clothes were on fire. I rushed and I experienced great difficulty in unfastening his bush-shirt belt. His trousers were not so much on fire and it was not necessary to take them off. He was not wearing the sweater. He was wearing Khaki drill. I laid him down on the ground and noticed a very deep cut on his head probably on the left side. His face had been scorched by heat and his hair had also caught fire and signed. The cut in his head was a long one, about 4 inches. I tried to stop his bleeding by handkerchief. As for myself, both my hands were very badly burnt.

As I came through the fire, the right side of my face was burnt and I noticed I had received a cut in the forehead which was also bleeding and the right side of my right knee was also bleeding profusely, as it had hit some hard substance. The head cut was caused by hitting the floor as the plane crashed. My clothes did not catch fire. My hands were burnt very badly in the attempt to take off Netaji's clothes. Both my hands upto the wrist show marks of deep burning even after a lapse of more than ten years. Later on, even my nails came off. The nails of the left thumb has not come up properly."

(Note—The members of the Committee examined the hands and saw marks of severe burns. Marks of burns were also noticed on the right side of the face and just near the right ear. Injury marks were also seen on the forehead and right leg.)

"When I laid Netaji on the ground, I myself lay by his side. I was feeling acute pain and exhausted. I saw a Japanese passenger about 24 yards away bleeding profusely and moaning. Just then, Netaji enquired from me in Hindustani: Aap Ko Ziada To Nahin Lagi? (Hope you have not been hurt badly). I replied, 'I feel that I will be all right.' About himself he said that he felt that he would not survive. I replied. 'Oh! No, God will spare you. I am sure you will be alright.' He said, 'No, I don't think so.' He used these words:

"When you go back to the country, tell the people that upto the last I have been fighting for the liberation of my

country ; they should continue to struggle, and I am sure India will be free before long. Nobody can keep India in bondage now."

(Jab Apney Mulk Wapis Jayen to Mulki Bhaiyon Ko Batana Ke Men Akhri Dam Tak Mulk Ki Azadi Key Liyay Larta Rahee Hoon ; Woh Jange Azadi Ko Jari Rakhen. Hindustan Zaroor Azad Hoga, Us Ko Koi Gulam Nahim Rakh Sakta.)"

In a way this was Netaji's last testament and very characteristic of him. It was in keeping with the oath he took to fight for the Independence of India till his last breath when he established the Provisional Government of Azad Hind on 21st October 1943.

15. Lt. Col. Sakai and Capt. Arai do not mention that they had seen Netaji immediately after the crash. Lt. Col. Nonogaki did. He says, "When I first saw Netaji after the plane crash, he was standing some where near the left tip of the left wing of the plane. His clothes were on fire and his assistant was trying to take off his coat. He took of Netaji's coat quickly but was finding difficulty in taking off the woolen sweater. Since Netaji was sitting very near the patrol tank, he was splashed all over with patrol. It seemed that all his body was on fire." Major Kono says that he saw Netaji standing very near the plane facing away from it. He was standing erect with his legs apart and arms stretched downwards with clinched fists. He was completely naked and was wearing only his shoes. He did not see any fire on his body. Major Kono goes on to say that while he himself was feeling the heat of the flames 30 metres away, Netaji who was standing a couple of metres away from them seemed to be oblivious of the heat. His face did not show any sign of pain. Then Col. Habibur Rehman moved him away from the burning plane. Major Takahashi gives a somewhat different version. He says that he saw Netaji getting out from the left front portion of the plane. His clothes were on fire and he was trying to take off his coat. Then he says that he (Major Takahashi) went upto Netaji and made him roll on the ground and managed to put out the fire from his clothes. He

says that Col. Habibur Rehman was there, but assigns him a passive role. He goes on to say that petrol had splashed only on certain parts of Netaji's clothes, only those patches were burnt. His trousers were burnt only slightly. While other witnesses have said that Netaji had to take off his clothes and was naked, Major Takahashi says that Netaji had his clothes on. As for Netaji's clothes being on fire, all the eye witnesses who had seen him agree. As for who helped to put out the fire, it seems much more likely that Col. Habibur Rehman should have been the man to have come to the aid of his leader. The version given by Col. Habibur Rehman and supported by the two more observant witnesses namely Lt. Col. Nonogaki and Major Kono appears more credible than the version of Major Takahashi. The Ground Engineer Capt. Nakamura alias Yamamoto has given a completely different version. He also says that Netaji's clothes were splashed with petrol and had to be stripped, but he claimed that it was he (Capt. Nakamura alias Yamamoto) who rescued the passengers from the burning plane, and specially Netaji. This version is completely uncorroborated by anybody else, and may perhaps be put down to confused recollection after such a lapse of time.

16. Of the other Japanese inside the plane, passengers and crew, General Shidei could not get out and died inside the plane. It may be of interest to mention that a copy of General Shidei's service record (translated in english) was obtained through the Japanese Foreign office, a copy of which is enclosed (Annexure I). It will be seen that the date of his death was 18th August 1945 at Taihoku Air field. The cause is given as death by war. His ashes were sent to Tokyo a week later through General Tanaka, Chief of General Staff, Burma Army, who passed through Taihoku a week later en-route to Tokyo with Dr. Ba Maw, President of Burma. Some of the crew were apparently rescued. There is some doubt about the fate of the two pilots and some of the crew who were initially trapped inside the plane. Captain Nakamura alias Yamamoto definitely says that Pilot Takizawa and

Co-pilot Ayoagi perished along with General Shidei, and he helped to bury their entrails and put their ashes in three boxes. But Major Kono says that he heard that Co-pilot Ayoagi had been pulled out. The two Doctors, Yoshimi and Tsuruta, definitely say that they had treated Co-pilot Ayoagi who died later in the hospital. From all this it would appear that General Shidei died instantaneously. One or two others also died with him, but it is not certain who they were. Most likely Major Takizawa, Chief Pilot was one of them. The rest, passenger and crew numbering about a dozen, were removed within a short time to Nanmom (South Gate) Military Hospital which was a few kilometres away, in motor vehicles, trucks, cars, and a peculiar vehicle called 'Shidosha' in Japanese, which was used for starting aeroplane propellors.

17. Before going on with the story of medical treatment in the hospital, account may conveniently be taken here regarding the air crash. Whether the crash took place, its cause, whether there could be any survivor. From the evidence given to the Committee, there is sufficient material to believe that the plane carrying Netaji crashed at Taihoku Airfield early in the afternoon of the 18th August, 1945. There is no reason to disbelieve the large number of witnesses, both Japanese and Non-Japanese. There is no evidence before us to show that the plane in question did not crash at Taihoku. Unfortunately, no formal enquiry into the air crash was carried by the Japanese authorities at that time. General Isayama, Chief of the general Staff of Formosa Army in 1945, was asked about this matter. He first said that since the aeroplane in question did not belong to Formosan Army, the Headquarters of the Formosan Army had no responsibility to hold an enquiry into the matter. Then he said that it was the duty of the Commander, within whose area an air crash took place, to enquire into and report it to the higher authorities. He said that in this case, a report was submitted to the Imperial General Headquarters by his staff officer Lt. Col. Shibuya, through him. Lt. Col. Shibuya, who was also examined, denied knowledge of any such enquiry, and said

that the responsibility of holding it lay entirely with the air division concerned. This matter was persued further by the Committee and a report was obtained from the Japanese Foreign Office to confirm that no official enquiry was held into the air crash by the Japanese authorities (Annexure I). One would have expected a formal enquiry into the air crash as it involved important personalities like Netaji Subhas Chandra Bose and Lt. General Shidei. Perhaps, there was disorganisation following the surrender of Japan on the 15th of August. We referred the available evidence regarding the plane, its condition and the crash, to the Director General of Civil Aviation, Government of India, on our return to Delhi, after placing on record the evidence of Japanese witnesses. The Director General of Civil Aviation had these papers examined by an expert, and the Committee recorded the opinion of Mr. A. M. N. Sastri, an Aircraft Inspector, Accident Investigation Branch, regarding the accident and its cause. Shri Sastri's opinion was :

"From the statement of witnesses, sketches and photographs, it appears that the aircraft crashed, and after the take off, within the boundary of the aerodrome. The maximum height attained by the plane might have been anything upto 150 feet. The initial cause of the plane falling to the ground, according to the statement of witnesses, is the breaking away of the propellor and then the engine on the left-hand side. It is not possible to establish the exact cause as to how the propellor came off from the engine from the details available. In the absence of details of construction of the engine and the various control systems, and the maintenance records, and without examining the wreckage, it is not possible to trace the exact defect causing the crash. As observed by Major Kono, one of the witnesses, the engine seems to have been defective and overspeeding at the time of the take-off from Saigon. This appears to have something to do with the crash."

Regarding the effect of the crash and chances of survival, Mr. Sastri has said, "Taking into consideration the starting point of the fire to be from the star-board front as stated by

Major Kono and the location of the patrol tank and also the inadequacy of emergency provision, it may be stated that,

(1) Those who were in the front could be the worst sufferer ;

(2) Those who were in the centre left could be seriously injured ; and

(3) Those who were in the rear could have chances of survival." He went on to elucidate ; "In case of an air accident, the survival of passengers or member of the crew is purely a matter of luck. I have come across accidents where in major crashes the occupants survived, whereas in similar accident they died. It is very difficult to predict anything accurately as far as the survival of passengers in an aircraft accident is concerned."

18. From the evidence given by the witnesses and the opinion of the expert, it is established that there was an aircraft accident at Taihoku on the 18th August 1945 due to some kind of engine trouble, the cause of which cannot be established clearly in the absence of data. As for survivors, there is nothing surprising that seven out of the 13 or 14 persons on the board the ill-fated plane survived. It is not a fact that Col. Habibur Rehman alone survived to tell the tale. So far as has been ascertained the following persons survived :

(1) Lt. Col. T. Sakai
(2) Lt. Col. S. Nonogaki
(3) Major T. Kono
(4) Major I. Takahashi
(5) Capt. K. Arai
(6) Sergeant Okishta and
(7) Col. Habibur Rehman.

Of these survivors, the Committee could not examine in person Lt. Col. T. Sakai (1) who was away from Japan. As stated previously, a written statement was obtained from him through the Japanese Foreign Office. Attempts were made to trace Sergeant Okishta (6) but he was not found.

CHAPTER III

Death of Netaji Subhas Chandra Bose

Thus Netaji was carried along with other injured persons to Nanmon Military Hospital, Taihoku. This was a small hospital, and had four general wards with accomodation for 80 patients, and 15 more in the infectious ward. As a precaution against air raids, the main Hospital and its several branches were removed to outer areas. The Nanmon branch was the only one left in Taihoku city, where patients received first-aid treatment before being sent to other hospitals. The Medical Officer in charge of this branch was Captain T. Yoshimi who had graduated in 1938 and was Commissioned in 1940. There was another Doctor, Dr. Tsuruta, who had qualified only in 1944. There was also a third doctor. The other staff consisted of half a dozen Japanese and Formosan nurses and 30 medical orderlies. The Committee examined both Dr. Yoshimi and Dr. Tsuruta. None of the Japanese nurses could be traced. A Formosan nurse, Tsan Pi Sha, who had made an important statement before an Indian Journalist Mr. Harin Shah of India Free Press Journal in 1946, could not be examined as the Committee did not find it possible to visit Formosa. At 2 P. M. on the 18th August 1945, Dr. Yoshimi received a telephone message from the Taihoku Aerodrome to be ready to receive number of persons injured in an air accident. Sometime later, a dozen injured persons including Netaji Subhas Chandra Bose were admitted into the hospital. There is some discrepancy between the witnesses, as to who travelled in which vehicles, and who arrived first. But these are minor points and may be overlooked. When Netaji was taken to the hospital, most of the witnesses have said that he was without any clothes on him, but there are others who say that he came partly covered. A Military Officer identified the big-built foreigner as the Indian leader Netaji Subhas Chandra

Bose. His adjutant, Col. Habibur Rehman, was also admitted at the same time.

2. When he was brought in, Netaji's condition was the most serious, but such was his magnanimity that he told the doctors to attend to the others first and to him last. In view, however, of his condition, the doctors attended to him first. Eye-witnesses, both medical and non-medical, have said that Netaji was burnt all over and his skin had taken on a dark colour, but none of them mentioned any cut injury. Col. Habibur Rehman has said that Netaji had a cut on his head 4 inches long which was bleeding. This is a discrepancy. Netaji was examined by Dr. Yoshimi who says, "I found that he was severely burnt all over his body, and all of it had taken on a greyish colour like ash. Even his head had burns. His face was swollen. In my opinion, his burns were of the severest type i.e. of the third degree. There was no injury on his body from which blood came out. His eyes were also swollen. He could see, but had difficulty in opening them. He was in his senses when he was brought in. He was in high fever ; his temperature was 39° centigrade. His pulse rate was 120 per minute. The condition of his heart was also weak." Dr. Yoshimi has stated that his condition was so serious that he was not likely to survive till the next morning. He says that Netaji's burns were caused by splashing of patrol. After examining Netaji and treating him, Dr. Yoshimi examined and treated the other injured persons. Netaji was not the only person who received severe burns. W/O Ayoagi, the Co-pilot, suffered similar burns over his shoulders. His forearms were also burnt and the legs below his knees were also burnt. All these were caused by splashing of patrol. Major Kono had third degree burns on his hands. Col. Sakai had burns on his hands. Only Lt. Col. Nonogaki did not have any burn or injury. Dr. Yoshimi has stated that Col. Habibur Rehman had burns on one side of his face and on his opposite hand. He also had a cut on his right temple.

3. Dr. Yoshimi has given details of the treatment given to Netaji. Initially Netaji's burns were dressed by Dr. Tsuruta

who applied a white ointment and bandaged him all over. Dr. Yoshimi gave for his heart, one after another, four injections of Vita-Camphor and two injections of Digitamine. He also gave him three intravenous of Ringer-solution, 500 c.c. each. The treatment was given initially in the dressing room, and then Netaji was removed to the attached ward No. 2 where further treatment was carried out. Different witnesses have given different versions of the room in which the initial treatment was given. Dr. Yoshimi has given a sketch plan of the Hospital showing the ward where Netaji lay. There is some discrepancy between the witnesses as to who were in the same ward with Netaji......After the lapse of years, it would perhaps be unwise to lay too much stress on such minor discrepancies, made by persons, many of whom were themselves seriously injured. It would be more reasonable to accept the statement of two doctors that only Netaji and Col. Rehman were kept in one room. Dr. Yoshimi has stated that in the case of severe burns of third degree, the blood gets thicker, and there is high pressure on the heart. In order to relieve this pressure, blood is usually let out and new blood given in its place. Approximately 200 c.c. of Netaji's blood was let out and a blood transfusion to the extent of 400 c.c. was given to him. Dr. Yoshimi has said that this blood was obtained from a Japanese soldier in the Nanmon Military Hospital and was given between 4 and 5 P.M. that day. There is little difference here between this and the evidence of Mr. Harin Shah, an Indian Journalist, who had the chance to enquire into this matter locally, in Formosa 1946. According to Mr. Shah, the blood was donated by a Japanese Medical Student. A more serious discrepancy is in the statement of Dr. Tsuruta, who attended on Netaji, that no blood transfusion was given.......As stated previously, none of the nurses could be examined. One Kazo Mitsui, a medical orderly, at that time at the Nanmon Military Hospital, came on his own, and gave evidence and said that he had helped the doctor attending on Netaji by bringing medicines, etc.

4. Netaji was conscious at the beginning and occasionally

asked for water, a little of which was given each time. ...J. Nakamura says, "During all this time not a word of complaint, either of pain or suffering came from his lips. The Japanese Officers at the other end of the room were groaning with pain, and crying out that they may be killed rather than continue to endure their suffering. This composure of Netaji surprised all of us."

5. Dr. Yoshimi has stated that about 7 or 7-30 P. M. he was informed by Dr. Tsuruta that Netaji's condition had deteriorated and his pulse was very weak. He hurried and gave Netaji injections of Vita-Camphor and Digitamine. In spite of administering stimulants, his heart and pulse beat did not improve. Slowly his life ebbed away. Shortly after 8 P. M. he breathed his last....According to Kazo Mitsui, a medical orderly, he was also present. According to Dr. Tsuruta, the time was about 7 or 8 P. M. Col. Habibur Rehman gave this time as 9 P. M.—six hours after the crash. It may be stated here that in a brief statement made by Dr. Yoshimi in 1946, when he was in Stanby Jail in Hongkong he gave the time 11 P. M. and according to the telegram sent by the Chief of Staff, Southern Army, to O.C. Hikari Kikan, on the 20th August 1945, which was recovered by British Military Intelligence, the death took place at midnight. This was repeated in the first publication of the news on the 23rd of August 1945 by the Japanese Domei Agency. The evidence of the fellow injured persons does not help to establish the correct hour, Lt. Col. Nonogaki and Major Kono had stated that they were removed to the second hospital the same night. Major Takahashi could only say that he heard from a nurse at about 10 P. M. that Netaji expired the same night. Only Capt. Arai said that Netaji had expired. So, the time of death cannot be established with accuracy ; it could be any time between 8 P. M. and Midnight on the 18th August 1945.

6. One of the reasons why many people cast doubt on the fact that Netaji was dead, was the manner in which the news was made known. For reasons not very clear, the Japanese authorities maintained a great deal of secrecy about

it. Presumably, it was partly due to reasons of security, Even in their official correspondence between one Commander and another, Netaji was referred to by the Japanese as Mr. "T". In the secret Telegram, dated 20th August 1945, from the Chief of Southern Army to O.C., Hikari Kikan, it was definitely stated that secreey is to be maintained....General Bhonsle says that the news about Netaji was promptly communicated to him at Bangkok in a series of telegrams. But Sardar Ishar Singh, who was the adviser to the Provisional Government of Azad Hind and Chairman of Thai Territorial Committee of the Indian Independence League, says that the news about Netaji's plane crash and death was communicated by Japanese Military authorities three or four days after Netaji had left Bangkok, that is to say, on the 20th or 21st of August 1945,...The News was broken to Mr. S. A. Ayer by Lt. Col. Tada who was flying with him to Tokyo, on the afternoon of the 20th at Canton. Mr. Debnath Das and others who went on to Hanoi, learnt of the tragedy only from the radio broadcast from Tokyo. It was given out on the 23rd August. Then there was the curious incident narrated by Mr. Debnath Das that a couple of days later, a Japanese Staff Officer came and told him that the plane crash was just a story, and they were not to believe it but to go on acting according to their plan. Col. Pritam Singh was told of this by Mr. Debnath Das.

7. Not only were the Japanese initially secretive, and delayed in publishing the news, but no convincing proof of the death of Netaji was produced before the Indians in South East Asia. Some pictures were taken two days later after the death, one of which shows Col. Habibur Rehman keeping vigil, and another shows a sheet covering some object. From these photographs (copies in annexure II) the dead person cannot be identified...There has been a certain amount of controversy about the watch, Col. Habibur Rehman brought with him, which was later handed over by Pandit Jawaharlal Nehru to the late Mr. Sarat Chandra Bose, elder brother of Netaji. It was a rectangular watch. Col. Habibur Rehman

has stated that it was handed over to him by Dr. Yoshimi as belonging to Netaji, but Dr. Yoshimi said that he did not remember anything about it,...The point about wach remains inconclusive. It may be stated here that these salvaged articles were shown to Netaji's valet Kundan Singh, who was with Netaji from his arrival in Singapore till his departure from Bangkok on 17th August 1945. Kundan Singh identified a number of articles as belonging to Netaji, such as a gold cigarette case studded with precious stones presented by Herr Hitler, a gold cigarette-lighter, a paper-knife used for manicuring, and an oval supari box made of gold....The point that is being made here is that owing to the secrecy, delay in publishing the news, and not bringing forward proofs of Netaji's death by the Japanese authorities, many people were led honestly to doubt that Netaji had died.

8. Soon after the end of hostilities, the Government of India sent two parties of Intelligence Officers (Police) headed by Messrs. Finney and Davies to the Far East to enquire about the whereabouts of Netaji Subhas Chandra Bose, and if possible, to arrest him. Two Indian Police Officers who were in those parties, Mr. H. K. Roy and Mr. K. P. De, appeared before us and gave evidence. Mr. H. K. Roy worked in Mr. Davies's party and proceeded first to Saigon, and then to Taihoku in Septmber 1945. He says that they interviewed the Japanese Military Officer in charge of Saigon Aerodrome, and obtained a list of the passengers of plane. It was the only plane which left Saigon on the 17 August 1945,...Mr. H. K. Roy who helped Mr. Finney to write the report states that the report was definite that Netaji was dead, and thereafter the Government of India withdrew the warrant of arrest against Netaji Subhas Chandra Bose. The Bangkok party seized a telegraphic message conveying the information that the plane carrying Netaji had crashed at Taihoku on the 18th August and that Netaji had expired on the same day. The telegram in question Signal 66, dated 20th August, from the Chief of Staff, Southern Army, to O. C. Hikari Kikan, is reproduced below :

"To O. C. Kikan

From Chief of Staff, Southern Army, Staff II

Signal 66, 20th August

"Top Secret"

"T" while on his way to the capital, as a result of an accident to his aircraft at TAIHOKU at 1400 hours on the 18th August was seriously injured and died at midnight on the same date. His body has been flown to TOKYO by the Formosan Army."

(Mr. "T" as already stated, was cock name for Netaji.) On being questioned, the discrepancy about the body was sought to be clarified by saying that the statement regarding Netaji's death, and not his body was flown to Tokyo. Col. Tada was specially brought down from Tokyo to Saigon for questioning on this point. A parallel enquiry was conducted about the same time at the instance of the Director of Military Intelligence, India for Admiral Lord Mountbattens Headquarters at Kandy, through Col, F. G. Figges at that time attached to General MacArthur's Hea dquarters at Tokyo, about Netaji Subhas Chandra Bose. This enquiry was handled by an American Igtelligence Officer working under G. H. Q., SCAP (Supreme Commander Allied Powers). The conclusion reached by from these reports was that Netaji had died of burns at Taipeh as a result of the air crash.

9. In August 1946, i.e., the year after the events, Mr. Harin Shah, an Indian Journalist visited Formosa at the invitation of the Chiang Kai-Shek Government. There he took up enquiry on his own about Netaji. Mr. Shah came across a number of Formosans who had something to say as to what happened to Netaji at Taihoku. He met some medical students who had heard that Netaji had been severely injured as a result of the air crash, and that a Japanese medical student donated blood for transfusion. He also examined at length a Formosan nurse, Sister Tsan Pi Sha, who said that she was in attendence on Netaji at the Nanmon Military Hospital. She gave correct description of Netaji and Col. Habibur Rehman. In the end, she said that Netaji had died at the hospital at 11 at night......

Mr. Harin Shah's evidence is, therefore, all the more valuable, as it was taken on the spot, soon after the time of occurance. He was satisfied on the strength of his enquiries that Netaji had died at Taihoku as a result of the air accident,

10. It will thus be seen that the evidence given by witnesses before us as to Netaji's death is corroborated by the findings of British and American Intelligence organisations who undertook independent enquiries very soon after the occurance, and the conclusion of an unofficial enquiry conducted a year later by an Indian Journalist. As for the witnesses who have deposed before us, neither from their antecedents, nor from the manner in which they made their statements, has the Committee any reason to disbelieve their stories. These witnesses are of different nationalities. Some were Japanese, Col. Habibur Rehman, an Indian (now a Pakistani), and Col. Figges, an Englishman. They were unconnected with each other and came from different walks of life. There is absolutely no reason why they should come and depose to something which they know to be untrue. The Japanese witnesses came from all over Japan—some of them at much personal loss and inconvenience, for instance Dr. Yoshimi, who owns a medical clinic at Miyasakiken in Kyushi Island, had to close down his clinic for several days and come to Tokyo, a distance of about 1,200 kilometres from his place. The Japanese Foreign Office had themselves conducted an enquiry into the matter sometime ago, and had suggested the names of some witnesses who might give us information. But Japan is not a totalitarian country and the mere fact that some names were suggested by the Japanese Foreign Office need not necessarily mean that they were compelled to tell any particular story. It may be added that Committee examined a much larger number of witnesses than originally suggested by the Japanese Foreign Office. These witnesses were either called by the Committee, or they themselves volunteered in response to a newspaper notice, issued by the Committee. Most of the Japanese witnesses are not now connected with the Government of Japan, and are in no way obliged to give evidence

according to any particular brief. In fact, as will be seen different witnesses have given different stories, which would disprove any suggestion of "Prompting". So, not withstanding discrepancies and variations, which are only too likely after the lapse of so many years, the statements of witnesses must be taken as worthy of credit. These statements are corroborated by enquiries through military and non-official channels soon after the events. They all point to the fact that Netaji Subhas Chandra Bose died at Taihoku Military Hospital on the night of 18th August 1945. We accept this conclusion. In General Shidei's service record, the cause of his death is shown as death by war. The same was true of Netaji, only in his case it was a different war, the war for the independence of India. His war was continuing. He was only changing over from one battle field to another—from South-East Asia to Manchuria.

11. Against this mass of evidence that Netaji died as a result of the plane crash, there are some who hold that he is alive. Those who believe this are again divided into two schools. The first, mainly consisting of certain members of the Bose family, believe that although Netaji is alive, nobody is in touch with him, and for reasons of his own, he is in hiding, and will reappear in India at a time chosen by him. The best spokesman of this school was Mr. Aurobindo Bose. According to him Netaji was a master planner, and he had planned his last escape so well, that nobody could find his clues. The Japanese Government helped him to escape, and they have, therefore, put out an elaborate deception story which is supported by Japanese witnesses. As for Col. Habibur Rehman, he is bound by an oath of secrecy and his injuries are faked.

12. The other school claims that Netaji is not only alive, but people have seen him, and that he has appeared here and there mainly in China, and also on the border of India and China. Mr. Mathuralingam Thevar, M. L. A. (Madras), has issued press statements from time to time that he has been in contact with Netaji. He was the first witness to be called by

the Committee. Although implored by the Committee, he would not part with his secret. He took the plea that he must first be satisfied that Netaji Subhas Chandra Bose was not on the list of War Criminals. When on enquiry from the Government of India, he was told that the Government did not have any such list, he was still not satisfied.......Mr. S. M. Goswami has produced a sensational pamphlet "Netaji Mystery Revealed." He gave evidence before the Committee in Calcutta, and claims that Netaji is alive. Apparently, his theory started in 1949, when he went to Germany, and met a certain gentleman, Herr Heins Von Have, who told him that Netaji was aiive. Herr Have claimed to have been acquainted with Netaji. Mr. Goswami was questioned regarding Von Have. In reply, he said that when the plane crash took place, Von Have was in Tokyo. He was not sure whether he went to Formosa to enquire into the plane crash, or heard it from some German friends. These German friends, about whom no particulars are supplied, told Von Have that there had been no crash. Mr. Goswami did not go to Formosa. Such information can only be described as hearsay. Mr. Goswami has put forward several suggestions as to where Netaji was, or is—Soviet Russia, China and Mongolia. Mr. Goswami is prepared to hold that by stages Netaji, originally a Russian prisoner, became a Chinese Communist General, and subsequently a Mongolian Trade Union Delegate. But his main reliance is on pictures. Opposite page 8 of pamphlet "Netaji Mystery Revealed" is a picture of Chinese Military Officers. The person sixth from the left is supposed to resemble Netaji Subhas Chandra Bose. Identity is very difficult to establish from such picture, particularly when persons appear in foreign uniform. But the picture on which Mr. Goswami pinned his faith was that of visit of Mongolian Trade Delegation to Peking in 1952, which came to his hand in 1955, in a book published by the Workers' Press, Peking....In his enthusiasm, Mr. Goswami appeared before the Committee for the second time. He was questioned further about the Mongolian Delegate. The questions and answer are given below :

"Question : How did you come to know about the activities of this particular Mongolian Delegate ?

Reply : From the statement of Lt. N. B. Das made through the press.

Question : How did Lt. Das come to know of the whereabouts of the Mongolian Delegates ?

Reply : It is upto him to answer."

In this connection it may be stated that a certain person claiming to be Lt. N. B. Das appeared, and deposed before the Committee. Mr. Debnath Das, who was an advisor to the Provisional Government of Azad Hind, wrote a letter about this person to the Chairman of the Committee which reads we follows :

"It appeared in the press that one Lt. N. B. Das gave evidence to the Commission. Das was a Habildar attached to Col. P. N. Dutta and was at Zawabudy, Central Burma, when the Allied Troops took Burma. He was not a Security Officer. He was not stationed at Bangkok as was reported."

The value of information gleaned from such a source cannot be high, and the theories built by Mr. Goswami on such hearsay cannot carry much weight.,

13. One responsible person who suggested that Netaji might be alive, is Mr. A. K. Gupta, Joint Editor of the Hindusthan Standard. Mr. Gupta said that in 1951 he undertook a tour in the hill areas of Assam. There he met Mr. Phizo, the Naga leader. Mr. Phizo told him that even before the crash of Netaji's plane, he knew that such a false story would be given out.......To such suggestions, one can only quote from the historic speech Netaji delivered when he assumed charge of the Indian Independence Movement in Singapore on the 4th July 1943 : "Even my enemies will not have the audacity to say that I can injure the interest of my country."

(Page 79 in Major General A. C. Chatterjee's book India's Struggle for freedom).

CHAPTER IV

CREMATION OF NETAJI'S BODY

Immediately after Netaji passed away, the Japanese present stood up and paid respect to his body by saluting. Col. Habibur Rehman was one of Netaji's most trusted officers, and had been especially chosen by Netaji to accompany him on this journey. Habibur Rehman was deeply affected by Netaji's death. The Interpreter Nakamura who was present at the death bed, had graphically described how Col. Rehman prayed for the dead. At first he came and knelt by Netaji's bed, and prayed for five or six minutes. Then he opened the window and looking at the sky, prayed for a longer time, and then slowly came to his bed and lay down. All present in the room was affected. Dr. Yoshimi says that tears were rolling down Col. Rehman's eyes. The nurses were crying loudly. Everybody present in the room was crying. In fact, describing this poignant scene before the Committee, Dr. Yoshimi himself broke down and sobbed audibly. There after, Dr. Yoshimi informed the Military Headquarters of the sad event. Major Nagatomo was sent down from Headquarters. He came and saw Netaji's body lying on the hospital bed swathed in bandages. The body was removed to one corner of the room, and a screen was put round it, and according to Japanese custom, flowers and candles were placed by its side. The changed position is shown in the sketches of the hospital furnished by Dr. Yoshimi and Col. Habibur Rehman. Major Nagatomo posted soldiers to guard the body.

2. Next day, i.e. on the 19th August, the Formosan Army Headquarters received a telegram from the Imperial General Headquarters that the body should be flown to Tokyo by plane. Accordingly, Major Nagatomo instructed Dr. Yoshimi to inject Formalene into the body to preserve it. On the same day, the body was put in a coffin which according to

Col. Habibur Rehman, was made of Camphor-wood. Major Nagatomo says that he had lifted the lid of the coffin and seen Netaji's face. He says, "I saw Mr. Bose's face. It was a big round face." Col. Habibur Rehman also saw the body being put in the coffin. Meanwhile, Col. Habibur Rehman had been pressing the local Japanese Military authorities to arrange for the transport of the body, preferably to Singapore or alternatively to Tokyo. On that day, i.e. on the 19th, some senior Military Officers came to the Hospital, and expressed their regrets for the unfortunate accident and Netaji's demise. But the body was not transported by plane either to Singapore or to Tokyo. According to Major Nagatomo, the first telegram from the Imperial General Headquarters was followed by a second telegram, asking them not to send the body to Tokyo, but cremate it at Taihoku. No reason was given for this change of orders. Col. Habibur Rehman was told, on the 20th, that the body could not to be transported by plane, because the coffin was too big to be carried in the small plane which the Japanese had. Formosa was hot in August, and it was the third day after the death. Finding no alternative, he had to agree to the cremation of the body at Taihoku. There is some discrepancy about the date of cremation. In his statement before us, Col. Habibur Rehman had given the date of cremation as 20th of August, but in a statement signed by him dated 24th August 1945, and handed to Mr. Murti, the date was given as 22nd August, Mr. J. Nakamura definitely gives the date as 20th August. Dr. Yoshimi says that so far as he could remember, it was the 20th, but he was not very sure. Major Nagatomo has not mentioned any date, but says that the cremation was done "On the same day, on receipt of the second telegram from the Imperial General Headquarters"—which appears to have been received on the 19th of August. It is unlikely that with so much argument and change of orders, the body was cremated on the 19th, i.e. the date following the death. The cremation is more likely to have taken place sometime later.

3. The cremation was simple and quiet ceremony.

Although Col. Habibur Rehaman says that the Hospital staff and a large number of others accompanied the cortege, this is not confirmed by Dr. Yoshimi, the doctor in charge, of the Military Hospital. Dr. Yoshimi simply says, "that the body was taken from the Hospital by the captain of the guard that was posted there on the 18th......The coffin was placed in the truck and carried away" And Major Nagatomo, who has been detailed by the Military Headquarters to make all necessary arrangements for the cremation and funeral of Netaji's body, says that the coffin was placed on a truck, with twelve soldiers, and ahead of it he went in a car with the Indian Adjutant (Col. Habibur Rehman) and the Interpreter (Mr. Nakamura). The Interpreter, Mr. Nakamura, has given a detailed description as to what had happened at the crematorium. The crematorium was visited by Mr. Harin Shah. It was the Taihoku City Government crematorium, and was reached after crossing the main Sun-Yat-Sen Avenue. Mr. Harin Shah took some photographs of crematorium both from inside and outside. Apart from the Japanese soldiers, persons definitely present at the cremation were :

Col. Habibur Rehman
Major Nagatomo
Mr. J. Nakamura,

...a Buddhist priest and the crematorium Attendant, Mr. Chu Tung...According to the Buddhist custom, I first picked a bone from the throat with two chop-sticks and placed it in the box. Then I picked a bone from every portion of his body and placed it in the box. The Indian Adjutant did the same after me. I do not remember about the Interpreter, whether he picked up the bones or not. In this way, the whole of the box was filled up. The lid of the box containing the bones was nailed but I am not quite sure whether it was nailed here, or in the temple. After closing the box, it was wrapped up in white cloth. After wrapping the box in a white cloth, it was put round the neck of the Indian Adjutant and we went by car to the Nishi (West) Honganji temple. That day a special ceremony was held at the temple."

Col. Habibur Rehman corroborates Major Nagamoto's version, but he does not give so much details. Mr. Harin Shah had the advantage of not only visiting the crematorium in 1946, but he also had questioned the caretaker; Mr. Chu Tung. He said that the coffin of Netaji was very big. It was brought to the crematorium at about 3 P.M. and it took 8 hours to burn.. ...According to Mr. Chu Tung, it was he who collected the ashes next morning and put it into usual wooden funeral urn......He told Mr. Harin Shah that one Indian, with his fore arm bandaged came in a car with some Japanese and took away the urn. He described the Indian as a tall person dressed in white with his fore arm bandaged.

5. ...The slight confusion caused by the Southern Army Headquarter's telegram, dated 20th August, that the body had been flown to Tokyo, could be explained in two ways. First their own explanation that the report regarding Netaji's body was flown to Tokyo, presumably with Col. Tada. Secondly, they might have been referring at that time to the first instruction, received from Imperial General Headquarters to fly the body to Tokyo, which was subsequently counter-manded. It can be taken as well established that the body of Netaji Subhas Chandra Bose was burnt at Taihoku Crematorium, and his ashes were thereafter deposited at the Nishi Honganji temple in the same city......

6. ...It is true that at that time, air passages were not easy to come by. Major Kono, for instance, who was on transfer to Tokyo, had to wait at Saigon for two weeks for his passage. But then we have it from the evidence of Captain Nakamura alias Yamamoto that the flight of Japanese aircraft was restricted only after the 25th of August, i.e. 8 days after Netaji's departure from Saigon. Perhaps, it was not difficult to arrange for 7 seats in an air transport. General Isoda, the Chief of the Japanese Liaison Mission, expected this to be provided, and was disappointed when he was informed to the contrary. Then the plane itself was not probably in a particularly good state, as may be deduced from the fact that an engine had to be changed at Saigon. General Isayama,

Chief of the General Staff, Formosan Army had said that the engine of the plane was worn out. When the crash took place, it was dealt with in a somewhat casual manner......The Chief of the General Staff of the Formosan Army, General Isayama, who was candid enough to say that he learnt of the accident when he went to his office the next morning. And although Lt. Col. Nonogaki has stated that ; on informing the Headquarters, some Staff Officers came while Netaji was alive, the Staff Officers themselves, namely Col. Miyata and Major Nagatomo, say that they arrived after Netaji had died. Major Nagatomo says that immediately after receiving the information, General Ando, Commander of the Formosan Army, went to the hospital to see Netaji. He also says that General Ando attended the subsequent funeral ceremony at the Nishi Honganji temple. General Isayama, Chief of the General Staff, who should know what the Army Commander was doing, gives a completely different story. He says neither he nor General Ando went either to the hospital to pay respects to Netaji's body, or attended any funeral ceremony. He goes on to say that the Army Commander had shut himself up in his house from the day of surrender of Japan, and did not come out. In justification, he has said that they kept away so as not to give prominence to the fact that an important person like Netaji was fleeing to Tokyo. That explanation does not appear very convincing when he himself said that a week later he went and received Dr. Ba Maw, the Prime Minister of Burma, and General Tanaka, Chief of the General Staff, Burma Army, who were on their way to Tokyo. Apparently, no particular interest was taken by the local Army Command as to what happened to Netaji's body. A comparatively Junior officer, a Major (Nagatomo), was detailed and thereafter no further interest was apparently taken. General Isayama says, "I left the matter of disposal of Mr. Bose's ashes to my Staff Officer, and since I did not receive any report from him I presume everything must have worked out smoothly." One would have at least expected a formal enquiry into the air crash, which is more or less a routine matter......

CHAPTER V

Netaji's Ashes

The last part of this sad story is about Netajis ashes. The day the ashes were taken out of crematorium, the urn in which they were kept was taken and left at the Nishi Honganji temple in Taihoku city. Col. Habibur Rehman, Major Nagatomo and Mr. J. Nakamura, Interpreter, went to the temple. Mr. Nakamura has said that the urn was handed over to the Head Priest, with instructions that it should be well looked after, and fresh flowers placed before it every day. The urn was to be kept for the time being in the temple, till it was taken away to its final resting place. This temporary deposit seems to have been customary, for Mr. Nakamura says that in the same temple he saw another urn containing the ashes of General Shidei. There were two Buddhist temples near Nanmon Military Hospital, Taihoku. One was the Nishi (west) Honganji temple which was the biggest temple in Formosa and had twelve priests, and the other was the Higashi (west) Honganji temple which had eight priests. The Nishi Honganji temple was nearer to the Nanmon Military Hospital, and the other temple was 600 metres away from it. These details have been given by the priest of Higashi Honganji temple, Rev. H. Hidemaru, whom the Committee examined as a witness. No priest from the Nishi Honganji temple could be traced. According to Rev. Hidemaru, the ashes were kept in a white box in the Nishi Honganji temple......

2. On the 5th September, a plane was flying to Tokyo. A passage was secured for Col. Habibur Rehman who had been asking for it from the Headquarters of the Formosan Army. Lt. Col. Shibuya, the Staff Officer of the same Headquarters, also decided to send by the same plane that urn containing Netaji's ashes, and the box containing valuables,

and asked Lt, Col. T. Sakai to take charge of them. Sub-Lt. T. Hayashida was also asked to proceed to the Taihoku Aerodrome to carry the two boxes to Tokyo. According to the written statement of Lt. Col. T. Sakai, at that time his hands and face were still bandaged, and he could not lift any luggage. One Major Nakamiya, who was acquainted with Col. Habibur Rehman, also went on the same 'plane. Lt. Hayashida says that he arrived at the aerodrome at 11 A.M. on the 5th September, and found that Lt. Col. Sakai, Major Nakamiya and Col. Habibur Rehman were there. There were also two boxes—one containing Netaji's ashes, and the other gold and jewellery. The first box was 1 feet cubical in shape, and the second box was 3 ft. x 2½ ft. x 2 ft. Both were of wood. The first was covered with white cloth, and the second had a leather covering. Both were nailed. He slung the box containing the ashes from his neck in the Japanese style. According to Lt. Col. Sakai, the aerodrome was Minami Aerodrome near Taihoku. The plane accident had taken place at the bigger Matsuyama Aerodrome. Major Nagatomo had arranged for the box containing the ashes to be taken from the temple, and delivered at the aerodrome. The aeroplane in which the party was travelling was, according to Col. Habibur Rehman a Red Cross plane. Lt. Col. Sakai says that it was a 97 heavy bomber marked with a green cross. It flew to Ganmosh Airfield near Fukuoka in Kyushu, the southern most island of Japan. There is some discrepancy as to what happened then. According to Lt. Col. Sakai and Lt. Hayashida they all left by train next afternoon at 3 P. M., after having collected a guard of one Sergeant and two soldiers from the local Military Headquarters. According to Lt. Col. Sakai, they had consultations at Fukuoka and decided that, in the interest of safety, the party should be divided into two. While Col. Habibur Rehman and Major Nakamiya flew on to Tokyo, he (Lt. Col. Sakai) and Lt. Hayashida with ashes and the box of valuables, proceeded by train, attended by a guard of three soldiers from the local Army Headquarters. There is also discrepancy as regards the time of departure

from Fukuoka and arrival at Tokyo. Col. Habibur Rehman says that the party left by night by goods train, and next morning (6th September) they reached Tokyo. Lt. Col. Sakai says that he and Lt. Hayashida left Fukuoka on the morning of 6th September and reached Tokyo the same evening. According to the current time table of the Japanese National Railways, even the fast Express trains take 20 to 22 hours to reach Tokyo from Fukuoka (Hakata). It is unlikely that in 1945, after the war, the service was so much faster. So the time of travel, approximately 12 hours, given by Col. Habibur Rehman or Lt. Col. Sakai is incorrect. The timing mentioned by Lt. Hayashida is more reasonable. He says that the party left Fukuoka at 3 P.M. on 6th September and arrived at 6 P.M. on the 7th September. This date tallies with what has been mentioned by two officers of the Imperial General Staff, Major Kinoshita and Lt. Takakura, who received the ashes. However, the discrepancy as regards the time is not of great importance.

3. All the three witnesses, Col. Habibur Rehman, Lt. Col. Sakai and Lt. Hayashida, says that immediately on arrival at Tokyo the two boxes containing the ashes and valuables were taken to the Imperial General Headquarters. As it was after office hours, they made over charge to the Duty Officer, Major Kinoshita. The Duty Officer Major Kinoshita was examined by the Committee. He said that on the 7th of September at 11 P.M. an officer of the rank of Lt. Col. handed over to him for safe custody two wooden boxes which he said he had brought from Taiwan (Formosa). One box was 8″ in size and the other 10″ in size. One was light and the other heavy. The boxes were nailed and wrapped in cloth but were not sealed. The officer who brought them said that the smaller box contained the ashes of Netaji Subhas Chandra Bose, while the bigger one contained gold. As the boxes were received at late at night Major Kinoshita kept them in his room in his personal custody, and in the morning handed them over to the next Duty Officer, Lt. Col. Takakura. Lt. Col. Sakai went round to the Imperial

General Headquarters next morning, and met Lt. Col. Takakura, Chief of the Military Affairs Section, whom he knew, and confirmed that he had received the ashes and the box containing valuables. Neither the Duty Officers gave or took any receipt for the two boxes nor made any written entries about them. Having taken charge of the ashes Lt. Col. Takakura called the other officers of the Headquarters and paid respects to Netaji's ashes. He then contacted Mr. Ramamurti, President of the Indian Independence League, Tokyo, over the telephone and asked him to come to the Headquarters and take charge of the ashes. A car was also arranged for Mr. Murti. Mr. Murti came in about half an hours time, accompanied by Mr. Ayer, who had by then arrived in Tokyo. At the main entrance of the Imperial General Headquarters, on the morning of the 8th September, the ashes were handed over to Messrs Murti and Ayer, by Lt. Col. Takakura in a simple solemn ceremony which is described by Mr. Murti in the following words :

"There Major Takakura (later Lt. Col.) was present and there were two or three other officers. I do not recollect whether General Arishi was there. General Arishi was in the Imperial General Headquarters. Major Takakura told us that General Arishi had asked him to convey his personal condolences to us and to deliver the ashes to us. The urn was wrapped in white cloth, and was taken out from the safety locker. It had straps of long-cloth with which to sling around the neck of the bearer. It was a cubical box of about 1 foot dimension. Several other Military personal who were present solemnly bowed to the urn. It was received by Mr. Ayer. He was visibly moved by an overwhelming emotion. An Army Sedan car was arranged for our conveyance, Mr. Ayer and meself took the urn direct to my house."

4. At that time Mr. Murti's house was being used for all purposes as the Headquarters of the Indian Independence League. The urn was placed on a pedastal and flowers and incense were put on it. On the urn, which was so far without any marking, the words "Netaji Subhas Chandra Bose" were

written in English letters by Mr. Ayer. Indian Cadets, generally known as Tokyo boys, came and kept vigil over the ashes. The same night Col. Habibur Rehman turned up first at Mr., Murti's house, and later went to Mrs, Sahay's house, and met Mr. Ayer who was staying there. Since hearing the story of the crash Mr. Ayer had held up his judgement awaiting the arrival of Col. Habibur Rehman. Mr. Murti in his statement says : "Mr. Ayer lost no time in confronting him with a barrage of questions to all of which Col. Rehman very calmly, seriously and solemnly gave adequate replies. This conversation definitely cleared all doubts which Mr. Ayer had, and now Mr. Ayer was resolved that the crash was an indisputible reality and Netaji was a victim of it. Col. Rehman himself was surprised that Mr. Ayer should doubt his story. He showed his own hands and face as visible proof of what had happened. With a serious and solemn face, and eyes burning with sincerety Col. Rehman allayed all doubts of any-one who came in contact witn him, and we all accepted this as truth without a shadow of doubts in our minds." Next day he repeated the story to bigger a audiance. Fearing that he might be arrested by the Allies, Col. Habibur Rehman also handed over to Mr. Murti a copy of a brief written statement which was dated 24th August 1945 about what had happened to Netaji. (As previously stated, this statement was handed over to the Committee by Mr. J. Murti). (Annexure I).

5. To revert to the ashes, as the American Occupation of Japan had begun, Mr. Murti and his friends felt that an elaborate funeral ceremony would attract attention and might be treated as a hostile demonstration by the Occupation Forces. They, therefore, decided to hold such a ceremony on a modest scale. Large ceremonies are usually held at large temples like Nishi Honganji temple, Tokyo. For the modest ceremony they looked for a smaller temple and fixed upon the Renkoji temple in the same quarter of Tokyo, Sugunamiku, in which Mr. Murti lived. The priest, Rev. Mochizuki, also agreed to the proposal. At the request of Mrs. Sahay, the ashes were kept in her house for a day and

homage was paid to them also. Then the funeral ceremony was held at Renkoji temple. There is some difference as to the date. Mr. Ramamurti says that it was held on the 12th or 13th of September. Mr. Ayer gives the date as 14th September. According to Col. Habibur Rehman (who, however, was not present) it was five or six days after his arrival in Tokyo. According to the priest, Rev. Mochizuki, the date was the 18th of September. On the day of the funeral ceremony, the ashes were carried in a procession from Mrs. Sahaya's house to the Renkoji temple. Mr. J. Murti had described the occasion thus :

"All the Tokyo I. N. A. Cadets, my brother and I, Mrs. Sahay and her family and the I.N.A. broadcasting unit were present. Mr. Ayer was also with the procession. Col. Rehman could not accompany the procession as he was wanted by the American Police for interrogation. Besides the Tokyo Cadets numbering about 40, there were a small number of Japanese about 10 or 15 Japanese Military Officers and civilians were also present in the procession. The ashes were carried by a cadet by the name of Virick. The procession went from Mrs. Sahaya's house to the Renkoji temple, which was at a distance of about two miles from her house. On arrival at the temple, the ashes were put on the alter, and as the flowers and wreaths were placed, the religious ceremony was conducted by four or five Buddhist priests."

Lt. Col. Takakura says that he attended the funeral ceremony as a representative of the Imperial General Headquarters. There were approximately 100 persons, including some Japanese. The details of the procession given by Mr. J. Murti are corroborated by Rev. Mochizuki, priest of the Renkoji temple. About the ceremony he says : "The temple of which I am the priest is a Buddhist temple. When the ashes were brought, we placed them on a wooden stand. The ashes were contained in a small wooden box, 8″ cube. It was wrapped in a white cloth on which was written Netaji Subhas Chandra Bose. I can read printed English a little. At the ceremony I called six other priests. I stood in the front. We burnt

incense (Aggarbathi). Mr. Murti gave 30 yens wrapped in a piece of paper. I distributed this sum amongst all the priests ...The ceremony lasted for one hour, after which people went away, and I stayed behind in the temple by the side of the ashes to make sure that nobody came and took them away.

7. ......From what has been said, it will be seen that the ashes were moved in stages from the Crematorium to Nishi Honganji temple, from there to Minami Aerodrome and thence to Tokyo Imperial General Headquarters. The progress thereafter was from the Imperial General Headquarters, first to Mr. Ramamurti's house, and then to Mrs. Sahay's house, and finally to the Renkoji temple. There is no break in the chain. From the first, i.e., from the crematorium, the ashes were taken...

......There is no reason to believe that the temple was in a dilapidated condition a year back. The ashes were not kept in a casual manner, but well-kept, and looked after by the priest, Rev. Mochizuki. The Renkoji temple was inspected by the memhers of the Committee on the 30th May, 1956. An extract from the note (Annexure I) given below will show the condition of the temple and how the ashes are kept :

"The Renkoji temple is situated in Suginamiku quarter of Tokyo, about 6 miles from the centre of the town, where the Indian Embassy is situated. The temple is of a moderate size, built of timber in the usual style of Japanese Buddhist temples. Around it is a small Japanese garden. The temple, although not very large, is well kept. The ashes are kept in the main shrine just behind the alter in a large glass case. In this case are kept various venerated objects, such as guilded images of *Bodhisattvas*. On the left hand side of the glass case is a small wooden casket in the shape of a pagoda about 2 ft. high. In front of it is a small portrait of Netaji Subhas Chandra Bose. A larger photograph of Netaji is kept outside in the left hand corner of the glass case. Incense were burning before it. Rev. Mochizuki took out from the pagoda shaped casket a rectangular shaped wooden box painted red. On opening it was revealed a small container about 8″ cube

covered with some kind of white cloth. On it was written in large English letters in black ink "NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE". The contents of the smaller container were not examined. As he was handling these objects, Rev. Mochizuki was intoning some sacred *mantras*. One by one, he put back the container into their original position and securely locked with a key the door of the glass case......As in the case of most Japanese temples the temple was very clean, both inside and outside. The Committee was satisfied that Rev. Mochizuki takes good care of the ashes, and they are being kept properly within the limited means of the authorities of the Renkoji temple."

The reasons for doubts given by Mr. J. C. Sinha who went along with Mrs. Illa Pal in 1955, are somewhat different. He says that he had met one Mr. VIRICK, a young man who was one of the Tokyo cadet (I.N.A.) during the war. He was the cadet who had carried the urn containing the ashes to the Renkoji temple on the day of the original funeral ceremony on the 18th September 1945, Mr. Virick had returned to Japan, and was studying in the Tokyo University. His name was mentioned in this connection specifically by witness Mr. J. Murti. From Mr. Sinha's statement it appears that Mr. Virick who went with him had some difficulty in finding his way to the temple and in finding out where the urn was kept, Mr. Virick confessed to Mr. Sinha that since depositing the ashes in 1945 he had not been to the Renkoji temple. Mr. Sinha has given reason for his disbelief. He says, "......had they been Netaji's ashes, as Mr. Virick told me, the person who is in Tokyo for the last three years from today, and if he had been really that person who had carried the ashes to the temple, should have visited that temple a number of times to pay his homage and respects to that great departed leader." Mr. Virick was in Tokyo as a cadet when he was a boy. It is presumed that like others he was repatriated soon after the war terminated. Years have passed and he again came back to Tokyo as a University student apparently in 1952-53. As a young cadet he could not have

had much to do with Netaji, and one cannot say how much boyish impression the grown up man retained. In any case, it would hardly be fair or logical to arrive at any conclusion about the genuineness of the ashes on the basis of personal reactions, apparent lack of attachment for the same ashes on the part of Mr. VIRICK.

10. The third person who cast doubt is Mr. S. M. Goswami. Mr. Goswami appeared before the Committee twice. In his second statement recorded on the 16th June, Mr. Goswami says that whereas in 1953 he found that the writing on the urn of the words 'NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE'S ASHES' was in italics, he was surprised to find a picture in Amrita Bazar Patrika, dated the 5th June 1956 that the writing 'NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE' was in block letters. He concluded that the whole thing had been changed since 1953. On looking at Amrita Bazar Patrika, dated the 5th June 1956, that is, the picture of the urn appearing on its front page, it is seen that the writing is in block letters and not in italics.

CHAPTER VII

Recommendation

The Committee has come to the conclusion that Netaji Subhas Chandra Bose met his death in an air crash, and that the ashes now at Renkoji temple, Tokyo, are his ashes......If ashes are taken to be genuine, Renkoji temple cannot obviously be their final resting place......It is time that his ashes were brought to India with due honour, and a memorial erected over them at a suitable place......

Sd/—Shah Nawaz Khan
S. N. Maitra

ANNEXURE I

1. General Shidei's service record
2. Gaimusho's Report that there was no enquiry into the crash
3. Committee's report on Renkoji temple
4. Copy of telegram from the Japanese Government to Netaji Subhas Chandra Bose received from Shri Debnath Das
5. Statement of Col. Habibur Rehman regarding the air crash at Taihoku, Formosa, dated 24th August 1945
6. Photostat copy of list of treasure, signed by Col. Habibur Rehman
7. Photostat copy of the list of treasure, signed by Mr. S. A. Ayer
8. Points of agreement on writing the report
9. Copy of telegram about "Mongolian Delegate"
10. List of witnesses

General Shidei's service record

The GAIMUSHO
June 4th, 1956

Dear Mr. Dar,

In compliance with the request of the Netaji Subhas Chandra Bose Enquiry Commission, made at the Third Regular Meeting on May 26, 1956, I wish to state as follows :

1. * * *
* * *

2. Military Record on the death of the late Lt. General T. Shidei.

Two copies of the record......

(1) * * *
* * *

(2) Military Record on the Death of the Lt. Gen T. Shidei

Two copies of the record in question, secured from the Operation Branch, Repatriation Relief Bureau, Ministry of Health and Welfare, is attached hereto as enclosure respectively.

Mentioned above be translated to the Commission.

I should appreciate it very much if you would be good enough to transmit the above reply to the said Commission.

Sincerely Yours,
HISAJI HATTORI
Chief of 4th Section,
Assian Affairs Bureau, GAIMUSHO

Mr. A. K. Dar,
First Secretary,
Embassy of India.

(Translation)

RYU—SEN—MAN No. 483 August 4th, 1947

To
President of Demobilization Agency.

From :
Chief, Korean & Manchurian Affairs Section,
First Demobilization Bureau, Demobilization Agency.

[Subject-Application for Promotion of War-Dead]

Whereas the person mentioned below comes under

Paragraph 5, Article 26 of ICHIFUKU (First Demobilization Bureau) No. 744 of 1946, the application for his promotion is submitted herewith for your consideration.

Date of Death	August 18, 1945
Cause of Death	Death by war
Place of Death	Taihoku Airfield
Military Rank	Attached to Military Headquarters in Manchuria
Name	Lieut, General Tsunamasa SHIDEI
Date of birth	January 27, 1895
Permanent Domicile	No 24, Oku-onoe-cho, Yamasahina-Zushi, Higashiyama-ku, Kyoto city

Chief, Korean and Manchurian Affairs Section,
First Demobilization Bureau,
Demobilization Agency.
(Official Seal)

N.B. The promotion applied for was not approved.

Military career of Lieut General Shidei

December 25, 1915 :	Appointed Sub-Lieutenant of Cavalry
August 1, 1940 :	Appointed Major General
October 27, 1943 :	Appointed Lieut. General
May 23, 1945 :	Appointed the Chief of Staff of Japanese Corps in Burma
August 18, 1945 :	Died by war in Formosa

Examined and authenticated by the Ministry of Foreign Affairs.

(Seal)
(Sd) YASUTERU ASAHINA
Secretary
Ministry of External Affairs
(Archives Section)

June 4, 1956

Gaimusho's Report regarding Enquiry into the Crash

THE GAIMUSHO
June 4, 1956,

Dear Mr. Dar,

In compliance with the request of the Netaji Subhas Chandra Bose Enquiry commission, made at the Third Regular Meeting on May 26, 1956, I wish to state in reply as follows :

(1) Official Enquiry Commission on the Accident of the Plane where in Netaji was emplaned.

As a result of investigation made at the Operation Section, Repatriation Relief Bureau, Ministry of Health and Welfare, it has been revealed that no official enquiry Commission to determine the causes of the accident in question was held so far.

(2) * * *
* * *

I should appreciate it very much if you would be good enough to transmit the above reply to the said Commission.

Sincerely Yours
HISAJI HATTORI
Chief of 4th Section, Asian Affairs Bureau,
GAIMUSHO

Mr. A. K. Dar,
First Secretary,
Embassy of India.

Note on local Inspection of Renkoji Temple, Tokyo

On the 30th May after concluding the evidence of Rev. Mochizuki, the head of the priest of the Renkoji temple members of the Committee visited the Renkoji temple accompanied by Rev. Mochizuki and five lay members of the Temple Committee. The Renkoji temple is situated in Suginamiku quarter of Tokyo, about 6 miles from the Centre of the town where the Indian Embassy is situated. The temple is of a moderate size, built of timber in the usual style of Japanese Buddhist temples. Around it is a small Japanese garden. The temple, although not very large, is well kept. The ashes are kept in the main shrine. Just

behind the alter is a large glass case. In this case are kept various venerated objects such as gilded images of *Bodhisattvas.* On the left hand side of the glass case is a small wooden casket in the shape of a pagoda about 2 ft. high. In front of it is a small portrait of Netaji Subhas Chandra Bose. A larger photograph of Netaji is kept outside in the left hand corner of the glass case. Incense was burning before it. Rev. Mochizuki took out from the pagoda shaped casket a rectangular-shaped wooden box painted red. On opening it was revealed a small container about 8″ cube covered with some kind of white cloth. On it was written in large English letters in black ink "Netaji Subhas Chandra Bose." The contents of the small container were not examined. As he was handling these objects, Rev. Mochizuki was intoning some sacred mantra. One by one, he put back the container into their original positions, and securely locked with a key the door of the glass case. Before entering the shrine, the Committee was entertained to tea in the Japanese style by the priest and members of the Temple Committee. In all, our Committee spent about half an hour at the temple. As in the case of most Japanese temples, the temple was very clean both inside and outside. The Committee was satisfied that Rev. Mochizuki takes good care of the ashes, and they are being kept properly within the limited means of the authorities of the Renkoji temple.

Shri Debnath Das
171/3, Rash Behari Avenue
Calcutta—19
The 13th June, 1956

To
The Chairman,
Netaji Enquiry Commission,
Government of India,
NEW DELHI.

Sir,

Enclosed herewith you will kindly find some papers in connection with steps that Netaji adopted to continue India's

struggle for freedom. I could not submit these papers when I appeared to give evidence since they were kept at some of my friend's house and could not be had in time.

1. This is the English translation of the message received by Netaji from Tokyo through Southern Command in reply to Netaji's enquiry on the attitude of the Japanese Government to extend facilities to proceed to Russia with some of his associates should he (Netaji) so desired in the event of Japanese collapse. The English version is, no doubt, rendered by some Japanese Officers as was usual and was submitted along with the original letter that was in Japanese. This was delivered to Netaji by the second week of June 1945 (The original English typed copy of this message submitted by the Hikari Kikan is in my possession, enclosed one being the true copy).

2 & 3.........

Jai Hind
DEBNATH DAS

Copy of Tokyo Telegram to Southern Command Regarding Netaji's opinion for their consideration.

1. The opinion of the Nippon Government with regard to Your Excellency's plan of approaching the Soviet is as follows :

(a) Not only the assistance by Nippon Government to Your Excellency who are firmly determined to Co-operate to the last with Nippon in order to attain the object of Indian Independence remains wholly unchanged but it also desires to still further strengthen the spiritual tie.

(b) Nippon Government pays a deep respect with its whole heart to Your Excellency's Co-operation with Nippon on the moral strength to the uttmost in order to attain Indian Independence, convinced of Nippon certain victory and without resorting in the least to the opportunism of following in the wake of the powerful in spite of the present unfavourable world situation to Nippon. It may be added that the reason

why the above (a) item which is apparently needless to mention has been repeated here is that the Government more than ever earnestly hopes that Your Excellency will push on fighting for the liberation of India with firm determination to display the spirit of live or die together by India and Nippon.

(c) Nippon Government deems it almost without hope of success to get directly in touch with the Soviet Government on behalf of your excellency and it has no intention of doing so.

2. Nippon Government would like to study separately as to the possibility of Your Excellency's making political move towards India through the Chungking Regime.

3. Nippon Government desires that Your Excellency would endeavour in bringing our active combined operations to a successful issue in spite of present difficulty of war situations through good understanding of Nippon's intention.

Statement of Colonel Habibur Rehman Khan,
Indian National Army Regarding the Air Crash at Taihoku, Formosa.

At 10-30 hrs. on 16-8-1945, Netaji Subhas Chandra Bose accompanied by a few Government and Army Officers, I being one of the party, left Singapore for Bangkok by a Japanese bomber plane. We reached Bangkok at 15-30 hrs.

At 07-30 hrs. on 17-8-1945, two bomber planes left for Saigon. On the Indian side, the following comprised the party :

Netaji Subhas Chandra Bose
Sri Ayer
Col. Habibur Rehman Khan
Sri Gulzara Singh
Sri Debnath Das
Lt. Col. Pritam Singh
Major A. Hasan

Lt. Gen. Isoda, Chief of the Hikari Kikan, and H. E. Hachiya, Japanese Minister to the Provisional Government of Azad Hind, travelled by the other plane.

Saigon was reached at about 10-45 hrs. and negotiations with the Southern Region Command were started.

At about 15-45 hrs. Lt. Gen. Isoda, H. E. Hachiya and Col. Tada, Staff Officer of H. Q. Southern Region, informed Netaji that a maximum of two seats were available in a bomber plane leaving Saigon at 17-00 hrs. the same day. It was decided to avail of the seats and I was to accompany Netaji,

The plane left Saigon Aerodrome at 17-15 hrs. Six senior Japanese Officers, including Lt. Gen. Shidei, Chief of Staff of the Kwangtung Army, also were the passengers on the same plane. We spent the night at Tourane in French Indo-China where we reached at 19-45 hrs.

At 07-00 hrs. on 18-8-1945, we started from Tourane and reached Taihoku, in Formosa, at 14-00 hrs. Here we halted for about 35 minutes. At 14-35 hrs. the plane took off. It had not yet gained much height and was within the outskirts of the air-field when a loud report like that of an explosion was heard from the front. In actual fact, one of the propellers of the aeroplane had broken. Immediately the plane crashed on the ground and it caught fire both in the front and in the rear.

At the time of accident Netaji's position in the aeroplane was as follows :

Immediately behind the pilot was seated one Japanese Officer and behind him on the left side was Netaji. On his immediate right waa the petrol tank. I was behind Netaji.

Netaji got out of the plane from the left side from the front. I followed him. We had to pass through the fire in doing so. As soon as I got out, I saw that Netaji's clothes were on fire, from head to foot. I rushed to help him to remove the clothes. By the time his clothes were removed, he had sustained severe burns on his body in addition to serious head injuries received during the crash. In my opinion, petrol had dropped on his clothes from the adjacent tank during the crash. Within 15 minutes we were rushed to the nearest Nippon Army Hospital. It was about 13-00 hrs. at

the time. I also received serious head and body injuries in addition to burnt on the face and the body.

Netaji was given immediate medical attention but his condition was very serious. Nippon medical authorities did all they could in his treatment but he unfortunately expired at 21-00 hrs. (T.T.) the same day. Prior to his death he was in his senses and was quite calm. Whenever he talked to me, it was regarding India's Independence. Prior to his death he told me that his end was near and asked me to convey a message from him to our countrymen to the following effect :

"I have faught to the last for India's Independence and now am giving my life in the same attempt, Countrymen continue the Independence fight. Before long India will be free. Long Live Azad Hind."

Lt. Gen. Shidei and two other Japanese Officers had died instantaneously after the crash and all others were seriously injured,

I requested the Army authorities to arrange for the early transportation of the body either to Singapore or Tokyo, preferably to Singapore. They promised all help. I was told that arrangements for a box for the body and for the aeroplane were being made and that they had informed Saigon and Tokyo regarding the accident.

On 21-8-1945 a senior Japanese Staff Officer informed me in the hospital that the length of the box did not allow the box being put into the plane. He suggested that the body be cremated in Taihoku. Seeing no other alternative, I agreed to the suggestion and the body was cremated on 22-8-1945 at Taihoku under the arrangement of the Army authorities. The ashes were collected on 23-8-1945.

I have requested the Army authorities to arrange for the removal of the ashes to Tokyo where they can be kept in a safe place and from where at a later date they will be removed to India.

Above is the true account of the unfortunate tragedy and I have requested the authorities to keep it with the ashes so

that one day India will know the truth regarding the death of its outstanding and heroic Leader.

[Note : Photographs of the body in the box, myself seated beside, were also taken.]

TAIHOKU, TAIWAN ; (Sd) Habibur Rehman Khan,
The 24th August, 1945. Colonel

Principal points agreed to for Draft Report,
dated 30th June, 1956.

1. It was Netaji's idea to continue the struggle for the liberation of India. This was thought of by Netaji some time before Germany and Japan surrendered and Netaji had at that time told a selected few that they would sooner or later lose the war. Netaji also discussed about this point with his Cabinet members.

Since October 1944, when Netaji visited Tokyo, he carried out these intentions of his and attempted to contact the Russian Ambassador, and finally decided to go to Manchuria with that purpose in view.

2. *Whether the plane crash did take* place. The plane carrying Netaji did crash. There is no other evidence to the contrary ; the evidence should be considered carefully and in details.

3. *Whether Netaji met his death as a result of this accident.* The witnesses support this story. There is no reason why they should be disbelieved. After a lapse of about 10 years, these witnesses who belong to different walks of life and to different nationalities—Habib, an Indian and subsequently a Pakistani, and the others, who are Japanese, who are mostly unconnected with one another and no longer in the service of their Government, and Japan not being a totalitarian State—would not be expected to state what was not true.

Enquiries made subsequently by (1) British Intelligence teams operating from Delhi, (2) British and American Intelligence team operating from Tokyo, and (3) Non-official enquiry, appear to corroborate the statements of these eye-

witnesses and few others who appeared on the scene immediately after.

A peeson of the status of Netaji as Head of a State that was not only recognised by Japan, but was helped materially in every way by Japan, and *vice versa*, was not given the requisite facility and honour due to him from the very start, viz, by providing a separate plane or seats for him and for all of his associates ; treatment in a small hospital with a junior medical officer—a Captain ; manner of cremation ; disposal of ashes, etc. all without due honour and respect, viz, full military funeral, body placed on a gun carriage with full military honours etc.

4. *Cremation, Preliminaries* by the two doctor and some of the Subordinates Hospital Staff.

Main evidence by : 1) Habib. (2) Nakamura, and (3) Nagatomo—*more* or *less* corroborative. Regarding Habib —oath of secrecy may be argued only. Regarding the other two no interestedness, so their stories supporting Habib take away most of the charge against Habib for oath of Secrecy ; in what way could they be obliged to Habib ? No other manner—so body cremated.

The evidence of the doctors will have to be discussed very carefully, as it will surely be a matter of detailed criticism by eminent doctors throughout the world.

5. *Ashes* : Ashes from the crematorium to Renkoji temple is a long way—first to Nishi Honganji temple, then to Tokyo etc.

There is nothing to show that there was tempering, but to prove that they were definitely those of Netaji, much more stringent measures required by law should have been taken and a different and very strict procedure, by way of seals, guards, etc. should have been taken.

In all probability, the ashes could be said to be those of Netaji.

6. *Treasure* : Comments should be minimum.

Evidence recorded by us should be placed in a guarded manner.

We may state that out of the quantity carried by Netaji, a portion eventually was deposited in the National Archives.

We should state that this may be the subject matter of a separate enquiry and this enquiry should start from the complete assets, in cash and kind, and liabilities of the Azad Hind Government.

7, *Shri Thevar's statements and statements of Shri Goswami.* Their statements should be discussed while dealing with Netaji's death or otherwise and a little more a detail separately later on.

Draft by : Shri S. N. Maitra
Draft : 13-7-1956.
Discussion, correction and finalisation : 13-7-1956
Submission to Government of India : 16-7-1956

(Sd) S. C. Bose 2-7-56
S. N. Maitra 2-7-56
SHAH NAWAZ KHAN
2-7-56

'Copy of Telegram' dated 21st July 1956 from Indembassy, Peking, addressed to Foreign, New Delhi

Concerning alleged photograph of SUBHAS CHANDRA BOSE : We showed this to Foreign Office who have informed us that photograph is of LEE KE HUNG, Medical Superintendent of P. U. M. C. (Peking University Medical College)

List of witnesses examined by the Committee

S. No.	Name	Date	Place
1.	Shri Thevar	4th April 1956	New Delhi
2.	Shri Debnath Das	5th April 1956	New Delhi
3.	Capt. Gulzara Singh	6th "	"
4.	Col. Habibur Rehman	6th to 9th "	"
5.	Col. Pritam Singh	10th "	"
6.	Shri S. A. Ayer	11th & 12th April and morning of 14th April 1956	"

S. No.	Name	Date	Place
7.	General Bhonsle	16th April 1956	New Delhi
8.	Shri A. K. Gupta	16th „ „	„
9.	Shri Harin Shah	16th & 17th „	„
10.	Col. Thakur Singh	17th „	„
11.	Shri Mazumder	20th „	Calcutta
12.	Shri Kunizuka	23rd „	„
13.	Lt. N. B. Das	23rd „	„
14.	Shri H. K. Roy	24th „	„
15.	Shri Kalipada Dey	24th „	Calcutta
16.	„ S. M. Goswami	24th April & 9th June '56	„
17.	„ J. C. Sinha	25th April 1956	„
18.	„ Deben Das	25th „	„
19.	„ H. Singha	25th „	„
20.	Mr. Negishi	25th „	„
21.	Col. H. L. Chopra	26th „	„
22.	Shri D. N. Bose	26th April & 8th June '56	„
23.	Mrs. Pal Chowdhury M. P.	26th April 1956	„
24.	Shri A. Bose	26th April & 8th June '56	„
25.	Pandit Raghunath Sharma	28th April 1956	Bangkok
26.	S. Ishar Singh	28th „	„
27.	Shri U. C. Sharma	28th „	„
28.	„ A. C. Das	30th „	„
29.	„ Ramneo Gosai	1st May 1956	Saigon
30.	Shri A. M. Sahay	1st & 3rd May '56	Saigon
31.	Shri Dastgir	2nd May 1956	Tourane
32.	Mr. Hachiya	8th „	Tokyo
33.	Shri Narain Das	8th „	„
34.	Capt. Arai	9th May & morning of 10th May 1956	„
35.	General Isoda	10th & 12th May '56	„
36.	Mr. J. Murti	11th May 1956	„
37.	Lt. Col. Nonogaki	14th „	„
38.	Mr. Watanabe	14th „	„
39.	Dr. T. Tsuruta	15th „	„

S. No.	Name	Date	Place
40.	Mr. Sato Kazo	16th May 1956	Tokyo
41.	Major Kono	16th ,,	,,
42.	Mr. Suriya Miyata	17th ,,	,,
43.	Major Takhashi	17th ,,	,,
44.	Col. Yano	18th ,,	,,
45.	Major Kinoshita	21st ,,	,,
46.	Lt. Col. Takakura	21st ,,	,,
47.	Mr. T. Hayashida	22nd ,,	,,
48.	Dr. Yoshimi	22nd & 23rd May '56	,,
49.	Mr. Sen	22nd & 23rd May ' ,,	,,
50.	Lt. Col. Shibuya	24th May 1956	,,
51.	Capt. Yamamoto	25th ,,	,,
52.	Mrs. Yamamoto	25th ,,	,,
53.	Major Sakai	28th ,,	,,
54.	Mr. Kazo Mitshi	29th ,,	,,
55.	Mr. Nakamura	30th ,,	,,
56.	Rev. Mochizuki	30th ,,	,,
57.	Genl. Isayama	31st ,,	,,
58.	Mr. Ota Hide Maru	31st ,,	,,
59.	Mr. Miyoshi	1st June 1956	,,
60.	Major Nagatomo	1st ,, ,,	,,
61.	Mr. Kitazawa	2nd ,, ,,	,,
62.	Shri Asada	2nd ,, ,,	,,
63.	Col. Figgess	5th ,, ,,	,,
64.	Dr. Dutt	9th June 1956	Calcutta
65.	Shri Kundan Singh	19th ,,	New Delhi
66.	Shri Ramamurti	21st ,,	,,
67.	Shri A. M. N. Sastri	27th ,,	,,

[Col. T. Sakai : Written statement]
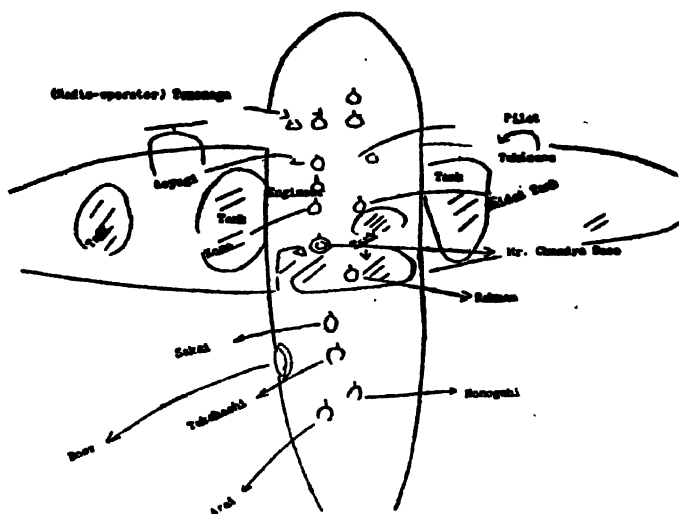
মেজর কোনোর পেশ করা বিমানের নক্সা (পৃঃ ১২৬-১৩১ দ্রষ্টব্য)
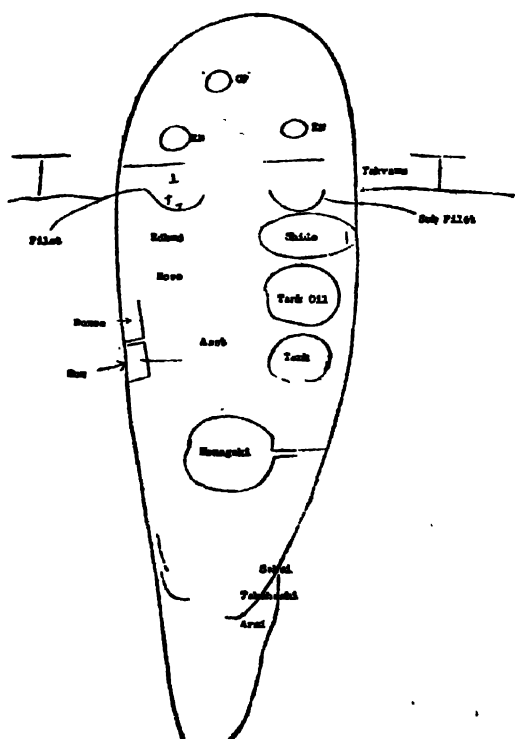
কর্নেল নোনো গাকির দেওয়া বিমানের নক্সা (পৃষ্ঠা ১২৬-১৩১ দ্রষ্টব্য)
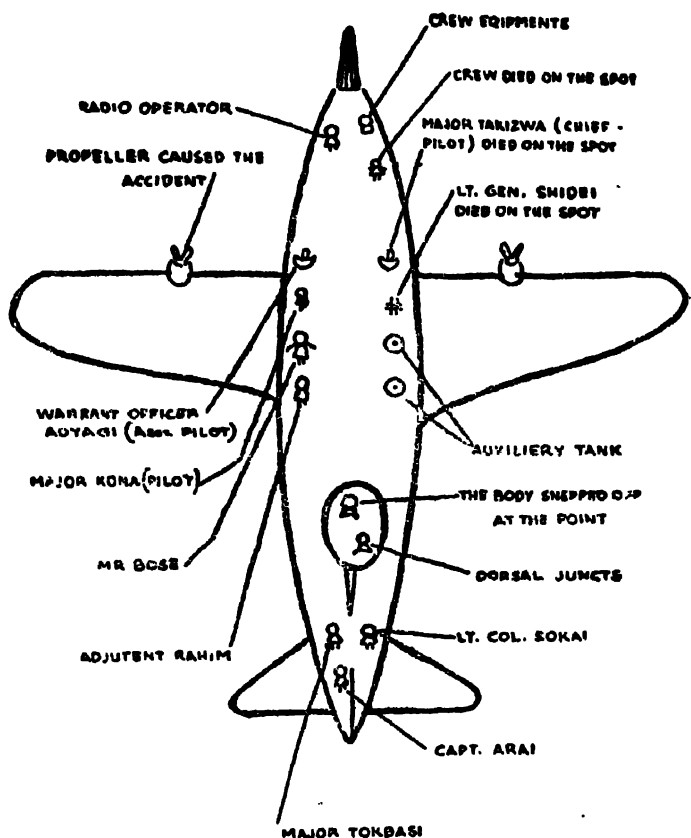
জাপ সরকার-এর দেওয়া বিমানের নক্সা

(পৃঃ ১২৬-১৩১ দ্রষ্টব্য)

SKETCH OF JAPANESE BOMBER IN WHICH NETAJI TRAVELLED FROM SAIGON TO TOIHOKU (FORMOSA)

কর্নেল রহমান-এর দেওয়া বিমানের নক্সা

(পৃঃ ১২৬-১৩১ দ্রষ্টব্য)
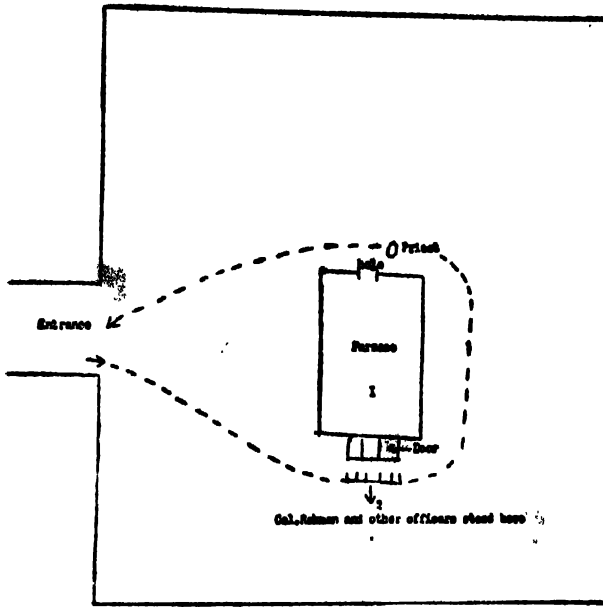
মিঃ নাকামুরা'র আঁকা দাহচুল্লীর নক্সা।
একটি দাহচুল্লী রয়েছে। (পৃঃ ৩০৯ দ্রষ্টব্য)
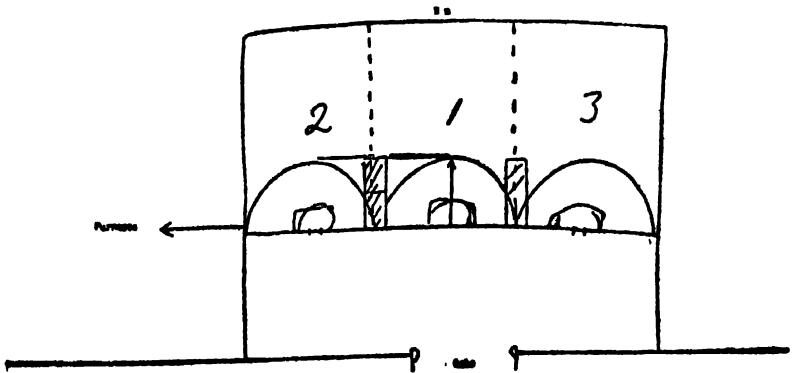
মেজর নাগাটোমো'র আঁকা দাহচুল্লীর নক্সা। তিনটি দাহচুল্লী রয়েছে।
(পৃঃ ৩০৯ দ্রষ্টব্য)
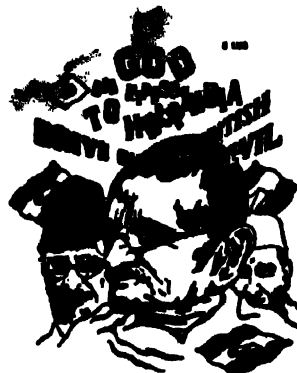
I.N.A. leaflets distributed near Imphal

ইম্ফলে বিলি করা আজাদ হিন্দ্-এর ইস্তাহার।

APPENDICES :

EXCERPTS FROM—NETAJI—THE MAN

By Dilip Kumar Roy.

"I had been staying in Bombay for well over a fortnight to raise funds for the Pandicherry Yoga-ashram of my Gurudev, Sri Aurobindo. The organisers of my concerts gave me a reception at the Cricket Club. The eminent lawyer, Bhulabhai Desai, of I.N.A. trial fame, had been asked to preside. At dinner, seated next to me, he thrilled us all with his warm tribute to Netaji.

I had heard about him a great deal and admired his impassioned and telling defence of the famous trio at the Delhi Red Fort in which he had declaimed so challengingly : "The honour and the law of the Indian National Army are on trial before this Court and the right to wage war with immunity on the part of a subject race for their liberation." But what I did not know was that he had grown overnight into an ardent admirer of Netaji. I will give here the gist of what he told me on that (for me) memorable evening.

"I am told, Sri Roy," he said without ado, "that you were one of Netaji's most intimate friends and that you were colleagues together in Calcutta and Cambridge. So I am going to tell you what you will surely be delighted to hear. You must be knowing that Netaji, like all great men, was rich in adverse critics who imputed all sorts of motives to his every act. It so happened that I had ranged myself against him with these, swelling the ranks of his political opponents. The hard-instinct, you know, is pretty difficult to resist. Thus I had grown to what the coterie in which I moved said against him—that it was a pity he wouldn't toe the line and

regretable that he talked flamboyantly about violence, armed insurrection and so on—you know the stock arguments."

"But," he went on to add, "when I was engaged as a defence counsel of the far-famed I.N.A. trio, I had, naturally, to scan and make the most of the plans and programmes of Netaji—first, through the evidence of his comrades-in-arms and, secondly, through that of the documents and records testifying to his many-sided achievements. Now, the more I came to know of him the more I was impressed till, soon enough the scales fell from my eyes and I felt deep pangs of remorse for having disparaged him in my cocksure arrogance like an irresponsible debunker of the spirit who has no sense or conception of the deeper soul-values. For it was brought home to me somewhat apocalyptically that here was no cheap firebrand patriot whose nationalism stemmed from blind fanaticism of a one-track mind or whose ardour derived from megalomania of a self-adulator. Nay: he was revealed to me in that awed moment of discovery as a far-seeing statesman, a born realist, a strategist to his finger-tips and an idealist-cum-seer who could not halt or rest on the way because he was haunted by an irresistible, almost a mystic, call he had to answer with the last drop of his freedom-hungry blood."

The I.N.A. trials which began with there of Col. Shah Nawaz, Captain Segal and Lt. Dhillon, created a great sensation throughout India. In fact they led to the discovery of the full facts relating to the formation of the Indian National Army and there was not a soul in India that was the soul-stirring, heart-rending and blood cardling tales which the experiences and exploits of the Army revealed. Day-in, day-out, the stories unfolded in the chambers of the judges.

Advocates court were eagerly read by the literate population of India and listened to with avidity by the iliterate. The radios, public, private, were much in request for the day's

development about the trials. The services rendered by Bhulabhai Desai and his colleagues, were of inestimable value. The Law Court and the freedom of expression permitted within the premises led to the elaboration of liberal and democratic theories about the rights of a subject nation to wage war for freedom. There was wide spread agitation that the trial should be suspended and the prisoners at the bar be liberated. At last, we may anticipate events, the trial concluded, the three were sentenced to transportation for life and the Commander-in-chief remitted the punishment. There was great jubilation in the Country over their release and in their tour throughout the land they were held everywhere with cries of Jaj Hind.

It may be added that the nation wide demonstration in favour of the release of the I.N.A. men undergoing trouble on the written of 1945 led to shooting in Calcutta in which 40 people died and over three hundred were injured and likewise in Bombay there was firing in which the casualties were 23 killed and some two hundred were wounded. When Captain Rashid was sentenced in the second batch (February 1946) to transportation for life and the same was commuted by the Commander-in-Chief to 7 years R. I. there were again nation-wide demonstrations including Muslims on large scale, in which in Calcutta once again 43 people were killed and some four hundred were wounder (February 1946).

On the other hand, during 1938, Netaji, who was then President of the Congress, spent some time in Bombay where he was in active contact with the German Consul. Netaji took great precaution while meeting the Consul; for example, he would go to a friend's house for lunch, after which he would retire for so rest, and all the guests would naturally depart. He would then change his dress, and put sufficient disguise to hide his indentity and go out to meet the Consul in his house of another friend, changing his taxi on his way. However, some coded message from the consul to Germany was intercepted by the British Secret service in 1938. and sent to the Government of India who managed to for-

ward it to Gandhiji through Munshi. Netaji's secret activities took Gandhiji entirely by surprise and he decided that he (Netaji) shouid not be re-elected President of the Congress. This led to his opposing Netaji's re-election and after the later was re-elected, to withhold co-operation which forced him to resign.........

What therefore, the Congress leaders did was as much due to compulsion of events, as to their conviction of this heroism of the I.N.A. prisoners. After his failure of the Simla talks the Congress prestige had reached a low level and at that time they could not attract the people with any new programme, having lost all initiative. The I. N. A. trial retrieved the situation for them, and Nehru seized the opportunity to put on a counsel's robe and appear for their defence, which was really conducted by Bhulabhai......

Excerpts from Advent of Independence
By A. K. Mazumdar.

পাঠকের মতামত

নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য সম্পর্কিত শ্রীঅভিজিৎ-এর "তাইহোকু থেকে ভারতে" একটি আশ্চর্য গ্রন্থ। গ্রন্থ নয়, প্রায়শ্চিত্ত। এক চরিত্রবীর্য মহামানবের মহত্বকে একটি তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার সুযোগ নিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ ও ভস্মীভূত করে দেবার যে চেষ্টা, এবং তাকে এক সংকীর্ণ ভস্মাধারে চিরদিনের মতো রুদ্ধ ও বদ্ধ রাখার যে 'উদ্দেশ্য প্রণোদিত কুশলী অপপ্রয়াস অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভারত-সরকার-নিয়োজিত 'নেতাজী তদন্ত কমিশ'নের অনুসন্ধানকর্মে। তার চুল-চেরা সত্যাসত্য বিচারের প্রয়োজন ছিল সমগ্র জাতির পক্ষে। শ্রীঅভিজিৎ উক্ত কমিশনের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তের পিছনের কানা-গলিতে মুক্তির আলোকসম্পাত করে স্তূপীকৃত মিথ্যার আবর্জনাকে আবিষ্কার করে ফেলেছেন। তাই বলছিলাম, এ শুধু গ্রন্থ নয়' প্রায়শ্চিত্ত।

সত্য চিরকাল স্বপ্রকাশ। নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্যের সত্য একদিন না একদিন বিস্ফোরিত হবেই। ইতিহাস ছেড়ে কথা কয় না, এক্ষেত্রেও কইবে না। আমার বিশ্বাস, শ্রীঅভিজিৎ-এর এই গ্রন্থ অনেক গবেষককে অনুপ্রাণিত করবে।

সাধারণ পাঠকদের কাছে বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এহেন গ্রন্থেও রোমাঞ্চমিশ্রিত ভ্রমণকাহিনী অথবা কপোলকল্পিত চটুল কাহিনীবিন্যস্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্বাদ না খোঁজেন।

সরিৎশেখর মজুমদার
৫২, নন্দনী পার্ক,
কলিকাতা-৩৪

প্রিয় বিশ্বজিৎ বাবু,

'তাইহোকু থেকে ভারতে' পড়িলাম। এ সম্বন্ধে আমার মন্তব্য আপনাকে জানাইতেছি।

"রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত শা'নওয়াজ কমিটির অসঙ্গতি-কণ্টকিত মন্তব্য, তাইহোকু বিমান-দুর্ঘটনার ফলে নেতাজীর দেহান্ত হইয়াছে, ভারতবর্ষ স্বীকার করিয়া লয় নাই।

এই অস্বীকৃতিকে প্রাণবন্ত রূপ দিয়াছেন শ্রীমান অভিজিৎ; সুনিপুণ ঘটনা-বিন্যাসেও বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রয়োগে তাহাকে মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছেন। জাতি ও ইতিহাসের সেবায় শ্রীমানের এই সার্থক প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাই।"

শ্রদ্ধা, প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করিবেন। ইতি—

স্নেহধন্য
শ্রীব্যোমকেশ দে
জয়নগর—মজিলপুর,
২৪ পরগণা।